বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৬

Class No. 080
বর্গ সংখ্যা সা. প.
Book No.
স্থানাঙ্ক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
স
তাং
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
সং
তাং
কলিকাতা

অষ্টমভাগের সূচী।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
অর্জ্জুন-সংবাদ	শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ...	২৬২
আর একখানি প্রাচীন দলীল ...	পত্রিকা-সম্পাদক	৮
কাশীরাম দাস	"	১৩
চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ ...	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় শ্রীনবকান্ত কবিভূষণ	১৫০
দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত ...	শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১৫
প্রাচীন পুঁথির বিবরণ	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৩০
ঐ	শ্রীরাজীবলোচন দাস	৪৪
ঐ	পত্রিকা-সম্পাদক	৪৮
বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দ ...	শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৭
বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৭
ঐ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২২৯
বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ...	শ্রীশিবচন্দ্র শীল	১৮৬ ২
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১
ঐ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ...	২০১
বাঙ্গালা শব্দতত্ত্ব	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২৩
বাঙ্গলার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য ...	শ্রীকালিদাস নাথ	২৫
ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা ...	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	
লালা উদয়নারায়ণ রায়	শ্রীদুর্গাদাস রায়	২৪
শব্দ-সংগ্রহ	৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ...	৭
সত্যদেব-সংহিতা	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫
সত্যনারায়ণ-কথা	ঐ	
সত্যনারায়ণের পাঁচালী	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল	
সম্পাদকীয় মন্তব্য	পত্রিকা-সম্পাদক	২

অষ্টম ভাগ] [প্রথম সংখ্যা ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যেই ইঁহাদের অধিকাংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গীয় বালকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত এবং তাঁহাদের অভিভাবকগণের পয়সা অপহরণ করিতেছেন। এতগুলি ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই; কারণ সমস্ত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলিই দুই শ্রেণীর লোক কর্ত্তৃক দুই প্যাটেণ্টে প্রস্তুত হইতেছে; একটি মুগ্ধবোধ-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি-প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার মাষ্টারগণ। এক প্যাটেণ্টের গ্রন্থ খুলিলেই বর্ণের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; অপর প্যাটেণ্টের ব্যাকরণ খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, শব্দসমূহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—বিশেষ্য বিশেষণ সর্ব্বনাম ক্রিয়া ও অব্যয়। ক্রমে এক প্যাটেণ্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জ্জমা, আর এক প্যাটেণ্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জ্জমা। বাঙ্গালাটা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, উহা যে পালি মাগধী অর্দ্ধমাগধী, সংস্কৃত পার্সি ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেণ্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। সে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ। তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই; বহুদর্শিতার নামও নাই। উদাহরণ দেখুন,—সংস্কৃত-ব্যাকরণকারেরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, পদরাশিকে দুই ভাগে ভিন্ন বিভক্ত করা যায় না। সেই জন্য তাঁহারা লিখিলেন—পদ দুই প্রকার—সুবন্ত ও তিঙন্ত। তাঁহাদের সংস্কার 'নাপদং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত' বিভক্তিযুক্ত না হইলে ধাতু ও শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা যায় না; সুতরাং ধাতুর উত্তর তিবাদি বিভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার শব্দের উত্তর সুবাদি বিভক্তি হয়, এই তাঁহাদের ব্যবস্থা; তাঁহারা অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি করিয়া লোপ করিবেন; কিন্তু বিনা বিভক্তিতে শব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলিলেন, অব্যয়ের উত্তর বিভক্তি হয় না। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে, 'রাম রাবণকে মারিলেন' 'কেশব আম খাইলেন' এ সকল স্থলে 'রাম', 'কেশব' ও 'আম' কেন অব্যয় শব্দ হইবে না, তাহা হইলেই ব্যাকরণকারেরা অবাক্। তাহারা দেখিয়াছেন সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি দেন;

সুতরাং তাঁহাদিগকে বিভক্তি দিতে হইবে। তাঁহারা দেখিয়াছেন ইংরেজি ব্যাকরণকারেরা parts of speech দেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে তুই দিতে হইবে। নৈলে বাহাদুরী হয় না, বৈ বিক্রী হয় না; কিন্তু তুই রকম ব্যাকরণ হইতে তুই রকম নিয়ম চুরি করিয়া নিজের বিদ্যা প্রকাশ হইয়া গেল, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না: আবার দেখুন সংস্কৃত ব্যাকরণে বিভক্তি স্বতন্ত্র জিনিস, কারক স্বতন্ত্র জিনিস। কারক অর্থসাপেক্ষ, বিভক্তি শব্দসাপেক্ষ। সংস্কৃতে অনেকগুলি বিভক্তি আছে, অনেকগুলি কারক আছে; কারক ভিন্ন নানা সম্বন্ধে নানা কারণে নানা বিভক্তির উৎপত্তি হয়; সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণে কারক ও বিভক্তি তুইটি স্বতন্ত্র রাখা প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃতে কারকের লক্ষণ স্বতন্ত্র; ক্রিয়ার সহিত অন্বয় না হইলে কারক বলা যায় না; কিন্তু ইংরেজিতে Case এর লক্ষণ অন্যরূপ; নাউনের কণ্ডিশন্ দেখাইয়া দিলে Case হয়; সুতরাং Caseএ ও কারকে আকাশ পাতাল তফাত। ইংরেজিতে পসেসিভ্ কেস্, সংস্কৃতে উহা কারক নহে; কিন্তু অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণে সম্বন্ধ পদ কারক রূপে বিরাজ করিতেছেন। ইংরেজিতে বিভক্তি বলিয়া জিনিস এক। পসেসিভের আপষ্ট্রফি এস্ আছে, আর বহুবচনে কিছু পরিবর্ত্তন আছে; সুতরাং কর্ম্মবাচ্যস্থলে ইংরাজিতে মোটামুটি কর্ত্তাকে নমিনেটিভ্ কেস্ই বলে; কিন্তু সংস্কৃতে কর্ম্মবাচ্যের সব্‌জেক্টকে ঐরূপে কর্ত্তা-কারক বলিলে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত হয়; কিন্তু আমরা তুই চারি খান ব্যাকরণ দেখিয়াছি তাহাতে একেবারে বিভক্তির নাম নাই। মাঝে মাঝে আছে, কর্ত্তা কারকে অধিকরণ কারক হয়, যথা,—'ছাগলে পাতা খায়'; করণকারকেও অধিকরণ কারক হয়; যথা 'ছুরিতে কাটে' 'মুখে খায়' ইত্যাদি। এইরূপে কারক ও বিভক্তিতে গোলযোগ করিয়া অনেক ব্যাকরণেই ছেলেদের মনে একটা ত্রাস জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি বিভক্তি ও কারক স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের কার্য্য লক্ষণ প্রয়োগ প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে দেখাইয়া দেওয়া যায়, কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ শব্দের যোগে কোন্ বিভক্তি হয়, কোন্ অর্থে কোন্ বিভক্তি হয়, এইগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিলে প্রণালীশুদ্ধরূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বিভক্তির আকার লইয়াই কত গোলযোগ আছে। কেহ লিখিলেন, বিভক্তির আকার এইরূপ :—

প্রথমা	:	রা
দ্বিতীয়া	কে রে য় তে	দিগকে দের
তৃতীয়া	দ্বারা	দিগের দ্বারা
	দিয়া এ য়	দিগকে দিয়া
চতুর্থী	কে	দিগকে
পঞ্চমী	হইতে	দিগের হইতে
	থেকে	দিগের থেকে

ইত্যাদি। কেহবা প্রথমার বিসর্গের পরিবর্ত্তে ফাঁক দিয়া থাকেন। সংস্কৃতে যেমন বিভক্তির রূপগুলি আছে, বাঙ্গালায় সেইরূপ থাকা চাই, নহিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি 'দ্বারা' 'দিয়া' বিভক্তি হইল কিরূপে? শব্দের সঙ্গে জমাট না বাঁধিলে বিভক্তি হয় না। 'আমাদিগের দ্বারা' 'আমার দ্বারা' দিব্য সম্বন্ধ পদ রহিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব উহা বিভক্তি? 'ছুরি দিয়া কাটিবে' এস্থলে 'দিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়া; কর্ম্ম 'ছুরি'; কি বলিয়া 'দিয়া' কে করণের বিভক্তি বলিব? অথচ সকল ব্যাকরণেই দেখি 'দিয়া' করণের বিভক্তি। কেমন করিয়া বলিব ব্যাকরণকারেরা ব্যাকরণ লিখিবার সময় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করেন। তাহার পর আবার 'দিগকে' বিভক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু 'দিগকে' কি আমরা কখনও ব্যবহার করি? পশ্চিম রাঢ়ে 'দিগ্‌গে' একটা কথা আছে বটে; আমাদেরও পুরাণ দলিলাদিতে 'আমার দিগরের' দেখিতে পাই বটে; কিন্তু 'দিগকে' কখনও দেখিতে পাই না, কখনও বলিও না। যখন 'আমার দিগরকে' ব্যবহার করিত, তখন 'দিগর' বিভক্তি ছিল না। 'দিগর' পারস্য শব্দ—অর্থ গণ। যদি বিভক্তি বলিতে হয়, যে টুকু জমাট বাঁধে, সেই টুকু 'দের।' বিভক্তি বলিতে গেলে 'দের' কেই বলিতে হয়। কিন্তু সে 'দের' কর্ম্মের বিভক্তি, সম্বন্ধের বিভক্তি, অধিকরণেরও বিভক্তি।

অনেক প্রাকৃত ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক নাই, বাঙ্গলায়ও সম্প্রদান কারক নাই; কিন্তু মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্টই হউক, আর হাইলি প্যাটেণ্টই হউক, উভয় প্রকার ব্যাকরণেই সম্প্রদান কারকের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। দুই এক খানি ব্যাকরণে "ধোপাকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান কারকের উদাহরণ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' যে সম্প্রদান হয় না, আর তা লইয়া যে সংস্কৃত ব্যাকরণকারেরা অনেক মাথা কুটাকুটি করিয়া গিয়াছেন, তাহা শোনেই বা কে আর পড়েই বা কে। বাঙ্গালা ব্যাকরণকার দেখিলেন, দান ক্রিয়ার কর্ম্মকেই সম্প্রদান বলে; সুতরাং রজক কেন সম্প্রদান হইবে না? সংস্কৃত ওয়ালারা বলেন, স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপত্ত্যনুকূল ব্যাপারকে দান বলে; রজককে যে বস্ত্র দেওয়া গেল. তাহাতে স্বস্বত্বেরও ধ্বংস হইল না, পরস্বত্বেরও উৎপত্তি হইল না; তবে রজককে বস্ত্র দান করা হইল কিরূপে, রজকই বা সম্প্রদান হইল কিরূপে?

তার পর সন্ধি—বাঙ্গালা ব্যাকরণ খুলিলেই চতুর্থ বা পঞ্চম পত্রেই সন্ধি আরম্ভ—'অকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়—আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়'। সুবুদ্ধি বালক যদি জিজ্ঞাসা করে 'রাম আইস' এ স্থলে 'রামাইস' কেন হইবে না, 'তখন অবিনাশ বলিল' 'তখনাবিনাশ বলিল' কেন হইল না, পণ্ডিত মহাশয় নিরুত্তর। সংস্কৃত ব্যাকরণে পদান্ত সন্ধি আছে; সুতরাং কোন কোন ব্যাকরণকার সংজ্ঞাপ্রকরণের পরেই সন্ধি আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় পদান্ত সন্ধি নাই, সুতরাং ব্যাকরণের প্রথমেই সন্ধি থাকা উচিত নহে; থাকিলেই "পাঁচ পণ বিচালি কিনিলাম, তথাপ্যাকচালাখানা বাঁধা হইল না" এইরূপ প্রয়োগ হইবে। বাস্তবিকও বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমে সন্ধি দেওয়া কেবল চিন্তা-

শূন্যতার পরিচয়। সংস্কৃতে লিখিত কাশ্মীরী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ সম্প্রতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রথম দুইটি সূত্র "সন্ধিঃ পদেষু" "ন বাক্যেষু"। কাশ্মীরীদের যে সুবুদ্ধিটুকু আছে, বাঙ্গালীর সেটুকু নাই; অনেক ব্যাকরণে "পদের অন্তে স্থিত নকারের পর ল থাকিলে নকারের স্থলে ল হয় এবং অনুনাসিকত্বসূচক চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয়; যথা,—বিদ্বাঁল্লিখতি" এইরূপ সূত্র ও পদ আছে। আবার "পদের অন্তস্থিত একার অথবা ওকারের পর অকার থাকিলে অকারের লোপ হয় ও লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে"। বলুন দেখি, এসকল ব্যাকরণকারকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়!

কেহ কেহ বলিবেন, যদি ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি না দাও, তাহা হইলে 'যদ্যপি' 'অদ্যাপি' 'অতএব' 'ইতস্ততঃ' ইত্যাদি স্থলে বালকে কিরূপে জানিবে যে এস্থলে সন্ধি আছে। তাহার উত্তর এই যে এরূপ স্থলইত অতি অল্প; তার পর সে গুলি সন্ধিতে জমাট করা জিনিস সংস্কৃত হইতে পাইয়াছি এবং আমরা তাহাকে একপদরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকি। উহা ভাঙ্গিবার জন্য ইচ্ছাও হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না, প্রয়োজনও নাই। আর যদি ঐ কটা সংস্কৃত শব্দের জন্যই ব্যাকরণের গোড়ায় সন্ধি শিখিতে হয়, তাহা হইলে অমন অনেক জমাট বাঁধা ইংরেজি শব্দ আমরা বাঙ্গালায় ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার জন্যওত সন্ধির সূত্র রাখা প্রয়োজন, যথা,—'মানোয়ারি গোরা'। এইরূপ পার্সী শব্দেরও করিতে হয়, যথা,—'সিরাজ উদ্দৌলা' 'নিজাম উল্‌মুলুক্' ইত্যাদি। হিন্দীশব্দেরও করিতে হয়; ফরাসীশব্দেরও দিতে হয়।

বাঙ্গালায় সমাস হইলে অনেক পদ একত্র করিয়া এক পদ হইলে সন্ধি হয়, একথা অনেকে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা বলি সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্যত্র সমাসেও সন্ধি হয় না; যথা, —'রেল ওয়ে' 'কমল আঁখি' 'জ্যাকেট আস্তেন' 'নিলাম ইস্তাহার' 'বাঙ্গালা ইতিহাস' 'সংস্কৃত অভিধান' 'বাঙ্গালা অভিধান' 'তুমি আমি' ইত্যাদি। তবে যে সকল সমাস করা পদ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি থাকে; যথা 'মহাশয়' 'দেবালয়' 'বিদ্যালয়' 'কুশাসন' ইত্যাদি। তবেই নিজ বাঙ্গালা ভাষায় সমাসেই হউক আর অসমাসেই হউক, সন্ধির দরকার নাই। তবে সন্ধির আর এক দরকার হইতে পারে কৃতে ও তদ্ধিতে; এখানেও সেই কথা; যে সকল শব্দ সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তাহাতেই সন্ধি আছে, নিজ বাঙ্গালায় নাই। তদ্ধিত যথা—'বাড়ীওয়ালা' 'ঘড়ী ওয়ালা'; কৃৎ যথা—'দেওন' 'লওন' 'লইয়া' 'খাইয়া' ইত্যাদি। সুতরাং সন্ধি জিনিসটা খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণে একেবারেই দরকার নাই। সংস্কৃত হইতে যে সকল শব্দ আসিয়াছে, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শব্দ বলিয়াই ব্যবহার করিব। যাঁহাদের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ুন।

সংস্কৃতজ্ঞেরা বলিবেন, বাঙ্গালায় সব শব্দই সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে অথবা এত অধিক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে আসিয়াছে, যে সংস্কৃত ব্যাকরণ একবারেই ছাড়িয়া দিবার যো নাই।

আমরা একথা স্বীকার করি না। লিখিত ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকরণে সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি কিছু বেশী হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাষা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি 'তেল' শব্দ সংস্কৃতে 'তৈল', প্রাকৃতে 'তেল্ল', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'তেল'। আমরা যদি 'তেল' লিখি, চণ্ডী অশুদ্ধ হইবে কেন? যদি অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যবস্থা শুনি, তাহা হইলে 'তৈল' শব্দ প্রয়োগ করিলেই অপ্রযুক্তত্ব দোষ আসিয়া পড়িবে। 'কাজ' শব্দ প্রাকৃত 'কজ্জ' শব্দ হইতে উৎপন্ন; এখনকার পণ্ডিতাভিমানীরা সংস্কৃত 'কার্য্য' শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া 'কায' অন্তঃস্থ য দিয়া বানান করেন, এ জায়গায় পাঠকবর্গ বলুন দেখি 'জ' শুদ্ধ না 'য' শুদ্ধ। আমরা ছেলেদের যাদু বলিয়া আদর করিয়া থাকি; পণ্ডিতদিগের সংস্কার উহা যাদব শব্দ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তাঁহারা 'যাদু' লিখিয়া থাকেন; কিন্তু যাদব শব্দ হইতে ছেলেদের আদর অর্থ আসে কেমন করিয়া? আসিবার ত কোন সম্ভাবনাই নাই। যদুবংশে উৎপন্ন বলিলে যদি আদর হয়, তবে রঘুবংশে উৎপন্ন বলিলে আদর হইবে না কেন? বাস্তবিক 'জাদু' শব্দটি 'যাদব' হইতে উৎপন্ন নহে; সংস্কৃতে ছেলেদের আদর করার জন্য 'জাত' একটি শব্দ আছে, প্রাকৃতে উহা 'জাদ' হয়, তাহা হইতেই বাঙ্গালায় 'জাদু' হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ য দিয়া 'যাদু' লিখিলে খাঁটি ভুল হইয়া যায়। অনেক স্থলে সংস্কৃত ও প্রাকৃতমূলক দুটি শব্দ একই অর্থে বাঙ্গালায় চলিত আছে, আমরা লিখিবার সময় সংস্কৃতমূলক শব্দটি ব্যবহার করি, আর কথা কহিবার সময় প্রাকৃতমূলক শব্দটি ব্যবহার করি—'অদ্য'—'আজ' 'কল্য'—'কাল'; কেন, 'আজ' 'কাল' লিখিলে কি অর্থ পরিষ্কার হয় না? আমরাত দেখি অর্থের কোন ব্যত্যয়ই হয় না; তবে কেন সাধ করিয়া চলিত শব্দ ত্যাগ করি, আর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া ছেলেদের মানের বইএর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দিই। গোড়ায়ত সেই আহাম্মুকি করি, আবার শেষ রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ সন্ধির সূত্র মুখস্থ করিয়া মরি।

শব্দবিভাগ সম্বন্ধে একটি কৌতুকের কথা মনে পড়িয়া গেল। এক জন সুবুদ্ধি বাঙ্গালা-ব্যাকরণকার প্রাতিপদিকের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া দেখিলেন, একজাতীয় শব্দ বিভক্তি-যুক্ত হইলেও বিকৃত হয় না, আর এক জাতীয় শব্দ বিকৃত হয়; যাহারা বিকৃত হয় না, সংস্কৃতে তাহাদের অব্যয় বলে, সেইজন্য যাহারা বিকৃত হয়, তিনি তাহাদিগকে সব্যয় বলেন। সব্যয় শব্দ না আছে সংস্কৃতে, না আছে বাঙ্গালায়! যদিবা সংস্কৃতে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলেও উহার অর্থ তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা কোনক্রমেই হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক বিভক্তিতে বাঙ্গালা শব্দের কোন বিকারই হয় না, সেগুলিও তবে অব্যয় হইয়া যাউক। বাস্তবিক বাঙ্গালায় তিন চারিটি বই বিভক্তি নাই। তাহার মধ্যে আবার 'এ' বিভক্তিটি সকল কারকেই হয়, সুতরাং সংস্কৃতের মত প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি এবং একবচন, বহুবচন করিয়া একটা লম্বা গাছ আঁকিবার প্রয়োজন কি? ইংরেজিতে বিভক্তি দুটি বই নাই, বাঙ্গালায় চার পাঁচটি আছে, সুতরাং বিভক্তিটা একেবারে লোপ

করিলে চলিবে না। বিশেষ যখন বিভক্তি শব্দের অঙ্গ ও কারক অর্থের অঙ্গ, তখন ও দুটা বাল্যকাল হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

বাঙ্গালা ব্যাকরণকারদিগের অতি অদ্ভুত আবিষ্কার 'মিশ্র ক্রিয়া'। তাঁহারা বলেন 'আহার করা', 'প্রচার করা' এ সকল 'মিশ্র ক্রিয়া', অর্থাৎ ক্রিয়াটার খানিকটা বিশেষ্য ও খানিকটা ক্রিয়া; দুইএ মিশিয়াছে, বলিয়া উহার নাম মিশ্র ক্রিয়া। পাণিনির চৌদ্দপুরুষেও এত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা বলেন, যদি 'আহার করা' ক্রিয়া না হয়, তবে 'অন্ন আহার করিতেছেন' এস্থলে 'অন্ন' কর্ম্মকারক কিরূপে হইবে? সুতরাং মিশ্র ক্রিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 'করে' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'আহার', 'অন্ন' ঐ ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারে না; 'অন্ন' পদটি 'আহার' এই কৃদন্ত পদের কর্ম্ম। সংস্কৃতে যেমন কৃদন্ত পদের কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়, বাঙ্গালায় সেইরূপ কৃদন্ত পদের কর্ম্মের রূপান্তর হয় না। কিন্তু পণ্ডিত-মানীরা বাঙ্গালার শক্তি যে সংস্কৃতের শক্তি হইতে বিভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে সাহস করেন না, সুতরাং 'আহার' এই কৃদন্ত ক্রিয়ার কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় নাই দেখিয়া 'আহার' টাকে শুদ্ধ ক্রিয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। দুই এক জন বাঙ্গালা লেখক এরূপ স্থলে 'অন্নের আহার করিতেছেন' এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন!

এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে "আহার করিতেছেন" বা "অন্ন আহার করিতেছেন" এ ত সাধুভাষা বা কেতাবী ভাষা, আমরা কি সচরাচর এরূপ কথা বলিয়া থাকি? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি 'তিনি খাইতে বসিয়াছেন' বা "তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন"। কিন্তু আমাদের এমনই রোগ যে যাহা সচরাচর ব্যবহার করি, তাহা লিখিতে চাহি না। "Familiarity breeds contempt", কিন্তু এই contempt সম্পূর্ণ অমূলক; উহাদের দ্বারা ভাষার ক্ষতি হইতেছে বই বৃদ্ধি হইতেছে না। উহাতে একার্থ-বোধক বহুতর শব্দ ভাষায় জমিয়া যাইতেছে, বহুতর ভাব সংগৃহীত হইবার পথে কণ্টক হইতেছে। বালকেরা নিরর্থক কতকগুলা শব্দ ও তাহার অর্থ মুখস্থ করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রথমেই শব্দের উচ্চারণস্থান ও নিয়ম বলিয়া একটি অধ্যায় আছে; কিন্তু এ অধ্যায়ের কিছুই প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণে এ অধ্যায়টি নহিলে চলে না, কারণ তাহাতে সবর্ণ ও অসবর্ণ ভেদের প্রয়োজন; সেই জন্য বোপদেব বর্ণের উচ্চারণ স্থান দিয়া বলিলেন "এষাং যো যেন সমঃ স তস্য তত্র ততঃ"। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণে কোথায়ও সবর্ণ শব্দেরও প্রয়োগ দেখি না। অথচ উচ্চারণস্থান সম্বন্ধে মুগ্ধবোধকে অনেক দূর ছাড়াইয়া গিয়াছে; মুগ্ধবোধে স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণের, অন্তঃস্থ স্পর্শ উষ্ম প্রভৃতির উল্লেখ নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে এ সকল না থাকিলে এ অধ্যায়ই হয় না। মুগ্ধবোধকার, কেন অমুক শব্দ অমুক স্থান হইতে উচ্চারিত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যান নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক সময়ে অনেক কৌতুক-

কর ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। এক জন লিখিয়াছেন,শ ষ স এবং হ উষ্মবর্ণ, কারণ এই সকল বর্ণের উচ্চারণ কালে মুখ দিয়া **গরম বাতাস** নির্গত হয়। অনুস্বার ও বিসর্গ অযোগবাহ বর্ণ, কারণ উহারা যে স্বরবর্ণের পরে থাকে, তাহাদেরও যে উচ্চারণস্থান, উহাদেরও সেই উচ্চারণস্থান। "অযোগবাহ" শব্দের পাণিনি ভিন্ন অন্য কোনও সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রয়োগ নাই। 'অযোগ' অর্থাৎ শিবসূত্র সমূহে যোগ নাই, অথচ 'বাহ' অর্থাৎ ব্যাকরণের কার্য্য নির্ব্বাহক, পাণিনির এই অর্থ। বাঙ্গালা ব্যাকরণকারেরা যে অর্থ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা বলি বাঙ্গালা ব্যাকণে এ অধ্যায়টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। সপ্তমবর্ষীয় বালকেরা শিক্ষকের শাণিত বেত্রাঘাতে এ অধ্যায়টি অতি কষ্টে মুখস্থ করে; কিন্তু ব্যাকরণের কোথায়ও ইহার একটা প্রয়োগও পায় না।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের আর একটা বিস্‌মোল্লায় গলদের কথা বলি—তাঁহারা বলেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতেছি; কিন্তু লক্ষণ লেখেন "যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ"; অর্থাৎ সংস্কৃত 'ব্যাকরণ' শব্দ ব্যবহার করেন; কিন্তু লক্ষণ দেন ইংরেজি গ্রামারের। সংস্কৃত ব্যাকরণ শব্দের অর্থ "ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন" অর্থাৎ "ইটিমলোজি—ডেরিভেশন্"। বাস্তবিকই মুগ্ধবোধাদিতে পদটি তৈয়ার করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যাকরণের কার্য্য; ইংরেজিতে যাকে Syntax বলে, সে সম্বন্ধে ব্যাকরণকারেরা বড় ব্যস্ত নহেন। ইংরেজি গ্রামার কি সচরাচর পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—অর্থোগ্রাফি, ইটিমলোজি, সিণ্ট্যাক্স, পংচুয়েসন্ এবং প্রস. সময়ে সময়ে উহাতে Figures of Speech এবং "Composition" ও থাকে; সংস্কৃতে কিন্তু Orthographyর জন্য শিক্ষা নামে শাস্ত্র, Syntaxএর জন্য বাদার্থ, "Prosody"র জন্য ছন্দঃ শাস্ত্র, Figures of Speech এর জন্য অলঙ্কার শাস্ত্র আছে; Punctuation ও Composition এর জন্য সংস্কৃতে স্বতন্ত্র শাস্ত্র নাই। ব্যাকরণ শুদ্ধ Etymology মাত্র; সেই ব্যাকরণকে Grammar এর লক্ষণে লক্ষিত করা উচিত কি না, সহজেই বোধ করা যাইতে পারে। অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণকারের এবিষয়ে উদ্বোধ হইয়াছে; এজন্য তাঁহারা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' না লিখিয়া 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব', 'বাঙ্গালা ভাষাবোধ' প্রভৃতি নাম দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এবার কতকগুলি স্থূল বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম; বারান্তরে বিস্তারিত বর্ণনার বাসনা রহিল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আর একখানি প্রাচীন দলীল।

১৩০৬ সালের চতুর্থসংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় একখানি প্রাচীন দলীলের প্রতিলিপি প্রকাশ করা গিয়াছিল। নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানিও সেই একই ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। পত্র দুইখানির তারিখে কিছু তফাত আছে। সে খানার তারিখ ১১২৫ সাল ৫ই ফাল্গুন; এখানির তারিখ ১১৩৮ সাল বৈশাখ। স্বাক্ষরকারীর ও সাক্ষীর নামেও কতক কতক তফাত আছে। এই দ্বিতীয় পত্রখানি জেমো (কান্দি) বিশ্বাসপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে উহা অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হইল। ইহার স্বতন্ত্র টিপ্পনী অনাবশ্যক। ইতি।

শ্রীশ্রীহরি।

শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ
শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীবল্লবীকান্ত দেবশর্ম্মণ

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ
শ্রীশ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভু
সধর্ম্মান্বিত শ্রীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরাবরেষু

শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ
শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ
শ্রীসাহেব পঞ্চানন দেবশর্ম্মণ
প্রভুসন্তান বর্গেষু

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং সুপুর তস্যপর শ্রীরাসানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং লোতা তস্যপর শ্রীমদনমোহন দেবশর্ম্মণ সাং সুদপুর তস্যপর শ্রীমুরলীধর দেবশর্ম্মণ সাং শ্রীপাট খড়দহ তস্যপর শ্রীবল্লবিকান্ত দেবশর্ম্মণ সাং বিরচন্দ্রপুর তস্যপর শ্রীসাহেব পঞ্চানন দেবশর্ম্মণ সাং গএষপুর তস্যপর শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবশর্ম্মণ সাং কানাইডাঙ্গা প্রভু সন্তবর্গেষু।

ইস্তফা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺ স্বকীয় ধর্ম্মের পর আখেজ করিয়া ৺ বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড় মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেয়ায় জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগবিজয় বিচার করিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতসাহি মনসবদার সমেত গৌড় মণ্ডলে আশীয়াছিলেন এবং আমারা সর্ব্বে থাকীয়া সধর্ম্ম উপরি বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগবিজয়

বিচার করিলেন এবং শ্রীনবর্দ্দিপের সভাপণ্ডীত এবং কাশীর সভাপণ্ডীত এবং সোনারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডীত এবং উৎকলের সভাপণ্ডীত এবং ধর্ম্মঅধীকারি ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব সোল আনা একত্র হইয়া শ্রীমৎ ভাগবত সাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোস্বামীদিগের ভক্তিসাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টিকা ও তোসনী লইয়া শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমারা থাকিয়া ছয়মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভুত হইয়া স্বকিয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই পরক স্বংস্থাপন করিতে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন আমারাও দিলাম সে পত্র পুনরায় পাঠাইলাম শ্রীবৃন্দাবনে জয়নগরে তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন পরকীয় ধর্ম্ম সে দেষে ও সেখানে সভাপণ্ডীত লইয়া ও দেবালস্থ আদি একত্র হইয়া তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক বিচার গৌড়মণ্ডলে পাঠাইলেন অতএব গৌড়মণ্ডলে পরকীয় ধর্ম্ম স্বংস্থাপন হইল পরকীয় ধর্ম্ম অধীকারি তোমাকে করিয়া পাঠাইলেন এবং শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন হইতে সিরোপা তোমাকে আইল আমারা পরাভুত হইয়া বাঙ্গালা উড়স্যা ও সোবে বেহার এই পঞ্চ পরিবারে বেদাও শ্রীমদজীব গোস্বামী ও শ্রীযুত নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীযুত ঠাকুর মহাশয় শ্রীযুত আচার্য্য ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ গোস্বামী এই পঞ্চ পরিবারের উপর বিলাত সম্বন্ধে ইস্তফা দিলাম পুনরায় কাল কাল ও বিলাত সম্বন্ধে অধীকার করি তবে শ্রীশ্রী৺তে বহিভূত এবং শ্রীশ্রী৺ সরকারে গুণাগার এতদর্থে, তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাও ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ

শ্রীকৃষ্ণদেব দেবশর্ম্মণ
সাং জয়নগর

এই পত্রে শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য অজয়পত্রমিদং আগীহ স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেওায় জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মের পরওানা লইয়া গৌড়মণ্ডলে স্বকীয় সংস্থাপন করিতে আশীয়াছিলাম এবং শ্রীযুত পাতসাহার হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌড়মণ্ডলে সর্ব্ব সুদ্ধা স্বকীয় সিদ্ধান্তের জয়পত্র ইয়া আশীয়াছিলাম মালিহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্ম বিচার ক মত করিলাম এবং শ্রীমৎ ভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺ গোস্বামীদিগের স্ত্র লইয়া সিদ্ধান্ত মতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না ইহাতে পরাভুত

হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং সিস্ত হইলাম ইতি সন ১১৩৭ সাল নি বাং সা
সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ

ইসাদী

শ্রী৺অদ্বৈত গোস্বামী	মহান্ত সন্তান
সন্তান	
শ্রীকা[illegible]চান্দ দেবশর্ম্মণ	শ্রীবক্রেরস্বর দেবশর্ম্মণ
সাং শ্রীপাট সান্তিপুর	সাং বসতপুর
শ্রীকৃষ্ণকীশোর দেবশর্ম্মণ	শ্রীআত্মারাম ঠাকুর
সাং বাবলা	সাং কুলীনগ্রাম
শ্রীকৃষ্ণরাম দেবশর্ম্মণ	শ্রীলালাজীউ দেবশর্ম্মণ
সাং নবদ্বীপ	সাং মালিপাড়া
শ্রীসাহেব পঞ্চানন শর্ম্মণ	শ্রীদর্পনারায়ণ রায় কানুনগো
সাং বাহাদুরপুর	সাং কাশীমহাট পুখরিয়া
শ্রীনারায়ণ দেবশর্ম্মণ	শ্রীসম্ভুনাথ মিত্র
সাং নাসিগ্রাম	সাং চুনাখালী
শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবশর্ম্মণ	শ্রীদামোদর ঘোষ
সাং শোনারগ্রাম বিক্রমপুর	সাং কুরড় পাড়া
শ্রীব্রজভূষন দুবে	শ্রীসেখ কাজী সদরদ্দীন
সাং বিষ্ণুপুর রামডিহা	সাং কুড়ারিয়া
শ্রীরাধাবল্লভ দাস	শ্রীসৈএদ করমউল্লা
সাং বিষ্ণুপুর	সাং চোঘরিয়া

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা।

কতকগুলি নিয়ম বিভিন্ন ভাষায় এক ভাবে কার্য্য করিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পূর্ব্ব প্রবন্ধে একই শব্দের অর্থের একই ভাবে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং metal (mettle), error এবং lust এই তিনটী ইংরাজী শব্দের অনুরূপ 'ধাতু' (ধাত) 'ভ্রমণ' (ভ্রম) ও 'কাম' (কামনা) এই তিনটী বাঙ্গালা শব্দের অর্থ একই নিয়মে রূপান্তরিত হইয়াছে দেখাইয়াছি। অদ্য আরও কতিপয় উদাহরণ দিতেছি। (ক) Cunning শব্দের আধুনিক অর্থ ধূর্ত্ততা ; কিন্তু ইহা ken, can, con, know প্রভৃতি জ্ঞানার্থক ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং ইহার আদিম অর্থ জ্ঞান। বাইবেলে 'a cunning player on the harp' প্রভৃতি স্থলে নিপুণ অর্থে cunning শব্দের প্রয়োগ। তদ্রূপ লিপিকুশল, কার্য্যকুশল প্রভৃতি পদে কুশলশব্দ নিপুণ অর্থে প্রযুক্ত ; 'কৌশল' শব্দ cunning শব্দের আধুনিক অর্থের প্রতিরূপ। (খ) ইংরাজী dexterous শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সকলেই জানেন। 'কার্য্যদক্ষ' প্রভৃতি স্থলে 'দক্ষ' শব্দ এবং 'দক্ষিণ হস্ত' স্থলে 'দক্ষিণ' শব্দ এতদুভয়ের মধ্যে সম্পর্কও ঠিক তদনুরূপ। ডান হাতে যেরূপ কাযের সুবিধা, বাম হাতে সেরূপ নহে ; এই কারণে dexterous ও দক্ষ উভয় শব্দেরই এক ভাবে অর্থ হইয়াছে। (গ) বিপরীতার্থবোধক sinister শব্দ এবং 'বাম' শব্দ উভয়ই প্রথমে বাম হস্ত (left hand) বুঝাইয়া পরে প্রতিকূল (hostile) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। (ঘ) সংস্কৃত ভাষায় 'অর্দ্ধ' শব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত ; সমাংশ ও অসমাংশ ; 'পুংস্যর্দ্ধোঽর্দ্ধং সমেঽংশকে' এই অমরবচন সকলেরই জানা আছে। বাঙ্গলায় 'বেশী অর্দ্ধেক রাখ' 'কম অর্দ্ধেক লও' এরূপ স্থলে অর্দ্ধ শব্দ অসমাংশবোধক। ইংরাজীতেও greater half, lesser half, two unequal halves প্রভৃতি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

অপর কতকগুলি নিয়ম ও তাহার দৃষ্টান্ত—

(১) বর্ণ বিপর্য্যাস বা metathesis :—ইংরাজীতে curd, curdled প্রভৃতি শব্দ হইতে cruddy ; এখানে r অক্ষর স্থানচ্যুত ; whit এবং wiht (wight) একই শব্দের বিভিন্ন মূর্ত্তি, এস্থলে h অক্ষরের স্থানচ্যুতি। বাঙ্গলায় উদাহরণ—নূতন=নতুন ; মুকুট=মটুক। ভর্ত্তা শব্দের অপভ্রংশে 'র' 'ত' এর পূর্ব্বে না বসিয়া পরে বসিয়াছে। ইতর লোকে 'বাতাস' 'বাতাসা' এই শব্দ দুইটিকে 'বাসাত' 'বাসাতা' উচ্চারণ করে। ইংরাজী হইতে উৎপন্ন tax, box, desk টেক্‌স ও টেস্‌ক, বাক্‌স ও বাস্‌ক, ডেস্‌ক ও ডেক্‌স দুই ভাবেই উচ্চারিত হয়। লোকসান ও লোস্কান দুইটী কথাই ভাষায় চলিত। সংস্কৃতে হিন্‌স্‌ ধাতু হইতে যদি সিংহশব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তবে ইহা metathesis এর একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত।

(২) Euphemism :—প্রাচীন গ্রীক জাতির মধ্যে বিশ্বাস ছিল যে নৃশংস দেবদেবী-গণকে মিষ্ট নামে সম্ভাষণ করিলে তাঁহারা মানবের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। এই বিশ্বাসের বশ-

বর্ত্তী হইয়া তাহারা Furies কে Eumenides বলিত। এই প্রণালীর নাম euphemism, আধুনিক ইংরেজ জাতির মধ্যে অবশ্য এরূপ সংস্কার নাই, কিন্তু মন্দ জিনিসকে ভাল নাম দেওয়া প্রথা এই জাতির ভাষায় আছে। যথা passing away (মরণার্থে) ; he walked off with the goods (চুরি করা অর্থে) ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এরূপ উদাহরণ বিরল নহে। যথা 'মরা' না বলিয়া 'ভাল মন্দ হওয়া' 'বেশ গিয়াছেন' ; চুরি অর্থে 'এ জিনিসটা কোন্ সময়ে সরাইয়াছে'। যাত্রা করার সময় 'তবে আসি' 'এখন এস' ইত্যাদি স্থলে 'যাওয়ার' পরিবর্ত্তে 'আসা' ব্যবহার হয়। রাত্রিকালে স্ত্রীলোকেরা সাপকে লতা, ভূতকে ছায়া এবং বাঘকে চারপেয়ে বলেন ; এগুলি গ্রীক euphemism এর সুন্দর উদাহরণ।

(৩) Extension of meaning বা ব্যাপ্তি। ইংরাজী orient শব্দ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহার আদিম অর্থ rising (অরুণ শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে কি ?)। দ্বিতীয়তঃ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠে ; এই জন্য ইহার অর্থ হইল প্রাচ্য। তৃতীয়তঃ প্রাচ্য দেশ হইতে মহামূল্য মণিমুক্তাদি ইয়ুরোপে সংগৃহীত হইত বলিয়া ইহার তৃতীয় অর্থ হইল উজ্জ্বল। বাঙ্গালা ভাষায় 'সন্দেশ' শব্দের অর্থে এই ব্যাপ্তির নিয়ম সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। 'সন্দেশ' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় বার্ত্তা, সংবাদ, খবর এই অর্থেই প্রযুক্ত, মিষ্টান্ন অর্থে নহে। আমাদের দেশে কুটুম্ব বাড়ী সংবাদ লইতে হইলে যে লোক পাঠান যায়, তাহার সহিত কিছু মিষ্টান্নও পাঠান হয় ; এই প্রথা হইতে 'সন্দেশ' শব্দে মিষ্টান্ন অর্থ হইয়া গিয়াছে। 'তত্ত্ব শব্দ' এখনও সম্পূর্ণভাবে অর্থান্তরিত হয় নাই। 'তত্ত্ব তল্লাস' 'তুমি যে আর আমাদের তত্ত্বই লওনা' এই সকল স্থলে তত্ত্ব শব্দ ইহার প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত। 'কুটুম্ব বাড়ী হইতে কি তত্ত্ব আসিল ?' এখানে তত্ত্ব শব্দ সন্দেশ শব্দের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'তুচ্ছতাচ্ছিল্য' একটী শব্দ চলিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় 'তাচ্ছীল্য' আছে, তাহার অর্থ 'তৎস্বভাবত্ব'। বাঙ্গলা 'তাচ্ছিল্য' কি ঐ শব্দেরই অপ-ব্যবহার ? তাহা হইলে কি ভাবে এই ব্যাপ্তি (extension of meaning) হইল তাহা বিচার্য্য বিষয়। অথবা ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এ বিষয়ে আমি কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।

(৪) ইংরাজীতে দুইটী শব্দে একটী সমস্ত শব্দ হইয়াছে, এরূপ স্থলে নূতন একটী অক্ষরের আবির্ভাব হইয়াছে, এরূপ উদাহরণ দেখা যায়। Nightingale, harbinger, messenger এই তিনটী শব্দে n অক্ষরটী এই নিয়মে আসিয়াছে। Night ও galan এই দুইটী শব্দে রাত্রি ও গান করা বুঝায়। উভয় শব্দ এক হওয়ার সময় একটী n আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ পক্ষী রাত্রিতে গান করে এই জন্য উহার এই রূপ নামকরণ। সংস্কৃত 'বাচস্পতি', 'বনস্পতি' প্রভৃতি পদে 'স' ও 'বিশ্বামিত্র' 'মিত্রাবরুণ' প্রভৃতি শব্দে 'আ'কার ঐ ভাবে আসা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা ছাড়িয়া প্রচলিত বাঙ্গলা হইতে উদাহরণ দেওয়াই ভাল। যথা 'গঙ্গাতীর'ও 'জলম্পয়'। গঙ্গাতীর না হইয়া গঙ্গাতীর হইয়াছে। উৎকট ব্যাকরণবাগীশেরা হয়ত

গঙ্গায়াস্তীরম্ ইহার অপভ্রংশ বলিবেন ! জলম্পয় এই শব্দটি আমাদিগের প্রদেশে জলময় অর্থে ব্যবহার হইতে শুনিয়াছি। অবশ্য অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকেই উহা ব্যবহার করে। কিন্তু আমি পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে বলিয়াছি যে অশিক্ষিত লোকের ভাষা হইতেই ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে অধিক মশলা পাওয়া যায়।

(৫) ভিন্ন দেশীয় ভাষা হইতে অনেক কারণে নিজ ভাষায় অনেক শব্দ আমদানি হয়। সেই শব্দগুলিকে নিজ ভাষানুযায়ী করিয়া লওয়ার জন্য একটু আধটু পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। যথা ইংরাজীতে asparagus-sparrow-grass ; crayfish জন্তুর fish এর সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলেও শব্দটিকে ইংরেজি আকার দিবার জন্য ঐরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বাঙ্গলায় একটি উদাহরণ turpentine—তার্পিণ তৈল ; বাস্তবিক ইহা তৈল নহে। Castor oil—কৃষ্ণ বা কেষ্ট তৈলও অনেকটা এই নিয়মেই হইয়াছে।

(৬) সহজ উচ্চারণের জন্য শব্দের পূর্ব্বে বা পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ বসাইয়া লওয়া হয়। যে সকল শব্দের আদিবর্ণ স্বরবর্ণ এবং যাহাদিগের অন্ত্যবর্ণ স্বরবর্ণ, তাহাদিগের পূর্ব্বে বা পরে ঐরূপ ব্যঞ্জনবর্ণ যোজনা হয়। ইংরাজীতে নামের পূর্ব্বে অনেক সময় এইরূপ হয়। নাম সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা সুখোচ্চার্য্য হওয়া প্রয়োজন। যথা Eleanor অথবা Ellen—Nell, Nelly ; Oliver—Noll, Nolly ; ইত্যাদি। বাঙ্গলায় অশিক্ষিত লোকে আমকে 'রাম' বলে, অবিনাশ'কে 'রবিনাশ' বলে। পরে ব্যঞ্জন যোজনা— ইংরাজীতে sound, pound প্রভৃতি শব্দের অনুরূপ বাঙ্গলায় স্ক্রূপ্ (screw), ম্যাজেণ্টার (magenta.)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশীরাম দাস।

১৩০৬ সালের দ্বিতীয়সংখ্যক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা হইয়াছে ও ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে কাশীরামদাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। তৎপরে জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থের আর একখানি পুঁথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। জেমো (কান্দি) বিশ্বাসপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর ঘোষ মহাশয় এই পুঁথির অধিকারী।

এই পুঁথিতে গ্রন্থকর্ত্তা গদাধর দাসের নিম্নলিখিত বংশপরিচয় আছে।

ভাগীরথী তট নদী ইন্দ্রায়ণি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায় পদতলে॥
নিবাস আমার সেই চরণকমলে॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব জে দৈত্যারি
দামোদর পুত্র তার সদা সে বেহারী॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
ভুবরাজ পুত্র হইল মীন জে কীর্ত্তন॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহাতে জন্মিল জেই এ তিন তনয়॥
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি।
রঘুপতির পঞ্চ পুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি।
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেবল সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখ দেব পঞ্চমে শ্রীধর॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু রাম জে রাঘব।
সুধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত * * মন্ত আর॥
কমলাকান্তের হৈল এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
দ্বিতীয়তে কাশীদাস ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয়ে কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগতমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৬।২।১৭৩ পৃষ্ঠে প্রকাশিত কাশীরাম দাসের বংশতালিকার সহিত এই পরিচয়ের বিশেষ অনৈক্য নাই। ঐ তালিকায় রঘুপতির পাঁচ পুত্র প্রিয়ঙ্কর, রঘুশ্বর (?) কেশব, শ্রীমুখ (?), শ্রীধর, উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুঁথিতে রঘুশ্বর স্থলে সুরেশ্বর ও বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথিতে শ্রীমুখদেব স্থলে শ্রীরঘুদেব রহিয়াছে। এই দুই নাম প্রকৃত ধরিলে, রঘুপতির পাঁচ পুত্র—প্রিয়ঙ্কর, সুরেশ্বর, কেশব, শ্রীরঘুদেব ও শ্রীধর। প্রিয়ঙ্করের পুত্র সুধাকর। সুধাকরের তিন পুত্র; শ্রীমন্ত ও কমলাকান্ত দুই জনের নাম; তৃতীয়ের নাম এখনও স্থির হইল না। কমলাকান্তের মধ্যম পুত্র কাশীদাস।

এই পুঁথির তারিখ ১২৪৬ সাল চৈত্র মাস। লিপিকারের আত্মপরিচয় পুঁথির শেষে রহিয়াছে।

নিজ বিবরণ শুন, জন্ম শ্রীকরণ কুল, আদ্যস্থল ঘোষকান্দি বসতি।
মাতামহ আশ্রিতে, নিবসি পাতগাতে, সাধিকার মাতুল শ্রীপতি॥
হরিপদ মকরন্দ, লিখি স্মরি কৃষ্ণচন্দ্র, কেবল ভরসামাত্র তার।
আমি অতি দীন হীন, ভজনবিহীন জন, তোমা বই কে করে নিস্তার॥
তুমি মাতা হর্ত্তা কর্ত্তা, ত্রিজগতের হও মাতা, তব পদ সদা করি আশে।
সময় দিবা দেড় প্রহর, বসি পূর্ব্বদ্বারী ঘর, লিখিল শ্রীতারাচরণ ঘোষে॥

দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত।

(সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

পুরাণাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের হিন্দুগণ দেবতাপূজা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই সকল অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আবার কোন কোন প্রদেশে ইহার মধ্যে বৈলক্ষণ্যও লক্ষিত হয়। যথা, দত্তাত্রেয় একজন বিখ্যাত যোগী ছিলেন এবং কয়েকখানি অধ্যাত্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাণে ইনি বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণিত। বঙ্গদেশে ইঁহাকে পূজা করিবার নিয়ম নাই; কিন্তু দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্রই ইঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং ইনি বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আবার, হনুমান্ পুরাণাদিতে রুদ্রাবতার বলিয়া বর্ণিত হইলেও বঙ্গদেশে তাঁহাকে পূজা করিবার নিয়ম নাই; কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে তাঁহার মন্দির আছে এবং তাঁহার নিয়মমত পূজা হইয়া থাকে। ব্রত সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখা যায়। আমরা দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রতাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

১— গুড়িচি পড়ওয়া।

প্রতিপদে বংশদণ্ড উত্তোলিত হয় বলিয়া ইহার নাম গুড়িচি পড়ওয়া। গুড়িচি অর্থ, বংশদণ্ড; আর পড়ওয়ার অর্থ, প্রতিপদ। এ অঞ্চলে চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদে নূতন বৎসর আরম্ভ। ইহা রাজা শালিবাহনের অব্দ। এই দিন প্রাতে প্রত্যেক হিন্দু অভ্যঙ্গ করিয়া গরম জলে স্নান করে। প্রত্যেক বাটীর সম্মুখে একটী বংশদণ্ড খাড়া করা হয়, এবং ইহার উপরিভাগে একটী নিশান, তাম্র বা পিতলের ঘটী, একখানি বস্ত্র এবং কতকগুলি নিমের পাতা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই তিথিতে রাজা শালিবাহন দিগ্বিজয়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণার্থ বংশদণ্ডটী উত্তোলিত করা হয়। আর দেবতারাও স্বর্গধামে ইন্দ্রের ধ্বজা উড়াইয়া থাকেন বলিয়া মর্ত্ত্যেও মানবগণ নিশান

উঠাইয়া দেন। এই দিনে সকলকে নিমপাতা চর্ব্বণ করিতে হয়। তদনন্তর নবপঞ্জিকা পূজা ও তাহার ফলাফল শ্রবণ করিতে হয়। জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণ কাহার ভাগ্যে কি আছে তাহা বুঝাইয়া দেন, এবং তজ্জন্য তাঁহারা কিছু কিছু দক্ষিণা পান। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও গুরুকে দান করা যে অতীব কর্ত্তব্য, তাহাও তাঁহারা সকলকে বুঝাইয়া দেন। উত্তম আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া এই দিনটী যাপন করিতে হয়। গৃহনির্ম্মাণ ও সৎকার্য্য আদির অনুষ্ঠান পক্ষে এই দিনটী প্রশস্ত।

২—রাম-নবমী।

চৈত্র মাসের শুক্ল নবমীতে এই উৎসবটী সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে রামচন্দ্রের মন্দির পরিষ্কার করান হয় এবং রাত্রিতে ইহাতে আলোকমালা দেওয়া হয়। রামচন্দ্রের মূর্ত্তিটীও নানা প্রকার বস্ত্র ও অলঙ্কারে শোভিত করা হয়। সন্ধ্যার পর রামায়ণ কথা হয় এবং তাহার পর রামলীলা কীর্ত্তন হয়। মন্দিরের সম্মুখ লাল রঙ্গের আলিপনায় শোভিত করা হয় *। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি গালিচা বিছান রহিয়াছে। প্রধান প্রধান মন্দিরে ব্রাহ্মণগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান হয়। চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত এইরূপে অতিবাহিত হয়। এই কয়েক দিনকে রাম নবরাত্রি বলে। নবমীর দিন বিশেষ ভাবে উৎসব হয়। এই দিন দ্বিপ্রহরে রামের জন্ম হইয়াছিল। সেই সময় মন্দিরসকল লোকে পূর্ণ হয়। এই দিন প্রাতে হিন্দুমাত্রই স্নান করিয়া উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া বেলা নয়টার সময় মন্দিরে গমন করে। তথায় পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে রামকথা শ্রবণ করে। দুই প্রহর হইলে পুরোহিত ঠাকুর রামের একটী ছোট মূর্ত্তি লোককে দেখাইয়া বলেন যে, এই দেখ রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহার পর সেই মূর্ত্তিটীকে একটী দোলার উপরে রাখিয়া দেন। তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া এই মূর্ত্তিটীকে নমস্কার করে। তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে লাল রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দেয়। বেলা একটা পর্য্যন্ত এইরূপ আনন্দ উৎসব করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। আবার সন্ধ্যা হইলে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই রামমন্দিরে গিয়া কথা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করে। সকলে সমস্ত দিন উপবাসী থাকে।

৩—হনুমান্ জয়ন্তী অর্থাৎ হনুমানের জন্মোৎসব।

চৈত্র মাসের পূর্ণিমা হনুমানের জন্মতিথি। কিন্তু শুক্ল দশমীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হনুমানের পূজা হইয়া থাকে। শেষ দিনের প্রাতে হনুমানের মূর্ত্তিকে দোলনায় শয়ন করান হয় এবং তাহা পালকিতে উঠাইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। এতদ্ভিন্ন হনুমানের মন্দিরে কয়েকদিন কথা হইয়া থাকে।

* বঙ্গদেশে যেমন স্ত্রীলোকেরা হস্তের দ্বারা আলিপনা দিয়া থাকে, এ অঞ্চলে সে পদ্ধতি নাই। এখানে এক প্রকার পিত্তলের যন্ত্র আছে, রঙের গুড়ায় তাহা পূর্ণ করিয়া ঘুরাইলে, তাহার ছিদ্র হইতে গুড়া বাহির হইয়া উত্তম আলিপনা হয়। এই আলিপনাকে রাঙ্গুলি বলে।

৪—বট-সাবিত্রী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পূর্ণিমাতে স্ত্রীলোকে এই ব্রত করিয়া থাকে। তাহারা সে দিবস উপবাস করিয়া বটবৃক্ষ পূজা করে। এ ব্রতের ফল বৈধব্যযন্ত্রণানিবারণ।

৫—আষাঢ়ী একাদশী।

আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশীর দিন বিষ্ণুর শেষনাগের উপর শয়ন আরম্ভ হয় এবং এই ভাবে তাঁহার চারি মাস অতিবাহিত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে বিষ্ণুপূজা হয়।

৬—নাগপঞ্চমী।

শ্রাবণ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে সর্পপূজার অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে মৃত্তিকার দ্বারা কালিয় সর্পের মূর্ত্তি গঠিত হইয়া তাহার পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার ফল সর্পভয় নিবারণ। স্ত্রীলোকেরই ইহাতে অধিক আমোদ। বৃক্ষে দোলন ঝুলাইয়া তাহারা দুলিতে দুলিতে গান করিয়া থাকে।

৭—শ্রাবণী বা নারিকেল পূর্ণিমা।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে দুইটী অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। (১) এই দিনে ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নূতন উপবীত ধারণ করে। কেহ কেহ এই অনুষ্ঠানটী নাগ-পঞ্চমীর দিন করিয়া থাকে। (২) এই সময়ে তুফান বন্ধ হওয়াতে পোত সকল নির্ভয়ে সমুদ্রের উপর যাতায়াত করে। এই দেব-প্রসাদটীর উপর লক্ষ্য করিয়া লোকে সমুদ্রকূলে গমন করিয়া জলের উপর নারিকেল নিক্ষেপ করিয়া দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।

৮—গোকুল অষ্টমী।

ইহা বঙ্গদেশের জন্মাষ্টমী। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীর দিন ব্রাহ্মণগণ অন্নাহার ত্যাগ করিয়া ফল মূল খাইয়া থাকেন। সন্ধ্যার পর স্নান করিয়া তাহারা কৃষ্ণের শিশুকালের মূর্ত্তি পূজা করেন। দুই প্রহর রাত্রির পর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময় অতিবাহিত হইলে ভোজন করেন। ইহার পর দিন শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়। গোপদের মধ্যে এই উৎসবটীর সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা হইয়া থাকে। অষ্টমীর দিন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে নাচিতে ও গোবিন্দ নাম লইতে লইতে পরস্পরের বাটীতে গমন করে। দধি বিতরণ ও অঙ্গে দধি ঢালাঢালি করে। রাত্রিতে শূদ্রগণ মন্দিরে গমন করে। তথায় কোলাহল ও বাদ্যোদ্যম হয়। পরে মন্দিরের পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। ইনি ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পর দিন পুরোহিত মহাশয় তাঁহার শিষ্যগণকে, উপস্থিত লোকের গায়ে দধি ঢালিতে বলেন। ইহার পর সকলে ভূমিতে নিপতিত হয় ও হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করে। পরে ভক্ত মহাশয় তাঁহার শিষ্যগণকে বেত্রাঘাত করেন। ইহা তাঁহার স্নেহের চিহ্ন। ইহার পর সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের মাটির মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজিত হয়।

৯—প্রাচ্য অমাবস্যা।

শ্রাবণ মাসের অমাবস্যাতে একটী পূজার অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে রমণীগণ সন্তান লাভের আশায় চৌষট্টি যোগিনীর পূজা করিয়া থাকে। বোম্বাইয়ে ইহা বিশেষ ভাবে সম্পাদিত হয়। অমাবস্যার রাত্রিতে সকলে বালকেশ্বরের মন্দিরে গমন করে। পরদিন প্রাতে বাণগঙ্গা-নামধেয় একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তাহার ধারে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করে। ইহার পর তাহারা মন্দিরে গিয়া পূজা করে। তদনন্তর ভোজন আদি হয়। অবশিষ্ট দিবস আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হইয়া থাকে।

১০—গণেশ-চতুর্থী।

ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্থীতে গণেশের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। এ অঞ্চলে তিনটী উৎসব উপলক্ষে মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত প্রতিমা পূজা হয়। প্রথম নাগপঞ্চমী, দ্বিতীয় গোকুল অষ্টমী এবং তৃতীয় গণেশ-চতুর্থী। প্রথম দুইটিতে তত সমারোহ হয় না। কিন্তু গণেশ চতুর্থী সার্ব্বজনীন উৎসব। কি ধনী কি দীন, সকলেই গণেশমূর্ত্তি কিনিয়া কিংবা ঘরে গড়িয়া পূজা করে। ছোট বড় নানা প্রকার মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এক দিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত লোকের ইচ্ছা অনুসারে গণেশের পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় এবং রাত্রিতে কথকতা হইয়া থাকে। ধনী ব্যক্তিদের বাটীতেই এই ভাবে পূজা সমাধা হয়। অন্যান্য গৃহস্থগণ দেবতার প্রসাদ পেড়া ও ফল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে দিয়া থাকেন। যাঁহারা বিশপঁচিশ টাকা ব্যয় করেন, তাঁহাদের পূজা জাঁক জমকের সহিত সমাধা হয়। ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিগণকে এই পূজা দেখাইবার জন্য মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতারা অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল যে তাঁহাদিগকে একবার বঙ্গদেশের দুর্গোৎসব দেখাইয়া দিই।

পূজা শেষ হইলে গণেশকে পাল্কীতে বসাইয়া বাদ্যোদ্যম সহ কোন নদী বা পুষ্করিণীতে অথবা কূপে বিসর্জ্জন করা হয়। ছোট ছোট অনেকগুলি গণেশের মূর্ত্তি একখানি পাল্কীতে থাকে। বাটীর সকলে সমবেত হইয়া পাল্কীর সহিত গমন করে।

গণেশচতুর্থীর রাত্রিতে চন্দ্রদর্শনে নিষেধ। এতদঞ্চলে এ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, একদা গণপতি মূষিকবাহনে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া চন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন। গণেশ ক্রোধপরবশ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, চন্দ্রের এবং যে তাঁহাকে দেখিবে তাহার, অমঙ্গল হইবে। চন্দ্র নিজ দোষ স্বীকার করিয়া গণেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গণেশ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা না করিয়া বলিলেন যে, কেবল তাঁহার জন্ম দিনে শাপটী প্রবল থাকিবে। চন্দ্রদর্শনে যে অমঙ্গল হইবার কথা আছে, তাহা ব্যর্থ হইবার একটী উপায়ও আছে। কেহ যদি দেখিয়া তাহার প্রতিবেশীর ক্রোধ উৎপাদন করে, এবং সেই প্রতিবেশী যদি প্রতি

স্বরূপ তাহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে চন্দ্রদর্শনজনিত শাপ বিমোচন হয়।

১১—ঋষি পঞ্চমী।

গণেশচতুর্থীর পর দিবস এই ব্রতটীর অনুষ্ঠান হয়। ইহা সপ্ত ঋষির সম্মানার্থ সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরাই এ ব্রতটী পালন করে। এই দিনে তাহারা গৃহস্থের গৃহজাত শস্য ও ফল ভোজন করে। কর্ষিত ভূমি হইতে উৎপন্ন কোন দ্রব্য ভোজন করা তাহাদের পক্ষে নিষেধ।

১২—গৌরী আহ্বান।

ভাদ্র মাসের শুক্ল অষ্টমীতে আরম্ভ হইয়া এই পূজা তিন দিন থাকে। এতদুপলক্ষে পার্ব্বতীর পূজা হয়। ইহাকে "গৌরীপূজা" কহে। স্ত্রীলোকেরাই ইহা সমাধা করে। তাহারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া রাত্রিতে ভোজন করে।

১৩—বামন দ্বাদশী।

ভাদ্র মাসের শুক্ল দ্বাদশীর দিন এই উৎসব হইয়া থাকে। ইহা বামন অবতারের আবির্ভাবের দিন। এতদুপলক্ষে তাঁহার পূজা হয়।

১৪—অনন্ত চতুর্দ্দশী।

এই ব্রতটী ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে অনন্তদেবের পূজা হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের পুরুষগণও এ ব্রতটী পালন করে।

১৫—পিতৃপক্ষ।

ইহা বঙ্গদেশের "অপর পক্ষ"। এ অঞ্চলে, এতদুপলক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থ পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকে।

১৬—দশহরা।

আশ্বিন মাসের শুক্লপ্রতিপৎ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠ হয়। চণ্ডীপাঠ ব্যতীত নবমীতে হোম হইয়া থাকে। ইহার পরদিন দশহরা। এই দিনই প্রকৃত উৎসবের দিন। প্রাতে স্নান করিয়া সকলে গৃহদেবতার পূজা করে, এবং ইহার আনুষঙ্গিক ধর্ম্মগ্রন্থও পূজিত হয়। ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রাদি পূজা করে। ইহা প্রকৃত পক্ষে সরস্বতী পূজা। মধ্যাহ্নে আত্মীয়স্বজন একত্রিত করিয়া ভোজন করে। বৈকালে দেবমন্দিরে গিয়া ফুল ও কাঞ্চন পত্রের দ্বারা দেবীকে পূজা করে। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাঞ্চনপত্র বিতরণ করে। ইহা স্বুবর্ণ দান বলিয়া অভিহিত হয়, এবং ইহা সৌভাগ্যের চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়। এই দিনে সকলে সমস্ত বৎসরের বিবাদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের সহিত বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হয়। এই দিনটাকে সকলে শুভপ্রসূ বলিয়া থাকে এবং এই নিমিত্ত সৎকার্য্য এই দিনে অনুষ্ঠিত

হয়। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যখন মহারাষ্ট্রীয়গণ দেশ লুণ্ঠন জন্য বাহির হইত, তখন এই দিনে যাত্রা করিত।

১৭—দীপাবলি।

এই উৎসবটী কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশীর দিনে আরম্ভ হইয়া অমাবস্যায় শেষ হয়। প্রথম দিনকে ধন ত্রয়োদশী বলে। এই দিনে মহাজনগণ তাহাদের দ্রব্যাদি ও ধন রত্নের পূজা করিয়া থাকে এবং যমকে আলোক দান করে। ইহা প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মী পূজা। দ্বিতীয় দিনের নাম নরক চতুর্দ্দশী। এই দিনে বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করিয়া প্রাতঃকালে নগরে প্রবেশ করেন। এই সময় লোকে নগরটীকে আলোকমালায় পরিশোভিত করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে এবং রমণীগণও বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া প্রজ্বলিত দীপ হস্তে লইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করে। এই ঘটনাটী স্মরণার্থে গৃহস্থগণ প্রাতঃকালে আপন আপন গৃহ আলোক মালায় শোভিত করে এবং স্ত্রীগণ ও বালকগণ অঙ্গে সুগন্ধ দ্রব্য লেপন করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হয়। ইহার পর গৃহিণী কোন পাত্রে আলোক লইয়া আরতি করেন এবং বাটীর প্রত্যেক পুরুষ সেই পাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করে। তদনন্তর মিষ্টান্ন বিতরণ হয় এবং আত্মীয় বন্ধুগণকে ভোজন করান হয়। তৃতীয় দিনের নাম "বহ্নি পূজন", ইহাই সরস্বতী পূজা। এই দিনে বিক্রমাদিত্যের প্রচলিত অব্দ অর্থাৎ সংবৎ শেষ হয়। এতদুপলক্ষে মহাজনগণ পুস্তকাদি পূজা করে এবং খাতা বদলায়। তাহারা লোক জনকে মিষ্টান্ন খাওয়ায় এবং দীন ব্যক্তিগণকে দানও করে। এই উৎসব উপলক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার বাটী পরিষ্কার করে, বালকেরা বাজী পোড়ায় এবং প্রৌঢ়েরা জুয়া খেলায় মত্ত হয়।

১৮—বলিপ্রতিপৎ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে এই উৎসবটী হইয়া থাকে। ইহা বলিরাজার পাতাল প্রবেশের দিন। এই দিনে সকলে প্রভাতে উঠিয়া গৃহ পরিষ্কার করে ও দীপাবলি প্রস্তুত করে। ইহার পর একটী ঝুড়ী আবর্জ্জনাতে পূর্ণ করিয়া তাহার উপর একটী প্রদীপ দিয়া বাটীর বাহিরে নিক্ষেপ করে এবং সেই সময়ে এই কয়েকটী কথা বলেঃ—সকল যন্ত্রণা ও বিপদ দূর হউক এবং বলির রাজত্ব আগমন করুক। তদনন্তর রমণীগণ স্নানাদি করিয়া বলি রাজার একটী প্রতিমূর্ত্তি পূজা করে এবং তদুপলক্ষে দান করে।

১৯—ভাউবীজ।

ইহা বঙ্গদেশের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এই দিনে পুরুষেরা তাহাদের ভগিনীর বাটীতে গিয়া তথায় আহারাদি করে এবং ভগিনীকে টাকা কিম্বা অলঙ্কার দিয়া অভিবাদন করে। প্রবাদ এই যে, এরূপ করিলে সকলে যম রাজার দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়।

২০—কার্ত্তিকী একাদশী।

কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশীতে নারায়ণ চারি মাস পরে শেষ শয়ন হইতে গাত্রোত্থান করেন। তদুপলক্ষে এই ব্রতটী অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে ইহাকে উত্থান একাদশী বলে।

২১—কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে এই উৎসবটী হইয়া থাকে। মহাদেব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুরের পরাজয় স্মরণার্থ ইহা সমষ্ঠিত হয়। অতি প্রত্যুষে নারীগণ মন্দিরে গিয়া মহাদেব পূজা করে। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একটী ধাতুনির্ম্মিত দীপে ফল ও কিছু অর্ঘ্য রাখিয়া একজন ব্রাহ্মণকে দান করে। ইহাকে দীপ দান বলে। রাত্রিতে শিবমন্দিরে আলো দেওয়া হয়।

২২—চাঁপা ষষ্ঠী।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে ইহা সমাধা হয়। খাণ্ডবাদেবের প্রীত্যর্থে এই উৎসবটী হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে যে যে স্থানে খাণ্ডবার মন্দির আছে সেই সেই স্থানে মেলা বসে। পুনা জেলার অন্তর্গত জিজুরি নামক স্থানের খাণ্ডবার মন্দির বিখ্যাত। এখানে অতি সমারোহ পূর্ব্বক উৎসবটী সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে এতদুপলক্ষে "চড়ক পাক" হইত। কিন্তু, এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে। এই দিনে চাঁপা ফুল অতীব পবিত্ররূপে পরিগণিত হয়।

খাণ্ডবা মহাদেবের অবতার। মণি ও মল্লাসুর নামক দুই জন দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য মহাদেব ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মহলসাকে বিবাহ করেন। পার্ব্বতী ধনগার (মেষপালক) বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইনিই মহলসা নামে অভিহিতা হয়েন। ধনগারগণ ইঁহাকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া থাকে।

২৩—দত্ত জয়ন্তী।

অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমার দিন এই উৎসবটি হইয়া থাকে। দত্তাত্রেয় এই দিনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিশেষরূপে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। রজনী যোগে হরিদাস * কর্ত্তৃক দত্তের জীবন সম্বন্ধীয় ঘটনা সকল পরিকীর্ত্তিত হয়।

২৪—মকরসংক্রান্তি

সূর্য্য মকর রাশিতে প্রবেশ করিবার সময়, হিন্দুগণ সমুদ্রে কিংবা নদীতে স্নানার্থ গমন করে। তথায় তিলবাটা মাখিয়া স্নান করিতে হয়। পুরোহিত মহাশয় তদুপলক্ষে মন্ত্রাদি পড়ান। বাটীতে প্রত্যাগমন করত সূর্য্য উপাসনা করিয়া পুরোহিতকে ভোজন করাইতে হয়, এবং দক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে ক্ষমতা অনুসারে তিল পূর্ণ তাম্র বা পিতল পাত্র, ধুতি, ছত্র ও টাকা দিতে হয়। কয়েক জন ব্রাহ্মণকেও ভোজন করাইতে হয়। ইহার পর সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণ একত্রিত হইয়া ভোজন করে। এতদুপলক্ষে গৃহিণীগণ পিষ্টক ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময় সকলে নূতন বস্ত্রাদি পরিয়া তিল গুড়ে প্রস্তুত মিষ্টান্ন হাতে লইয়া আত্মীয় ও বন্ধুগণের বাটী গমন করে, এবং এই মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া বলে যে, "যেমন মিষ্ট দ্রব্য দিলাম তোমার মুখ মিষ্ট হউক এবং আমরা উভয়ে সদ্ভাবে সময় ক্ষেপণ করি"। ইহার পর দিন স্ত্রীলোকেরা পরস্পরকে তিল গুড়

* দক্ষিণাপথের "কথক" হরিদাস নামে অভিহিত হয়েন।

প্রদান করে। এই তিল গুড় বিতরণ অনেক দিন পর্য্যন্ত চলে। তিল গুড় সঙ্গে থাকে, কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে দেওয়া হয়।

২৫—রথ-সপ্তমী।

মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে এই উৎসবটী হইয়া থাকে। ইহা মনুর রাজত্বের প্রথম দিন। মন্বন্তরের প্রথম দিনে নূতন সূর্য্য রথারোহণ করেন বলিয়া ইহার নাম রথ সপ্তমী। এতদুপলক্ষে সূর্য্যের উপাসনা হয়।

২৬—মহাশিবরাত্রি।

ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী এই ব্রতের দিন। এ অঞ্চলের লোক সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার পর পুরোহিত সহিত শিবমন্দিরে গমন করে। তথায় চারি প্রহরে শিবের পূজা হয়। পূজার নিয়ম এই যে পুরোহিত মহাশয় শিবের সহস্র নাম পাঠ করেন, এবং যেমন এক একটী নাম উচ্চারিত হয়, ব্রতীগণ এক একটী ফুল শিবের প্রতি অর্পণ করে।

২৭—শিমৃগা বা হুতাশিনী।

এ অঞ্চলে দোল যাত্রা নাই, কিন্তু "মেড়া পোড়া" আছে। ইহা একটী স্বতন্ত্র উৎসব। ইহার সহিত দোলের কোন সম্বন্ধ নাই। এতদুপলক্ষে প্রত্যেক হিন্দুর বাটীর সম্মুখে স্তূপাকার কাষ্ঠ জ্বালান হয়। যিনি গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান, তিনি ময়দার পিষ্টক অগ্নির উপর নিক্ষেপ করেন। পরে সকলে, বিশেষতঃ বালকগণ, করতালি দেয় ও চীৎকার ধ্বনি করে।

এই উৎসবসম্বন্ধে ভবিষ্যোত্তর পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে রঘুনামক এক রাজার রাজত্বকালে ঢোণ্ঢা রাক্ষসী প্রজাগণের প্রতি, বিশেষতঃ বালকগণের উপর, অশেষ অত্যাচার করিত। রাজা তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত বলিলেন যে ফাল্গুন মাসের শুক্ল পঞ্চদশীর দিন প্রজাগণ হাস্য কৌতুক করুক, এবং বালকগণ কাষ্ঠ বা পলল রাশি জ্বালাইয়া গান করুক, এবং গ্রামের ভাষায় রাক্ষসীকে গালি দিউক; তাহা হইলে রাক্ষসীর বলক্ষয় হইবে এবং রোগের উপশম হইবে।

দুই ঋতুর সন্ধিক্ষণে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বালকগণ ইহার প্রকোপ অধিক ভোগ করে। এই জন্য তাহাদের মধ্যে স্ফূর্ত্তি হইবে বলিয়া হাস্য কৌতুকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং দূষিত বায়ুকে দূর করিবার জন্য বহ্ন্যুৎসব বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রাক্ষসী পীড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই উৎসবে রমণীগণকে কুৎসিত গালি দিবার প্রথা আছে। ঢোণ্ঢা স্ত্রীলোক ছিল বলিয় তাহার পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোক মাত্রেই গালি খাইয়া থাকে। আবার গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিবার কথা আছে বলিয়া লোকে রমণীগণের প্রতি অশ্লীল শব্দ সকল প্রয়োগ করিয়া থাকে।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা-শব্দ-তত্ত্ব।

এবারকার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ" শীর্ষক একটী অতি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। পত্রিকায় প্রকাশিত "সভাপতির অভিভাষণ" ভাষাতত্ত্ব" বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক প্রভৃতি পরিভাষা এবং "বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত" প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকগণের সুচিন্তিত এবং সময়োপযোগী প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভরসা হয়, এইবার বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান প্রণীত হইবে। অভিধানের আবশ্যকতা এক্ষণে যত অধিক, ব্যাকরণের তত নহে। আর ব্যাকরণ প্রণয়নের সময়ও এক্ষণে আইসে নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, এমন অনেক শব্দ এবং পদসমষ্টি (phrase) এবং ভাষাপদ্ধতি (idiom) প্রচলিত আছে ও নিত্যব্যবহৃত হইতেছে, যাহা বর্ত্তমান অভিধানের বার আনা অংশ স্থান অধিকার করিতে পারে, অথচ সেগুলি অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ঐগুলি অভিধানে স্থান পাইলে ও কিছু কাল সুলেখকবর্গের দ্বারা লিখিত এবং সাহিত্য সমাজে ব্যবহৃত হইলে ভবিষ্যৎ ব্যাকরণের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে ব্যাকরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইবে, বলা যায় না। সাহিত্য-পরিষদের ইহাও একটী উদ্দেশ্য বলিয়াই এস্থলে ব্যাকরণের কথা পাড়িলাম।

সুদূর প্রবাসে প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধানের অভাব আমরা যতদূর অনুভব করি, এরূপ বোধ হয় মাতৃভাষার ও সাহিত্যের পীঠস্থান কলিকাতার এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বঙ্গসন্তানগণ করেন না। সুতরাং এরূপ অভিধান যত শীঘ্র প্রণীত হয়, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই কারণেই সর্ব্ববিধ অযোগ্যতা সত্ত্বেও "বাঙ্গালা ধ্বন্যাত্মক শব্দ" শীর্ষক প্রবন্ধলেখক মহোদয়ের আহ্বানে ভরসা পাইয়া যথাজ্ঞানে একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি। উহা পরিষদের উদ্দেশ্যপক্ষে কতদূর সহায়তা করিবে জানি না; তবে প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির প্রবাসে থাকিয়া পরিষদের কথঞ্চিৎ কার্য্যে আসিলেও স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বিবেচনা করিবে।

পরিষৎ-পত্রিকোদ্ধৃত তালিকায় বর্ণানুক্রমে নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংযোজিত হইতে পারে।* যথা—

আতালি পাতালি, আকুলি বিকুলি, আড়ামাড়া, আলুচালু, আঁইআঁই; ইস্‌পিস্‌; ইতিউতি, ইকড়িমিকড়ি; উস্কুখুস্কু; এড়ানগড়ান; ক্যালরব্যালর, ককইয়ে, কটাসকামড়, কলকলানি, কস্‌কসানি, কুড়ুরমুড়ুর, কঁ্যাকটকট, ক্যারক্যারানি, কড়াক্কড়; ঘ্যাঁসঘ্যাস, ঘুনকুচি, ঘড়োরঘড়োর; চচ্চড়াচড়, চৈচাপটে, চিলোচিলি, চোঁৎ; ছরকোট, ছচ্ছর, ছাঁতরাভাঁতরা,

* রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে "ধ্বন্যাত্মক" আখ্যা একটু বিশেষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান তালিকায় উদ্ধৃত সকল শব্দ সেই অর্থের অনুযায়ী নহে; রবি বাবুর তালিকায় সকলগুলির স্থান হইবে না।—পঃ পঃ সঃ।

ছিন্‌ভিন্‌, ছড়াৎছড়াৎ, ছিটেছাটা, ছ্যাৎছ্যাৎ, ছাঁৎছাঁৎ, ছম্‌ছম্‌ (ভয়ে), ছ্যাডাংলা, ছ্যাডাংড্যাং, জুলুরজুলুর, জুল্‌জুল্‌, জমজমা, জবড়জঙ্গী ; ঝিম্‌ঝিম্‌, ঝপাৎ, ঝাঁই ঝাঁই, ঝিঁজইয়ে ঝিজইয়ে, ঝুরঝুর, ঝাঁকড়া ঝোঁকড়া, ঝুলোঝুলি, ঝাঁপাঝাঁপি, ঝাঁকাঝাঁকি, ঝাঁকিমারা, ঝটাপটি, ঝাপ্‌টামারা ; টুংটাং, টরাটুট্‌ টরাটুট্‌, টুপ্‌টাপ্‌, টুস্‌টাস্‌, টকাৎ টকাৎ ; ঠায় (যেমন ঠায় দাঁড়ইয়ে আছে), ঠ্যাটা, ঠেলাঠেলি, ঠুন্‌ঠান্‌, ঠুস্‌ঠাস্‌, ঠোঁটে ঠোঁটে (লাগা), ঠিকরে (যাওয়া) ; ডুক্‌রে ডুক্‌রে, ড্যামগে, ডওয়াডাঁয়, ডুংডাং, ড্যামডেমে ; ঢ্যাংঢেঙে, ঢিব্‌-ঢিব্‌, ঢিল্‌-ঢিলে, ঢিস্‌ঢিস্‌, ঢনঢন ; তাক্‌তাক্‌সিন্‌, তানানানা, তাথেই তাথেই, থ্যাসরথ্যাস, থমথমে, থতমত, থেবড়ে থ্যাতোং থ্যাতোং ; দুলদুলে, দনাদ্দন্‌, দাঁতে দাঁতে দাঁতি লাগা ; ধাম্‌সাধাম্‌সি, ধড়ফড়ানি, ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে (ঘুরে পড়া), ধুনে দেওয়া, ধস্তাধস্তি, ধক্কাধাক্কি ; নপ্‌নপ্‌, নেংচেনেংচে, ন্যাতাক্যাতা, ন্যাবড়া, নদ্‌বদ্‌, নদরবদর, নদ্‌নদ্‌, নাহুস্‌নুহুস্‌, নিস্‌-পিস্‌, নেদিয়ে (পড়া), নিটিন্‌টিনে, নিরিবিলি, নিশুত্তি, নিঝুম্‌, নন্নেমারা ; প্যাচ্‌-প্যাচ্‌, পিটির পিটির, পেঁজা (তুলো পেঁজা), পত্‌পত (নিশান), পাক্‌লে পাক্‌লে ; ফিস্‌ফিস্‌, ফাঁইফাঁই, ফ্যাঁস্‌ফাস্‌, ফরফরাণি, ফরদাফাঁই ; বাঁইবাঁই বলবল্‌, বিস্‌বিস্‌, বজ্‌বজ্‌, ব্যাড়্‌ব্যাড়, বড়বড়ানি, বংবং, বঙাবঙ ; ভ্যাড়্‌ভ্যাড়, ভ্যাজভ্যাজ, ভট্‌ভট্‌, ভস্‌ভস্‌, ভোঁৎ-ভোঁৎ, ভুস্‌ভুস্‌, ভল্‌ভল্‌, ভিদ্‌ভিদ্‌, ভ্যাদ্‌ভ্যাদ্‌ ; ম্যাক্‌ম্যাক্‌, ম্যান্‌ম্যান্‌, মিউমিউ, মা মা (চেহারা দেখনা, যেন মা মা কচ্চে), রস্‌কস্‌, রণ রণ, রুন্‌ঝুন্‌, র‍্যাঙরেঙে ; রংচঙে, লবালব্‌,* লচ্‌পচ্‌,* লসালস্‌, * লটকালটকি, লুটোপুটি ; সগ্‌বগ্‌ (নোলা) সটপট ; হুড়্‌দ্দম, হুড়্‌মদাড়ুম, হালুচালু, হা মা কা, হৈ চৈ, হৈহৈরৈরৈ, হকচকইয়ে, হোল্লা হোল্লা (হোল্লা হোল্লা করে বেড়ায়), হ্যাঁকোঁচকোঁকোচ, হ্যাঙোলদোলানি, হিম্‌শিম্‌।

উপরোক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যতীত এমন অনেক শব্দ আছে, যদ্দ্বারা আমাদের ভাব ও ভাষা এরূপ সহজবোধ্য এবং সুপরিস্ফুট হয় যে ঠিক ঐরূপ আর কোন শব্দে হয় না, তথচ সেগুলি অভিধানে নাই ; তন্মধ্যে দুই চারিটী মাত্র মার্শমান, কেরী, হফটন প্রভৃতি বাঙ্গালা ইংরাজী এবং ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধানে পাওয়া যায়। যথা—"ডামাডোল" "টইটুম্বুর" ইত্যাদি। এই শ্রেণীর প্রায় দুই শত শব্দ পরিষৎ-পত্রিকায় "ভাষাতত্ত্ব" প্রবন্ধে দৃষ্ট হয়। ঐগুলি ব্যতীত প্রায় চারি শত শব্দের এবং উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী প্রবচনের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সেগুলি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা অভিধানে স্থান পাইতে পারে। সময়াভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ প্রদর্শন করিতে পারিলাম না ; পরে আবশ্যক হইলে চেষ্টা করিব। ইতিপূর্ব্বে পরিষদের কিম্বা অন্যান্য সাময়িকপত্রে ঠিক্‌ এ শব্দগুলি প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানি না। হইলেও বোধ হয় সবগুলি না হইতে পারে। দেখা যাইতেছে এরূপ শব্দের অন্ত নাই ; সংগ্রহ করিতে পারিলে সহস্রেরও অধিক হইবে। সুতরাং উপ

* এই শব্দগুলি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাঙ্গালীগণের মুখে অধিক শুনা যায়।

৩৩০৩/তাং ৩০.২.৭৯

স্থিত যাহা স্মরণ হইতেছে, তাহারই তালিকা পাঠাইলাম। সম্পাদকের অনুমোদিত হইলে নূতন উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইবে।

দিগ্‌ধাউড়ি, হেঁটে ট্যাংরা, টক-মাঝারি, চ্যাকড়া-মুড়ি, টনক নড়া, চানকে লওয়া, কূট-কচালে, ধূল-ধাবাড়ি, ধুকপুকুনি, টুগবুগুলি, ক্যাঁথাধুকড়ি, হাই বোঝা, খাই বোঝা, নিম রাজি, ল্যাজে গোবরে, ল্যাজে খেলা, কেঁদে ককিয়ে, কেঁদে রেঁদে, রাত বিরাতে, ছবড়ি ছপন, সই স্যাঙ্গাতি, ডব্‌ডবানি, ডঙ্কা মারা, চাল চিবিয়ে, ল্যাজ গুটান, বর্গমানা, গেঁনি টেংরা টেংরা-গেঁটে, কেঁদে হাট, হাড়িহাট্টা, ডাকাবুকো, ঠাওর করা, ঠগ বাছা, ফকরে ফোসা, পোঁ ধরা, টং টাঙান, আটকপালে, কড়িকপালে, বেঁটে খেঁটে, বেঁটে বাংখুর, টেবলে, টিবলে, বগ দেখান, খটকা লাগা, ললকরে, নুলোনাড়া, কেঁচ হওয়া, ভেড়া বনা, বয়ে যাওয়া, ঘণ্টঘাঁট, হাতে নতে, মামার ভাতে, হদ্দমুদ্দ, উড়ো ভাষা, ধনে পলতা, ঝোল ভাত, ট্যাঁকখোর, খপিস, ঠাট্টাবাজী, জারিজুরি, বাগে গরুতে, রয়ে সয়ে, রেখে ঢেকে, জায়ে জায়ে, যগ্‌গি যাগে, টেনে বুনে, লাকপঁচাশি, হাড়হাবাতে, হাবাৎকুড়ে, ডানপিটে, আকালকেঁড়ে, কেঁয়ে, ধপড়ধন্ব, গতরকুড়ে, আলসে কুঁড়ে, গতরখেকো, কাণপাতলা, উচকপালে, বরাখুরে, উনপাজুরে, ধিক্‌জীবুনে, কালামুখো, পেটগজন্দার, নাদাপেটা, হাঁদারাম, ধুকড়িঝাড়া, উধাউ হওয়া, পোকাবাচুনি, ফেকো পাড়া, ঠোক্কর কাড়া, ঠোঁটকাটা, সঙ্গের সাথি, শাঁকের করাত, পটলচেরা, চকরাকাণা, উপর চাল, আলাভোলা, সাপটে ধরা, থুবড়ো থাকা, মুড়কিমুখী, নাক তোলা, ন্যাকরা করা, লম্বা হওয়া, পাড়ি মারা, ওত পাতা, হাপু গোনা, গলায় গাঁথা, হাসিল করা, হ্যাপায় পড়া, মুখ ঝামটা, বুড়ো খোকা, বুড়ো ডোকরা, বুকের পাটা, ভদর কুঁড়ে, বদ্দি বুড়ো, ভুঁড়ো মোষ, ভুঁড়োশিয়াল, মৌটুসকি, শেয়ালমুরুব্বি, ন্যাড়াগিন্নি, পুঁটেতেলি, কেউগোম্না, ডোক্‌লা, ড্যাকরা, উড়নচড়ে, হাবা গোবা, ন্যাবড়া, ন্যাতাজোবড়া, ন্যাকা আজুলি, হাবলা গোবলা, ঘাড়ে গদ্দানে, অবুরে সবুরে, বাহাত্তুরে, পুনুকে শত্রু, তল্পিতাল্লা, মুড়িখ্যাংরা, দাঁতের বাড়ি ঠোঁটের আগা, তীর সীমানা, মরণকামড়, নড়নচড়ন, গড়ন পেটন, হড়মা কড়মা, ধিঙ্গির পদ, বেম্মডাঙ্গা, শুকন ড্যাঙ্গা, ছোঁ দেওয়া, ফাঁদে ফেলা, কাণ ভাঙ্গান, ছেমো চাপা, কাজ বাগান, বিদ্‌কুটে, হাঁসকুটে, তিতকুটে, মারকুটে, গালকুটে, আকখুটে, কিরখুট্টি, ঘেঁচড়া পড়া, শক্ত ঘানি, গত্তিগরাস, তুলকালাম, ভয়-তরাসে, মিচকেপোড়া, মিচ্‌কেফেরা, ভাইভগ্‌গর, জ্ঞাতগোত্তর, একাছত্তর, আপ্তাআপ্তি, ডেরিডামরি, জনাজুতি, সন্ধান সুলুক, নোলাদাগা, গানাঘুষো, সতিকজাত, কুয়ের গোড়া, শাগে বেগুনে, বগে বেগুনে, নাস্তানাবুদ, হরের খুড়ো, সাউখুড়ি, সাদালতি, সরফরাজী, জ্যান্তে মরা, ধুপসো, ধামধুম্বো, গদাইনস্করি, পায়া ভারি, শাঁসে জলে, ভাঙাঢোল, ঠেকোঠাকা, ইতুনিদ্‌কুড়ে, ছিচকাঁদুনে, ঘুমকাতুরে, ফেকোপাড়া, হাতেহেতড়ে, নেতুড়ে, ভবঘুরে, পাকওঠা, ম্যাড়াকান্ত, বোকাকান্ত, রামকান্ত, ভোমাকান্ত, আবাথাবা, তাগ্‌বাগ, তক্কে তক্কে, টুমটাম, টৌ টৌ, ছিটফিটান, তিরবিরান,

অষ্টে পিষ্টে, আড়া আড়ি, হুদমো, হুতুমথুমো, মাথাকাড়া, বেঁকে বসা, মুখচোরা, খপ্পরে পড়া, খপ্‌পুরে, চট্‌করে, আড়েগিলে, ঘরকন্না, বান্না করা, ঘর করা, উত্তমমধ্যম, ঘোটমণ্ডল, সরষে পড়া, ধুতুরাফুল বা সরষেফুল দেখা, ডুমুরফুল হওয়া, ছড়াঝাট, কোলাকুলি, লোটাষষ্ঠি, তম্বড়ে, ডেঙোডোক্‌লা, কেঁওকেডা, বিলকুল, দাখিলে যাওয়া, ঝক্কি পোয়ান, হাড়ে ভেস্কি, হাসিমস্করা, রগচটা, মচ্ছিমুলোয়, এটেল চিমড়ে, এঁয়েন্ত্যাকড়া, মেয়েন্ত্যাকড়া, মনমর্জ্জি, ঢ্যাঁঙা ওসার, দমে ভারি, পিছু লওয়া, খিরকুচ, আৎকে ওঠা, রেশারেশি, ঠেসাঠেসি, ঘেঁসাঘেঁসি, পাশাপাশি, পায়ে পায়ে চলা, চোখে চোখে রাখা, মুখে মুখে যোগান, আঁতে ঘা দেওয়া, হাতে হাতে সঁপে দেওয়া, পৈ পৈ বারণ করা, মাথার উপর টিক্ টিক্ করা, হাঁক ডাঁক, ধিমেচালে, দাঁতকপাটি, চোখকপালে, আক্কেল গুড়ুম, ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড়, জোঝাজুঝি, লেখাজোখা, ঢ্যাকলাঢেকলি, সরাসরি, উদোমাদা, পোয়া বার, হাবুডুবু, শট্টেপট্টে, পেটে তলান, বিষ ঝাড়া, বিষ নজর, নজর ছাড়া, হতচ্ছাড়া, আম্বা বড়, জমিজমা, জমিজরাৎ, খানাখন্দ, রগঘেসে, তুলরাম খেলারাম, ঝাড়েবংশে, বাপের জন্মে, আদ্দিকেলে, সাত পুরুষে, আধকামারে, নাকজুবড়ে, টক্কর দেওয়া, নাকে কাঁদা, ফেরফার, ধনধ্যাকড়া, দ্যাখন হাসি, দিনখ্যান, থরহরি, টালমাটাল, দুপুরে মাতন, আউলে চাঁদ, কথা ঘেঁচড়া, দরকোচো, জড়ভরত, জবুথবু, হটকা, জড়পুটুলি, বিষ্ণুপঞ্জর, আতেকাত্তালে, মাথাপাগলা, মাথাধরা, ফুলে ঢোল, গায়ের জ্বালা, বাড়বাড়ন্ত, মেয়েমদ্দানি, টেপাগোঁজা, ছাদনদড়ি, পায়েবেড়ি, গোদাবেড়ি, আটেকাটে, মানুষমুনুষ, ডাগর ডোগর, ইটপাটখেল, খোলাখাপরা, ছায়ামাড়ান, গোল্লায় যাওয়া, দেখমার, রেখে বসা, গিলেবিচি, পাতরকুঁচি, ঝাল দেখনা, ধর্ম্মঢোল, ডেও ঢাকনা, চক্ষুস্থির, সোনাদানা, কুলকপালে, বিটকেল, মুস্কিকাল, রগুম রেওয়াজ, নিতকিত, ভিদভিদে, ভেতর বুদে, নক্কড়া ছকড়া, মাথা খাওয়া, চক্ষু বোজা, পটল তোলা, পথে বসা, ভাসিয়ে দেওয়া, তাক লাগান, পিটোপিটি।

এক শ্রেণীর শব্দ আছে, যাহার ধাত্বর্থ বা সংস্কৃত ভাষানুগত অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালা মানে পাওয়া যায় না। যেমন "তাই ত" র "ত"; "নিজে কেন যাওনা?—গেলুম ত" এই স্থলের "ত"; "না দেখিলে ত তোমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না" র "ত"; "তুমি কে গো" র "গো"; "অমুক সেখানে যাবে কিনা", "তুমি যাবে কিনা?" "আমিই করব এখন",—এই 'কিনা', 'এখন', "তুমি কেন যাও না" র 'কেন', ইত্যাদি। অনেক সময় বাঙ্গালার 'ত', ইংরাজির *did* এর ন্যায় ব্যবহৃত হয়। "Why not go yourself?—I *did* go, *but* &c."—"তুমি নিজে কেন যাওনা?—গেলাম ত, কিন্তু" ইত্যাদি; এখানে *did* বলায় যাওয়া সম্বন্ধে যেমন নিশ্চয়ের ভাব এবং পরে *but* বলায় যেমন নিষ্ফলতার ভাব প্রকাশ পায়, 'ত' এবং 'কিন্তু' বলায় ঠিক সেই সেই ভাব প্রকাশ পায়; তবে *did* এবং 'ত' এর বিশেষত্ব এই

যে, *but* এবং 'কিন্তু' না থাকিলেও উক্ত নিশ্চয় ও নিষ্ফলতার ভাব ফুটিয়া উঠে এবং পর ক্ষণেই যেন একটী *but* ও একটী 'কিন্তু' সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া আনে। এইরূপে স্থানবিশেষে দেখা যায়, ইংরাজির unless, indeed, of course, must, প্রভৃতির ভাব বাঙ্গালায় "ত" এর দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। এ সকল শব্দ সহজে আমাদের নজরে পড়ে না; কিন্তু বৈদেশিকগণ দুরূহ শব্দের অর্থ অনায়াসে বুঝিয়া এই সকল স্থানেই অন্ধকার দেখেন। কল্লে সিন্, বল্লে সিন্, দেখা যাবে, হবে এখন, কেঁদে ফেলেছে, এলে গিয়েছে, প্রভৃতির 'সিন্', 'যাবে', 'এখন', 'ফেলেছে', 'গিয়েছে', তাঁহাদের ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। সেইরূপ সংখ্যা বা পরিমাণবাচক কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করিবার বা নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিবার কালে বড় গোল বাধে। অভিধানে লেখে swarm = পাল, ঝাঁক, দল ইত্যাদি; flock = ঝাঁক, পাল, সমূহ, সমাজ ইত্যাদি; pack = গোছা, তাড়া, দল, বোঝা প্রভৃতি; আবার ঐ শব্দগুলির ইংরাজি প্রতিশব্দেও ঐরূপ একের অর্থ অপরে পাওয়া যায়। ফলে এই হইতে পারে, উভয় ভাষা উত্তমরূপে জানেন না এমন কোন বৈদেশিক "a flock of sheep" কিম্বা "a swarm of bees", এর অনুবাদ করিতে যাইয়া "এক মৌমাছির গোছা বা পাল" কিম্বা "এক ভেঁড়ার ঝাঁক" লিখিয়া বসিতে পারেন। কারণ অভিধানই তাঁহার অনুবাদের সম্বল, আর অভিধানে flock মানে পাল ও ঝাঁক; swarm অর্থেও তাহাই আছে। এই শ্রেণীর শব্দগুলির ভেদ ও প্রয়োগ প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। আবার cry, roar, bleat প্রভৃতি একই ক্রিয়ার জ্ঞাপক, অথচ ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর ডাকের শব্দভেদে ব্যবহৃত হয়। এই কারণে জন্তুর নাম না থাকিলেও ডাকের শব্দে বুঝা যায় কোন্ জন্তুর কথা হইতেছে। ঘেউ ঘেউ, মিউ মিউ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ফোঁস্ ফোঁস্, গাঁক গাঁক, বলিলে কে না বুঝিতে পারে উহা কোন্ জন্তুর ডাক। এইরূপে ঝাঁক, পাল, গোছা, তোড়া, তাড়া, আটী, দল, গাদা, সা'র প্রভৃতি শব্দ, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জীব জন্তু ও দ্রব্যসামগ্রীর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করে। বাঙ্গালায় উহাদের বিশেষত্ব এই যে শব্দগুলি দ্বিরুক্ত হয় যথা:—"খাব্লা খাব্লা" "মুঠো মুঠো", "খোলো খোলো", "কা কা", "ভ্যা ভ্যা" ইত্যাদি।

ইংরাজিতে যদি "put in motion" এর স্থানে "put to motion" বলা যায়, look at him না বলিয়া "look on him" বলা যায়, তাহা হইলে যেমন idiom রক্ষা হয় না, বাঙ্গালায় তদ্রূপ "পাশ ফেরা" না বলিয়া "কাত ফেরা", হুমড়ি খাওয়া, "উপুড় হওয়া" না বলিয়া 'হুমড়ি হওয়া" "উপুড় খাওয়া" বলিলে বাঙ্গালার ভাষাপদ্ধতি (idiom) বজায় থাকে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি এবং ভঙ্গীসূচক শব্দগুলি অভিধানান্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। দৃষ্টান্ত যথা—পা বাড়ান, ডিগ্‌বাজী বা কলাবাজী * খাওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া,

* এই শব্দ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অধিক প্রচলিত।

(কিন্তু) গুড়ি মারা, উবু হওয়া, উল্টে পড়া, (কিন্তু) উলোট খাওয়া, চোখ ঠারা, পেট ফাঁপান, গাল ফুলান, নাক তোলা, ঠোঁট ওল্টান, চোক রাঙান, দাঁত খিচান, হাত ছানি দিয়ে ডাকা, চিমটি কাটা, টিপনি দেওয়া, থাবড়া মারা, চড় ওঁচান, হাত তোলা, গা তোলা, হোঁচোট খাওয়া, টাউরে পড়া। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের যন্ত্রণা এবং অবস্থা প্রকাশক শব্দের উদাহরণও এই সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে ; যথা :—

চোক টন্ টন্ করে, দাঁত কন্ কন্ করে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, কপাল দপ্ দপ্ করে, রগ্ টিপ্ টিপ্ করে, মাথা কট্ কট্ করে, পেট ঢক্ ঢক্ করে, পেট কুন্ কুন্, কড়্ কড়্, হড়্ হড়্, গড়্ গড়্ বা চচ্চড় করে, পেট খোঁচায়, পেট কামড়ায়, গলা সাঁই সাঁই করে, ঘড় ঘড় করে বা ঘং ঘং করে, বুক দুদ্দুড় করে বা ধড় ফড় করে বা চিন্ চিন্ করে, পিট চচ্চড় করে, বুকে পিটে সেঁটে ধরে, কোমর কট কট করে, পা কামড়ায়, পায়ের দড়ি ছেঁড়ে, হাত অসাড় হয়, অবশ হয়, গা মদ্‌রে যায়. চোখ ঠিকরেযায়, মুণ্ডু ঘুরে যায়, কাণে তালা ধরে, নাক ঝাঁজিইয়ে যায়, জিব আড়ষ্ট হয়, হাত পা কালইয়ে যায় এবং শরীর পাকইয়ে যায় ; লোকে গতর খাটায়, পেট চালায়, মাথা ঘামায়। লোকে বুক পুরে, পেট ভরে, আশ মিটইয়ে, পেট ফাটইয়ে এবং কুঁচকি কণ্ঠা ঠেশে খায়। অধিক চলাফেরা করিয়া কষ্ট হইলে লোকে বলিয়া থাকে "পায়ের সুতা ছিঁড়ে গেল"। অলস ব্যক্তিকে গতরের মাথা খেয়েছে বলতে শুনা যায়। সত্যই কিছু চক্ষের কর্ণের বা গতরের এক একটী মাথা নাই, যাহা মাঝে মাঝে খাইতে শুনা যায়। না থাকিলেও ঐ সকল বাক্যে বিশদবর্ণনাপেক্ষা স্পষ্টতর বুঝিতে পারা যায়। এই যে "হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতা ছেঁড়া," "বকে বকে মুখের ফেণা বাটা বা ধুলা বাটা" "শুনে শুনে পেটের ভিতর হাত পা সেঁদইয়ে যাওয়া", "দেখে দেখে হাড় ভাজা ভাজা, হাড় কালি হওয়া বা হাড়ে নাড়ে জলে যাওয়া"—এগুলি আমাদের মনে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থার এমনি সরল, স্পষ্ট এবং যথাযথ চিত্র অঙ্কিতাকরে, যাহা অন্য কোন বর্ণনায় ততদূর পরিস্ফুট হয় না ; রোগে কৃশ হইলে বলে পাতুড়ি, বা পাত হয়ে গেছে, নেশায় কৃশ হইলে বলে পাকইয়ে গেছে, পাক তেড়ে হয়ে গেছে বা চাম দড়ি হয়ে গেছে', ভাবনায় কৃশ হইলে বলে মুষড়ে বা শুকাইয়ে গেছে, খেটে খেটে রোগা দড়ি হয়ে গেছে, খেটে খেটে খুন হয়ে অথবা সারা হয়ে গেছে। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া আবাল বৃদ্ধ সকলেই কেমন খিটখিটে, রাগী, অভিমানী এবং অসন্তুষ্ট চিত্ত হয়। ছেলেরা ছিচকাঁদুনে, রোগাছেঁয়ে, অধিকবয়স্কগণ রোগাবেরু হইয়া পড়ে। এই রোগা শব্দের সহিত বেরুও ছেঁয়ে শব্দ প্রযুক্ত হইলে কেমন অভিমানের আভাস, অসন্তোষের চিহ্ন এবং খিট্‌খিটে ভাবের সহিত রোগীর আনুষঙ্গিক ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করে। কেবল খিট খিটে, কিম্বা অভিমানী বা ঐগুলি একত্র সমাবেশের দ্বারা তাহা হয় না। 'ঢোক্কেশে' এই কথাটি যে লোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহার বয়স অঙ্গসৌষ্ঠব ও ভাবভঙ্গী প্রভৃতির এমনি হুবহু চিত্র শ্রোতার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদিত হয়, যাহা অন্য কথায় বর্ণনা করিতে রাশি রাশি

শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি এ "ঢোক্কেশের" সহিত যে ভাব জড়িত আছে ঠিক তাহা আনা যায় না।

ঋতুভেদে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা এবং তৎসঙ্গে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সূচক অনেক কথা বাঙ্গালায় আছে, সেগুলি সংগ্রহ করিয়া অভিধানের কলেবর পুষ্ট করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে গুটিকত লিখিত হইল। শীতে কুঁকড়ি শুঁকড়ি, জড়সড়, হিহি করা; বসন্তে ঢল ঢল; গ্রীষ্মে আই ঢাই, ঢিস্ ঢিস্, ম্যাজ ম্যাজ; বর্ষায় খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ, ঢ্যাব ঢ্যাব; শীতের বাতাস শন্ শন্; গ্রীষ্মে বোঁ বোঁ, হু হু, শোঁ শোঁ; বর্ষায় ঝপাৎ ঝপাৎ, ঝর ঝর; হেমন্তে শির শির; বসন্তে ঝিং, ঝির করিয়া বহিতে থাকে। খট খট, খাঁ খাঁ, তড় তড়, ঝমাঝম, হুড় হুড়, প্রভৃতি শব্দ ঋতুভেদে ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালায় যদি ইংরাজির ন্যায় একখানি ইডিয়মের এর অভিধান প্রণয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ তালিকাভুক্ত শব্দ এবং বাক্যাবলী তাহার প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসে, সুতরাং ও গুলি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা অভিধানের উপেক্ষার পাত্র নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের আহ্বান এত শীঘ্র সার্থকতা লাভ করিবে, আমরা আশা করি নাই। সেই আমন্ত্রণের ফলে বাঙ্গালা মাসিক পত্রেও বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা কিঞ্চিৎ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাও একটা আশ্বাসের কথা। প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দিরের প্রেরিত এই পত্র খানি আমরা আদরের সহিত প্রকাশ করিলাম। অতঃপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে থাকিলে সাহিত্যপরিষদের অস্তিত্ব অনেকটা সার্থক হইবে, এইরূপ আশা করি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাকরণের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে যে আক্ষেপ করিয়াছেন, কালক্রমে সেই আক্ষেপের কারণ দুর হইতে পারে। বাঙ্গালা ব্যাকরণের সমাস প্রকরণে সম্প্রতি সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাসপ্রকরণ অনুবাদ করিয়া দেওয়া নিয়ম আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের মধ্যভাগে যে সকল শব্দসমষ্টির তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষায় সমাস প্রক্রিয়ার মূল সূত্র গুলি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যাই হউক, ব্যাকরণ শাস্ত্র নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে সেই শাস্ত্রের উপাদান সংগ্রহ আবশ্যক। সেই উপাদান সংগ্রহেই আমাদের এখন প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক; এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ইচ্ছা করিলে প্রচুর পরিমাণে উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখক সংগৃহীত উদাহরণ গুলি শ্রেণীবদ্ধ ও অকারাদি বর্ণক্রমে সাজাইয়া দিলে আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইত। ভরসা করি ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লেখকগণ এ

বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশ শব্দই গ্রাম্য অপভাষায় ব্যবহৃত হয়; সাধু ভাষায় তাহাদের ব্যবহার নাই, বোধ করি কখন হইবেও না। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের নিকট গ্রাম্য ভাষা ও সাধু ভাষা উভয়েরই সমান আদর। বরং গ্রাম্য ভাষা হইতে ভাষার মূল প্রকৃতি ও ভাষার সহিত জাতীয় প্রকৃতির সম্বন্ধ যত সহজে বোঝা যায়, সাধু ভাষা হইতে তেমন হয় না। এইজন্য গ্রাম্য slang শব্দের সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন; এই সংগ্রহ কার্য্যে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

পত্রিকা-সম্পাদক।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত প্রাচীন পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। চেষ্টা করিলে এখনও বহুতর পুস্তক বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনেক হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তৎকর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া আমিও নিজ ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ যে পুস্তকগুলির সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার অনেকগুলি এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সে গুলির রচনাও মন্দ নয়। ইহা ব্যতীত কতকগুলি মুদ্রিত পুস্তক পাইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়; কিন্তু পুনর্মুদ্রণ না হওয়ায় সে সমস্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহারাও রক্ষণযোগ্য। প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সমূহের কতকগুলি অক্ষরের গঠন আধুনিক গঠন হইতে বিভিন্ন, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট একখানি খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে, তাহার অক্ষরসমূহ প্রাচীনকালে মুদ্রিত কোন পুস্তকের সহিত মিলে না। ইহার সমস্ত অক্ষর ঠিক হাতের লেখা অক্ষরের ন্যায়; হঠাৎ দেখিলে হাতের লেখা বলিয়াই ভ্রম জন্মে। সম্মুখের পত্র না থাকায় উহার নাম বা পুস্তক প্রণয়ন বা মুদ্রণের তারিখ পাইলাম না। যখন মুদ্রাযন্ত্র বঙ্গে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সম্ভবতঃ যন্ত্রের অক্ষরসমূহ এইরূপই ছিল। ভবিষ্যতে প্রাপ্ত পুস্তকসমূহের বিশেষ বিবরণ দিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ কেবল হস্তলিখিত পুঁথি গুলির একটী তালিকা দিলাম।

১। অষ্ট কালের আখ্যান।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।	প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুদেবের চরণ
"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য" ইত্যাদি শ্লোক।	তাহার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ

অন্ধতা ঘুচয়ে যার করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমির নাশ করে যেই জনে ॥
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব যার নাম।
এ তিন লোকের পুষ: (?) দয়াগুণ

শেষ—

যুগলকিশোর লীলা অমৃতের সিন্ধু।
সম্যক লইতে নারি লই এক বিন্দু ॥
উদ্দিশ করিল মাত্র লীলা অনুসারে।
লীলাকে করিয়ে স্তুতি দয়া কর মোরে ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান ॥
ইতি স্মরণমঙ্গল অষ্টকাল সমাপ্ত ॥
পৃষ্ঠ সংখ্যা ৩৮।

২। অষ্টকাবলী।—

ইহাতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত চৈতন্যাষ্টক ও অদ্বৈতাষ্টক, গৌর চন্দ্রের বিরচিত রাধিকাষ্টক, জীব গোস্বামীর বিরচিত ব্রজকুমার অষ্টক এবং নিত্যানন্দাষ্টক আছে। অষ্টকগুলি অতিশয় সুললিত। রাধিকাষ্টক হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম।—

রাধিকা শরদইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলি।
কুন্তলে বিচিত্র বেণী চম্পকের দোলনি ॥
নীলপট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ ঘোড়নি।
বন্দিব শ্রীপাদপদ্ম বৃকভানুনন্দিনী ॥
খঞ্জন গঞ্জন দিঠি বঙ্কিম নেহারনি।
অঞ্জন খঞ্জন গুরু সিন্দূরের টীকুনি ॥
তিলপুষ্প নিন্দি নাসা নিসি ফুল দোলনি।
বন্দিব শ্রীপাদপদ্ম বৃকভানুনন্দিনী ॥

*   *   *

৩। আত্মজিজ্ঞাসা সারাৎসার—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। তুমি কে। আমি জীব। কোন জীব। তটস্থ জীব। থাক কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে হইল।

শেষ—

অবশ্য মিলিবে তারে নিত্য বৃন্দাবন।
আনন্দে সেবিবে সেই প্রভুর চরণ ॥
সহচরী সহ আস্বাদি তোমার চরণ।
আত্ম জিজ্ঞাসা সারাৎসার কহে কৃষ্ণদাস ॥

৪। আশ্রয় নির্ণয়।—

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্য গোসাঞি কোন স্বরূপ। নামের স্বরূপ। নিত্যানন্দ প্রভু কোন স্বরূপ। আনন্দ স্বরূপ অদ্বৈত প্রভু কোন স্বরূপ। ইত্যাদি।

শেষ—

কোন ভাব। মধুর ভাব। কোন মধুর। উজ্জ্বল মধুর। কোন উজ্জ্বল। কোন সেবা। যুগল রস সেবা ইতি আশ্রয় নির্ণয় সমাপ্ত।

৫। কাহ্নাই-বন্ধন-খালাস।—

আরম্ভ—

রজনী প্রভাত কালে উদয় হইল ভানু।
শয্যা থেকে উঠিয়া বসিল রাম কাহ্নু॥
শয্যা থেকে উঠিয়া বসিল নীলমণি।
যশোদার অঞ্চল ধর্‌য়া খেতে চায় ননী॥

শেষ—

কোথা গেল্যা বলরাম শ্রীদাম গুণের ভাই।
গোপীর সহিত খেল লইয়া কাহ্নাই॥
এ কথা শুনিবে যে তার ব্রজে হবে বাস।
এত পনে হইল কাহ্নাই বন্ধন খালাস॥

৬। কৃষ্ণের শত নাম।

আরম্ভ—

হরে নারায়ণ গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র দয়া কর করুণা সাগর॥
জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধিকার প্রাণনাথ মুকুন্দ মুরারি॥

শেষ—

জেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিতে আছে আপনি শ্রীহরি॥

এই নামে আরও দুইখানি পুস্তক আমাদের নিকট আছে; কিন্তু পরস্পরের পাঠ্য-পার্থক্য আছে।

৭। গুরুতত্ত্ব—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীগুরু চরণারবিন্দ অগম্য আশয়।
যাহার কৃপায় জীব নিত্য স্থান পায়॥

শেষ—

এ কিছু কহিলাম যে সাধন নির্ণয়।
শিক্ষা গুরু বিনে ব্রজধাম প্রাপ্তি নাহি হয়॥
ইতি শ্রীগুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণদাসোক্তি সম্পূর্ণ॥

৮। গোপাল-মঙ্গল পাঁচালী।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণায় নমঃ।
অদ্য গোপাল মঙ্গল লিখ্যতে।
প্রভাতে উঠিয়া যেবা সউরে শ্রীহরি।
ইহলোকে সুখে থাকি পরলোকে তরি॥
হরি বিনে গতি নাই এতিন ভুবনে।
হরি নাম নিলে সুখে থাকে মরণ জীবনে।

শেষ—

যতনে শুনিবে ভাই দিনে তিন বার।
মরণে জীবনে কৃষ্ণ গতি হয় তার॥

ইতি গোপালমঙ্গল পুস্তক সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। সমাপ্ত পাকিল মকদুম-পুর। পরগণে ভাতিয়া গোপালপুর। সন ১২৫৯ সাল মাহ কার্ত্তিক ২৯ রোজ তিথি দ্বিতীয়া। লেখক শ্রীগোলকচন্দ্র দাস বৈরাগী। পুস্তক সমাপ্ত।

৯। চম্পককলিকা।

১০। চৈতন্য-গণোদ্দেশ।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীহরি

অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বন্দো শ্রীগুরুপদ।
যাঁহার স্মরণে বিঘ্ন না রহে বিপদ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত ঠাকুর।
যাহার কৃপাতে পু* হৈল ভরপুর॥

অন্যত্র—

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বন্দো হঞা হরষিত।
শ্রীচৈতন্যগণোদ্দেশ কহিব কিঞ্চিত॥

শেষ—

পূর্ব্বকালে নবজা মথুরায় ঘর।
কাশী মিশ্র নাম কহিল তৎপর॥
পূর্ব্বে ভাই কৃষ্ণের করিলা চামালি।
সেই গোবিন্দ আচার্য্যের গীতাবলী॥

পৃষ্ঠসংখ্যা ১৮।

১১। জবামঞ্জরী—কৃষ্ণ দাস।

আরম্ভ—

ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি বাতাস আকার এই পঞ্চ রূপে। দেহের সঞ্চয়। ইহার বীজ যোনি শুক্র হয়। আধার হয়। ইহাকে ভূত আত্মা বলে।

শেষ—

অতএব যার বস্তু তারে আরোপিয়া।
সদাই ব্রজে বাস কর হৃদি শুদ্ধ হয়া॥
শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ পদে যার আশ।
জবামঞ্জরী গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস॥

১২। তালিকা।

ইহাতে দ্বাদশ সখা, দ্বাদশ মোহন্ত ও দ্বাদশ পাটের একটী তালিকা আছে।

১৩। তিন মানুষ বিবরণ—জগন্নাথ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

আদৌ আশ্রয় হয় শ্রীগুরুচরণ।
তবে নামাশ্রয় হয় শুন বন্ধুগণ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। এই মহামন্ত্র হৈতে সমস্কার জীব হয়।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ গুরু নিজ মন্ত্র দিয়া আত্মা করি লয়॥

অথ গুরু মন্ত্র। শ্রীগুরুদেবায় কৃষ্ণবৈষ্ণবস্বরূপায় সর্ব্বশক্তিপ্রদায় নমঃ।
এই চব্বিশ অক্ষর গুরুর স্বরূপ।

শেষ—

জগন্নাথ দাস কহে তিন মানুষ আখ্যান। এই তিন মত কারণ তিন হৈলে।
ইহা যেই নর হয় পরম বিজ্ঞান॥ তবে নিত্য বৃন্দাবন ধাম তারে মেলে।

অথ তিন মানুষ বিবরণ সম্পূর্ণ। সাক্ষরমিদং শ্রীগোবিন্দ দাস।

পৃষ্ঠসংখ্যা ৮।

১৪। তুলসীমাহাত্ম্য—ভগীরথ।

আরম্ভ—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য" ইত্যাদি শ্লোক।

প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন। জয় জয় গণপতি পার্ব্বতীনন্দনে॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার কারণ॥ রসিক জনার সঙ্গে বসি নানা রঙ্গে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো হরষিত মনে। মন দিয়া শুন কিছু তুলসীপ্রসঙ্গে॥

শেষ—

শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ যায় নাশ। তুলসীর পরশে সর্ব্ব পাপ বিমোচন।
ইহলোকে সুখভোগে যায় বার মাস॥ দ্বিজ ভগীরথে কয় গোবিন্দ চরণ॥

ইতি তুলসীমাহাত্ম্য কথা সম্পূর্ণ। সমাপ্ত।

ইতি যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। লিখিতং শ্রীউপানন্দ সাহা সাং দাদপুর সন ১২৫০ সা।

পৃষ্ঠসংখ্যা ১৭।

বিষয়—শঙ্খাসুরের উপাখ্যান।

১৫। পদাবলী (১)।

ইহাতে গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের পদ সন্নিবিষ্ট আছে। পৃষ্ঠসংখ্যা ১৬।

১৬। পদাবলী—(২) বাসুদেব ঘোষ।

ইহাতে মোট ৪২টী পদ আছে। পুঁথির তারিখ ১১৬১ সাল।

১৭। গোবিন্দ দাসের পদাবলী।

পদসংখ্যা মোট ৩৫টী।

১৮। পণ্ডিত গোঁসাঞির সখাগণ।

আরম্ভ—

শ্রীরাম।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি সাক্ষাতে মহোত্তম।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥ তার নিজ শাখা কিছু করিয়ে গণন।

শেষ—

সংক্ষেপে কহিল সখাবলীর গণ। অতএব সভায় করিয়ে বন্দন॥

ইতি শ্রীপণ্ডিত গোসাঞির সখাগণ সম্পূর্ণ।

১৯। প্রার্থনা-পদাবলী—নরোত্তম ঠাকুর

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

গৌরাঙ্গ বলিতে কবে হবে পুলক শরীর। আর কবে নিতাই চান্দের করুণা হইবে।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥ সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

শেষ—

দুহুঁরূপ লাবণি, হেম মরকত জিনি রাসবিলাস রস কলারস মৃদুহাস
লোচনমোহন লীলা ধরে নরোত্তম মনোরথ পূরে॥ ২৯॥

ইতি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সংপ্রার্থনা পদাবলী সম্পূর্ণ। পদাবলীর সংখ্যা মোট ২৯।

পৃষ্ঠসংখ্যা ১৪।

২০। পঞ্চাঙ্গ-নিগূঢ়ার্থ।

আরম্ভ—

উত্তরে কৃ, দক্ষিণে ষ্ণ, পশ্চিমে কৃ, পূর্ব্বে ষ্ণ, মস্তকে গো, বক্ষে বি, ভগে ন্দ, জানুতে রা পৃষ্ঠে ধে, নাভিতে কৃ, গুহ্যে ষ্ণ ইত্যাদি।

শেষ—

দুই কক্ষ দুই কর দুই বাহুতল।
দুই হাঁটু দুই জুনি এক মূল স্থল॥
এই নব জুনিতে নবরস রসিক সাধয়ে নিশ্চয়।

ইহা বাউল সম্প্রদায়ের একখানি পুস্তক।

২১। প্রেমতরঙ্গিণী—ভাগবতাচার্য্য।

আরম্ভ—

নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

গুরু সত্য বৈষ্ণব গোসাঞি চরণেষু।

মঙ্গলাচরণ— *

শ্রীকৃষ্ণ গোপীনাথ নন্দের নন্দন। ক্ষিতিতলে কৃপার কারণা অবতার।
বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজরমণী জীবন॥ অশেষ পাতকী জীব করিলা উদ্ধার॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সার নাম এ দুই অক্ষর। বৈকুণ্ঠনায়ককৃষ্ণচৈতন্যমূরতি:
এক কৃষ্ণ নামে হয় কোঁ (?) নাম ফল॥ তাহার অভিন্ন হয় সহজে শকতি:
* * * * মোর ইষ্ট গুরুদেব সেই দু চরণ।
পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীগদাধর নামে। দেহ মন বাক্য মোর সেই সে সেবন॥
ভাগবত মহিমা গাইল ভুবনে॥

পাঁচালি রচিব কৃষ্ণ-প্রেম তরঙ্গিণী।
শুনিলে গোবিন্দ প্রেম হয় হেন জানি॥

ভণিতা—

১। ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত আচার্য্যের মধুরস গান॥

২। শ্রীগদাধর জান ধীরশিরোমণি।
ভাগবত আচার্য্যের প্রেম-তরঙ্গিণী॥

প্রেমতরঙ্গিণী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ। আমরা যে পুঁথি পাইয়াছি তাহাতে ১ম হইতে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আছে। ইহা ছাড়া দশম স্কন্ধের ১৪, ৪২ ও ৪৫ অধ্যায় আছে ৯ম স্কন্ধ পর্য্যন্ত পুঁথির পৃষ্ঠসংখ্যা ১১২।

২২। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স পদান্তিকং॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দ মুঞি সাবধান মনে।
যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যা হইলে॥

শেষ—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বোলান বাণী।
কি বলিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথপদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥
সহ অক্ষর শ্রীরামকানাই দাস নরাধম।
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক।

এই পুস্তকের আরও দুই খানি পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট আছে।
উল্লিখিত পুস্তক খানির পৃষ্ঠসংখ্যা ১৫।

২৩। বিলাপকুসুমাঞ্জলি।

রঘুনাথ গোস্বামীর কৃত মূল ও রাধাবল্লভ দাস কৃত অনুবাদ। সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা ১০১।

আরম্ভ—

ত্বং রূপমঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং ন হি পশ্যসীতি॥
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগতভর্তৃকায়া
যত্তে ব্যধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেন॥
অস্যার্থঃ—
শ্রীরতিমঞ্জরী পুছেন শ্রীরূপমঞ্জরী।
ব্রজপুরে খ্যাতা তুমি পতিব্রতা করি॥
পর পুরুষের মুখ কভু নাহি দেখ।
বিম্বাধরে ক্ষত-চিহ্ন দেখি পরতেক।
ভর্ত্তা তোমার ঘরে নাহি গিয়াছেন গোষ্ঠে।
তবে কেন ক্ষতচিহ্ন দেখি তোমার ওষ্ঠে॥
বিম্ব ফল লোভে বুঝি শ্রীশুকপুঙ্গব।
আসি আস্বাদিল তেঞি চিহ্ন হৈল সব॥

শেষ

প্রণয় শালিনি প্রণয় পুষ্ট দাস্যে।
প্রাপ্তের নিমিত্তে করি কাম অভিলাষে॥

প্রচুর দুঃখে দগ্ধ আত্মা অতি রোদনেতে।
বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ধরি হৃদয়েতে॥
তুয়া পাদ পদ্মে কৈল ইহা সমর্পণ।
কৃপা করি হউক তোমার তুষ্টির কারণ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনা বিরচিতঃ বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবঃ সম্পূর্ণঃ।

পৃষ্ঠসংখ্যা ৩৩।

২৪। বৈষ্ণব বন্দনা—শ্রীদৈবকীনন্দন।

আরম্ভ—

জয় জয় চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রাণ গোরা চান্দ মোর ধন গোরাচান্দ।
শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ॥

শেষ—

প্রভাতে উঠিয়া পড়িবে বৈষ্ণববন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি তারে লবে।
দৈবকীনন্দন কহে এই সব লোভে॥
ইতি বৈষ্ণববন্দনা সমাপ্ত॥

২৫। বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ—বলরাম দাস

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥
আনন্দে বল হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
বৈষ্ণব ঠাকুর বড় করুণার সিন্ধু।
ইহ লোক পরলোক তিন লোকে বন্ধু।

শেষ—

বলরাম দাসে কহে এতেক বিচারি।
বিসয়ার ঘরে জন্ম না হয় আমারি॥
ইতি শ্রীবৈষ্ণববিধান গ্রন্থ সমাপ্ত।

পৃষ্ঠসংখ্যা ৫।

২৬। ভক্তিরসাত্মিকা—অকিঞ্চন দাস

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় :
পতিত পাবন জয় জয় মহাশয়॥
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাসাগর।
কৃপা কর নিতাই চান্দ রসের ঠাকুর॥

শেষ—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির প্রকাশ।
ভক্তিরসাত্মিকা কহে অকিঞ্চন দাস॥
ইতি শ্রীভক্তিরসাত্মিকা গ্রন্থ সমাপ্ত।
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং শ্লোক।

২৭। ভক্তিরসের আখ্যান।

আরম্ভ—

নিদ্রামুদ্ঘলিতাং ভক্তিসুধামপয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতং তং শচীগর্ভে ব্যোম্নি পূর্ণবিধুং শ্রয়ে।

শ্রীগুরু পদারবিন্দ ক্ষরে যাতে মকরন্দ
বন্দো মুঞি হইয়া সাবধান।
যাহার করুণা হইতে, শ্রীরূপ ভাবিয়ে চিতে,
স্বরূপ হৈলা বিদ্যমান॥
রাধিকার প্রিয়া অতি, তাহার চরণে নিতি
সেবে তার সখি রূপ হৈঞা।
ঞিহ গুরুরূপ ধরি, জীবেরে করুণা করি,
বুলে গোরাগণে বিহরিয়া॥

পুস্তকে ভাব, রতি, ভক্তি প্রভৃতির প্রকারভেদ ও প্রত্যেকের লক্ষণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের মত সমর্থন জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগের শ্লোক ও পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবত, উজ্জ্বলনীলমণি, চৈতন্য চরিতামৃত হইতেই অধিক শ্লোক ও পদ উদ্ধৃত। ১৬ পৃষ্ঠের পর পুস্তক খণ্ডিত। এই কয় পৃষ্ঠে শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৬০।

২৮। জ্ঞানসন্ধান।

আরম্ভ—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞি যার প্রাণধন।
যাহার প্রসাদে পাই স্মরণ মনন॥
গুহ্যাতিগুহ্য যেই স্থান হয়।
অপ্রকট নিত্য স্থান যাহাতে উদয়।
অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড পরে আছে যেই স্থান।
তাহার অবধি শুন হৈঞা সাবধান॥

শেষ—

শিক্ষাগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবস্বরূপ হন।
তাহাতে জানিবা সব ভজন সন্ধান॥
এই দিনে উদ্ভব হৈল সভার হয়।
বস্ত্র বয়স বর্ণ সেবা জানিবা নিশ্চয়॥

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪।

২৯। মনোবৃত্তিপটল—কৃষ্ণদাস।

প্রথম পত্র খণ্ডিত। ২য় পত্রে

প্রারম্ভে—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
গৌরচন্দ্র মনোবৃত্তি কহি বিস্তারিয়া॥

শেষ—

কহিতে কহিতে দুই ভাই প্রফুল্লিত।
রজনী সময় হৈল দিবস উপস্থিত।
জন্মে জন্মে রাধা পদ করিয়া আশ।
মনোবৃত্তি পটল কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীমনোবৃত্তি পটল সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক। তারিখ মাহ ফাল্গুন রোজ মঙ্গলবার। শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র দাস বৈরাগী সাং সিহলস্থান।

৩০। রাধাবিলাস—ভবানীদাস।

আরম্ভ—

'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোক।
অথ রাধাবিলাস লিখ্যতে।
প্রণমহো নারায়ণ গোলোকের ধাম।
তার প্রাণপ্রিয়া বন্দো রাধা যার নাম॥
এক প্রাণ এক বুদ্ধি এক রাধা কানু।
ক্রীড়া করিবার লাগি হইলা দুই তনু॥

পুনশ্চ—

আগম পুরাণ বেদ বুধমুখে শুনি।
সেই অনুসারে রচে দাস ভবানী ॥
পাতগুা নিবাসী ঘোষ ভবানী অবোধা।
জনক যাদবানন্দ জননী যশোদা ॥
* * দ্বিজগুরু মনে করি আশ।
ভবানী দাস কহে রাধা কৃষ্ণের বিলাস ॥
দানখণ্ড নৌকা খণ্ড করিয়ে রচন।
ভাগবতে ইহাঁ নাহি বলে বুধজন ॥

শেষ—

নৌকাখণ্ড পুস্তক রচিল ভবানী দাস।
যে জনে শুনে তার গোলোকে হয় বাস ॥

ইতি রাধাবিলাস পুস্তক সমাপ্ত। সন ১০৫৬ সাল। ১৭ই চৈত্র মঙ্গলবার। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি শ্লোক।

পৃষ্ঠসংখ্যা ৪২।

৩১। রাধামোহন পুস্তক—গোপিকামোহন।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তি।
'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোক।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় রাসক্রীড়া জয় শিশুগণ ॥
জয় জয় নন্দঘোষ গোয়ালা প্রধান।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥
জয় জয় বৃকভানু রাধিকার পিতা।
জার ঘরে বৈসে রাই কৃষ্ণের বনিতা ॥
কৃষ্ণের পরম ভক্ত বৃকভানু ঘোষ।
রাধা কৃষ্ণ পরিবাদ কথাতে সন্তোষ ॥

শেষ—

রাধা নহে জানিল সে শ্রীদাম গোয়াল ॥
জানিল সকল লোক রাধা হৈল সতী।
গোপীগণ ফিরে সবে রাধার সঙ্গতি ॥
গৃহকর্ম্ম করিতে গেলা রাধা আপন ভুবনে।
* * কহে গোপিকা মোহনে ॥

ইতি রাধামোহন পুস্তক সমাপ্ত। স অক্ষর শ্রীরামকাহ্নাই দাস। তারিখ ১২ শ্রাবণ রাত্রে।

৩২। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত কথা—বিপ্র যাদবানন্দ।

প্রথম পত্র খণ্ডিত। ২য় পত্রের প্রারম্ভে—

যাহার স্মরণে দুঃখ দারিদ্র এড়াই।
মৃত্যু কালে রথে চড়ি বৈকুণ্ঠেতে যাই।

শেষ—

কহে ত যাদবানন্দ বিপ্রকুলে খ্যাতি।
লক্ষ্মীনারায়ণ বিনে অন্য নাই গতি ॥
* * * বোধ মোর করিবে বিমোচন।
জন্মে জন্মে মন রহুঁ তোমার চরণ ॥

ইতি শ্রীলক্ষ্মী নারায়ণ ব্রত কথা সমাপ্ত। 'য   ং তথা লিখিতং' ইত্যাদি শ্লোক।

লিখিতং শ্রীসাহেবরাম পাল দাস সাং হুজুরাপুর। সন ১১৮৩ সাল তাং ৯ই ফাল্গুন রোজ সমবার চাদ মহরম।

পৃষ্ঠসংখ্যা ২২।

৩৩। শ্রীরূপমঞ্জরীর পদপঙ্কজ প্রার্থনা—বৈষ্ণবচরণ দাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

হে রূপমঞ্জরী শুন নিবেদন করি। তোমার শ্রীচরণ পঙ্কজে মোর গতি।
শ্রীরাধামাধব তোমার নিজ সুরেশ্বরী॥ অতি দীন জন্তু মুই কর আমা প্রতি॥
সেই দুঁহার পাদপদ্ম সেবামৃত রসে। নিজ কৃপা অতিশয়ে দৃষ্টি বিক্ষেপণ।
পরিপূর্ণ হও তুমি রজনী দিবসে॥ করিয়া করিবা মোর বাঞ্ছিত পূরণ।

শেষ—

কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি শ্রীরাধিকা। শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হৃদয়ে ধারণ।
কৃপাদৃষ্টি বিস্তারণ করহ রাধিকা॥ করিঞা কহিলা দাস বৈষ্ণব চরণ।

ইতি শ্রীরূপমঞ্জরী পদপঙ্কজ প্রার্থনা সমাপ্ত।

৩৪। সত্যনারায়ণের পুঁথি।

আরম্ভ—

'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোক।

ভূমিতে করিয়া নতি বন্দ দেব গণপতি
বিঘ্ন নাশ শিবের নন্দন।
দ্বিতীয়ে বন্দিব রবি জবা পুষ্প দিয়া ছবি
এক চক্র রথে আরোহণ॥

শেষ পৃষ্ঠ খণ্ডিত।

৩৫। সরণিটীকা।

ইহা গত বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদক উদ্ধৃত জেমোর চম্পক-লতিকার অনুরূপ। মধ্যে মধ্যে সামান্য পাঠান্তর আছে। ইহাতেও পুঁথির মাঝামাঝি 'জিজ্ঞাসা' অংশ আছে।

আরম্ভ—

অষ্ট বৎসর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে। রূপের লাগিয়া সদা স্থির নহে মন।
এথা সনাতনের * * দিনে॥ গৌরাঙ্গপদারবিন্দে করে আরাধন॥

মধ্যে—

অথ জিজ্ঞাসা। কৃষ্ণলীলা কয় মত। দুই মত। প্রকট অপ্রকট। প্রকট লীলাতে মথুরাতে গমন। অপ্রকট বৃন্দাবনে স্থিতি। অবতারি কে। নন্দনন্দন। অবতার বসুদেবের নন্দন। কয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কে কে। বসুদেবের নন্দন আর নন্দের নন্দন ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই তিন কৃষ্ণ। রাধা কে কে। প্রেম রাধা কাম রাধা ভাব রাধা। কাম রাধা চন্দ্রাবলী। প্রেম রাধা বৃকভানুনন্দিনী।

৩৬। সাধনাশ্রয়।

আরম্ভ—

শ্রীরূপগোস্বামিচরণেভ্যঃ নমঃ।
প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ।
দশনে ধরিব মুঞি করি নিবেদন॥
তবে বন্দো হরষিত মনে গোবিন্দ গোঁসাঞি।
কৃষ্ণ প্রেম ধন দিতে আর কেহ নাই॥
সর্ব্ব অভীষ্ট মিলে নিলে যার নাম॥

শ্রীনন্দনন্দন বয়েক্রম ভাব। * পনর বৎসর নয় মাস সাত দিবস ছয় দণ্ড। শ্যামবর্ণ পীতবস্ত্র পরিধান। নেত্র হস্ত পাদ কর্ণ অরতি ত্রিভঙ্গ। ময়ূর পুচ্ছ চূড়ার চালনে। অধরে মুরলী রসরাজ মুরতি। নবলীলা আস্বাদন করিব। শ্রীবৃকভানু জীউর বয়েক্রম চৌদ্দ বৎসর দুই মাস পনর দিবস। * নীল বস্ত্র পরিধান। তপ্ত-কাঞ্চন গৌরাঙ্গী। মুখবর্ণ চন্দ্রমার প্রায়। কর্ণে নেত্রাষ্টক। * নাসাপরে গজমুক্তা হার। ইসের (?) প্রায় গজ-গামিনী প্রেমের মুরতি হইল। নিরন্তর ভাবনা করিব। শ্রীরূপমঞ্জরীর যুথের সহাই। স্থিতি বিলাস তিন প্রকার হয়। সাধারণী সমঞ্জসা সংর্থা। সাধারণী রতি। * * * কামবীজ স্বরূপ শ্রীরাধিকা। সেই কামবীজ কৃষ্ণের আশ্রয়। সেই প্রেমের আশ্রয় সাধক সাধন প্রাপ্তি। সাধন সখির আশ্রয়। হইলে সখি হয়। * * *

শেষ—

রাগী কাকে বলি। রাগী রাগময় *। ইতি সাধনাশ্রয় সম্পূর্ণ। দাস গোস্বামীকর সিদ্ধান্তট। ইতি তারিখ ২০ আশ্বিন। রোজ শনিবার সাল ১৬ * ৯। পূর্ণমাসি।

পৃষ্ঠসংখ্যা ৭।

৩৭। সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস।

'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য' ইত্যাদি শ্লোক।
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
শ্রীগুরু হইতে ভাই পাই সর্ব্বজনে॥
যেমন দয়ার সিন্ধু শ্রীগুরু গোসাঞি।
যাহার কৃপাতে দেখ হেন ধন পাই॥

শেষ—

স্মরণ মনন যেই জান সার হৈতে।
বুঝিয়া সাধক ভাই রাখিবে হিয়াতে॥
শ্রীগুরুপাদপদ্ম করি আশ।
সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

৩৮। সাধ্যভাবামৃত গ্রন্থ।

আরম্ভ—

'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য' ইত্যাদি শ্লোক।
শ্রীরূপ গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি।
দুই জন বসি আছে আর কেহ নাই।
শ্রীজীব গোসাঞি কহে শুন করি নিবেদন।
আজ্ঞা কর কৃষ্ণ কথা যদি লয় মন॥

শেষ—

মন ভাগ কর গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি।
তবে সাধ্য সিদ্ধি হবে কিছু ভয় নাই॥
ইতি শ্রীজীবগোস্বামিবিরচিতং সাধ্যভাবামৃত পুস্তকং সমাপ্তং। সন ১২৫৯ সাল ৩০এ পৌষ।
পৃষ্ঠসংখ্যা ১৭।

৩৯। সিদ্ধিপ্রণালী।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণজীর বয়েক্রম ১৫ পনের বৎসর নয়মাস সাত দিবস। বর্ণ বস্ত্র ভূষা। নবীন নীরদ শ্যাম বর্ণ। পীতবস্ত্র পরিধান। ভূষা ধরা চূড়া।

শেষ—

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর পীত বর্ণ কাঁচ বস্ত্র। মাসাধিক ত্রয়োদশবর্ষীয়া হেম পরসেবা।

৪০। স্বরূপবর্ণনা—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণেভ্যঃ নমঃ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ সভেই আইলা জীব করিতে তারণ॥
৩ জয় জয় শ্রোতাগণ শুন দিয়া মন।
গৌরচন্দ্র অবতার হইল যে কারণ॥

শেষ—

শ্রীরূপ শ্রীব্রজলীলা করিলা বিস্তার। শ্রীরূপ শ্রীরঘুনাথ পদে যার আশ।
পরকীয়া মতে তাহা করিলা প্রচার॥ স্বরূপবর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীস্বরূপ বর্ণন গ্রন্থ সমাপ্ত। সাল ১২৪৮।

পৃষ্ঠসংখ্যা ১২।

৪১। হরিনামামৃতদীপিকা।

আরম্ভ—

জয়তি শ্রীকৃষ্ণমন কৃষ্ণআহ্লাদস্বরূপিণী। তথাহি। অহো তাং শ্রীকৃষ্ণ রাধা পরিকীর্ত্তিতা। কৃষ্ণের মন হরেকৃষ্ণ আহ্লাদস্বরূপিণী। হর শব্দে হয় সেই রাধা ঠাকুরাণী। শ্লোক।

রাম শব্দে কহি তত্ত্ব রাধিকারমণ।
বিদগ্ধ নাগররাজ মদনমোহন॥

শেষ—

সৃষ্টির মধ্যে আমার আছে যত জন। ইতি গোস্বামী স্বকৃত শ্লোকের আশয়।
তা সভার মন পূর্ণ কর দিয়া দরশন॥ হরিনামামৃতদীপিকা করিল নির্ণয়॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ হরিনাম পরা বেদা হরি নাম পরাঙ্করা। হরিনাম পরাশ্রয়া হরিনাম পরাগতি॥

পৃষ্ঠসংখ্যা ৪।

৪২। হরিনামের অর্থ।

আরম্ভ—

হ শব্দে গুরু হয়। রে শব্দে রাধা। কৃশব্দে নায়ক হয়। আরু শব্দে গোবিন্দ। রা শব্দে সঙ্কর্ষণ হয়। ম শব্দে চিত্ররাধা। বীজ ক্লীং কৃষ্ণায় সহায়। ইত্যাদি।

পৃষ্ঠসংখ্যা ১২।

৪৩। হাটপত্তন—নরোত্তম দাস।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচরণ ভরসা।

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার। কলি ঘোর অন্ধকার পাপাচ্ছন্নময়।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥ পূর্ণ শশধর ভেল বৈষ্ণব তাহায়॥

শেষ—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদয়েতে ধরি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ু গিরি করি॥ দাস নরোত্তমে কহে হাটের প্রবন্ধ॥

পৃষ্ঠসংখ্যা ১২।

৪৪। ব্যবস্থাতত্ত্ব।

ব্যবস্থাসম্বন্ধীয় একখানি প্রাচীন পুস্তক। অধিকাংশ বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত। ইহা একাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এক এক পরিচ্ছেদে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদ সংস্কৃতে লিখিত। ভাষা ভ্রান্তিপূর্ণ ও কষ্টপাঠ্য। বিষয় গঙ্গাস্নান-ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তীর্থযাত্রা ব্যবস্থা; ভাষা সংস্কৃত, ভ্রান্তিপূর্ণ ও কষ্টপাঠ্য। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অপালনবিধি। প্রথম অংশ সংস্কৃত। দ্বিতীয় অংশ বাঙ্গালা গদ্য। ইহা প্রথমাংশের অনুবাদ। দ্বিতীয়াংশের আরম্ভ:—

অথ অপালন নিমিত্তক গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। সর্ব্বথা প্রকারে প্রতিপালন না করে ইহাতে শীত অনিল উদ্বন্ধন শূন্যাগার জলমধ্য অগ্নিদাহ পতন গর্ত্তে ব্যাঘ্র ইত্যাদি নিমিত্তক যদি গোবধ হয় তবে অর্দ্ধ গোচর্ম্ম গাত্রে দিঞা গোসহিত প্রত্যহ যাতায়াৎরূপ ইতি কর্ত্তব্যতা করিঞা প্রাজাপত্য ব্রত প্রায়শ্চিত্ত হয়। যদি ইতিকর্ত্তব্যতা না কোরিতে পারে তবে ইতিকর্ত্তব্যতার অনুকল্প এক প্রাজাপত্য হয়। অতএব প্রাজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়। তদ অনুকল্প ষট্ কার্ষাপণ বরাটিকা দিবেক। ইচ্ছাতে এক সামান্য গোদক্ষিণা হয় তদনুকল্প বৃষমূল্য পঞ্চ কার্ষা সামান্য গোমূল্য এককার্ষাপণ এবং ষট্ কার্ষাপণ বরাটিকা দক্ষিণা হয়। ইহাতে বিশেষ বচন প্রাপ্ত শূদ্রের প্রাজাপত্য দুই প্রায়শ্চিত্ত হয়। ইত্যাদি।

অবশিষ্টাংশ এইরূপ গদ্যে লিখিত, তবে মধ্যে মধ্যে প্রমাণস্বরূপ দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শেষ—

অপর অমাবস্যা শ্রাদ্ধ দীপান্বিতা লক্ষীপূজা শ্রাদ্ধমঞ্জরীতে কোথিত। অর্দ্ধোদয়ব্যবস্থা * *।

লেখক শ্রী প্রাণনাথ শর্ম্মা। শ্রীব্রেজ মোহন শর্ম্মার সাকিন বেগমাবাদের এ পুস্তক সমাপ্ত হয়। বৃহস্পতি-বারের একপ্রহর বেলা হৈলে পর তিথি তৃতীয়া মাহ মাঘের ১১ এগারোহি তারিখে। ইতি সন ১২৩৫ সাল শকাব্দা ১৭৫০ ইতি ব্যবস্থাতত্ত্ব সমাপ্ত। যথাদৃষ্টং ইত্যাদি শ্লোক।

উপরোক্ত পুস্তকসমূহ এখন শ্রীযুক্ত মাধবলাল অধিকারী মহাশয়ের নিকট আছে।

তাঁহার ঠিকানা পোঃ মালদহ, গ্রাম মকতুমপুর, জেলা মালদহ। পুঁথি গুলি তাঁহারই সম্পত্তি। প্রকাশিত পুঁথিগুলি ব্যতীত অধিকারী মহাশয়ের নিকট কাশীরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের পুস্তক হইতে কতক কতক অংশ খণ্ডাকারে সংগৃহীত আছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম অধিকারী মহাশয় পুথিগুলি বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক।

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মালদহ।

প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

১। ঘোরমঙ্গলচণ্ডী।

আরম্ভ—

সৃষ্টি স্থিতি বিনাসাং শক্তিভুতা সুনাতনি।
গুণাশ্রই গুণমহি নারায়নি নমস্ততে॥
প্রণমহ নারায়নি দেবি ভগবতী।
এ তিন ব্রহ্মাণ্ড আদি যাহার উতপতি॥
আদ্য শক্তি মহামায়া মায়াএ মুহিআ।
ত্রিভুবনের মৈধ্যে রৈছে নিরাকার হৈআ॥
আদি অন্ত নাহি যার অপার মহিমা।
চারি মুখে প্রজাপতি দিতে নারে সীমা॥

শেষ—

এতেক পুজহ ভাই ভক্তি ক * * * *।
* * * সেবা করিতে না লাগে বহু ধন॥
যদি কালীপাদ সেবা করে এক মনে।
সমন কিঙ্কর তারে কি করিতে পারে॥
সভাতে বসিয়া জেই করে উপহাস।
নিচাএ জানিয় সেই হএত বিনাস॥
হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
জয়কালীর চরণ বিনে অন্য গতি নাই॥
দুঃআসা ছাড়িআ ভাইপুজএ ভবানি।
বিসম সঙ্কট কালে গতি নারায়নি॥
ঘুরচণ্ডির পুস্তক হইল সমাধান।
ঘুর চণ্ডির প্রীতে ভাই করএ প্রণাম॥

দুই পৃষ্ঠে লেখা। পত্রসংখ্যা ৮।

"ইতি ১১০৪ বাং মাহে ৫ আসাড় পং চাপঘাট মৌজা আমলসীদ রোজ স্থকুরবার ২ দুই পসর উদন সমর্ন (সম্পূর্ণ) * * * শ্রীকাসীরাম দে দাষস্য * * *"

২। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

আরম্ভ—

হরি হরি বল ভাই শ্রীমধুসুদন।
অখিলের পতি হরি পতিতপাবন॥
সরির পবিত্র হএ লইলে হরি নাম।
সংসার সকলী মিথ্যা এই মাত্র কাম॥
পাণ্ডব বিজই জদি হইল সমাধান।
আশু হইয়া জগ দিল দেব ভগবান॥

শেষ—

যুধিষ্টির দেখী সীব হরস অপার।
সীবলোক পবিত্র আজি হইল আমার॥
যুধিষ্টির আগমন আমার পুরিতে।
মনরত পুর্ণ আমার হইল আজি হতে॥
আমার পুরিতে আজ থাকহ আপনে।
আমা সঙ্গে হইয়া যাইবা কৃষ্ণ দরসনে॥
জুড় হস্তে নরবর করে নিবেদন।
মুই পাপির কৃষ্ণ বিনে আর নাহি মন॥
সীবে বলে সিদ্ধি হউক তুমার মনস্কাম।
সাক্ষাতে আসিয়া দেখা প্রভু অবিরাম॥
তথা হনে গেলা রাজা বৈকন্ট নগর।
চতুর্ভুর্জ বিষ্ণু তথা দেখে নৃপবর॥
দণ্ডবত হইআ রাজা করিল প্রণাম।
বিষ্ণুবলে সীদ্ধি হউক তব মনস্কাম॥
* * * * * গলক ভণনে।
* * * রূপে কৃষ্ণ রাধিকার সনে॥
পারিসাদ সঙ্গে করি ধর্ম্মের নন্দন।
দণ্ডবত হইয়া পড়ে প্রভুর চরন॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি নয়ানে বহে নির।
অতি সুকমল তনু অধিক গম্ভির॥
পুন্যবান জনের হয় এমত প্রকার।
সংসার সহ নাসি রহে ভবের মাঝার॥
হইছে না হইব আর সমান ইহার।
এই হনে সমাধান সঙ্গারন (স্বর্গারোহণ) তার॥

৪৬ পাতা। উভয় পিঠে লেখা। পুঁথির তারিখ—

"ইতি সন ১১২২ সাল বাঙ্গলা মাহে ৫ ভাদ্র লেখিতং শ্রীবিজয়রাম স্বামী।"

৩। শ্রীরাধিকার কলঙ্ক উদ্ধার—মদনচান্দ ও গোলোকচান্দ।

আরম্ভ—

রাধিকা জিবনং ধনং সদা জপতি মাধব।
ত্রৈলৈখে জপতি কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপতি রাধিকা।
ত্রিতিএ বন্দিএ বিষ্ণু ত্রিজগত পতি।
তান দুই ভার্জ্যা বন্দি লক্ষি সরেস্বতি॥
প্রথমে প্রণাম করি নাথ নিরঞ্জন।
দিতিএ বন্দিএ ব্রহ্মা সৃজন কারণ॥

শেষ—

অজ্ঞান মদন চান্দে কর জুড়ে কহে।
অন্তকালে প্রভু মরে না দিও সমন ভএ॥
অগান গলকচান্দে বলয়ে বচন।
এই হনে কলঙ্ক উদ্ধার সমাপন॥
মনে এই আসা করি আমি মতিহিন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাম বল প্রতিদিন॥

পত্রসংখ্যা ২১। দুই পৃষ্ঠায় লেখা। পুঁথির তারিখ—

"ইতি সন ১১৩৪ সাল বাঙ্গলা মাহে ১৩ শ্রাবন নিজ পুস্তক শ্রী * নাথ অলদে হুলাস নাথ সাকিম প্রগণে ডর মৌং টঙ্গিবাড়ী।"

৪। শ্রীকৃষ্ণ বিজয়—গুণরাজখান।

আরম্ভ—

নারায়ণং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরর্ত্তমং।
দেবি স্বরেস্বতি ব্যাসং তত জয়মুদিরত॥

প্রণমহু নারায়ণ অনাদি নিধন। গণপতি প্রণমহু বিঘ্ন কর তার॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েত যাহার কারণ॥ সকল দেবতা মুই বন্দিয়া চরণ।
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দু সৃষ্টির সংহার। কৃষ্ণের মহিমা কিছু করিএ রচন॥

শেষ—

শুন শুন ওরে লক হইয়া সাবধান। শ্রীগোবিন্দ বিজয় বলে শুণ রাজথান॥

"ইতি শ্রীকৃষ্ণবিজই পুস্তক সমাপ্তি; ভিমস্যাপী রণে ভঙ্গ মনিরপী মতিভ্রম। যথা দৃষ্টয়া তথা লিখীতং শ্রীসুভারাম * * ' রামেশ্বর দাসস্য সাকিম প্রগনে পঞ্চখণ্ড কালা * * * ইতি সকদা (শকাব্দা) ১৬৮৫ মাহে ৫ চৈত্র—বোদবার।"

পুঁথির বিবরণ—২১১ পাতা। দুই পৃষ্ঠে লেখা।

৫। শ্রীবৈষ্ণববন্দনা—দৈবকীনন্দন।

আরম্ভ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়ৌ। সর্ব্বাবতার সন্তক্তৌ সোর্ব্বভক্ত জনাশ্রয়॥

আহির রাগ।

প্রাণ গোরাচান্দ মর ধন গোরাচান্দ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্তানন্দ অবতারে।
বন্দিলা জীবের মন দিয়া প্রেমফান্দ॥ যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
মিনতি করিআ তির্না ধরিএ দশনে। বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
নিবেদন করি গুরু বৈষ্ণব চরণে॥ মুই কুন জীব হই সিসু অল্পমতি॥

শেষ—

এই অবতারে জত অসেস বৈষ্ণব। সরণ লইল গুরু বৈষ্ণব চরণে।
কহন না জাএ জত অনন্ত বৈভব॥ সঙ্কপে কহিলু কিছু শ্রীবৈষ্ণব বন্দনে॥
অনন্ত বৈষ্ণবের অনন্ত মহিমা। বৈষ্ণব বন্দোনা পাট সুনে জেই জন।
হেন জন নাহি জে করিতে পারে সিমা॥ অন্তরে মলিন ঘুচে সুদ্ধ হএ মন॥
বন্দোনা করিতে মর কত আছে বোদ্ধি। প্রভাতে উঠিয়া পাট বৈষ্ণব বন্দোনা।
বেদেহ কহিতে নারে বৈষ্ণবের সুদ্ধি॥ কুন কালে নাহি পাএ কুনই জন্ত্রনা॥
সভাকার উপদেস বৈষ্ণব ঠাকুর। দেবের দুর্ল্লভ প্রেম ভক্তি এই লভে।
শ্রুবন নজন মর বচনের দুর॥ দৈবকী নন্দনে কহে এই সব হবে॥

ইতি বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সমাপ্ত। সন ১২ সাল বাঙ্গলা মাহে ৮ আটই ভাদ্র রুজ বোদবার। এক প্রহর থাকিতে সমাপ্ত॥ সয়ক্ষরে লেখিতং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস বৈষ্ণব। নিজ গ্রন্থ শ্রীসতাইনাথ ওলদে কেচাই নাথ। সাং পং প্রতাপগড় মুকাম চরগুলা কিং পছিমসনা॥ সাং কচুখাউরি॥

মন ভ্রম হৈআ জদি অক্ষর পড়ি থাকে। বির্দ্ধানের হাথে গেলে উর্দ্ধারিব তাকে॥

৭ পাতা। প্রথম ও শেষ পাতার এক পিঠে, অবশিষ্ট পত্রের উভয় পৃষ্ঠে লেখা।

৬। বৈষ্ণবচরিত—বলরাম দাস।

আরম্ভ—

ব.ন্দ গুরুনিসভথতা নিসমীসাবতারকান। আনন্দে ভজহ হরি প্রভু ভগবান।
তর্ত্ত প্রকাশ তর্ত্ত শক্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতৈর্ন্না সন্নিকং॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পদে ঘুচাইআ মান॥
বাঞ্চা কল্পতরুবচা কৃপাসিন্ধু ভএবচ। বৈষ্ণব ঠাকুর মর করুণার সিন্ধু।
পতিতানাং পাপনবা বৈষ্ণব চরণবা নমনম॥ এহলুক পরলুক দুই কুলের বন্দু॥ ইত্যাদি।

শেষ—

বৈষ্ণব ঘরেত যদি ভির্থ কর্ম্ম করি। শ্রীবলরাম দাসে বলে এতেক বিচার।
তথাপি বিসয়র দুক্ক সহিতে না পারি॥ বিসইয়ার ঘরে ধর্ম্ম নহে যেন আর॥

"ইতি বৈষ্ণবচরিত্র গ্রন্থ সমাপ্ত—ইতি সন ১২০৫ বাং মাহ ৩০ পোউস, নিজগ্রন্থ শ্রীহুলাসরাম দত্ত—সাং পং ওয়াদি মৌং ইস্বরশ্রী।"

পত্র সংখ্যা ৭। দুই পৃষ্ঠে লেখা। পাতা জোড়া।

৭। সত্যরামের পাঁচালী—দ্বিজ রামকৃষ্ণ।

আরম্ভ—

বেদে রামাঅনে চৈব পুরাণে ভারথস্তথা। তদন্তরে প্রণমহু দেবি স্বরেসতি॥
আদি অন্তে মোধে চ হরি সর্ব্বত্র গিঅতে॥ ব্যাস বৃহস্পত্তি বন্দু সঙ্কর ভবানি।
প্রণমহু নারায়ণ লক্ষ্মিকান্ত পতি। বিবেচিয়া কহি সুন অপুর্ব্ব কাহিনি।

শেষ—

ভকতি প্রণতি স্তুতি কিছু নহি জানি। কহিল পাচালি এই করহ প্রণাম॥
খম অপরাধ হরি প্রভু চক্রপাণি॥ দিজ রামকৃষ্ণে বলে করিয়া প্রণতি।
ভক্তি করিআ লও নারায়ণের নাম। এই হনে পুস্থক জে হইল সমাপতি॥

"ইতি সত্যদেবের পুস্থক সমাপর্ত্ত (সমাপ্ত)। ভিমস্বামি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম। যাদৃসা তথা লিখিতং লেখনং নাস্থি দুসনং দুয়ে অক্ষর (সাক্ষর) শ্রীজাদবরাম দাষ সাং প্রগনে চাপঘাট মৌং হাসনপুর তিজারতে মুকাম সিন্দুদই * * * চকির উপর বসিআ লেখিলাম। ইতি সন ১২৩৭ সাল বাঙ্গলা মাহে ২ কার্ত্তিক রোজ রবিবার তিতি প্রিতিতে দিবসে সমাপত্ত করিলাম। ইতি নিজ পুস্থক শ্রীসতাইনাথ পিত্তুরে কেচাইনাথ সাকিম প্রগনে প্রতাপগড় মৌং সিঙ্গয়া শ্রীজাদবরাম দাষস্ত।"

পত্রসংখ্যা ৮। দুই পিঠে লেখা।

৮। চণ্ডীদাস পদাবলী।

"ইতি সন ১২৬১ সাল বাংলা মাহে ২৯ জ্যেষ্ঠ নীজ গ্রন্থ শ্রীদআল দাস বৈষ্ণব ব্রজবাসি সাং পং পলড়য় মৌং পুরান র.তাবাড়ি সঐক্ষর শ্রীগৌরুরাম দাস সাং পং কৌড়িআ মৌজে রায়পুর।"

পুঁথির বিবরণ—পত্র সংখ্যা ৭। দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা ২১।

৯। রামচন্দ্র কবিরাজের পদাবলী।

সংগ্রহকারীর নাম নাই। পত্রসংখ্যা ৮। দুই পৃষ্ঠে লেখা। পদসংখ্যা ১৭।

"ইতি নিজ গ্রন্থ শ্রীমিলননাথ।"

আমি কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ্য করিতেছি যে, আমাদের দেশের গড়রগাউ নিবাসী ধর্ম্মানুরাগী শ্রীমান্ কোটিমণি নাথ পুঁথি সংগ্রহে আমার প্রধান সাহায্যকারী। বলা বাহুল্য তাঁহাকে সহায় না পাইলে আমি এতগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিতাম না।

শ্রীরাজীবলোচন দাস।

প্রাচীন পুথির বিবরণ

নিম্নে বিবৃত পুঁথিগুলির অধিকারী (মুর্শিদাবাদ) কান্দি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বঙ্ক-বিহারী ঘোষ।

১। গোবিন্দ-চরিতামৃত—যদুনাথ দাস বা যদুনন্দন দাস।

পত্রসংখ্যা ১১৮, দুই পৃষ্ঠে লেখা।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ, কেবল প্রথম পত্রের অভাব। ১—৬৮ পত্র গোটা অক্ষরে, ৬৯—১১৮ ভাঙ্গা অক্ষরে লেখা। লেখকের নাম বা লেখার তারিখ নাই। ভণিতায় যদুনাথ ও যদুনন্দন উভয় নাম আছে।

বিষয়—ত্রয়োবিংশতি সর্গে রাধাকৃষ্ণের একদিবসমাত্রব্যাপী বিবিধ বিলাস বর্ণনা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে আপনাকে আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

বন্দো গুরু পদতল, চিন্তামণিময় স্থল,
সর্ব্বগুণ-খনি দয়ানিধি।
শ্রীআচার্য্যপ্রভুসুতা, নাম তাঁর হেমলতা,
তাঁহার স্মরণে সর্ব্ব সিদ্ধি।
অজ্ঞান অন্ধকারে, পতন দেখিয়া মোরে,
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া কৃপা করি।
তাঁহার করুণা হৈতে, চক্ষু হৈল প্রকাশিতে,
দূরে গেল অন্ধকারাবলি।

বন্দো শ্রীআচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু,
তাঁর পদে কোটি পরণাম।
বন্দো ভট্ট গোপাল নাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমধাম,
পরাপর গুরু কৃপাধাম।
বন্দো প্রভু গৌরচন্দ্র, সকল আনন্দকন্দ,
পরমেষ্ঠী গুরু তেঁহো হয়।
যেঁহো কৃষ্ণপ্রেম বন্যা, দিয়া কৈল ক্ষিতি ধন্যা,
অনন্ত প্রণতি তাঁর পায়।

স্মরণমঙ্গল—নরোত্তমদাস।

পত্রসংখ্যা ৯—উভয় পৃষ্ঠে লেখা।

আরম্ভ—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ। যাঁর কৃপানন্দে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ ইত্যাদি।

পুনশ্চ,

কবিরাজ গোসাঞি বন্দো খ্যাতি কৃষ্ণদাস। শ্রীশ্রীঠাকুর মোর কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃত যাহার প্রকাশ॥ জন্ম জন্ম হঙ তোমার উচ্ছিষ্টের কুকুর॥

শেষ—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান। শ্রীরূপ চরণপদ্ম করিয়া * *।
সংক্ষেপে কহিল অষ্ট:কালের আখ্যান॥ স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি স্মরণমঙ্গল পুস্তক সম্পূর্ণ।

শকাব্দা ১৬৮৫ তারিখ ২৭ আশ্বিন রোজ সোমবার লিখিতং শ্রীগোরাচাঁদ মোকাম জামুয়া।

৩। কৃষ্ণকর্ণামৃত—শ্রীযদুনন্দন (দাস)।

পত্রসংখ্যা ৫৬—দুই পৃষ্ঠে লেখা। লেখকের নাম ও লেখার তারিখ নাই।

বিষয়—লীলাশুক বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্রের প্রাকৃত ভাষায় ব্যাখ্যা। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য লিখিত হইয়াছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর কৃষ্ণকর্ণামৃত রচনা করেন। চৈতন্যদেব ঐ গ্রন্থের অত্যন্ত আদর করিতেন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার সংস্কৃত টীকা লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থকার তাহা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারার্থ এই গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোকের অন্তর্দ্দশা ও বাহ্যদশানুসারী দুই অর্থ আছে। গ্রন্থকার কেবল অন্তর্দ্দশানুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

শেষ—

শ্রীগুরু গোপাল পঁহু, অন্তরে করুণা রহুঁ,
মোরে বলে বান্দি কৃপাডোরে।
ঠাকুর আচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু,
এই মোর ভরসা অন্তরে॥
* * *
ঠাকুর বৈষ্ণব মোরে, কর কৃপা অনুগ্রহে,
সদা দোষ নাহি যার মনে।
সহায় আপন গুণে, দয়া কর দীন জনে,
তুয়া পদ লইনু শরণে॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, সমাপ্ত হইল হেথা,
সবে মেলি বোল হরি বোল।
কৈল আমি বন্দন, সব প্রভুর শ্রীচরণ,
এ যদুনন্দন গেল ভোলে॥

৪। স্বরূপবর্ণন প্রকাশ—কৃষ্ণদাস।

পত্র সংখ্যা ৭—দুই পিঠে লেখা।

পুঁথির তারিখ ১৬৮৪ শক, সন ১১৬৯ সাল। লেখকের নাম নাই।

বিষয়—চৈতন্যদেবের অনুচরগণের স্বরূপবর্ণনা

গ্রন্থশেষে গ্রন্থরচনার ইতিহাস—

শুন শ্রোতাগণ মনে না করিহ রোষ।
স্বরূপ লিখিতে মোর কিছু নাহি দোষ॥
কৃপার সমুদ্র গৌর হইলা অবতার।
অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ যত ভক্ত আর॥
রাধাকৃষ্ণলীলা প্রেম গৌরাঙ্গবিলাস।
আপনে করিলা শক্তি রূপের প্রকাশ॥
তবে সনাতনাকৈল শক্তির সঞ্চার।
শক্তি দিয়া সঙ্গে দিল অন্তরঙ্গগণার॥
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস।
লোকনাথ গোপাল ভট্ট সঙ্গের।বিলাস॥
সভাই করিলা রাধাকুণ্ড তীরে বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ॥
কুণ্ড তীর্থ প্রকট করিল বৃন্দাবন।
বৈরাগ্যের চেষ্টা যত করিল ঘটন॥
পতিত অধম আমি নীচ নীচাকারে।
প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈলা মোরে॥
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে।
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে॥
শ্রীনব রঘুনাথ ভট্ট পতিত পাবন।
ভরসা করিয়া চিতে লইনু শরণ॥
চরণমাধুরী আমি কিছু না জানিল।
তথাপি আমারে সভে অতি কৃপা কৈল॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
এহি শুনি ভরসা মনে বাড়ে নিরন্তর॥
তার গুণে লিখি তার লীলা রস গুণ।
কি লিখিএ ভাল মন্দ না জানি সন্ধান॥
শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত করিলা বিস্তার।
লীলা ক্রমে না জাগিয়ে মুক্তি সারাসার॥
তথাপি লালসা বাড়এ অনুক্ষণ।
তবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিএ লিখন॥
একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয়।
বন্দোহ গোবিন্দলীলামৃত রসময়॥

আমার অভাগ্য কথা শুন সর্ব্বজন।
প্রাণত্যাগ নাহি হয় কহিতে কারণ॥
সভে মেলি একদিন রহিল নির্জ্জনে।
গৌরলীলা অপ্রকট শুনিলাম কাণে॥
শ্রীগোপাল ভট্ট গোসাঞির শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস
তার স্থানে রহি সদা বৃন্দাবনে বাস॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির শিষ্য কহি তার নাম।
ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম॥
আচম্বিতে আল্য সভে প্রভুর অগ্রেতে।
কোথাকারে গেলা সভে না পাই দেখিতে॥
তথাপিহ প্রাণ মোর শরীরে রহিল।
সে সব বিচ্ছেদ লিখা বর্ণন কহিল॥
একদিন দুঃখে কুঞ্জে রহি তিন জন।
আজ্ঞা হৈল শ্রীরূপের শুনহ বচন॥
মোর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোসাঞি।
গ্রন্থের অধিকার দেহ তাহারে আনাই॥
শ্রীজীব আনিয়া গ্রন্থ অধিকার দিল।
গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা কৈল॥
অনেক সন্দর্ভ গ্রন্থ কৈল মহাশয়।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজ রসপুর॥
শ্রীরূপ ব্রজলীলা করিলা প্রকাশ।
পরকীয়া মত যত করিল প্রচার॥
পূর্ব্ব সেই মত তাহা গ্রন্থে বিরচন।
নিজ গ্রন্থে স্বকীয়া করিয়া প্রচারণ॥
এক দুই দুঃখ আর এ সব কথন।
লজ্জাগত প্রাণমাত্র করিএ ধারণ॥
একদিন নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হইল তোমার উপরে॥
তিন জনে কৃপা কর কিছু গ্রন্থ আর।
গৌড় দেশ লৈঞা তাহা করিব প্রচার॥
তেঁহো কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে।
নমস্করি গৌড়দেশ করিল গমনে॥

এমন দয়াল নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা জানি তাহার শরণে॥
অবশেষে সেই গ্রন্থ করিতে লিখন।
প্রভুর নিষেধ হইল না কইল লিখন॥
শ্রীরূপের আজ্ঞা তাহা রাধাকৃষ্ণ লীলা।
সুখে গৌড়দেশ বাসী তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
স্বরূপবর্ণন কহেন কৃষ্ণদাস॥

৫। ভজনরত্ন—বংশীদাস।

পত্রসংখ্যা—৬, দুই পিঠ। পুঁথির তারিখ নাই।

বিষয়—বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহিত কৃষ্ণভজনের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

শেষ—

দীনহীন বংশী দাস করে নিবেদন।
মোর মন রহুক ভাই বৈষ্ণবচরণ॥
ইতি ভজনরত্ন সমাপ্ত।

৬। নরোত্তম দাসের প্রার্থনা পদাবলী।

পত্রসংখ্যা—১৫, দুই পিঠ।

লেখক শ্রীনীলকমল পাল সাং গিদগ্রাম। তারিখ ১২০০ সাল ১১ মাঘ। শ্রীঠাকুর মহোদয়ের পদ সামাপ্ত।"

পদসংখ্যা—৭৯।

৭। তুলসী-মহিমা—দ্বিজ গোবিন্দ।

পত্রসংখ্যা—৬, ছোট কাগজ, লেখক শ্রীবিজয়গোবিন্দ ঘোষ।

৮। চৈতন্যচরিতামৃত।

আদিখণ্ড—৩০ পত্র।

মধ্যখণ্ড—১৩৯ পত্র।

অন্ত্যখণ্ড—১১১ পত্র। তারিখ শকাব্দা ১৬৯৯ লেখক শ্রীগৌরচন্দ্র দাস শর্ম্মা।

নিম্নে বিবৃত পুঁথিগুলির অধিকারী (মুর্শিদাবাদ) কান্দিনিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন সিংহ।

১। বৃন্দাবনলীলামৃত—নন্দকিশোর দাস

বরাহ-সংহিতা অবলম্বনে বরাহধরণীসংবাদ ছলে কৃষ্ণলীলাবর্ণনা—পঞ্চাশ অধ্যায়ে বিভক্ত। পত্রসংখ্যা—৩৩৩, উভয় পৃষ্ঠে লেখা।

তারিখ—

"শকাব্দা ১৭৪২ বাঙ্গলা ১২২৭, ২৩ অগ্রহায়ণস্য বুধবারে শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ায়াস্তিথৌ লিখিতং, শকাব্দা ১৭৩৯॥"

২। চৈতন্যভাগবত—বৃন্দাবন দাস।

আদি মধ্য ও অন্ত্যখণ্ড সম্পূর্ণ।

আদিখণ্ড—পত্রসংখ্যা ১১০।

তারিখ—

"শকাব্দা ১৭৬৬ সন ১২৫১ সাল তারিখ ৬ চৈত্র মঙ্গলবার দশমীদিবসে গ্রন্থারম্ভ হয়।"

"সমাপ্তশ্চায়ং আদিখণ্ড সন ১২৫৩ সনের ২২ আশাঢ় রবিবার সয়নেকাদশীর দিবসে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।"

মধ্যখণ্ড—পত্রসংখ্যা—২০৪।

"সন ১২৫৩ সালের ১৬ শ্রাবণে শুক্রবারে দুই প্রহর দিবস সময়ে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ হয়। শকাব্দা ১৭৭৩ সন ১২৫৮ তারিখ ১৫ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার একপ্র হর আন্দাজ বেলার সময়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।"

অন্ত্যখণ্ড—পত্রসংখ্যা—১২৯।

"শকাব্দা ১৭৭৩ সন ১২৫৮ সাল তারিখে ৭ ফাল্গুন শুক্রবার চতুর্দ্দশী দিবসে এক প্রহর আন্দাজ বেলার সময় গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ হয়।"

৩। পদামৃতসমুদ্র—সটীক—রাধামোহন ঠাকুর।

পত্রসংখ্যা—১৭২। প্রত্যেক শ্লোকের ও গানের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত টীকা আছে। এই টীকায় গানের রাগতালাদির অর্থ, পাঠবিচার ও গানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। পুঁথিখানি পণ্ডিতের লেখা, অন্যান্য প্রচলিত পুঁথির মত বানান ভুল নাই। এই সকল কারণে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান্। দুঃখের বিষয় পুঁথিখানির তারিখ বা লেখকের নাম দেওয়া নাই। টীকাকারের নামও কোথাও দেখিলাম না।

৪। নরোত্তমবিলাস—নরহরি দাস।

পত্রসংখ্যা—১৩৪।

লিখিতং শ্রীহরিদয়াল চন্দ্র সাং পক্কপুরী মধ্যে জনার্দ্দনপুর সন ১২৫৮ সাল তারিখ ৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার তিথি প্রতিপদ বেলা চারিদণ্ড গতে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

শকাব্দা * * সন ১২৫৭ সাল তারিখ ২৪ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার গ্রন্থারম্ভ হয়।

৫। প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস।

শেষ—

শ্রীজাহ্নবী বীরচন্দ্র পদে যার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস॥
ইতি চান্দরায়নিস্তার নামক ষোড়শ বিলাস।

পত্রসংখ্যা—১২৭ মধ্যে ২২ হইতে ৫২ পত্র হারাইয়া গিয়াছে। পুঁথির তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

৬। জন্মাষ্টমীব্রতকথা—বিপ্র পরশুরাম।

পত্রসংখ্যা—১৩। লেখকের নাম ও পুঁথির তারিখ নাই। পরীক্ষিৎ শুকদেব সংবাদ ছলে রচিত, ভাগবতের অন্তর্গতরূপে উল্লিখিত। ভণিতায় বিপ্র পরশুরামের নাম আছে।

৭। একান্নপদ—গোবিন্দ দাস।

পত্রসংখ্যা—৯।

লেখক—রমাকান্ত সিংহদাস সাং যয়জান পরগনে ফত্তেসিংহ মোকাম বর্দ্ধমান। তারিখ সন ১২০৯ সাল ২৪ ফাল্গুন।

৮। চণ্ডীদাসের পদাবলী—অসম্পূর্ণ।

১—২৯ পত্র বর্ত্তমান। এই কয়েক পাতায় ১২৮টি পদ রহিয়াছে। তারিখ বা লেখকের নাম নাই।

৯। স্মরণমঙ্গল—নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—২০, লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

শেষ—

শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সূত্ররূপে কহিল অষ্ট কালের আখ্যান॥
মোর মোর করি বোলো ব্যর্থ অভিমান।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ মোরে যে বোল বোলান॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্ম করি আশ।
স্মরণমঙ্গল কহে নরোত্তম দাস॥

১০। চমৎকার-চন্দ্রিকা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৩৫, তুলোট কাগজ, লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

আরম্ভ—মঙ্গলাচরণের পর।

একদিন প্রভাতে উঠিয়া নন্দরাণী।
রাধিকার লাগি বহু ভূষণাদি আনি॥
পেটারিতে রাখে তাহা হই হরষিত।
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা উপনীত॥

শেষ—

এইত কহিল রাধাকৃষ্ণের বিহার।
পরম নিগূঢ় এই সব রসসার॥
রসিক ভকতে ইহা করে আস্বাদন।
অভক্তে সর্ব্বদা ইহা করিবে গোপন॥
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ পদে করি আশ।
চতুর্থ কুতুহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকায়াং চতুর্থ কুতুহলঃ সংপূর্ণঃ।

১১। আশ্রয়-নির্ণয়—নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—৩, লেখক শ্রীরাধামোহন শর্ম্মা।

তারিখ—শকাব্দ ১৭০৫ সন ১১৯০ সাল তারিখ ২৫ মাঘ।

আরম্ভ—

আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার। নামাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, প্রেমাশ্রয়, রসাশ্রয়, জানিহ নিশ্চয় এই পঞ্চ প্রকার। ইত্যাদি।

শেষ—

শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদপদ্ম করি আশ।
আশ্রয় নির্ণয় কহে নরোত্তম দাস॥
ইতি আশ্রয়নির্ণয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

১২। জগন্নাথদাসের পদাবলী—অসম্পূর্ণ।

পত্রসংখ্যা—১ হইতে ২৮ বর্ত্তমান। শেষভাগ নাই। পদসংখ্যা ১২৩।

১৩। মনসামঙ্গল—কবি কালিদাস।

পত্রসংখ্যা—৪৩

লেখক—শ্রীঠাকুরদাস ঘোষ সাং পাঁচথুপি।

তারিখ—সন ১২০৯ সাল তারিখ ১২ আশ্বিন সোমবার।

আরম্ভ—

অহি হত ভীতহরা বন্দো জরৎকারদারা
হেরি হেমচম্পকসঙ্কাশা।
খরতর রূহ অতি উরগভূষণ তথি
অম্বুরুহ খরতর নাসা॥
শুনগো শঙ্করসুতা বাণীরূপে হয়া ত্রাতা
কণ্ঠরুহে কর অবস্থিতি।

মনের জড়িমা যত দংশিয়া করহ হত
অজ্ঞানে করহ অনুমতি॥
তেজ দেখি নিজ স্থান উড়িয়া শুনহ গান
আসরে করহ আরোহণ।
রাগতালমান সঙ্গে নৃত্য বাদ্য পদ ছন্দে
হইল যেন না হয় স্খলন॥ ইত্যাদি।

ভণিতা—

(১) অঙ্ক বিধু রস শশী, শকনরপতে বুঝি
এই অঙ্কে করিও প্রকাশি।
মনসা মঙ্গল নাম, কাব্যরসে অনুপাম
কবি কালিদাস রসভাষী॥

(২) অজল্ল জল্লন সুতা কার্ত্তিক ব্রাহ্মণ।
অবশেষে কাব্যরসে করিল যতন॥
দ্বিজসুত উপরোধ হেতু নিরন্তর।
কবি কালিদাসে ভণে মনসা মঙ্গল॥

(৩) গোলোকনাথের পদ ধ্যান করি অবিরত
হৃদগত তম করে নাশ।
মনসামঙ্গল নাম কাব্যরসে অনুপম
বিরচিল কবি কালিদাস॥

(৪) গ্রহ ধরা ঋতু শশী সেই খ্যাত
এই অব্দে কাব্য বুঝি।
মনসা মঙ্গল কাব্য মনোহর
কবি কালিদাসে ভাষি॥

গ্রন্থকারের পরিচয় আর কিছু জানা যায় না। গ্রন্থরচনার তারিখ ১৬১৯ শকাব্দ অথবা সন ১১০৪ সাল। গ্রন্থের বিষয় বেহুলার উপাখ্যান।

১৪। জগন্নাথমঙ্গল—গদাধর দাস।

পত্রসংখ্যা—১—৫৭।

১৫। কৃষ্ণলীলা—যদুনন্দন দাস।

অসম্পূর্ণ ১—৯ বর্ত্তমান।

১৬। ভক্তিচিন্তামণি—বৃন্দাবন দাস।

অসম্পূর্ণ ১—৯ বর্ত্তমান।

১৭। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—বিপ্র পরশুরাম।

ভাগবতকথা অবলম্বনে রচিত, পুঁথি কীটদষ্ট দুরবস্থ; শেষের গোটা দুই পাতা নাই। পত্রসংখ্যা ১—৭৯ বর্ত্তমান।

১৮। চণ্ডী—কবিকঙ্কণ।

অসম্পূর্ণ, ১—১৬২ বর্ত্তমান,—খুল্লনার ছাগপালন পর্য্যন্ত আছে।

সত্যনারায়ণ কথা।

আমাদের প্রদেশে রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ প্রচলিত, কিন্তু চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত টাকী অঞ্চলে রামেশ্বরের আদর নাই। সেখানে সত্যনারায়ণের আর দুইটী কথা চলিত আছে। টাকাতে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী উভয়বিধ কায়স্থের বাস। এই উভয়বিধ কায়স্থসমাজে সত্যনারায়ণের বিভিন্ন কথা প্রচলিত। বঙ্গজসমাজে দ্বিজ রামভদ্র রচিত এবং রাঢ়ীয় সমাজে কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায়ের কথা পঠিত হইয়া থাকে।

পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় টাকীনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ; তিনি আমাদিগকে এই দুইটী কথা প্রদান করেন।

কবিচন্দ্র আযোধ্যারাম রায় সম্বন্ধে দুটী কথা বলিবার আছে। চণ্ডীকাব্যপ্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নিজ পরিচয় দান কালে কবিচন্দ্র নামে আপনার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবিচন্দ্র শব্দটী নাম অথবা উপাধি তাহা মুকুন্দরাম কোথাও খুলিয়া লেখেন নাই। তিনি পিতৃপিতামহের পরিচয়, গাঞীর পরিচয়, বংশ পরিচয় এবং নিজের দ্বিজত্ব, চক্রবর্ত্তিত্ব, কবিকঙ্কণত্ব ইত্যাদি সকল কথাই তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, অথচ কোথাও জ্যেষ্ঠের নাম বা সোপাধিক নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিচন্দ্র উপাধি আরও অনেকের ছিল, তাহা আমরা পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ হইতে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে জানিতে পারি।

গত ১২৯৯ সালের অনুসন্ধান পত্রিকায় ২৯শে মাঘ কবিকঙ্কণপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অম্বিকা-চরণ গুপ্ত মহাশয় একটি অনুমান প্রকাশ করেন যে কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্রের নাম অযোধ্যারাম। তাঁহার এ অনুমানের মূল বড় দৃঢ় নহে।

১৩০২ সালের পরিষৎপত্রিকায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে যে সুন্দর ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনিও অম্বিকাচরণ বাবুর

অনুমানের পোষকতা করেন নাই। সে প্রবন্ধে আমরা কবিকঙ্কণের বংশপরিচয় অতি স্পষ্টরূপে জানিতে পারি। কবিকঙ্কণের উত্তর পুরুষের এক কন্যার পৌত্রই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়; সুতরাং তাঁহার পিতামহীর পিতৃপরিচয় তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহার উপর সন্দেহ করা অন্যায়; কিন্তু তিনিও কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বা উপাধি কবিচন্দ্র কি না বা সোপাধিক নাম কি, তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

আমরা যে কবিচন্দ্রের সত্যনারায়ণ কথা অদ্য পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশ করিলাম, এখানিতে আমরা কবিচন্দ্র উপাধির সহিত অযোধ্যারামের নামসংযুক্ত ভণিতা পাইতেছি,—"রচিল অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র রায়।" কিন্তু ইহাঁকে আমাদের কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া উপস্থিত করিবার সুদৃঢ় প্রমাণ কিছুই এ গ্রন্থে নাই, বরং "রায়" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে "চক্রবর্ত্তীর" ভ্রাতৃপদবীতে যেন দাবী করিতে দিতেছে না। কিন্তু হৃদয় মিশ্রের পুত্র মুকুন্দরাম যদি "চক্রবর্ত্তী" হন, তাহা হইলে কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম "রায়" হইলেও ক্ষতি হয় না; কারণ ঐ সকল উপাধি গুণবাচী, বংশগত নহে। আরও এক কথা, কবিকঙ্কণ শ্রোত্রিয় কয়ড়ী গাঞীর ব্রাহ্মণ। প্রায় সমস্ত শ্রোত্রিয়বংশে সাধারণতঃ রায় উপাধি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্ব হইতেও চলিয়া আসিতেছে এরূপ স্থলে অযোধ্যারাম 'রায়' বলিয়া যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা হইতে পারেন না, এরূপ কোন কথা নাই। তবে তাঁহার পিতৃনাম না পাওয়ায় আমরা তাঁহাকে মুকুন্দরামের ভ্রাতা বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক শিশুবোধকে কবিচন্দ্রের প্রণীত দাতা কর্ণ ও কলঙ্কভঞ্জন নামক কথা আছে, আর অযোধ্যারামের "গুরুদক্ষিণা" আছে, এবং অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের সত্যনারায়ণ অদ্য প্রকাশিত হইল। এ সকলের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের উপযুক্ত বটে।

অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণ কথার প্রকাশ হইল। উহার মধ্যে সাধুর হিরণ্য পাটনে যাত্রার যে পথ বর্ণিত হইয়াছে, ঐতিহাসিকের কাছে উহার কিছু মূল্য আছে।

দ্বিজ রামভদ্রের সত্যনারায়ণ—এখানিও একখানি নূতন গ্রন্থ।

দ্বিজ রামভদ্র আপনার পরিচয় দেন নাই, কেবল একস্থানে "দ্বিজ রামভদ্র বলে ভাবি ভগবান" এই ভণিতা হইতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বটুকু জানা যায়। সর্ব্বশেষে আছে "রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য লভে, রামভদ্র এই ভাবে, সত্যদেব সংহিতা প্রকাশে।"—এই সত্যদেব সংহিতার নায়ক সাধু ধলেশ্বর বহিয়া সুরাট বন্দরে গিয়াছিলেন, ইহা হইতে রামভদ্রকে ধলেশ্বরীর তীরবর্ত্তী লোক বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। এই সাধুর পথবর্ণনা অপেক্ষা তাঁহার সুরাটে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের বিবরণ ঐতিহাসিকের নিকট অধিক তৃপ্তিপ্রদ হইবে। এই বিবরণে তৎকালপ্রচলিত এদেশীয় নানাবিধ শিল্পজাত বস্ত্রের ও নানাবিধ গুণভেদে অশ্বগণের শ্রেণীভেদের বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিজ রামভদ্র কিছু সাবধান লেখক। তিনি রাজারাজড়ার কথা বা নাম কল্পনা করিয়া একটা গণ্ডগোল করেন নাই। অযোধ্যারামের অপেক্ষা রামভদ্রের বর্ণনায় কিছু মধুরতা আছে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

সত্যনারায়ণ কথা।

(কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায় প্রণীত)

বন্দ বিশ্বময়ীসুত বিমলকমলযুত
বিরাজিত রতন নূপুর।
দিয়ে রত্নময় মালা সাজাইয়ে গিরিবালা
শঙ্খ চক্র গদা শ্বেতাম্বুজ॥
সরোরুহ পরে স্থিতি ব্রহ্মাণ্ডের গতি মুক্তি
গণপতি বিশ্বের ঠাকুর।
স্থূল খর্ব্ব কলেবরে প্রণতি যুগল করে
বিঘ্ননাশ বিঘ্ন কর দূর॥

তদন্তে বন্দিব দেব গুরুর চরণ।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু পঞ্চানন॥
অখণ্ডিত তেজপুঞ্জ মণ্ডল আকার।
গুরু হৈতে চক্ষুদান বিখ্যাত সংসার॥
অজ্ঞানতিমির গুরু নয়নযুগল।
জ্ঞান যোগ করে গুরু বিশেষ নির্ম্মল॥
দিব্য চক্ষু দিল গুরু চক্ষের নিমেষে।
পশুজন মুক্ত হয় গুরুর চরণপরশে॥
উপদেশক্রমে গুরু প্রাণ দান দিল।
সংসারসাগরে পড়ি দিব্য জ্ঞান হৈল॥
এ ভবসংসার ভাই হেলে হব পার।
গুরুর চরণ বিনা নাহিক উদ্ধার॥
কৃপা করি গুরুদেব হইল কাণ্ডারী।
গুরুর চরণে মোর কোটি নমস্কারি॥

॥ নমঃ সত্যনারায়ণায় নমঃ ॥
কলিযুগে সত্য সত্য সত্যনারায়ণ।
সেবিলে সকল সিদ্ধি শুন সর্ব্বজন ॥
নারায়ণ নামে নর নরক এড়ায়।
যেই নামে অজামীল তরিল হেলায় ॥
শির্ণি দিয়া সেবে যেই সেই দীননাথে।
দুঃখ পারাবার তার খণ্ডে অচিরাতে ॥
পৃথিবীতে পূজার প্রকাশ যে কারণ।
দুঃখী এক দ্বিজ ছিল দ্বারিকাভুবন ॥
হরি শর্ম্মা নাম তার হরিপদে মতি।
পতিব্রতা প্রিয়া তার নাম প্রভাবতী ॥
চালে খড় নাহি ভাঙ্গা বাসে খান জল
সহজে না থাকে এক সাঁজের সম্বল ॥
ভিক্ষায় ভ্রমণ ভগ্ন বস্ত্র পরিধান।
মহীতে নাহিক দীন দ্বিজের সমান ॥
বেলা অবসানে যান নিজ নিকেতনে।
ক্ষুধায় কাতর তনু না চলে চরণে ॥
নারী তার রহিয়াছে নিরখিয়া বাট।
রাঁধিয়াছে বনের পুঁই কুড়াইয়া কাট ॥
পতিপদ প্রক্ষালিয়া দিলেন যতনে।
সারা দিন অনাহারী বসিল রন্ধনে ॥
পৃথক তণ্ডুলগুলি করিলেন পাক।
ভোজন করিল মাত্র উপলক্ষ শাক ॥
অশনেতে অর্দ্ধেক উদর পূরে নাই।
দুঃখে দহে কহে দ্বিজ কি কল্লে গোঁসাই ॥
পর দিন পথে পথে পয়ান করিতে।
সত্যনারায়ণ গেল সদয় হইতে ॥
দ্বিজআগে দাঁড়াইল দ্বিজরূপ ধরি।
ছলিতে ময়ূরধ্বজে গেল যেন হরি ॥

যত্ন করি জিজ্ঞাসেন জগতের পতি।
কহ দ্বিজ কোথাকারে করিয়াছ গতি॥
বিপ্র বলে বিধি মোরে বড়ই বৈমুখ।
নারায়ণ না দেখিয়ে মোর এত দুখ॥
সত্ত্ব গুণে সকল সংসার যাঁর ভার।
মোর পক্ষে নহিল কটাক্ষ দৃষ্টি তাঁর॥
বিপ্র বাক্য শুনি প্রভু ব্যথিত হৃদয়।
পরম পুরুষ প্রভু দিল পরিচয়॥
কলিযুগে সত্য আমি সত্যনারায়ণ।
আজি তুষ্ট তুষিব তোমারে দিয়ে ধন॥
বলিতে বলিতে বসুদেবের তনুজ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হৈল চতুর্ভুজ॥
কিরীট কুণ্ডল হার শোভে পীত বাস।
তরুণ তমাল জিনি তিমির প্রকাশ॥
হরি হেরি হরি শর্ম্মা মোহিত হইল।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পদে প্রণতি করিল॥
এক মণি দিল প্রভু দুঃখ ঘুচাইতে।
সূর্য্য যেন স্যমন্তক দিল সত্রাজিতে॥
ইহাতে অনেক রত্ন হবে প্রসবিয়া।
সত্য নারায়ণ নামে শির্ণি কর গিয়া॥
সওয়া সের শির্ণি আনিবে সন্ধ্যাকালে।
সওয়া পোন পান দিবে গোপের মিশালে।
ধরণী গোময় দিয়ে আলিপনা দিবে।
আসন নিকটে ঘট স্থাপন করিবে॥
ধৌত বস্ত্র আরোপিয়ে দিবে দুর্ব্বাধান॥
তার মধ্যে আয়ুধ রাখিবে এক খান॥
প্রতিবাসী বন্ধু জন আনিবে ডাকিয়া।
পাঠকে পুস্তক পাঠ করিবে বসিয়া॥

কমলা অচলা হয়ে থাকিবেন বাস।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল কৃত্তিবাস ॥
মনের উল্লাসে দ্বিজ করিল পয়ান।
নিজ নিকেতনে দ্বিজ দিল দরশন ॥
মহিলারে কহিল সকল সমাচার।
দুঃখের সাগরে হরি করিলেন পার ॥
রচিল অযোধ্যারামে শ্রীগোবিন্দ স্মরি।
সত্যনারায়ণ নামে সবে বল হরি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

সেই পেয়ে রত্ন মণি, ব্রাহ্মণ হইল ধনী
সত্যনারায়ণে শির্ণি দিল।
দুঃখ দশা গেল দূর, শতেক বৃহন্দপুর
শক্রসম সম্পদ বাড়িল ॥
দেখা হইল যেই মতে, দরশন দিল পথে
শঙ্খ চক্র শার্ঙ্গাদি ধারী।
সেই রূপ ধ্যান করি, হৃদয়ে বান্ধিল হরি
পুলকে নয়নে বহে বারি ॥
ব্রাহ্মণীর বেশভূষা, রূপে জিনি রতি ঊষা
অঙ্গে হেম আট অলঙ্কার।
কত কত দাস দাসী, সেবায় রহিল আসি
মহীতে তুলনা নাহি তার ॥
ভক্তিযুক্ত কায়মনে, সদা সত্যনারায়ণে
সওয়া মণ শির্ণি করে পাকা।
বিলাইতে সেই ভোগে, হেন কালে দৈবযোগে
কাটরিয়াগণে দিল দেখা ॥
কিনু দিনু বেলু বালু, সদা নদা গদা কালু
তেকু নকু ছকু গোবর্দ্ধন।

জিজ্ঞাসিল তারা সবে, ইহার কারণ কবে
এ পুরী করিল কোন জন ॥
শুনিয়া কয়েন দিজ, মোর এ সম্পদ নিজ
সত্যনারায়ণ প্রসাদাৎ।
এইরূপ উপহারে, শির্ণি দিয়া পুজ তাঁরে
খণ্ডিবেক দুঃখ অচিরাৎ ॥
শুনিয়ে দ্বিজের বাণী, বিধান সকল জানি
কাটরিয়া গণে শির্ণি দিল।
সত্যনারায়ণ বরে, ধন পুত্র লক্ষ্মী ঘরে
পূর্ব্ব দুঃখ সকলি ঘুচিল ॥
ভীষ্মজননীর তটে, বিচিত্র মন্দির গঠে
সত্যনারায়ণ বসে তায়।
ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাভূপ, জগন্নাথ যেন রূপ
স্থাপন করিল উড়িষ্যায় ॥
পুরী করি বিরচিত, কাটরিয়া হরষিত
শির্ণি করে পরিপুর ঠাটে।
একজন সদাগর, নামেতে রতনাকর
ডিঙ্গা চাপাইল সেই ঘাটে ॥
সাধু বড় কুতূহলী, জিজ্ঞাসিল উঠি কুলি
কোন ধর্ম্ম কর ভাই সব।
কহে কাটরিয়াগণ, পূজি সত্যনারায়ণ
জানিয়ে পরম অনুভব ॥
পূজিলে সকল সিদ্ধি, ধন পুত্র লক্ষ্মী বৃদ্ধি
কলিযুগে নারায়ণ সত্য।
সাধু বলে তবে পুজি, কিঞ্চিৎ মহিমা বুঝি
যদি মোর জনমে অপত্য ॥
কহিলাম সভাসদে, শির্ণি দিব এই মতে
এত বলি চাপিল ডিঙ্গায়।

উত্তরিল নিজ দেশ, পুরী কৈল প্রবেশ
সুকবি অযোধ্যারামে গায় ॥

পয়ার

শির্ণি মানী সদাগর সদনে আইল।
সীমন্তিনী সহ সাধু শর্ব্বরী বঞ্চিল ॥
সাধু সাধু বিধুমুখী রূপে জিনি রতি।
গজেন্দ্রগামিনী ধনী হৈল গর্ভবতী ॥
প্রসব হইল এক উত্তম তনয়া।
যশোদা জঠরে যেন জনমিল জয়া ॥
বিধুকলা যেন বালা বাড়িতে লাগিল।
সাত মাসে সাধের নাম সুশীলা রাখিল ॥
যথাকালে যোগ্য বরে কন্যা কৈল দান।
কাটোয়ায় সদানন্দ নাগের সন্তান ॥
বানিয়া বানিয়া হৈল কথোপকথন।
পূর্ব্বপুরুষের ধারা আছিল যেমন ॥
নানা সুখে আছে সাধু নিজ নিকেতনে।
বাণিজ্যে যাইতে সাধু চিন্তিলেন মনে ॥
বাটীর খরচ দিল দশ হাজার মোহর।
রমণীর ঠাঁই আনি দিল সদাগর ॥
হীরা মণি রজত কাঞ্চন পলা আর।
চামর চন্দন শঙ্খ লইল অপার ॥
করলাল দামামা ঠমক বাজে শিঙ্গা।
শুভমনে দুই জনে আরোপিল ডিঙ্গা ॥
পলিতা করিয়ে দিল কামানে আগুন।
আষাঢ়িয়া মেঘ যেন গর্জ্জিল দারুণ ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
এড়াইল নিজ রাজ্য বাগীশনগর ॥

বেণীপুর রহে বামে ডাহিনে সনত।
উজানি পশ্চাতে করি চলে বায়ুবৎ ॥
বড়যাঁহাপুর ত্যজি আইল সাকাই।
কাটোয়া ইন্দ্রাণী বহি পাটুলি এড়াই ॥
ত্যজিয়া কুবজপুর সাধু গুণনিধি।
নবদ্বীপ রহে পাছে আর খড়ে নদী ॥
গুপ্তিপাড়া ডাহিনে রহিল বহুদূর।
বামেতে রহিল গ্রাম নাম শান্তিপুর।
জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সন্ততি।
ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা হৈল ভাগীরথী ॥
মুহূর্ত্তেকে এড়াইল হুগলি সহর।
চুঁচুড়ায় পূজিল ঠাকুর ষাঁড়েশ্বর ॥
দেগঙ্গে আইল তরী বায়ু অনুকুল।
যথায় নিমের গাছে ফোটে চাঁপাফুল ॥
চাকলে পূজিল হর হরিষ বিশেষ।
জগন্নাথ পূজা কৈল একেলা মহেশ ॥
ভদ্রখালি বালি বামে বরাহনগর।
ডিহি কলিকাতা বাহি চলে সদাগর ॥
ধুলন্ত রহিল বামে ডাহিনে জিরাট।
ত্যজিয়া ভবানীপুর গেল কালীঘাট ॥
বিধির স্থাপিত কালী পূজিলেন তায়।
তরণিতে উঠিল অযোধ্যারামে গায় ॥

ত্রিপদী।

কালীঘাট পরিহরি,   বাহে তবে সাত তরী
মহা আনন্দিত সদাগর।
বাজে দামা দড়মশা,   বামে রহে গ্রাম রসা
গীত গায় গাটের গাবর ॥

শাখা বাহি সারভাট্টা, ডাইনে বৈষ্ণবঘাট্টা
তীরের সমান তরী চলে।
বামে মহামায়াপুর, মালঞ্চ করিয়ে দূর
উপনীত হৈল ব্রদস্মলে॥
বারুইপুরের পর, রত্নাকর সদাগর
সাধুঘাট্টা করিল পশ্চাৎ।
বারাশত গ্রামে গিয়ে, নানা উপহার দিয়ে
পূজিল অনাদ্য বিশ্বনাথ॥
অবিলম্বে হেতেগড়, এড়াইল দড় বড়
করে সবে হরি হরি রব।
তার গঙ্গা পরশিয়ে, কপিলেরে প্রণমিয়ে
পূজে গঙ্গাসাগরে মাধব॥
বন্দিয়া দক্ষিণরায়, সিন্ধু মধ্যে তরী যায়
বিষম তরঙ্গ কুল নাই।
বেণীতরণের পুর, এড়াইল বহুদূর
নীলগিরি দরশন পাই॥
উড়িষ্যায় জগন্নাথে, সুভদ্রা বলাই সাথে
দরশন কৈল সদাগর।
যেবা দেখে একবার, পুনর্জন্ম নাই তার
মহিমা মহেশ অগোচর॥
স্থানের নাইক মূল্য, কেবল বৈকুণ্ঠ তুল্য
যেবা সেই পুরে ত্যজে প্রাণ।
চতুর্ভুজ তেজময়, বিষ্ণুর সমান হয়
সর্গে যায় চাপিয়ে বিমান॥
সদাগর শিরোমণি, প্রসাদ খাইল কিনি,
তরণিতে উঠিল তৎকাল।
নানা দেশ এড়াইয়ে, অপরূপ দেখে গিয়ে
সিন্ধু মধ্যে শ্রীরামের জাঙ্গাল॥

ডাহিনে মাণিকপুর, কালীদহা রহে দূর
সিংহলপাটন করি বামে।
ছয় মাস জলে ভাসি, হিরণ্যপাটনে আসি
উত্তরিল কহে অযোধ্যারামে ॥

পয়ার।

হিরণ্যপাটনে সাধু গেল ছয় মাসে।
চিত্রসেন নামে নরপতি সেই দেশে ॥
সত্যনারায়ণের আছয়ে ক্রোধ মনে।
না দিল আমায় শির্ণি সাধু দুই জনে ॥
চিত্রসেন রাজার ভাণ্ডারে যত ধন।
হরিয়ে লইল তাহা সত্যনারায়ণ ॥
যোগবলে রাখিলেন সাধুর নৌকায়।
ভাণ্ডার দেখিয়ে শূন্য কোপে নররায় ॥
কোটালে ধরিয়ে আনে যতেক সওয়ার।
ভীষণমূরতি বেড়াজাল নাম তার ॥
ক্রোধে কহে মহীপাল শুন কোটালিয়া।
দুই দণ্ড মধ্যে চোর আনিবে ধরিয়া ॥
নহে তোরে উভে উভে করাতে চিরিব।
জনে জনে শূল দিয়ে সবংশে মারিব ॥
নৃপতির তাড়নায় কোটাল কম্পিত।
চৌকিতে ছেঁকিল সেনাগণ চারি ভিত ॥
কোটালিয়া ঘাটে গিয়া দেখে সাত তরী।
অবিলম্বে দুই সদাগরে আনে ধরি ॥
দেখিল রাজার ধন তরণীতে পোরা।
হীরা মণি রজত কাঞ্চন বোরা বোরা ॥
জামাতা শ্বশুর দুই সাধু বাঁধে ক্রোধে।
বাণ যেন বাণেতে বাঁধিল অনিরুদ্ধে ॥

সহস্র সহস্র লোক বহে সেই ধন।
দেখি তুষ্ট চিত্রসেন ধরণিভূষণ ॥
আদেশ করিল তবে কোটালের তরে।
শ্বশুর জামাতা দোঁহে রাখ কারাগারে ॥
বিধি বাম হইলে এমনি দশা হয়।
সাধুপুত্র চোর হোয়ে কারাগারে রয় ॥
হেতায় সাধুর নারী বড় দুঃখ পায়।
না জোড়ে ওদন রোদনে দিন যায় ॥
ফুরাইল যত ধন কিছু নাই আর।
ভাবিতে গণিতে তনু অস্থিচর্ম্মসার ॥
বাণিজ্যে পতির গতি অতি দূর দেশ।
ভাল মন্দ সমাচার না জানি বিশেষ ॥
হরিশর্ম্মা নামে দ্বিজ শির্ণি করে সদা।
দৈবযোগে তথা গেল সাধুর প্রমদা ॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণীকে যোড় করি পাণি।
কার পূজা কর এই কহ ঠাকুরাণী ॥
শুনিয়ে দ্বিজের জায়া কহিল কারণ।
শির্ণি দিয়া পূজা করি সত্যনারায়ণ ॥
দুঃখ তাপ দূর হয় বন্ধনে খালাশ।
যেই যে কামনা করে তার আশ ॥
সত্যনারায়ণের মহিমা এত জানি।
সেই রূপে কৈল শির্ণি সাধুর রমণী ॥
জামাতা সহিত সাধু আইলে আলয়।
পুনরপি দিব শির্ণি যথাশক্তি হয় ॥
এত যদি মায়ে ঝিয়ে কৈল আরাধন।
ক্ষমি দোষ পরিতোষ সত্যনারায়ণ ॥
শ্বশুর জামাতা বন্দী যথায় পাটনে।
সেই সে রাজারে গিয়ে দেখান স্বপনে ॥

চিত্রসেন নৃপতিকে কহেন গোপনে।
বিনা দোষে বন্দী কৈলে সাধু দুই জনে॥
কারাগারে আমার সেবক যায় মারা।
প্রভাতে খালাশ দেহ দেশে যাক তারা॥
যে ধন লইয়ে থাক দশগুণ দিবে।
নহিলে আমার কোপে সবংশে মরিবে॥
কেশে ধরি উঠাইয়ে হৈল অন্তর্দ্ধান।
গোবিন্দ স্মরিয়া রাজা ভয়ে কম্পমান॥
উনমত্ত মত ভূপ ঊষায় উঠিয়া।
শীঘ্রগতি কোটালেরে আনে ডাক দিয়া॥
তরণীর দুই চোর মোর কাছে আন।
শুনিয়া দুই সাধু তবে আনে বিদ্যমান॥
রাজার আদেশে নরসুন্দর তখনে।
ক্ষেউর করিয়া দিল সাধু দুই জনে॥
স্নান পূজা পরেতে ভোজন পরিতোষ।
রাজা বলে ক্ষমহ আমার যত দোষ॥
দৈবের কারণে দেখ রাম বনচারী।
শ্রীবৎস রাজার দুঃখ কহিতে না পারি॥
পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির বনে কৈল গতি।
কলিতে করিল নল রাজার দুর্গতি॥
এত বলি নরপতি কোটালে ডাকিয়া।
ভাণ্ডারের ধন আনে শকটে বহিয়া॥
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা বহু মূল্য দিল।
দশগুণ ধন দিয়ে বিদায় করিল॥
অবিলম্বে সপ্ত ডিঙ্গা পূরিল রতনে।
মাণিক্য প্রবাল শঙ্খ চামর চন্দনে॥
শুভক্ষণে দুই জনে হইল বিদায়।
যাত্রা করি চলিল অযোধ্যারামে গায়॥

ত্রিপদী।

তরী পূরি ধনে, সাধু দুই জনে
নিজ দেশে কৈল গতি।
বায়ু অনুকূল, বড়ই প্রতুল
ডিঙ্গা বাহে দিবা রাতি॥
দুই কূলে গ্রাম, কত লব নাম
উড়িষ্যা করিয়ে পাছে।
সঙ্গম সাগরে, স্নান দান করে,
কপিল দেবের কাছে॥
বন্দিয়া মাধবে, যাত্রা কৈল তবে
উপনীত কালীঘাটে।
পূজি কালীমাতা, ত্যজি কলিকাতা
তরী গেল শ্রীপাটে॥
ব্রহ্মচারিবেশ, ধরি হৃষীকেশ
জিজ্ঞাসেন সদাগরে।
ডিঙ্গায় কি ধন কহ বিবরণ
কিছু দিয়া যাও মোরে॥
সাধু কহে কথা, কি পুছ বারতা
অঙ্গার লইয়ে যাই।
শুনি প্রতারণা, দৈব বিড়ম্বনা
সকল ডিঙ্গায় ছাই॥
জামাতা সহিত, সাধু চমকিত
প্রাণ নহি যেন ধড়ে।
তরী পরিহরি, যথা ব্রহ্মচারী
পদপ্রান্তে গিয়ে পড়ে॥
আমি অভাগিয়া, তোমা না চিনিয়া
কহিনু চাতুরী ভাষা

বিহীন লোচন, কি করে দর্পণ
শাস্ত্র নাহি মানে চাষা ॥
তুমি নারায়ণ, ব্রহ্ম সনাতন
আমি ত অজ্ঞান শিশু।
শৃগালের দোষে, সিংহ নাহি রোষে
পশু কি চিনিবে বস্তু ॥
বিনয় সাধুর, শুনিয়া ঠাকুর
কহেন সদয় হই।
মোর শিণি মেনে, নাহি দিলে বেনে
পূর্ব্ব বিবরণ কই ॥
তোমার রমণী, করিল শিরণি
বাঁচিলে তাহার পাকে।
গিয়া নিজ ঘর, মোর শির্ণি কর
যদি জিতে সাধ থাকে ॥
কারাগার ঘরে, মুক্ত কৈনু তোরে
মোরে কর বাক্ ছলা।
ধন পুত্র লয়ে, গঙ্গা পার হয়ে
কুম্ভীরে দেখাও কলা ॥
কহিয়ে কারণ, সত্যনারায়ণ
অদর্শন হইলে তবে।
ডিঙ্গার আকার, কিছু নাহি আর
ধন হইল অনুভবে ॥
পূর্ব্ব মত ধন, পেয়ে দুই জন
বহিত্র করিল ভর।
কৌতুক বিশেষ, উত্তরিল দেশ
বার বৎসরের পর ॥
সন্ধ্যার সময়, দূত গিয়ে কয়
কি কর সাধুর দারা।

অপরূপ কথা, শ্বশুর জামাতা
দেশেতে আইল তারা ॥
তরীভরা ধন, অমূল্য রতন
তরণে দুঃখের সিন্ধু।
শুনি শুভ বাণী, জননী নন্দিনী
করেতে পাইল ইন্দু ॥
শির্ণি দিতেছিল, প্রসাদ ফেলিল
সুশীলা সাধুর বালা।
তরণী বরিতে, ধাইল ত্বরিতে
দেবতারে করি হেলা ॥
সত্যনারায়ণ, সকুপিত মন
আমার শিরণি ফেলে।
এত অহঙ্কার, ফল দিব তার
অযোধ্যারামেতে বলে ॥

পয়ার।

শির্ণি ফেলি গেল যদি সাধুর নন্দিনী।
পতি তার তল গেল সহিত তরণী ॥
সাধু দেখে জামাতা ডুবিল আসি ঘাটে
কাতর হইয়া কাঁদে দুঃখে বুক ফাটে ॥
সুশীলা এমত কালে ঘাটে উপনীত।
উত্তরিয়ে সেই ঘাটে দেখে বিপরীত ॥
পিতার রোদন অতি পতি নাহি নায়।
সুখাইল মুখ বুক ধরনে না যায় ॥
সাধুর প্রমদা কহে শুন প্রাণনাথ।
কি লাগি রোদন কর শিরে হান ঘাত ॥
সাধু কহে মোর সম নরাধম নাই।
এই মাত্র ঘাটে আসি ডুবিল জামাই ॥

শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন মায়ে ঝিয়ে তারা।
কপালে আঘাত করে বহে রক্ত ধারা ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কহে সাধুসুতা।
জনম অবধি আমি বড় দুঃখযুতা ॥
হায় হায় আচম্বিতে কি হইল আমায়।
কাঁদিয়া সুশীলা জলে ঝাঁপ দিতে চায় ॥
গণকের বেশ ধরি সত্যনারায়ণ।
সাধুর কন্যার আগে দিল দরশন ॥
জীবনে জীবন কেন ত্যজিবে সুন্দরী।
ত্রিভুবন গণিয়া বলিতে আমি পারি ॥
পুনশ্চ পাইবে পতি খণ্ডিবে বিপাক।
কপট গণনা ভূমে পাতিলেন আঁক ॥
মায়ে ঝিয়ে বসিলেন করে করি ফল।
ঠাকুর বলেন তত্ত্ব জানিনু সকল ॥
প্রসাদ শিরণি ফেলি আসিয়াছ বটে।
তাহার কারণে এত পরমাদ ঘটে ॥
কুড়াইয়া সেই শির্ণি খাও ভক্তি করি।
এখনি পাইবে পতি ভাসিবেক তরী ॥
শুনিয়া ধাইল কন্যা মাতা পাছে যান।
সত্যনারায়ণ হাঁসি হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
যথা ফেলেছিল শির্ণি খাইল চাটিয়া।
তরী সহ পতি তার উঠিল ভাসিয়া ॥
জামাতা দেখিয়ে সাধু মহা আনন্দিত।
পুনরপি মায়ে ঝিয়ে ঘাটে উপনীত ॥
জয় হুলাহুলি দিল সাধুর বনিতা।
তরণী বরণ কৈল সহিত দুহিতা ॥
বাজে ঘন দামামা ভেউর করতাল।
জোড়া শঙ্খ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল ॥

শ্বশুর জামাতা কূলে উঠিল দুই জন।
একান্ত ভাবিয়ে মনে সত্যনারায়ণ ॥
ভাবিলেক শির্ণি দিব সত্যনারায়ণে।
ভকতি করিয়ে অতি উপহার আনে ॥
প্রতিবেশী বন্ধু জন ডাকিয়া আনিলা।
করয়ে পূজার স্থান সাধুর মহিলা ॥
আলিপনা দিয়ে কৈল ধরণি লিখন।
তাহার উপর পাতিলেক দিব্যাসন ॥
নানা জাতি কুসুম চন্দন গন্ধ চুয়া।
পরিপাটী কামনা করিল তুষ্ট হইয়া ॥
সদাগর সহস্র তঙ্কার শির্ণি আনে।
সভা করি বসিলেন যত ধীর গণে ॥
সুরগুরু সমান সম্মুখে পুরোহিত।
সত্যনারায়ণ তথা করিল স্থাপিত ॥
পাঠকে পুস্তক পাঠ করেয়ে সভাতে।
শিরণি খাইয়ে লোক কর পুঁছে মাথে ॥
প্রাণপণে শির্ণি যদি দিল সদাগর।
তুষ্ট হয়ে সত্যনারায়ণ দিল বর ॥
শক্রের সমান হইল সম্পদ অতুল।
জলনিধিতনয়া হইল অনুকূল ॥
বংশ বৃদ্ধি হইল অনেক দাস দাসী।
সহস্র সহস্র লোক গৃহে ভুঞ্জে আসি ॥
এইরূপে হরষিত শ্বশুর জামাই।
রহিল আপন গৃহে সুখে ওর নাই ॥
যেই যে কামনা করে শির্ণি করি পণ।
অবশ্য পূরেন তাহা সত্যনারায়ণ ॥
কলিকালে কৃপাময় করুণার সীমা ॥
নরে কি জানিতে পারে তাঁহার মহিমা ॥
রচিল অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র রায়।
হরি হরি বল সবে পুস্তক হইল সায় ॥

সমাপ্ত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

শব্দ-সংগ্রহ।

সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত এই শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশার্থ প্রদান করিয়া সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শেষের একটা কি দুইটা পাতা না থাকায় তালিকার অন্তর্গত হকারান্ত শব্দসংখ্যা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। দি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ একটা অনুযোগ প্রচলিত আছে। তৎসঙ্কলিত তালিকা হইতে প্রতিপন্ন হইবে, খাঁটি বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য সহকারে তিনি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সঙ্কলনের পরিশ্রম স্বীকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, একখানি বৈজ্ঞানিক-প্রণালী-সম্মত বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ অথবা বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব প্রণয়নের পূর্ব্বে যথোচিত পরিশ্রম করিয়া তদুপযোগী উপাদান সঙ্কলন করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই পরিশ্রম স্বীকারে কেহই প্রস্তুত নহেন। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের আবশ্যকতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের দেশে তত্ত্বান্বেষীর বড় অভাব নাই। কিন্তু তত্ত্বান্বেষণে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহার অঙ্গীকারে প্রস্তুত লোকের সম্যক্ অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মবীর ছিলেন। বর্ত্তমান সংগ্রহ তাঁহার অনন্যসাধারণ কর্ম্মপরতার অন্যতর উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া গৃহীত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে বিচার বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তৎকালে ব্যাকরণের উদ্দেশ্য যেরূপ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন, তাহার পরে পরিষদের পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বনীয়, সে বিষয়ে আর দ্বিধা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য পরিষৎ-পত্রিকার পক্ষে অতঃপর আর ত্রুটী হইবে না আশা করি। পরিষদের সদস্য ও পত্রিকার পাঠকগণের নিকট এই বিষয়ে আনুকূল্য লাভের প্রার্থনা করিয়া আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত শব্দসংগ্রহ যথোচিত সমাদরের সহিত প্রকাশ করিলাম।

পত্রিকা-সম্পাদক।

অ	অজ্ঞস্মিত	অপাজ্জ	অসান
অকষ্টবদ্ধ	অজ্ঞানা	অপাজ্জমান	অসুদ
অকাজ	অজ্ঞানিত	অবাক	অসুচ
অকাজুআ	অটল	অবাদ	আ
অকাট্যা	অটুট	অবাধ	আঅন
অকালকুষ্মাণ্ড	অঠেল	অবুঝ	আই
অকুলান	অড়হর	অবেলা	আইন
অকুল	অত	অভাগা	আউল
অক্কা	অতদ্‌বির	অভাগিআ	আউলিআ
অখল	অদস্ত (?)	অভাগী	আউস
অগচ্ছিত	অধম্ম	অমত	আএব
অগণন	অধম্মিআ	অমন	আএবি
অগতি	অধঃপাত	অমনি	আএস
অগন্‌তি	অধঃপাতিআ	অমিঅ	আওআজ
অগমতা	অনাসৃষ্টি	অম্বল	আওআজি
অগা	অন্তর	অম্বলিআ	আওল
অগুণ	অন্তরঙ্গ	অরন্ধন	আওলাত
অগৌন	অন্তরা	অলম্বড্ডিআ	আক
অঘর	অন্তরাল	অষ্টাসি	আকনি
অঘোর	অপগণ্ড	অসাজন্ত	আকল
অচিনা	অপড়	অসাড়	আকাচা
অজচ্ছল	অপয়া	অসাধ	আকাট

আকাটা
আকামাম
আকাল
আকাঁড়া
আকিঞ্চন
আক্কেল
আক্কেলগুড়ুম
আক্কেলমন্ত
আখড়া
আখড়াধারী
আখনজী
আখা
আখাম্বা
আখুট্টি
আখেজ
আখের
আগ্
আগড়
আগড়া
আগত্রা (?)
আগমনী
আগল
আগলা
আগলান
আগা
আগাই
আগাগোড়া
আগাছা
আগাড়
আগাড়ি
আগান
আগানি
আগাস
আগাঁথা
আগু
আগুআন
আগুন
আগুনখাকি
আগুরি
আগুসর
আঘাটী
আঘাসা
আঙ
আঙট
আঙটা
আঙটি
আঙরা
আঙরাখা
আঙার
আঙিয়া
আঙুর
আঙুল
আচম্‌খা
আচমনি
আচম্বিত
আচসা
আচা
আচাভুআ
আচোট
আচ্ছা
আছ্
আছাড়
আছাড়া
আছাড়ান
আছানা
আছাবা
আছাঁটা
আজ
আজকাল
আজগবি
আজব
আজবি
আজমাইস
আজা
আজাড়
আজাড়া
আজাড়ান
আজানা
আজালা
আঝাড়া
আঝালা
আট
আটই
আটক
আটকা
আটকান
আটকিআ
আটকৌড়িআ
আটচল্লিস
আটচালা
আটত্রিস
আটসট্টি
আটসাল
আটা
আটাইস
আটাত্তর
আটানব্বই
আটান্ন
আটাল
আটাসি
আটাসিআ
আটি
আঠা
আঠাকাঠি
আঠার
আঠারই
আড্ডা
আড়
আড়কাট
আড়খত
আড়গড়া
আড়ঙ
আড়ত
আড়তদার
আড়বাঁকা
আড়ভাঙা
আড়মাদলা
আড়া
আড়াআড়ি
আড়াই
আড়ানি
আড়াল
আড়ি
আড়ি তোলা
আড়ি পাতা
আড়ি মারা
আড়ুনি
আড়েহাত

আতপ
আতর
আতরদান
আতসবাজি
আতা
আত্তিত (?)
আদ
আদকপালিআ
আদকামারিআ
আদখেঁচড়া
আদত
আদব
আদরিআ
আদা
আদাগা
আদামাদা
আদামুলা
আদালত
আদুড়িয়া
আদুরিআ
আদুলি
আদেক
আদেঙ্গা
আদৌ
আদ্দাস
আধানিক
আন্
আনকোরা
আনখা
আনা
আনাজ
আনাড়
আনাড়ি
আনান
আনামাসা
আনারস
আনুপাড়ি
আন্দাজ
আন্দাজি
আন্দেসা
আপন
আপনি
আপস
আপসোস
আপাঙ
আপাদমস্তক
আপামরসাধারণ
আপিল
আপিলাণ্ট
আপিলি
আপিস
আফলন্ত
আফলা
আফাই
আফাটা
আফিঙ
আফিম
আফিমি
আফুটা
আফুলা
আবকারি
আবদার
আবদারিআ
আবাচ্চি
আবাছা
আবাদ
আবাদি
আবার
আবির
আভাঙ
আভাঙা
আম
আমচুর
আমট
আমড়া
আমড়াগাছিআ
আমতা
আমদানি
আমন
আমমোক্তার
আময়দা
আমরক্ত
আমল
আমলকি
আমলদারি
আমলনামা
আমলা
আমসত্ত
আমা
আমাটি
আমানি
আমাসয়
আমির
আমিরানা
আম্মিরি
আয়না
আয়মা
আয়মাদার
আয়া
আর
আরক
আরজ
আরজবেগ
আরজি
আরতি
আরদালি
আরন্ধ
আর্সা
আরসি
আরসুলা
আরাম
আল
আলকাতরা
আলকুসি
আলগছ
আলগা
আলজিব
আলত পালত
আলতা
আলনা
আলপাকা
আলপিন
আল্পো
আলবোলা
আলমারি
আলসিআ
আলা

আলান
আলাপন
আলাপি
আলিপনা
আলু
আলুদোষ
আলুন
আলেকম
আল্লা
আশী
আস্
আসক
আসন
আসনা
আসনাই
আসবাব
আসমান
আসমানি
আসর
আসল
আসা
আসান
আসামি
আসঁাতলা
আসঁাতলান
আস্কারা
আস্কিআ
আহআল
আহলুদিআ
আহা
আহামক
আহামকি

আহামরি
আহাহা
আহির
আহোআল
আঁইস
আঁউমাউ
আঁক
আঁকড়
আঁকড়ান
আঁকড়াআঁকড়ি
আঁকড়ি
আঁকসি
আঁকা
আঁকাড়
আঁকাড়ান
আঁকাড়ামাকাড়ি
আঁকুড়,-র
আঁকুবাঁকু
আঁখর
আঁখরতাড়া
আঁখরবন্দি
আঁখি
আঁচ
আঁচড়
আঁচড়া
আঁচড়াআঁচড়ি
আঁচড়ান
আঁচল
আঁচলা
আঁচা
আঁচাআঁচি
আঁচান

আঁচিল
আঁজির
আঁট
আঁটন
আঁটনি
আঁটা
আঁটাআঁটি
আঁটান
আঁটাল
আঁঠি
আঁঠু
আঁড়িআ
আঁত
আঁৎক্
আঁতকান
আঁতথানি
আঁতটান
আঁতড়ি
আঁতুড়
আঁতুড়িআ
আঁধ
আঁধার
আঁধারমাণিক
আঁব
আঁবুই
আঁস
আঁসুআ
আঃ

ই
ইআদ
ইআদদস্ত
ইআর
ইআরকি
ইকুন
ইচড়
ইচড়েপাকা
ইজারদার
ইজারদারি
ইজারা
ইজের
ইজ্জত
ইজ্জতমস্ত
ইট
ইটখোলা
ইতফাক
ইতবার
ইতবারি
ইতর
ইতরামি
ইতরিআ
ইথু
ইথে
ইস্তিহাম
ইমাম
ইমামদার
ইমারত
ইমারতি
ইঁদ
ইঁদারা
ইঁদুর

ইয়াদা
ইরসাল
ইলিম
ইষ্টকিং
ইষ্টাম্প
ইষ্টিমার
ইষ্টেট
ইষ্টেসন
ইসপাত
ইসবগুল
ইস্তক
ইস্তফা
ইস্তমজাজ
ইস্তাহার
ইস্তাহারি
ইস্ত্রি
ইহকাল
ইহা
ইহুদি

উ

উই
উইঢিপি
উইল
উকি
উকিল
উকিলী
উকুন
উগর
উগরা
উগরান
উগা
উগ্রক্ষত্রিয়
উচকথা
উচা
উচাটন
উচু
উচ্ছিআ
উজবুক
উজাড়
উজালা
উজির
উজ্জাপন
উজ্জোগ
উট
উঠ্‌
উঠা
উঠান
উঠিত
উড়্‌
উড়া
উড়ান
উড়ানচণ্ডি
উড়ানি
উড়িধান্য
উড়িআ
উড়িষ্যা
উতলা
উতর্‌
উতরা
উতরান
উৎখাত
উৎপাত
উৎপাতিআ
উদম
উদমাদা
উদরি
উদাস
উনান
উনুই
উপকথা
উপচ্‌
উপছা
উপছান
উপজ্‌
উপজান
উপড়্‌
উপড়া
উপড়ান
উপর
উপরওআলা
উপরচড়া
উপরপড়া
উপরি
উপসর্গ
উপোস
উপোসি
উবুড়
উবুদল
উভরায়
উমর
উমরা
উমেদ
উমেদার
উমেদারী
উল
উলট্‌
উল্টা
উল্টান
উলান
উলু
উলুই
উলুটি
উস্খুস্খু
উস্খুল
উস্খুলি
উস্ক
উস্কান
উহা
উহু

এ

এ
এই
এও
এওত
এওতি
একগাছিআ
একঘরিআ
একঘাইআ
একচল্লিস
একচাটিআ
একচালা
একজাই
একজাতিআ
একট
একটানা
একটিন

একতারা
একতালা
একত্রিত
একত্রিস
একত্রিসে
একলা
একলাই
একসট্টি
একসা
একহারা
একা
একাএক
একান্তর
একানব্বই
একান্ন
একাসী
একিদা
একুন
একুস
একুসে
একে
এখন
এখান
এগ্‌
এগজামিন
এগজিকিউটর
এগন
এগানা
এগার
এগারই
এজমাল
এজমালি
এজলাস
এজাহার
এজাহারি
এঠুয়া
এড়্‌
এড়া
এড়ান
এড়ানিআ
এত
এতবার
এতবারি
এথা
এবং
এবারত
এবালিস
এবালিসি
এবে
এমত
এমন
এমামবাড়ী
এল
এলথেল
এলন
এলপাতাড়ি
এলবাস
এলমেল
এলাকা
এলাচি
এলাহি
এঁঠ
এঁড়
এঁড়বিচি

ও

ওআর
ওআরিস
ওআরিসান
ওআরিসি
ওকর
ওকালতনামা
ওকালতী
ওখান
ওগারহ (?)
ওজন
ওজর
ওজরি
ওঝা
ওড়নপাড়ন
ওড়না
ওড়ম্বা
ওত
ওথা
ওল
ওলদ
ওলন
ওলন্দাজ
ওলন্দাজি
ওলপ
ওলা
ওলাউঠা
ওলান
ওসআস
ওসার
ওসার ওআলা
ওস্তাগর

ক

কই
কএত
কএদ
কএদি
কখন
কচকচ
কচকচি
কচা
কচালা
কচালান
কচি
কচু
কচুরি
কজাক
কট
কটকট
কটকটান
কটকটানি
কটকটিআ
কটকোআলা
কটরা
কটা
কটাল
কটালিআ
কটাস
কড়
কড়ক্‌
কড়কড়
কড়কড়ানি
কড়কড়িয়া
কড়কান

কড়কানি	কদর	কমা	কলপ
কড়খ্	কদরদান	কমান	কলম
কড়খা	কদিচ	কমি	কলমদান
কড়খান	কদু	কমিটি	কলমপেসা
কড়খানি	কনকন	কমিবেসি	কলমি
কড়চা	কনকনানি	কমিসনর	কলশুদ্ধ
কড়মড়	কনকনিআ	কমিসনরি	কলা
কড়মড়ান	কনকনানিআ	কমোড	কলাই
কড়মড়ানি	কনা	কম্পাস	—
কড়মড়ি	কনিষ্ঠ	কম্পোজ	কলাখাকুআ
কড়মড়িআ	কনুই	কম্পোজিটর	কলাচুসা
কড়্সি	কপাল	কয়	কলান
কড়া	কপালিআ	কয়লা	কলিকা
কড়াই	কবজ	কয়াল	কলিজা
কড়াকড়	কবজা	কয়ালি	কস্
কড়াকড়ি	কবাজ	কয়েক	কসকস
কড়াকিআ	কবর	কর্	কসকসান
কড়ানিআ	কবি	করম	কসকসানি
কড়ি	কবিওআলা	করবুলি (?)	কসম
কড়িআ	কবু	করজ	কসা
কড়িওআলা	কবুতর	করজা	কসাই
কড়িকসা	কবুল	করমচা	কসব
কড়িকটকা	কবুলতি	করলা	কসবি
কড়ুই	কবুলা	করা	কসবিগিরি
কড়েআ	কবুলান	করাকরি	কসাকসি
কত	কভু	করাত	কসান
কতক	কম	করাতি	কসামাজা
কতল	কমজোর	করান	কসি
কথক	কমফর্টর	কল	কস্তুটিআ
কথকতা	কমবক্ত	কলকল	কস্তুনি
কদম	কমবেশ	কলকলানি	কস্তুর
কদমা	কমলা	কলকা	কস্তুরি

কস্ত
কস্তাকস্তি
কহ
কহত
কহন
কাই
কাউর
কাএম
কাএমি
কাওআ
কাওরা
কাওরানি
কাক
কাগজ
কাগজি
কাগডিমিআ
কাঙাল
কাঙালিনি
কাঙুই
কাচ্
কাচা
কাচান
কাচানি
কাছ
কাছা
কাছাকাছি
কাছাড়
কাছান
কাছারি
কাছি
কাছিম
কাছে

কাজ
কাজপাগলা
কাজল
কাজললতা
কাজলিআ
কাজি
কাজুআ
কাজেকাজে
কাট্
• কাটন
কাটনা
কাটনি
কাটা
কাটাকাটি
কাটান
কাটানি
কাটানিআ
কাটারি
কাটুনি
• কাটুরকুটুর
কাঠ
কাঠখোট্টা
কাঠখোলা
কাঠগড়া
কাঠবিরালি
কাঠা
কাঠাকালি
কাঠাকিআ
কাঠাবাড়ি
কাঠান
কাঠি
কাঠুরিআ

কাড়্
কাড়া
কাড়াকাড়ি
কাড়ান
কাত
কাতর্
কাতরান
কাতরানি
কাতলা
কাতা
কাতান
কাতার
কাতুকুতু
কাতুর কুতুর
কাদা
কাদাখোঁচা
কান
কানড়
কানা
কানাকানি
কানাচ
কানাত
কানি
কানুন •
কানুনগুঁই
কানেড়
কাপ
কাপড়
কাপাস
কাপাসি
কাপেকাপ
কাপ্তেন

কাফর
কাফ্রি
কাবা
কাবাড়ি
কাবাব
কাবার
কাবিল
কাবু
কাবুলিআ
কাবেল
কামটা
কামড়
কামড়াকামড়ি
কামড়ান
কামড়ানি
কামবাই
কামবাইআ
কামরা
কামরাঙা
কামাই
কামান
কামানি
কামানিআ
কামার
কামারনি
কামাল
কামিজ
কামিন
কামেআ
কায়ক্লেশ
কায়দা
কায়েত

কায়ের্তনি
কায়েম
কায়েমি
কারকুন
কারকুনি
কারখানা
কারচোপ
কারচোপি
কারপরদাজ
কারবার
কারবারি
কারসাজি
কারিকর
কারিকরি
কারিগর
কারিগরি
কারিন্দা
কালা
কালি
কালিআ
কালেক্টর
কালেক্টরী
কালেজ
কালেজি
কালেভদ্রে
কাস্
কাসন্দি
কাসা
কাসান
কাসি
কাস্তুআ
কাস্তিআ

কাহার
কাহারনি
কাহিল
কাহিলি
কাঁকড়া
কাঁকড়ি
কাঁকর
কাঁকাল
কাঁকুই
কাঁকুড়
কাঁথ
কাঁচ
কাঁচকলা
কাঁচপোকা
কাঁচা
কাঁচান
কাঁচামিঠা
কাঁচি
কাঁচুমাচু
কাঁটা
কাঁটাল
কাঁটালি
কাঁড়্
কাঁড়া
কাঁড়ান
কাঁড়ি
কাঁড়ুনি
কাঁত
কাঁতড়া
কাঁথা
কাঁদ্
কাঁদন

কাঁদনি
কাঁদনিআ
কাঁদা
কাঁদাকাঁদি
কাঁদান
কাঁদানিআ
কাঁদি
কাঁধ
কাঁপ্
কাঁপন
কাঁপনি
কাঁপা
কাঁপান
কাঁপানিআ
কাঁসর
কাঁসা
কাঁসারি
কাঁসি
কাঁসিদার
কাঁহন
কাঁহিনি
কি
কিআ
কিচকিচ
কিচকিচি
কিচড়
কিচিকিচি
কিচিমিচি
কিছু
কিতা
কিতাব
কিতাবত

কিতাবতি
কিতাবি
কিন
কিনা
কিনান
কিপটিআ
কিফাত
কিমাকার
কিম্ভূত
কিম্মত
কিম্মতি
কিল
কিলকিল
কিলান
কিল্লা
কিস
কিসমত
কিসমিস
কু
কুআ
কুআসা
কুইআ
কুইনাইন
কুইল
কুকাজ
কুকাল
কুচ
কুচকুচ
কুচনি
কুচা
কুচাল
কুচুটিআ

কুট্
কুটকচালিআ
কুটনা
কুটনি
কুটনিপনা
কুটা
কুটান
কুটি
কুটুম
কুটুরকাটুর
কুটুরিআ
কুঠ
কুঠরি
কুঠরিআ
কুঠি
কুঠিআ
কুঠিআল
কুঠিওআলা
কুড়
কুড়চি
কুড়বা
কুড়া
কুড়াকুড়ি
কুড়ান
কুড়াল

——

কুড়ি
কুড়িআ
কুড়িআমি
কুত
কুতুকুতু
কুতুরকাতুর
কুত্তা
কুত্তি
কুদাল
কুন
কুনকুন
কুনকুনান
কুনকুনানি
কুপত্তি
কুফল
কুমার
কুমারনি
কুমির
কুর
কুরকুর
কুরনি
কুরা
কুরান
কুল
কুলকুল
কুলঙ্গি
কুলপি
কুলা
কুলান
কুলি
কুলুই
কুলুপ
কুসী
কুস্তি
কুস্তিগির
কুহক
কুহকি
কুঁকড়্
কুঁকড়া
কুঁকড়ান
কুঁকড়ি
কুঁকুড়া
কুঁচি
কুঁজড়া
কুঁজি
কুঁড়া
কুঁদ্
কুঁদনি
কুঁদরি
কুঁদা
কুঁদান
কুঁদানি
কুঁদি
কুঁদুনি
কুঁদুনিআ
কেঅট
কেউ
কেউটিআ
কেতা
কেতাব
কেতাবি
কেদারা
কেন
কেনা
কেমন
কেমনে
কেমবিস
কেরানি
কেরামত
কেলাস
কেসুর
কেহ
কেঁক্
কেঁকান
কেঁকানি
কেঁচকেঁচ
কেঁচকেঁচানি
কেঁচকেঁচিআ
কেঁট
কেঁটকেঁট
কেঁটকেঁটানি
কেঁটকেঁটিআ
কোকসিমা
কোঙা
কোচ
কোচমান
কোট
কোটাল
কোটালনি
কোটালি
কোটালিআ
কোঠা
কোড়া
কোড়ান
কোতোআল
কোতোআলি
কোথা
কোথায়
কোদাল
কোন
কোনঠাসা
কোনাকোনি

কোপ্তা
কোমর
কোমরাকুর্মারি
কোমরবন্দ
কোম্পানি
কোর
কোরকাপ
কোরন্দ
কোরন্দিআ
কোরমা
কোরা
কোঁরাকুার
কোরান
কোল
কোলঙ্গা
কোলঙ্গি
কোলা
কোলাকুলি
কোলাচ
কোলাচিআ
কোলু
কোলুনি
কোসা
কোঁক
কোঁকড়া
কোঁকড়ান
কোঁঙা
কোঁচড়া
কোঁছড়
কোঁছড়িআ
কোঁছা
কোঁড়
কোঁত
কোঁতকোত
কোঁতা
কোঁতানি
কোঁদল
কোঁদলি
কোঁদলিআ
কোঁপা
কোঁটা

খ
খই
খএর
খএরখাঁ
খক
খকখক
খকখকানি
খচ
খচখচ
খচর
খট
খটখট
খটখটানি
খটখটিআ
খড়
খড়খড়
খড়খড়ানি
খড়খড়ি
খড়খড়িআ
খড়ম
খড়ান
খড়ি
খড়্আ
খত
খতম
খতান
খতিআন
খণ্ডান
খনখন
খনখনিআ
খনা
খন্তা
খন্তি
খপ
খপড়দার
খপড়দারি
খবর
খবিস
খয়রা
খয়রাত
খয়রাতি
খয়ের
খয়েরখাঁ
খর
খরগোস
খরচ
খরচা
খরচিআ
খরসান
খরা
খরান
খরিস
খরিসলা
খলিপা
খলিসা
খস
খসখস
খসখসিআ
খসম
খসা
খসান
খসানিআ
খা
খাই
খাউন্তি
খাউন্তিআ
খাওআ
খাওআখাই
খাওআন
খাওআনি
খাওনিআ
খাক
খাকি
খাকুআ
খাগড়া
খাগড়াই
খাঙরা
খাঙরান
খাঙরানি
খাজা
খাজানা
খাজারি
খাট
খাটনি
খাটা

খাটাখাটি
খাটান
খাটাল
খাটিআ
খাট্টা
খাড়া
খাড়াখাড়া
খাড়াদম
খাড়ি
খাড়ু
খাত
খাতক
খাতকালি
খাতকি
খাতা
খাতাল
খাতির
খাতিরজমা
খাতিরি
খাদ
খান
খানকি
খানকিপনা
খানকিগিরি
খানসামা
খানসামাগিরি
খানা
খানাতলাসি
খানামানা
খানি
খানিক
খাপ

খাপা
খাপান
খাবল
খাবলা
খাবলান
খাম
খামকা
খামচ
খামচা
খামচান
খামচানি
খামল
খামার
খামি
খামিন্দা
খামিরা
খার
খারা
খারাপ
খারাপি
খাল
খালা
খালাস
খালাসি
খালি
খালুই
খাস
খাসা
খাসি
খাস্তা
খাঁচা
খাঁজ

খাঁটি
খাঁড়
খাঁড়া
খাঁড়ি
খাঁদা
খাঁদি
খিআ
খিআঘাট
খিআন
খিআল
খিআলি
খিআলিআ
খিচ
খিচখিচ
খিচখিচি
খিচড়ি
খিচিমিচি
খিজমত
খিজমতগার
খিজমতগারি
খিটখিট
খিটখিটান
খিটখিটিআ
খিড়কি
খিড়কিদার
খিতাব
খিদা
খির
খিরসা
খিরা
খিল
খিলখিল

খিলান
খিঁচ
খিঁচন
খিঁচনিআ
খিঁচড়
খিঁচড়ন
খিঁচড়া
খুআ
খুআড়
খুআর
খুক
খুকখুক
খুকি
খুঙি
খুচরা
খুজ্
খুজা
খুজান
খুটখুট
খুড়খুড়
খুড়তত
খুড়সাস
খুড়া
খুড়াশ্বশুর
খুড়ি
খুদ
খুদা
খুদান
খুন
খুনি
খুব
খুবি

খুর
খুরপা
খুরপি
খুরি
খুল্
খুলা
খুলান
খুলি
খুস
খুসখুস
খুসকি
খুসখুসান
খুসখুসানি
খুসখুসিআ
খুসি
খুঁচ
খুঁচানি
খুঁচড়
খুঁচড়ান
খুঁচা
খুঁচান
খুঁচি
খুঁট
খুঁটনি
খুঁটা
খুঁটান
খুঁটি
খুঁড়ি
খুঁড়িআ
খুঁত
খুঁতখুঁতিআ
খেআল

খেআলি
খেআস
খেই
খেইহারা
খেউড়
খেউর
খেউরি
খেঙরা
খেঙরান
খেঙরানি
খেজুর
খেজুরিআ
খেত
খেদ
খেদান
খেদানিআ
খেপ
খেপা
খেপান
খেপি
খেমটা
খেমটাওআলি
খে
খেআ
খোআঘাট
খেআন
খেএামত
খেআমতকারী
খেরুআ
খেল্
খেলআড়
খেলা

খেলাত
খেলান
খেলানা
খেলুআ
খেস
খেসারত
খেসারতি
খেঁউড়
খেঁকসিআলি
খেঁচ
খেঁচক্
খেঁচকা
খেঁচকান
খেঁচকানি
খেঁচড়া
খেঁচড়ানি
খেঁচড়াপনা
খেঁচনি
খেঁচা
খেঁচাখেঁচি
খেঁচান
খেঁট
খেঁটিআ
খেঁতখেঁত
খেঁতখেঁতান
খেঁতখেঁতানি
খোআ
খোআন
খোকা
খোজ
খোজা
খোজান

খোট্টা
খোট্টাই
খোট্টাগিরি
খোদ
খোদকস্তা
খোদা
খোদান
খোদানি
খোদাবন্দ
খোনা
খোর
খোরপোষ
খোরা
খোরাক
খোরাকি
খোল
খোলস
খোলসা
খোলা
খোলাকুচি
খোলান
খোলানি
খোলাসা
খোস
খোসা
খোসামদ
খোসামদি
খোসামদিআ
খোঁআড়
খোঁআরি
খোঁচ
খোঁচডাখোঁচড়ি

খোঁচড়ান
খোঁচড়ানি
খোঁচানি
খোঁচাখোঁচি
খোঁচান
খোঁটা
খোঁড়া
খোঁদল
খোঁপা

গ

গইন্দা
গইন্দাগিরি
গইব
গইবি
গঙ্গাজলি
গঙ্গাজলিআ
গচ
গচ্ছা
গচ্ছিত
গচ্ছিতি
গছ
গছা
গছান
গছাল
গজ
গজব
গজবি
গজরা
গজল
গজা
গজান
গজাল

গজি
গট
গঠন
গড়
গড়গড়
গড়গড়ানি
গড়গড়িআ
গড়ন
গড়া
গড়াগড়ি
গড়ান
গড়িআ
গড়িআন
গড়িমিসি
গড়ুই
গণ্ডগোল
গণ্ডগ্রাম
গণ্ডা
গণ্ডাকিআ
গণ্ডার
গণ্ডিআ
গতর
গতরখাকুআ
গতরজমা
গতাজি
গতিক
গতিক্রিয়া
গতিবিধি
গত্ত
গদ
গদগদ
গদাইনস্করি

গদি
গদিআন
গন্
গনতি
গনা
গনান
গনানি
গপ
গপগপ
গপ্প
গপ্পিআ
গবা
গবাটিআ
গম
গমগম
গমগমিআ
গয়ঙ্গচ্ছ
গয়রাত
গয়লা
গয়লানি
গয়ালি
গয়েশ্বরি
গরগর
গরগরান
গরগরানি
গরজ
গরজি
গরজিআ
গরদ
গরদা
গরদান
গরদানি

গরব
গরবিআ
গরবী
গরবিনী
গরম
গরমাগরম
গরমি
গরিব
গরিবানা
গরিবি
গল
গলগল
গলগলিআ
গলতি
গলন
গলা
গলাগলি
গলান
গলাবন্দ
গলানি
গলি
গলুই
গহরা
গহিরি
গঁদ
গঁদান
গা
গাই
গাএন
গাওআ
গাগর
গাগরা

গাঙ	গাবিন্	গাঁথান	গুটিপোকা
গাছ	গাভি	গাঁদা	গুড়
গাছড়া	গামছা	গিড়গিড়	গুড়গুড়
গাছা	গামলা	গিড়গিড়ান	গুড়গুড়নি
গাছি	গারদ	গিড়গিড়িআ	গুড়গুড়ি
গাজন	গাল	গিনি	গুড়ন
গাজনিআ	গালা	গিমা	গুড়ান
গাজর	গালাগালি	গিল্	গুড়ি
গাজল	গালান	গিলন	গুড়িমারা
গাড়্	গালানি	গিলা	'গুড়ুক
গাড়আন	গালি	গিলান	গুড়ুকিআ
গাড়িআনি	গালিম	গিলাপ	গুড়ুম
গাড়ন	গালিমি	গিসগিস	গুণধাম
গাড়া	গাহক	গু	গুণমণি
গাড়ান	গাঁই	গুচ্	গুণমন্ত
গাড়ি	গাঁএন	গুচনি	গুদস্তা
গাড়িওআলা	গাঁজা	গুছা	গুদড়ি
গাঢাকা	গাঁজর	গুছনি	গুদাম
গাঢালা	গাঁজা	গুছাল	গুদি
গাদ্	গাঁজাখোর	গুছি	গুন
গাদন	গাঁজাখোরি	গুজর	গুনগুন
গাদনি	গাঁট	গুজরত	গুনগুনানি
গাদা	গাঁটকাটা	গুজরা	গুনা
গাদান	গাঁঠ	গুজরাটি	গুনান
গাদামি	গাঁঠা	গুজরান	গুবন
গাদি	গাঁত	গুজিআ	গুম
গাদোলা	গাঁতি	গুট্	গুমট
গাফিল	গাঁতিদার	গুটন	গুমটি
গাব	গাঁথ্	গুটনিআ	গুমখুন
গারা	গাঁথা	গুটান	গুমর
গাবান	গাঁথনি	গুটি	গুমরা
গাবাল	গাঁথা	গুটিগুটি	গুমরান

গুমসা
গুমান
গুমি
গুমুক
গুল
গুলগুলুআ
গুলন
গুলনি
গুলা
গুলান
গুলানা
গুলি
গুলিখোর
গুলুআ
গুঁজ্
গুঁজা
গুঁজান
গুঁজি
গুঁজিকাটি
গুঁড়্
গুঁড়া
গুঁড়ান
গুঁড়ানি
গুঁড়ি
গুঁত্
গুঁতন
গুঁতনি
গুঁতনিআ
গুঁতা
গুঁতান
গুঁতানিআ
গুঁতিআ

গুঁফো
গেদা
গেরদা
গেলা
গেলান
গেলাপ
গেলাস
গেলি
গেঁজ
গেঁজগেঁজ
গেঁজগেঁজানি
গেঁড়
গেঁড়া
গেঁড়ি
গেঁড়িভাঙা
গেঁড়ুআ
গেঁতুআ
গেঁদা
গোআল
গোআলা
গোআলিনি
গোএন্দা
গোএন্দাগিরি
গোকল (?)
গোখাদক
গোঙা
গোচর
গোচারণ
গোছ
গোছা
গোছান
গোছাল

গোট
গোটা
গোঠ
গোড়
গোড়া
গোড়াগুড়ি
গোদ
গোদা
গোধড়
গোবর
গোবরাট
গোভাগাড়
গোমুআ
গোর
গোরস
গোরস্থান
গোরা
গোরু
গোল
গোলমাল
গোলমালিআ
গোলা
গোলাবাড়ি
গোলাপ
গোলাপজাম
গোলাপি
গোলাম
গোলামচোর
গোলামি
গোলাল
গোসা
গোসাপ

গোহাল
গোঁ
গোঁআন
গোঁআনা
গোঁআর
গোঁআরিত্তি
গোঁজ
গোঁজা
গোঁজাগোঁজি
গোঁজামিল
গোঁজামিলন
গোঁড়
গোঁড়া
গোঁড়ামি
গোঁতা
গোঁফ
গোন

——

ঘ

ঘট্
ঘটক
ঘটকালি
ঘটকি
ঘটঘট
ঘটা
ঘটান
ঘটি
ঘড়ঘড়
ঘড়ঘড়ানি
ঘড়া
ঘড়াঞ্চি

ঘড়ি
ঘড়িআল
ঘণ্ট
ঘণ্টা
ঘনা
ঘনাঘনি
ঘনিষ্ঠ
ঘনিষ্ঠতা
ঘন্নুআ
ঘর
ঘরকরা
ঘরনি
ঘরভাঙা
ঘরা
ঘরাঘরি
ঘরানা
ঘরামি
ঘস্
ঘসন
ঘসনি
ঘসা
ঘসাসসি
ঘসান
ঘা
ঘাই
ঘাগরা
ঘাগী
ঘাট
ঘাটতি
ঘাটআল
ঘাটআলি
ঘাড়

ঘাড়ান
ঘানি
ঘাম
ঘামাচি
ঘামুআ
ঘাল
ঘাসিআড়া
ঘাঁট
ঘাঁটন
ঘাঁটনি
ঘাঁটা
ঘাঁটাঘাঁটি
ঘাঁটান
ঘি
ঘিচ্
ঘিনঘিন
ঘিনঘিনান
ঘিনঘিনানি
ঘিনঘিনিআ
ঘির
ঘিরা
ঘিরান
ঘুঙনি
ঘুচ্
ঘুচন
ঘুচা
ঘুচান
ঘুট
ঘুটা
ঘুটিঙ
ঘুটিঙিয়া
ঘুনি

ঘুম
ঘুমগড়িআ
ঘুমনা
ঘুমন্ত
ঘুমান
ঘুর্
ঘুরঘুরিআ
ঘুরন
ঘুরনি
ঘুরন্নুআ
ঘুরা
ঘুরান
ঘুর্নুআ
ঘুল
ঘুলঘুলি
ঘুলনি
ঘুস
ঘুসখোর
ঘুসনি
ঘুসা
ঘুসাঘুসি
ঘুসান
ঘুসি
ঘুসিম
ঘুসিমি
ঘুঁটিআ
ঘুঁড়ি
ঘেঅর
ঘেউ
ঘেউঘেউ
ঘেউঘেউনি
ঘেটিআ

ঘেটু
ঘেটুআ
ঘেনঘেন
ঘেনঘেনান
ঘেনঘেনানি
ঘেনঘেনিআ
ঘের
ঘেরন
ঘেরা
ঘেরান
ঘেঁচ
ঘেঁচড়
ঘেঁচড়া
ঘেঁচড়ান
ঘেঁচড়ানি
ঘেঁচড়াপড়া
ঘেঁটু
ঘেঁতঘেঁত
ঘেঁতঘেঁতিআ
ঘেঁস
ঘেঁসা
ঘেঁসাঘেঁসি
ঘোঙরা
ঘোচা
ঘোচান
ঘোটন
ঘোটনা
ঘোটা
ঘোটাঘুটি
ঘোটান
ঘোপ
ঘোরা

ঘোরান
ঘোল
ঘোলা
ঘোলান
ঘোলানি
ঘোঁজ
ঘোঁট
ঘোঁটা
ঘোঁটাঘুঁটি
ঘোঁটুআ
ঘোঁড়া

চ

চক
চকচক
চকচকানি
চকচকিআ
চকমকি
চকসা
চকা
চকি
চকিত
চট
চটক
চটকা
চটকান
চটকাভাঙা
চটচট
চটচটিআ
চটপট
চটপটিআ
চটা
চটাচটি
চটান
চটানিআ
চটি
চড়
চড়চড়
চড়চড়ানি
চড়চড়ি
চড়ক
চড়কতলা
চড়ন
চড়নদার
চড়নদারি
চড়া
চড়ান
চড়ানিআ
চড়ুই
চড়ুইভাতি
চনচন
চনচনিআ
চনমন
চনমনান
চনমনিআ
চনাচুর
চপচপ
চপচপিআ
চপাটি
চব্বিশ
চব্বিশে
চর
চরখা
চর্বি
চরস
চরা
চরান
চল
চলতি
চলন
চলনি
চলা
চলাচল
চলান
চলিত
চস
চসম
চসমখোর
চসমনামাই
চসমা
চসা
চসান
চা
চাউনি
চাউল
চাওয়া
চাক
চাকনা
চাকর
চাকরান
চাকরানি
চাকরি
চাকরিআ
চাকলা
চাকলাদার
চাকা
চাকি
চাকু
চাখ্
চাখড়ি
চাখন
চাখনদার
চাখনবিবি
চাখা
চাখাচাখি
চাখান
চাগাড়
চাগাড়
চাঙারি
চাঙ্গা
চাট্
চাটন
চাটনি
চাটা
চাটাই
চাটাচাটি
চাটান
চাটি
চাটু
চাটুআ
চাড়
চাড়া
চাতাল
চাদর
চা-দান
চাপ
চাপকান

চাপট
চাপড়
চাপড়ান
চাপড়ানি
চাপন
চাপনি
চাপরাস
চাপরাসি
চাপা
চাপাচাপি
চাপান
চাপানি
চাব্
চাবা
চাবি
চাবুক
চাম
চামচিআ
চামচিকা
চামড়া
চামার
চামারনি
চামেলি
চার
চারা
চারান
চারানি
চারি
চাল
চালতা
চালন
চালনা
চালান
চালা
চালাক
চালাকি
চালাচালি
চালান
চালানি
চালি
চাস
চাসবাস
চাসাড়িআ
চাহ্
চাহন
চাহনি
চাহা
চাহান
চাঁচ
চাঁচর
চাঁচি
চাঁছ
চাঁছনি
চাঁছা
চাঁছান
চাঁছি
চাঁটি
চাঁদ
চাঁদিআ
চাঁদনি
চাঁদা
চাঁদি
চাঁপ
চাঁপা
চাঁপকলি
চি
চিআন
চিক
চিকচিক
চিকন
চিকনা
চিকনাই
চিকিমিকি
চিঙড়ি
চিচিঙ্গা
চিট
চিটা
চিঠি
চিঠিবাজি
চিড়
চিড়ান
চিড়িয়া
চিড়িয়াখানা
চিত
চিতপাত
চিতল
চিতা
চিতান
চিন
চিনা
চিনান
চিনি
চিনিআ
চিপ
চিপটান
চিপটানিআ
চিব্
চিবা
চিবান
চিমড়িআ
চির
চিরকালিআ
চিরনি
চিরা
চিরান
চিল
চিলিয়া (ছাত)
চিঁড়া
চুআ
চুআত্তর
চুয়ান্ন
চুআল
চুআল্লিশ
চুক
চুকচুক
চুকলি
চুকলিখোর
চুকা
চুকান
চুট্
চুটকি
চুটান
চুড়ি
চুড়িদার
চুন
চুনা
চুনারি
চুনি

চুপ
চুপচাপ
চুবড়ি
চুম্
চুমক
চুমকি
চুমরা
চুমরান
চুর
চুরট
চুরনব্বই
চুরাশি
চুরি
চুল
চুলা
চুলি
চুস
চুসা
চুসান
চুসি
চুঁচি
চেক
চেঙ
চেঙরা
চেত্
চেতা
চেতান
চেপটা
চেরা
চেরান
চেরানি
চেল্
চেলা
চেলান
চেলানি
চেলি
চেলুআ
চেহারা
চেঁচ
চেঁচাচেঁচি
চেঁচান
চেঁচানি
চেঁচামেচি
চেঁট
চৈ
চৈচৈ
চৈতনচুটকি
চোখ
চোখাল
চোঙ
চোঙা
চোট
চোটপাট
চোটা
চোটাচুটি
চোটান
চোপদার
চোপদারি
চোপা
চোমরা
চোমরান
চোমা
চোমান
চোঁ
চোঁচ
চোঁচা
চৌকি
চৌকিআ
চৌকিদার
চৌকিদারান
চৌকিদারি
চৌখুলি
চৌঘরা
চৌচাপট
চৌঠা
চৌতারা
চৌত্রিশ
চৌথ
চৌদানি
চৌদিক
চৌদ্দ
চৌধুরি
চৌপায়া
চৌপালা
চৌবাচ্চা
চৌমাথা
চৌষট্টি
চৌহদ্দি

ছ

ছক
ছকা
ছকান
ছটপট
ছটপটানি
ছটপটিআ
ছটাক
ছটাকিআ
ছড়
ছড়া
ছড়াছড়ি
ছড়ান
ছড়ি
ছড়িদার
ছনছন
ছমছম
ছমছমিআ
ছনমন
ছয়লাপ
ছয়লাপি
ছরাদ
ছল্
ছলছল
ছলছলান
ছলছলিয়া
ছলা
ছা
ছাই
ছাউনি
ছাওআ
ছাওআল
ছাওআলি
ছাগল
ছাগলিআ
ছাড়
ছাড়া
ছাড়াছাড়ি

ছাড়ান
ছাড়ানি
ছাত
ছাতা
ছাতি
ছাতিম
ছাতু
ছাদন
ছান
ছানা
ছানান
ছানি
ছান্‌তা
ছাপ
ছাপর
ছাপা
ছাপাখানা
ছাপছাপি
ছাপান
ছাপানি
ছাব
ছাবা
ছাবাখানা
ছাবাছাবি
ছাবান
ছাবানি
ছার
ছারকপালিআ
ছারখার
ছারপোকা
ছাল
ছালন

ছালা
ছাঁক্
ছাঁকন
ছাঁকা
ছাঁকান
ছাঁচ্
ছাঁচা
ছাঁট
ছাঁটন
ছাঁটা
ছাঁটাছাঁটি
ছাঁটান
ছাঁদ
ছাঁদনি
ছাঁদা
ছি
ছিআ
ছিআল
ছিট
ছিটা
ছিটান
ছিটাফোঁটা
ছিন
ছিনছিন
ছিনা
ছিনান
ছিনানি
ছিনার
ছিনারি
ছিনিআ
ছিপ
ছিপি

ছিমড়িয়া
ছিল
ছিলা
ছিলান
ছিলিম
ছিঁচ
ছিঁচকা
ছিঁচকাঁদানিআ
ছিঁচা
ছিঁচান
ছিঁড়্
ছিঁড়া
ছিঁড়াছিঁড়ি
ছিঁড়ান
ছিঁদ
ছুকরি
ছুট
ছুটা
ছুটাছুটি
ছুটান
ছুটি
ছুত
ছুতা
ছুতার
ছুতারনি
ছুব
ছুবান
ছুবানি
ছুরি
ছুল
ছুলা
ছুলান

ছুলি
ছুঁ
ছুঁআ
ছুঁআচ
ছুঁআচিআ
ছুঁআছুঁই
ছুআঁন
ছুঁইছুঁই
ছুঁচ
ছুঁচাবাজি
ছুঁড়ি
ছে
ছেচে
ছেড়
ছেপ
ছেঁক
ছেঁকা
ছেঁচ
ছেঁচকি
ছেঁচাছেঁচি
ছেঁচান
ছেঁড়া
ছেঁড়ান
ছেঁদা
ছোআরা
ছোকরা
ছোকা
ছোট
ছোটকা
ছোটকি
ছোটা
ছোটান

ছোব
ছোবা
ছোবান
ছোবানি
ছোরা
ছোলা
ছোলান
ছোঁ
ছোঁআচ
ছোঁআচিআ

———

জ

জউ
জক
জকা
জখন
জখম
জখমি
জগঝম্প
জজ
জজমেণ্ট
জজিয়তি
জঞ্জাল
জট
জটলা
জটামাংসী
জটিআ
জড়
জড়াও
জড়াজড়ি
জড়ান
জড়ি
জড়িত
জত
জতন
জনম
জনমভর
জনার
জপ
জপা
জপান
জবড়জঙ
জবর
জবরদস্ত
জবরদস্তি
জবাই
জবান
জবানবন্দি
জবানি
জবাব
জবাবি
জবে
জম্
জমক
জমকা
জমকান
জমকাল
জমা
জমাখরচি
জমাট
জমাদার
জমাদারি
জমান
জমাবন্দি
জমি
জমিদার
জমিদারি
জমানবিস
জন্ম
জন্মশোধ
জর
জরজর
জরা
জরান
জরি
জরিপ
জরিপি
জরু
জরুর
জরুরি
জল
জলন
জলন্ত
জলা
জলাতন
জলান
জলানিআ
জলুই
জসম
জহন্নম
জহর
জহরতি
জহরি
জা
জাউ
জাওআ
জাওন
জাগ
জাগন্ত
জাগরনি
জাগরানি
জাগা
জাগাজাগি
জাগান
জাগানি
জাঙ
জাঙাল
জাঙিআ
জাট
জাড়
জাড়ি
জাত
জাদু
জাদুগর
জাদুগরি
জাদুঘর
জাদুমণি
জান
জানত
জানা
জানাজানি
জানান
জানালা
জানানা
জাব
জাবেতা
জাম

জামরুল	জালিমি	জিতপাটি	জুড়ি
জামা	জাসু	জিতা	জুড়িদার
জামাই	জাসুগিরি	জিতান	জুড়িদারি
জামিআর	জাহা	জিদ	জুৎ
জামিন	জাহাজ	জিদ্দি	জুতন্ত
জামিনদার	জাহাজি	জিন	জুতা
জামিনি	জাহির	জিনা	জুতান
জামির	জাহিরি	জিনিস	জুতাবরদার
জায়	জাঁক	জিব	জুদা
জায়গা	জাঁকজমক	জিবআ	জুমর
জায়গির	জাঁকড়	জিম্মা	জুমল
জায়গিরদার	জাঁকড়ি	জিম্মাদার	জুমলা
জায়দাদ	জাঁক	জিরন্দাজ	জুরি
জায়ফল	জাঁকাজাঁকি	জিরা	জুল
জারক	জাঁকান	জিলদ	জুলপি
জারা	জাঁকাল	জিলা	জুলি
জারান	জাঁকুআ	জিলাপি	জুঁই
জারি	জাঁত	জুআ	জে
জারিজুরি	জাঁতা	জুআচুরি	জেঠ
জারুল	জাঁতি	জুআচোর	জেঠতত
জাল	জি	জুআন	জেঠা
জালন	জিঅন	জুআনি	জেঠাই
জালা	জিঅন্ত	জুআর	জেঠাত
জালাতন	জিঅল	জুআরি	জেঠামি
জালান	জিআন	জুআলি	জেঠি
জালানি	জিউ	জুজু	জেত
জালানিআ	জিউদান	জুট	জেব
জালিআত	জিউলি	জুটা	জেমন
জালিআতি	জিকির	জুটান	জের
জালিআ	জিগির	জুড়	জেরদস্ত
জালিআনি	জিত	জুড়া	জেরবার
জালিম	জিতপাখা	জুড়ান	জেরা

জেল
জেলখানা
জেলখালাসি
জেলে
জেলেনি
জো
জোগাড়
জোগাড়িআ
জোগান
জোগানিআ
জোট
জোটপাট
জোটবাঁধা
জোটা
জোটাই
জোটান
জোড়
জোড়ঘাই
জোড়তাড়
জোড়ভাঙা
জোড়ন
জোড়া
জোড়াতাড়া
জোড়ান
জোত
জোতদার
জোতা
জোতাজুতি
জোনাকি
জোনাপোকা
জোর
জোরআর
জোরআরি
জোরাল
জোল
জোলা
জোলাপ
জোঁক
জোঁকা
——

ঝ

ঝক
ঝকঝক
ঝকঝকানি
ঝকনি
ঝকা
ঝকাঝকি
ঝগড়া
ঝগড়াটিআ
ঝট
ঝটকা
ঝটপট
ঝটপটানি
ঝটপটিআ
ঝড়
ঝড়া
ঝড়ান
ঝড়ি
ঝড়্আ
ঝন
ঝনঝন
ঝনঝনানি
ঝনঝনি
ঝনঝনিআ
ঝন্ঝাট
ঝপ
ঝম
ঝমঝম
ঝমঝমানি
ঝমঝমিআ
ঝর
ঝরখা
ঝরন
ঝরনা
ঝরঝরিআ
ঝরান
ঝলঝল
ঝলঝলিআ
ঝলমল
ঝলমলানি
ঝলমলিআ
ঝাউ
ঝাড়
ঝাড়ন
ঝাড়া
ঝাড়াঝাড়ি
ঝাড়ান
ঝাড়ানি
ঝাড়্
ঝাড়্বরদার
ঝামা
ঝারা
ঝারি
ঝাল
ঝাঁ
ঝাঁক
ঝাঁকড়া
ঝাঁকর
ঝাঁকরা
ঝাঁকরান
ঝাঁকরানি
ঝাঁকা
ঝাঁকি
ঝাঁট
ঝাঁটা
ঝাঁটান
ঝাঁটি
ঝাঁতলা
ঝাঁতাড়ু
ঝাঁপ
ঝাঁপনি
ঝাঁপা
ঝাঁপান
ঝাঁপানা
ঝাঁপানি
ঝাঁলি
ঝি
ঝিউড়ি
ঝিকুর
ঝিঙা
ঝিট
ঝিটা
ঝিনঝিন
ঝিনঝিনি
ঝিনুক
ঝিম
ঝিমকিনি

ঝিগান
ঝিল
ঝিঁক
ঝিঁকরা
ঝিঁকা
ঝিঁঝিঁ
ঝিঁঝিঁট
ঝিঁট
ঝুট
ঝুটা
ঝুড়
ঝুড়া
ঝুড়ান
ঝুড়ি
ঝুন
ঝুনা
ঝুপ
ঝুপড়ি
ঝুপি
ঝুম
ঝুমকা
ঝুমঝুমি
ঝুমুর
ঝুর্
ঝুরা
ঝুরি
ঝুল
ঝুলন
ঝুলনা
ঝুলা
ঝুলাঝুলি
ঝুলান
ঝুলানযাত্রা
ঝুলি
ঝুঁক
ঝুঁকা
ঝুঁকান
ঝুকি
ঝুঁটি
ঝোড়
ঝোড়া
ঝোড়ান
ঝোপ
ঝোল
ঝোলনা
ঝোলা
ঝোলান
ঝোঁক
ঝোঁকাঝোঁকি

———

ট

টক
টকঝক
টকুআ
টক্কর
টক্করাটক্করি
টগর
টঙ
টনকা
টনটন
টনটনিআ
টনটনানি
টপটপ
টপটপানি
টপাটপ
টব
টল
টলটল
টলটলান
টলটলিআ
টলন
টলমল
টলমলান
টলমলিআ
টলান
টস্
টস্কান
টসটস
টসটসানি
টসটসিআ
টহল
টহলদার
টহলিআ
টাকুআ
টাক
টাকা
টাকসাল
টাঙ
টাঙন
টাঙা
টাঙান
টাঙি
টাট
টাটকা
টাটান
টাটানি
টাটি
টাটু
টাণ্ডাই
টান
টানা
টানাটানি
টানান
টাপু
টায় টায়
টারপিন
টাল
টালমাটাল
টালা
টালাটালি
টালান
টালি
টাঁক
টাঁকন
টাঁকা
টাঁঠি
টাঁড়
টি
টিআ
টিক
টিকটিকি
টিকা
টিকাদার
টিকাদারি
টিকান
টিটকারি
টিন

- টিপ
- টিপনি
- টিপা
- টিপাটিপি
- টিপান
- টিমক
- টু
- টুআন
- টুক
- টুকটাক
- টুকটুকিআ
- টুকনি
- টুকরা
- টুকরি
- টুকা
- টুকান
- টুট
- টুটা
- টুটান
- টুটি
- টুপি
- টুপিওআলা
- টুনি
- টুঁ
- টেক্স
- টেকসই
- টেকুআ
- টেঙরা
- টেঙরি
- টেড়া
- টেড়ি
- টেনা
- টেপা
- টেপান
- টেবিল
- টের
- টেরা
- টেলিগ্রাফ
- টেলিগ্রাম
- টেঁ
- টেঁক
- টেঁকখর
- টেঁটা
- টেঁপা
- টেঁপারি
- টেঁকো
- টেঁস
- টেঁসটেঁস
- টেঁসটেসিআ
- টৈটুম্বুর
- টোকা
- টোকান
- টোঙর
- টোপ
- টোপর
- টোপা
- টোল
- টোলা
- টোসা
- ট্রেজরি

ঠ

- ঠক
- ঠকঠক
- ঠকঠাক
- ঠকা
- ঠকাঠকি
- ঠকান
- ঠকানিআ
- ঠকামি
- ঠঙ
- ঠঙঠঙ
- ঠঙঠঙানি
- ঠন
- ঠনঠন
- ঠনঠনান
- ঠনঠনানি
- ঠসমস
- ঠসমসিআ
- ঠাঅর
- ঠাঅরা
- ঠাঅরান
- ঠাকুর
- ঠাকুরঝি
- ঠাকুরদাদা
- ঠাকুরপো
- ঠাকুরমা
- ঠাকুরানি
- ঠাকুরানিদিদি
- ঠাকুরালি
- ঠাট
- ঠাট্টা
- ঠাট্টাবাজ
- ঠাট্টাবাজি
- ঠাড়
- ঠাড়া
- ঠাণ্ডা
- ঠাণ্ডাই
- ঠাণ্ডাগারদ
- ঠাণ্ডি
- ঠাম
- ঠার
- ঠারে ঠোরে
- ঠাস
- ঠাসন
- ঠাসা
- ঠাসাঠাসি
- ঠাসান
- ঠাহর
- ঠাহরা
- ঠাহরান
- ঠাঁ
- ঠাঁই
- ঠাঁইনাড়া
- ঠিক
- ঠিকা
- ঠিকাদার
- ঠিকাদারি
- ঠিকানা
- ঠিল
- ঠিলা
- ঠিলান
- ঠুক
- ঠুকর
- ঠুকরান
- ঠুকরানি
- ঠুকা

ঠুঙ	ঠোসা	ডালনা	ডুকরান
ঠুনি	ঠোঁট	ডালা	ডুব
ঠুস	——	ডালান	ডুবডুবি
ঠুসা		ডালি	ডুবা
ঠুসানি	ড	ডালিম	ডুবান
ঠেক	ডগ	ডাহা	ডুবি
ঠেকনুআ	ডগা	ডাঁইন	ডুবুডুবু
ঠেকা	ডগানি	ডাঁট	ডুমুর
ঠেকাঠেকি	ডগাসাল	ডাঁটা	ডুরি
ঠেকান	ডগি	ডাঁড়	ডুরিআ
ঠেঙ	ডাক	ডাঁড়ি	ডুলি
ঠেঙা	ডাকা	ডাঁস	ডেক
ঠেঙাঠেঙি	ডাকাডাকি	ডাঁসান	ডেকচি
ঠেঙাড়িআ	ডাকাত	ডিক্রি	ডেগরা
ঠেঙান	ডাকাতি	ডিক্রিজারি	ডেঙ
ঠেঙানি	ডাকান	ডিক্রিদার	ডেঙডেঙ
ঠেল	ডাকিনী	ডিগবাজি	ডেড়
ঠেলা	ডাক্তর	ডিঙ্	ডেড়া
ঠেলাঠেলি	ডাক্তারি	ডিঙন	ডেড়ি
ঠেলান	ডাগর	ডিঙা	ডেঁকল
ঠেলানি	ডাঙ	ডিঙান	ডোকরা
ঠেস	ডাঙপিটিআ	ডিঙি	ডোব
ঠেসঠোস	ডাঙস	ডিপজিট	ডোবা
ঠেসান	ডাঙা	ডিপজিটরি	ডোবান
ঠেঁট	ডাঙান	ডিম	ডোম
ঠোকর	ডাব	ডিমকি	ডোমনি
ঠোকরান	ডাবর	ডিমল	ডোর
ঠোকরানি	ডাবা	ডিমডিম	ডোরা
ঠোঙা	ডামর	ডিমিডিমি	ডৌল
ঠোনা	ডামাডোল	ডিসমিস	——
ঠোস	ডাল	ডিহি	
ঠোসন	ডালকুত্তা	ডুকর্	

ঢ
ঢক
ঢকি
ঢঙ
ঢঙঢঙ
ঢঙঢঙানি
ঢনঢন
ঢনঢনানি
ঢনঢনিআ
ঢপ
ঢপঢপ
ঢপঢপিআ
ঢল
ঢলঢল
ঢলঢলিআ
ঢলা
এলাঢল্লে
ঢলান
ঢলানি
ঢাক
ঢাকন
ঢাকনা
ঢাকনি
ঢাকা
ঢাকাই
ঢাকাঢাকি
ঢাকান
ঢাকি
ঢাল
ঢালা
ঢালাঢালি
ঢালান
ঢালি
ঢিট
ঢিপ
ঢিপঢিপ
ঢিপনি
ঢিপান
ঢিল
ঢিলন
ঢিলা
ঢু
ঢুক্
ঢুকা
ঢুকান
ঢুপ
ঢুপঢাপ
ঢুপঢুপ
ঢুপঢুপি
ঢুল
ঢুলনি
ঢুলা
ঢুলাই
ঢুলান
ঢুলি
ঢুলঢুল
ঢুসান
ঢুসানিআ
ঢুঁড়
ঢুঁড়া
ঢেউ
ঢেকফাজিল
ঢেকা
ঢেকুর
ঢেঙা
ঢেঙি
ঢেপ
ঢেপঢেপ
ঢেপঢেপিআ
ঢেপসা
ঢেমন
ঢেমনা
ঢেমনি
ঢেমনিবাজ
ঢেমনিবাজি
ঢের
ঢেরা
ঢেরাসই
ঢেরি
ঢেলা
ঢেলান
ঢেলামারা
ঢেঁকি
ঢেঁকিশাল
ঢেঁস্কাল
ঢেঁটা
ঢেঁটামি
ঢেঁড়রা
ঢেঁড়স
ঢেঁড়ি
ঢোক
ঢোকনা
ঢোকা
ঢোকান
ঢোল
ঢোলা
ঢোলাই
ঢোলান
ঢোলী
ঢোঁক
ঢোঁড়া
ঢোঁসা
ঢোঁসান

ত
তক
তকতক
তকতকিআ
তক্তপোস
তক্তা
তকরার
তকরারি
তক্তি
তকমা
তকমারি
তখন
তজবিজ
তটস্থ
তড়তড়
তড়তড়িআ
তড়াক
তত
তদবির
তদবিরি
তন্মধ্যে
তপসিল
তফাত

তফিল
তফিলদারি
তবক
তবাক
তবিঅত
তবু
তবে
তমস্থক
তমস্থকি
তমাদি
তয়ের
তয়েরি
তর্
তর
তরআল
তরকারি
তরম্বর
তরজা
তরতরিআ
তরদ্দুদ
তরফ
তরফসান
তরফসানি
তরবির
তরমুজ
তরস্ত
তরা
তরাজু
তরান
তরিবত
তরুই
তল

তলতল
তলতলিআ
তলা
তলান
তলাস
তলাসি
তলি
তলুআ
তল্লাট
তসর
তসরপাত
তসলা
তহবিল
তহবিলদার
তহবিলদারি
তহমত
তহমতি
তা
তাই
তাইদ
তাইদনবিস
তাইদনবিসি
তাইন
তাউই
তাওআ
তাওআল
তাক
তাকতম্বি
তাকান
তাকানি
তাকিআ
তাকিত

তাকুড়
তাকুত
তাখিত
তাগ
তাগা
তাগাড়
তাগাদা
তাগিদ
তাণ্ডড়্
তাণ্ডড়ান
তাজ
তাজা
তাজারুজু
তাড়
তাড়ন
তাড়া
তাড়াতাড়ি
তাড়ান
তাড়ানিআ
তাড়ি
তাড়ু
তাত
তাতরসি
তাতা
তাতান
তাতিল
তান
তানপুরা
তানানা
তামা
তামাক
তামাম

তামাসা
তামাসাগির
তামিল
তামুলি
তামুলিনি
তার্
তারান
তারিখ
তারিফ
তাল
তালা
তালাস
তালাসি
তালি
তালিকা
তালিম
তালিমি
তালুক
তালুকদার
তালুকদারি
তালেবর
তাল্লাক
তাস
তাসা
তাসান
তাহদ্দ
তাহুদ
তাঁত
তাঁতি
তাঁতিনি
তাঁবা
তাঁবেদার

তাঁবেদারি
তিঅর
তিআরি
তিকোনা
তিখুড়
তিত
তিতির
তিন
তিনি
তিপান্তর
তিপ্পান্ন
তিয়াত্তর
তিরনব্বই
তিরন্দাজ
তিরন্দাজি
তিরপল
তিরপাই
তিরবির
তিরবিরান
তিরাশী
তিলিআ
তিলুআ
তু
তুআজ
তুই
তুইতকার
তুইতকারি
তুইতকারিআ
তুক
তুক্কা
তুখড়
তুড়
তুড়া
তুড়ান
তুত
তুফান
তুমর
তুমারি
তুমি
তুরপন
তুরিত
তুরুপ
তুল
তুলকালাম
তুলা
তুলান
তুলাপাড়া
তুস
তুসা
তুসি
তেইসা
তেইসে
তেউটি
তেউড়
তেকর
তেকোনা
তেগ
তেজ
তেজপাত
তেজারত
তেজারতি
তেজাল
তেজি
তেজিমন্দি
তেড়া
তেড়ি
তেতলা
তেতালিস
তেত্রিস
তেপান্তর
তেপান্তরি
তেপায়া
তেবাচক
তেমত
তেমন
তেমনি
তেমাথা
তেমোহানা
তের
তেরই
তেরিআ
তেরিজ
তেরিমেরি
তেল
তেলা
তেলি
তেলুআ
তেষট্টি
তেহাই
তেহারা
তেঁত
তেঁতুল
তেঁতুলিআ
তোক
তোকা
তোড়
তোড়া
তোড়ান
তোতলা
তোতা
তোপ
তোরঙ্গ
তোলন
তোলা
তোলান
তোলাপাড়া
তোষক
তোষামদ
তৌজি
তৌজিভুক্ত
তৌল
তৌলন্দার
তৌলন্দারি
তৌলা
তৌলান

থ

থই
থক
থকা
থপ
থপথপ
থপথপিআ
থমথমিআ
থর
থরথর
থরথরানি

থল
থলথল
থলথলিআ
থলি
থলিআ
থলুআ
থসথস
থসথসিয়া
থা
থাই
থাউকা
থাক
থাকন
থাকবস্ত
থাকা
থাকাথাকি
থান
থানদার
থানদারি
থানফাড়া
থানা
থাপড়
থাবড়
থাবড়া
থাবড়ানি
থাম
থামা
থামান
থামাল
থাল
থালা
থালি

থালিআ
থাস
থাসন
থাসা
থাসান
থিৎ
থিতন
থিন
থিনান
থির
থু
থুআ
থুআপাড়া
থুক্
থুড়
থুড়নি
থুড়া
থুড়ি
থুত্
থুতু
থুথু
থুপ্
থুপ
থুপথুপ
থুপথুপিআ
থুর
থুরথুর
থুরথুরিআ
থুরা
থুরান
থুসুআ
থেঁতল

থেঁতলা
থেঁতলান
থেঁতলানি
থৈ
থৈথৈ
থোক
থোকা
থোড়
থোড়া
থোড়ান
থোপ
থোপা
থোবা
থোলা
থোরা
থৌকা

———

দ
দই
দইআ
দগদগ
দগদগিআ
দঙ্গল
দড়
দড়কচা
দড়দড়
দরবড়
দড়বাড়িআ
দড়া
দড়ি
দপ

দপদপ
দপদপানি
দপ্তর
দপ্তরি
দফা
দফাঅত
দফাদার
দফাদারি
দবদবা
দবদবানি
দম
দমক
দমকা
দমদমা
দমপোক্তা
দমবাজ
দমবাজি
দমা
দমান
দয়াল
দয়েল
দর
দরআন
দরআনি
দরকার
দরকচা
দরকসান
দরকস্তুরি
দরকারি
দরখাস্ত
দরজা
দরজি

দরদ
দরদালান
দরদি
দরবার
দরবারি
দরমা
দরমাহা
দল
দলপতি
দলস্থ
দলভুক্ত
দলা
দলাক্রান্ত
দলাদলি
দলান
দলিল
দলিলি
দলুআ
দস্ত
দস্তক
দস্তখত
দখখতি
দস্তাবেজ
দস্তুর
দস্তুরি
দহরম
দহি
দঁক
দা
দাই
দাএর
দাএরি
দাএআ
দাওআদার
দাকোটা
দাখিল
দাখিলা
দাখিলি
দাগ
দাগনি
দাগা
দাগান
দাগাবাজ
দাগাবাজি
দাগি
দাঙ্গা
দাঙ্গাবাজ
দাড়
দাড়া
দাড়িআ
দাড়িম
দাড়ু
দাদ
দাদন
দাদনি
দাদা
দাদাশ্বশুর
দাদি
দাদিশাশুড়ি
দাদেইজ
দাদেইজি
দানা
দানাদার
দানাই
দানি
দাপ
দাপট
দাব
দাবড়ি
দাবন
দাবনি
দাবা
দাবান
দাবি
দাবিদার
দাম
দামড়া
দামড়ি
দামা
দামামা
দামি
দায়
দায়গ্রস্ত
দায়রা
দায়মাল
দারা
দারি
দারিক্
দারু
দালান
দালাল
দালালি
দালিম
দাসখত
দাস্ত
দাঁ
দাঁও
দাঁড়
দাঁড়া
দাঁড়ান
দাঁড়ি
দাঁত
দাঁতন
দাঁতুআ
দি
দিক
দিকদারি
দিগর
দিগার
দিঘি
দিদি
দিদিসাশুড়ি
দিল
দিলদরিআ
দিলদার
দিলদারি
দিলামা
দিশা
দিশাহারা
দিস্তা
দু
দুআ
দুআত
দুআন
দুআনি
দুআর
দুআল
দুআলি

দুআঁসলা
দুই
দুও
দুকর
দুখ
দুখচাটিআ
দুখিনী
দুখী
দুগজন
দুড়দুড়
দুড়দুড়ানি
দুধ
দুধল
দুনা
দুনাদুনি
দুপ
দুপদাপ
দুপদুপ
দুপদুপানি
দুপাক
দুবরা
দুম
দুমদাম
দুরন্ত
দুরবিন
দুরস্ত
দুল্
দুলন
দুলনা
দুলা
দুলান
দুলাল

দুসরা
দেইজ
দেইজি
দেউল
দেউলিআ
দেক
দেকদার
দেকদারি
দেদার
দেন
দেনদার
দেনমোহর
দেনা
দেনাদার
দেমাক
দেনাকিআ
দেরি
দেসেলাই
দেহাত
দৈসত
দোআ
দোআত
দোআল
দোআঁসলা
দোকতা
দোকর
দোকান
দোকানি
দোকানদার
দোকানদারি
দোক্তা
দোগজা

দোষেঁচড়া
দোটান
দোতরফা
দোনর
দোনা
দোপিআঁজা
দোবরা
দোরোখা
দোল
দোলন
দোলমালাই
দোলযাত্রা
দোলা
দোলাই
দোলান
দোলুআ
দোবরা
দোসর
দোসরা
দোস্ত
দোস্তি
দোহর
দোহা
দোহাই
দৌড়
দৌড়ন
দৌড়নি
দৌড়া
দৌড়াদড়ি
দৌড়ান
দৌলত
দৌলতমন্দ

ধ

ধক
ধকধক
ধড়
ধড়ধড়
ধড়ধড়ানি
ধড়পড়
ধড়পড়ানি
ধড়া
ধড়িধক্কার
ধড়িবাজ
ধড়িবাজি
ধনিআ
ধনুক
ধনুকধারী
ধন্ধ
ধমক
ধমকান
ধমকানি
ধরণ
ধরণা
ধরা
ধরাকাট
ধরাট
ধরাধরি
ধস
ধসা
ধা
ধাই
ধাউড়িআ
ধাউস
ধাওআ

ধাঙর
ধাড়া
ধাড়ি

ধান
ধানি
ধানুআ
ধাপ
ধাপ্পা
ধাবড়া
ধামা
ধামি
ধার
ধারক
ধারণ
ধারণা
ধারা
ধারানি
ধারাল
ধারি
ধারুআ
ধাস
ধাঁচা
ধাধাঁ
ধিতকার
ধিতকারি
ধিনধিন
ধিনি
ধু
ধুক
ধুকড়ি
ধুকড়িআ

ধুকধুকনি
ধুকধুকি
ধুতি
ধুতুরা
ধুধু
ধুন
ধুনা
ধুনাচি
ধুনান
ধুনানি
ধুনি
ধুপ
ধুপধাপ
ধুপড়ি
ধুম
ধুমড়ি
ধুমধাম
ধুমধামিআ
ধুমল
ধুমলান
ধুমসা
ধুমসি
ধুমা
ধুমি
ধুরপদ
ধুরবাজ
ধুরবাজি
ধুল
ধুলা
ধুলি
ধুলিগুঁড়ি
ধুঁআ

ধুঁক
ধেঙে
ধেড়
ধেড়ধেড়িআ
ধেড়ান
ধেড়ানি
ধৈধত
ধৈরজ
ধোআ
ধোআট
ধোআন
ধোআনি
ধোপ
ধোপা
ধোপানি
ধোব
ধোবা
ধোবানি
ধোলাই
ধোসা
ধোকা

ন

নকল
নকলদানা
নকলনবিস
নকলনবিসি
নকলিআ
নকাসি
নগুর
নচ্ছার

নজর
নজরবন্দি
নজরানা
নট
নটিআ
নটী
নঠ
নড়

নড়ন
নড়বড়
নড়বড়িআ
নড়া
নড়ানড়ি
নড়ি
নড়িআভোলা
নত
নথি
নধর
ননদ
ননদি
ননদিনি
ননি
নন্দাই
নফর
নবাত
নবাব
নবাবি
নবুদ
নব্বই
নমাজ
নমুদ

নর
নরম
নরাজ
নরুন
নল
নলচালা
নলি
নলিআন
নষ্ট
নষ্টামি
নহবত
না
নাই
নাইকুণ্ডল
নাএব
নাএবি
নাক
নাকচ
নাকাল
নাকি
নাগর
নাগরী
নাগরালি
নাগরিনি
নাগাল
নাঙ
নাচ
নাচন
নাচনিআ
নাচা
নাচান
নাচানিআ
নাচার
নাচারি
নাছ
নাছি
নাছোড়বন্দা
নাজানা
নাজিম
নাজিমি
নাজুক
নাট
নাটশালা
নাটা
নাটাই
নাটিম
নাড়
নাড়ন
নাড়া
নাড়ান
নাড়ানাড়ি
নাড়ানি
নাতক
নাতি
নাতিবউ
নাতিন
নাতিনি
নাদ
নাদনা
নাদান
নাদা
নানকপন্থি
নানা
নানান
নানি
নাপাজ্জ
নাপাজ্জমান
নাপিতনি
নাব্
নাবা
নাবান
নাবানি
নাবাল
নাবালগ
নাবি
নাম
নামঞ্জুর
নামতা
নামা
নামান
নারাঙ্গি
নারসাই
নারাজ
নারাজি
নারাকাতরিআ
নাল
নালা
নালায়েক
নালি
নালিতা
নাস
নাসা
নাহক
নাহি
নাহিক
নিকর
নিকড়িআ
নিকস
নিকাস
নিকাসি
নিকি
নিখরচা
নিখুঁত
নিখুঁতি
নিগাছ
নিগূঢ়
নিঙড়
নিঙড়ান
নিছক
নিছু
নিজস্ব
নিজাম
নিজামত
নিজামতি
নিট
নিটুট
নিঠুর
নিড়
নিড়বিড়
নিড়বিড়িআ
নিড়ান
নিনতা
নিনামি
নিব
নিব্
নিবা
নিবান
নিম

নিমক	নেজ	পচা	পড়তা
নিমকচৌকি	নেজা	পচান	পড়ন
নিমকি	নেজুড়	পচানি	পড়পড়
নিরদয়	নেড়	পচাল	পড়শ
নিরমল	নেড়া	পচলাপচলি	পড়সি
নিরালা	নেড়ি	পচি	পড়া
নিরিখ	নেড়্নি	পছত	পড়াক
নিরবিল	নেদা	পছতান	পড়ান
নিরেট	নেসা	পছতানি	পড়িআন
নিরোগা	• নেসাখোর	পছন্দ	পড়্আ
নিলাম	নেহাইত	পছন্দদার	পড়িত
নিলামি	নেহাল	পছন্দসই	পতর
নিসান	নোঙরা	পঞ্চম	পদক
নিসানা	নোঙরামি	পট	পদবি
নিসি	নোট	পটক	পদান
নিহাইত	নোড়	পটকা	পদিনা
নিহাল	নোড়া	পটকান	পদ্দার
নুগা	নোনা	পটকানি	পয়
নুড়ি	নোলা	পটপট	পয়জার
নুন	নোলাবাজ	পটপটানি	পয়ড়া
নুনি	নোলাবাজি	পটপটি	পয়দা
নুনু	নৌবত	পটপটিআ	পয়নালা
নুর	——	পটাপটি	পয়মন্ত
নুরি		পটি	পয়মাল
নুলা	প	পটিদার	পয়মাস
নেউল	পইপই	পটুআ	পয়সা
নেঁকা	পকুড়ি	পঠ্	পয়াড়
নেকাপনা	পকেট	পঠন	পয়ার
নেকামি	পগার	পঠা	পরআ
নেঁকি	পঙ্গপাল	পঠান	পরআনা
নেঙা	——	পঠিত	পরকলা
নেচি	পচ্	পড়	পরকিত

পরখ
পরখদার
পরখা
পরখান
পরগনা
পরঘরি
পরজ
পরচালা
পরটা
পরতাল
পরদা
পরদানসিন
পরদেশি
পরব
পরবস্তি
পরভাতি
পরমিট
পরস
পরসন
পরস্থ
পরান
পরানি
পরি
পরিষ্টি
পলক
পলখা
পলটন
পলতা
পলা
পলান
পলি
পসম

পসমি
পসার
পসুরি
পঁহুছ
পঁহুছন
পঁহুছা
পঁহুছান
পা
পাই
পাওয়া
পাওআন
পাওআনা
পাওআনাদার
পাক
পাকলা
পাকলা
পাকসাঁড়াসি
পাকা
পাকান
পাকাপাকি
পাকাম
পাকি
পাকুড়
পাখআজ
পাখনা
পাখা
পাখি
পাখুরা
পাস
পাগড়ি
পাগল
পাগলা

পাগলামি
পাঙা
পাঙাস
পাঙাসিআ
পাচক
পাচার
পাচিকা
পাছ
পাছড়
পাছড়া
পাছড়ান
পাছা
পাছাড়
পাছাড়া
পাছাড়ান
পাছাড়াপাছাড়ি
পাছুড়ি
পাছে
পাজ
পাজা
পাজান
পাজামা
পাজি
পাজিআমি
পাট
পাটকরনি
পাটকিলা
পাটা
পাটাদার
পাটাসেলামি
পাটি
পাঠ

পাঠান
পাঠাপাঠ
পাড়
পাড়ন
পাড়া
পাড়ান
পাড়ানি
পাড়াপড়সি
পাড়াবেড়ানি
পাড়াবেড়ানিআ
পাড়ি
পাড়িওআলা
পাণ্ডা
পাণ্ডাগিরি
পাত
পাতকুআ
পাতখোলা
পাতড়া
পাতড়ামারা
পাতল
পাতলা
পাতা
পাতান
পাতি
পাথর
পাথরি
পাথরিআ
পাদরি
পাদোদক
পান
পানকাঁটা
পানকৌটি

পানড়া
পানতা
পানতি
পানতুআ
পানদান
পানদানি
পানমসালা
পানমুছি
পানসি
পানসিআ
পানা
পানাদার
পানি
পানিফল
পাপূজা
পাপোস
পায়খানা
পায়তক্ত
পার
পারক
পারকতা
পারদর্শী
পারদর্সিতা
পারদারিকতা
পারা
পারান
পারানি
পারাপার
পারাপারি
পারুল
পাল
পালআন

পালক
পালকি
পালনি
পালা
পালান
পালানিআ
পালাহুড়কি
পালি
পালিস
• পালুই
পাস
পাসর
পাসরা
পাসরান
পাহাড়
পাহাড়ি
পাহাড়িআ
পাঁউরুটি
পাঁক
পাঁকাটি
পাঁকাল
পাঁকুআ
পাঁকুই
পাঁচ
পাঁচড়া
পাঁচন
পাঁচনি
পাঁচালি
পাঁচির
পাঁচুটিআ
পাঁজ
পাঁজর

পাঁজরা
পাঁজা
পাঁজারি
পাঁজি
পাঁঠা
পাঁঠি
পাঁঠিআল
পাঁড়
পাঁড়ে
পাঁতি
পাঁপড়
পাঁপর
পাঁয়জোর
পাঁয়তারা
পাঁয়দল
পাঁস
পাঁসকুড়
পাঁসটিআ
পিআদা
পিআর
পিআরা
পিআলা
পিআস
পিক
পিকদান
পিকদানি
পিঙলা
পিচ
পিচকারি
পিচান
পিচুটি
পিছ

পিছন
পিছা
পিছে
পিট
পিটন
পিটনবাজি
পিটনা
পিটপিটনি
পিটপিটিআ
পিটা
পিটান
পিঠ
পিঠটান
পিঠা
পিঠাপিঠি
পিঠালি
পিতল
পিন
পিনাস
পিনিস
পিপরমেণ্ট
পিপা
পিপুল
পিয়াদা
পিয়ারা
পিয়ালা
পিয়াস
পির
পিরান
পিরালি
পিল
পিলখানা

পিলপিল
পিলসুজ
পিলুড়ি
পিস্
পিসতত
পিসবোট
পিসা
পিসাত
পিসান
পিসাশ্বশুর
পিসি
পিসিশ্বাশুড়ি
পিঁআজ
পিঁজ
পিঁজা
পিঁজান
পিঁড়া
পিঁপা
পুআ
পুআল
পুই
পুকুর
পুজ
পুজারি
পুট
পুটলি
পুড়
পুড়নি
পুড়া
পুড়ান
পুড়ানি
পুত
পুতলি
পুতা
পুতান
পুতি
পুতুপুতু
পুতুল
পুদিনা
পুনরায়
পুমু
পুর
পুরা
পুরান
পুরি
পুরিআ
পুরিখাকি
পুরু
পুরুষ্ট
পুল
পুলবন্দি
পুলি
পুলিস
পুলিসি
পুলিন্দা
পুহ
পুহান
পুঁ
পুঁক
পুঁজ
পুঁজি
পুঁঠি
পুঁথি
পেগম্বর
পেজ
পেট
পেটভরা
পেটভাঙা
পেটা
পেটান্তিআ
পেটি
পেটুক
পেটুকামি
পেটুকুআ
পেণ্টলুন
পেরাকি
পেরু
পেরেক
পেরেত
পেরেসান
পেস
পেসকস
পেসকার
পেসকারি
পেসা
পেসাদার
পেসাদারি
পেসান
পেসানি
পেঁক
পেঁকপেঁক
পেঁকপেঁকানি
পেঁচ
পেঁচা
পেঁচাপেঁচি
পেঁটরা
পেঁটরি
পেঁটারি
পেঁড়া
পেঁড়ি
পেঁপিআ
পৈতা
পৈতাধারী
পো
পোআতি
পোআন
পোআল
পোকা
পোক্ত
পোক্তা
পোক্তাই
পোক্তান
পোড়া
পোড়ান
পোড়ানি
পোতা
পোতান
পোদ
পোদ্দার
পোনা
পোল
পোলা
পোলাও
পোস
পোসা
পোসাক
পোসাকি
পোসান

পোসানি
পোস্ত
পোস্তা
পোহ
পোহান
প্রাণপ্রিয়সি
প্রিয়সি

ফ

ফইজৎ
ফক
ফকা
ফকামি
ফকির
ফকিরনি
ফকিরি
ফক্কা
ফক্কুড়
ফক্কুড়িআ
ফচকিআ
ফচকিআমি
ফজ্জাল
ফজ্জিহৎ
ফট
ফটক
ফটফটিআ
ফটিক
ফটকিরি
ফড়িআ
ফড়িঙ
ফতনা
ফতা
ফতে
ফম
ফরক
ফরকাল
ফরসি
ফরাস
ফরাসি
ফরিআদ
ফরিআদি
ফলন
ফলনা
ফলন্ত
ফলা
ফলান
ফলাফল
ফলার
ফলারিআ
ফলুই
ফসল
ফস্ক
ফস্কা
ফস্কান
ফাইল
ফাইলি
ফাও
ফাগ
ফাগুন
ফাজিল
ফাট
ফাটন
ফাটা
ফাটান
ফাটাফাটি
ফাটাল
ফাড়
ফাড়ন
ফাড়া
ফাড়ান
ফাড়ানি
ফানস
ফাপর
ফারখত
ফারখতি
ফারম
ফারমান
ফাল
ফালতুআ
ফালা
ফালি
ফাঁক
ফাঁকা
ফাঁকি
ফাঁকেফাঁকে
ফাঁড়া
ফাঁড়ি
ফাঁপ
ফাঁপন
ফাঁপনি
ফাঁপর
ফাঁপা
ফাঁপান
ফাঁপানি
ফাঁস
ফাঁসন
ফাঁসা
ফাঁসান
ফাঁসি
ফাঁসিআড়া
ফাঁসিকাট
ফিক্
ফিকফিক
ফিকা
ফিকির
ফিকিরি
ফিঙা
ফিচ্
ফিচান
ফিচানি
ফিট
ফিটফাট
ফিতা
ফির্
ফিরন
ফিরা
ফিরান
ফিলকোল
ফুট
ফুটকড়াই
ফুটফাট
ফুটা
ফুটান
ফুটি
ফুনফুন
ফুল
ফুলড়ি

ফুলা
ফুলান
ফুলারি
ফুস
ফুসফুস
ফুসফুসি
ফুসল্
ফুসলান
ফুসলানি
ফুক্
ফুঁকন
ফুঁকা
ফুঁকান
ফুঁপ্
ফুঁপান
ফুঁপি
ফেন
ফেনফেন
ফেনফেনিআ
ফেনা
ফেফে
ফের
ফেরত
ফেরা
ফেরান
ফেরুআ
ফেল
ফেলফেল
ফেলফেলানি
ফেলা
ফেলান
ফেলানি

ফেলানেল
ফেসাত
ফেসাতিআ
ফৈজত
ফৈরাদ
ফৈরাদি
ফোকলা
ফোড়
ফোড়ন
ফোড়া
ফোস্কা
ফোঁটা
ফোঁড়
ফোঁপান
ফোঁপানি
ফোঁপানিআ
ফোঁস
ফোঁসফাঁস
ফোঁসান
ফৌজ
ফৌজদার
ফৌজদারি
ফৌত

ব
বআ
বআন
বআনি
বই
বইন

বইনঝি
বইনপো
বউ
বউনি
বউকাঁটকি
বএল
বক
বকনা
বকবক
বকম
বকরিদ
বকসি
বকসিস
বকা
বকান
বকাবকি
বকাল
বক্কেশ্বর
বখরা
বখরাদার
বখেড়া
বখিল
বগ
বগল
বগলস
বগনি
বগি
বগুনা
বচ
বজবজ
বজবজানি
বজবজিআ

বজ্জাত
বজ্জাতি
বটব্যাল
বটুআ
বটের
বড়
বড়বড়ানি
বড়সি
বড়া
বড়াই
বড়াল
বড়ি
বড়িআ
বণ্টন
বদ
বদনা
বদনাম
বদনামি
বদমাস
বদমাসি
বদমিজাজি
বদমিজাজ
বদল
বদলা
বদলাই
বদলান
বদলানি
বদলাবদলি
বদলি
বদিঅত
বনতি
বনবন

বনা
বনাজ
বনান
বনিয়াদ
বনিয়াদি
বনিবনাও
বন্ধান
বন্ধানি
বম
বমবম
বমা
বমি
বয়নামা
বয়বাত
বয়া
বয়ান
বরকন্দাজ
বরখাস্ত
বরগি
বরজ
বরন
বরফ
বরফি
বরবাদ
বরযাত্র
বরলা
বরস
বরসা
বরাত
বরাতি
বরাদ্দ
বরাদ্দি
বরাবর
বরাভরণ
বরামদ
বরামদি
বরামদিআ
বল
বলক
বলকা
বলগিঅত
বলদ
বলদিআ
বলবল
বলা
বলান
বলাবল
বলাবলি
বলিদান
বলিষ্ঠ
বস্
বসা
বসাক
বসান
বহ্
বহতা
বহা
বহান
বহানি
বহি
বহির্বাস
বহুগুনা
বহুত
বহুতর
বঁটি
বা
বাঅ
বাআ
বাআন্ন
বাই
বাউল
বাওআ
বাওআন
বাকড়
বাকড়া
বাকল
বাকস
বাক্স
বাখড়
বাখান
বাখানি
বাখারি
বাখুল
বাগ
বাগড়া
বাগা
বাগান
বাগাল
বাগালি
বাগি
বাগিচা
বাঘ
বাঘিনি
বাঙাল
বাঙালি
বাঙি
বাচ
বাচকানি
বাছ
বাছন
বাছনি
বাছা
বাছাগোছা
বাছান
বাছানি
বাছাবাছি
বাছুর
বাছুরি
বাজ
বাজন
বাজনদার
বাজনা
বাজা
বাজান
বাজাবেতা
বাজার
বাজি
বাজিগর
বাজিগরি
বাজু
বাজুবন্দ
বাজে
বাজোর
বাট
বাটখারা
বাটনা
বাটা
বাটান

বাটালি	বাধাই	বারদুআরি	বাঁউনিআ
বাটি	বান	বারিক	বাঁএন
বাটী	বানক	বারুই	বাঁক
বাড়	বানরিআ	বারুদ	বাঁকন
বাড়ন	বানা	বালা	বাঁকা
বাড়ন্ত	বানান	বালাই	বাঁকান
বাড়া	বানানি	বালাখানা	বাঁকি
বাড়ান	বানি	বালাগস্তি	বাঁখারি
বাড়াবাড়ি	বানিকর	বালাঞ্চি	বাঁচ
বাড়ি	বানেআ	বালাপোস	বাঁচন
বাড়ুই	বাপ	বালাভোলা	বাঁচা
বাত	বাপা	বালাম	বাঁচনি
বাতা	বাপান্ত	বালি	বাঁট
বাতাবি	বাপু	বালিস	বাঁটআ
বাতাস	বাব	বালুসাই	বাঁটআরা
বাতাসা	বাবত	বাস	বাঁটআরি
বাতি	বাবরসা	বাসন	বাঁটন
বাতিক	বাবলা	বাসর	বাঁটা
বাতিল	বাবা	বাসা	বাঁটান
বাতিলি	বাবাজি	বাসাড়িআ	বাঁটুল
বাদ	বাবু	বাসি	বাঁদ
বাদল	বাবুই	বাসিন্দা	বাঁদন
বাদলা	বাবুগিরি	বাহক	বাঁদনি
বাদলি	বামন	বাহা	বাঁদর
বাদলিআ	বামনা	বাহাদুর	বাঁদরামি
বাদা	বামনাই	বাহাদুরি	বাঁদা
বাদান	বামনি	বাহানা	বাঁদান
বাদাবাদি	বায়না	বাহির	বাঁদাবাঁদি
বাদাম	বার	বাহআ	বাঁদি
বাদামি	বারইআরি	বাঁ	বাঁধ
বাদুর	বারকস	বাঁআ	বাঁধন
বাধআ	বারতা	বাঁউনি	বাঁধনি

বাঁধা
বাঁধান
বাঁধাবাঁধি
বাঁধি
বাঁস
বাঁসমতি
বাঁসরি
বাঁসি
বিআ
বিআই
বিআইন
বিআড়া
বিউলি
বিক্
বিকন
বিকনি
বিকান
বিক্রী
বিখোড়
বিগড়্
বিগড়ন
বিগড়া
বিগড়ান
বিঘা
বিচ
বিচালি
বিচি
বিচিকিচ্ছি
বিছ্
বিচ্ছনি
বিছা
বিছান

বিছানা
বিছানি
বিচ্ছিরি
বিচ্ছু
বিজ্ বিজ্
বিজক
বিজাতক
বিজুত
বিজুলি
বিজোড়
বিটল
বিটলিআ
বিড়্
বিড়ন
বিড়নি
বিড়বিড়
বিড়বিড়ান
বিড়বিড়িআ
বিদল
বিদায়
বিন
বিনন
বিননি
বিনাট
বিনান
বিনানিআ
বিবি
বিম
বিমজ্জিম
বিমা
বিরানা
বিল

বিলন
বিলনি
বিলাত
বিলাতি
বিলান
বিলি
বিশ
বিশি
বিশে
বিসবিস
বিসবিসান
বিসবিসান
বিহন
বিহান
বিহিদানা
বুক
বুকবুক
বুকনি
বুকল
বুকবুক
বুচকি
বুজ
বুজন
বুজা
বুজান
বুজানি
বুঝ
বুঝা
বুঝান
বুট
বুটদার
বুড়

বুড়ন
বুড়া
বুড়ান
বুড়ানি
বুড়ি
বুড়িকসা
বুন্
বুনন
বুননি
বুনা
বুনাট
বুনান
বুনানি
বুয়ল
বুল্
বুলন
বুলবুল
বুলবুলি
বুলা
বুলান
বুলানি
বেঅকুব
বেঅকুবি
বেআইন
বেআইনি
বেআড়া
বেআন্দাজ
বেআন্দাজি
বেইজ্জত
বেইমান
বেইমানি
বেউড়

বেওআরিস
বেওআরিসী
বেকসুর
বেকার
বেকারি
বেগ
বেগম
বেগার
বেগারিআ
বেগুন
বেগুনিআ
বেঙ
বেঙাচি
বেচ্
বেচা
বেচান
বেচারা
বেচারি
বেচাল
বেজায়
বেজার
বেটা
বেটি
বেটুআ
বেঠিক
বেঠিকানা
বেড়
বেড়া
বেড়ান
বেড়ি
বেড়িআ
বেত

বেতর
বেতাইন
বেতাগ
বেতার
বেতাল
বেতালা
বেতি
বেথা
বেথাক
বেথাকিআ
বেথি
বেথিক
বেথুআ
বেদল
বেদানা
বেদিআ
বেদুআ
বেধড়ক
বেনা
বেনাম
বেনামি
বেনিআ
বেনুআ
বেন্নন
বেপরআ
বেপার
বেপারি
বেপোট
বেফাঁস
বেবসা
বেবসাদার
বেভার

বেভারিআ
বেমক্কা
বেমজলিসি
বেমনাসিব
বের
বেরঙ
বেরন
বেরান
বেরেআঁ
বেল
বেলআরি
বেলকার
বেলকুল
বেলমোক্কা
বেলসুঁটা
বেলা
বেলি
বেলিআ
বেলিক
বেলিকামি
বেলুন
বেস
বেসন
বেসর
বেসাত
বেসাতি
বেসি
বেসুআ
বেহাগ
বেহদ্দ
বেহান
বেহায়া

বেহারা
বেহাল
বেহুদা
বেঁঠিআ
বেঁধা
বেঁধান
বেঁসুআ
বৈকাল
বৈকালি
বৈকালিক
বৈঠক
বৈঠকখানা
বৈঠকি
বো
বোআল
বোকা
বোকামি
বোজা
বোজাই
বোঝ
বোঝা
বোঝাই
বোঝান
বোট
বোটকা
বোড়া
বোতল
বোতাম
বোদা
বোদাম
বোনা
বোনাট

বোনান
বোমা
বোমবেটিআ
বোরা
বোল
বোঁচা
বোঁচামি
বোঁটা
বৌ
বৌকাঁটকি
বৌনি

——

ভ

ভক
ভকভক
ভকত
ভকতি
ভগন্দর
ভড়
ভড়কান
ভড়ঙ
ভড়ভড়
ভনভন
ভনভনানি
ভয়সা
ভর্
ভরন
ভরতি
ভরম
ভরন্তর
ভরসা
ভরা
ভরাট
ভরাডুবি
ভরান
ভরাভর
ভরি
ভস
ভসকা
ভসকান
ভসকানি
ভসভস
ভসভসিআ
ভাই
ভাইজামাই
ভাইঝি
ভাগ
ভাগড়া
ভাগা
ভাগান
ভাগিনজামাই
ভাগিনবৌ
ভাগিনা
ভাঙ
ভাঙচুর
ভাঙন
ভাঙা
ভাঙান
ভাঙানি
ভাঙাভাঙি
ভাচা
ভাজ
ভাজন
ভাজনা
ভাজা
ভাজান
ভাজি
ভাট
ভাটা
ভাটি
ভাটিআরাখানা
ভাড়া
ভাত
ভাতা
ভাতার
ভাতুড়িআ
ভান
ভানা
ভানাকুটা
ভানান
ভানানি
ভাদুরিআ
ভাপ
ভাপা
ভাপান
ভাব
ভাবন
ভাবনি
ভাবা
ভাবান
ভাবান্তর
ভাবান্তরি
ভায়রাভাই
ভায়া
ভায়াদ
ভায়াদগিরি
ভায়াদি
ভার
ভারা
ভারান
ভারানি
ভারার্পণ
ভাল
ভালবাস্
ভালবাসা
ভালবাসাবাসি
ভালা
ভালাভালি
ভালুক
ভালুকী
ভাস্
ভাসা
ভাসান
ভাসুর
ভাঁটা
ভাঁড়
ভাঁড়ান
ভাঁড়াভাঁড়ি
ভাঁড়ামি
ভাঁড়ুই
ভিআন
ভিক
ভিকারি
ভিকন
ভিখারি
ভিজ্
ভিজা

ভিজান
ভিট
ভিটা
ভিড়
ভিড়ভিড়
ভিড়ান
ভিত
ভিতা
ভিতরবুদিআ
ভিতরি
ভিন
ভিয়ান
ভিরকুটি
ভুক
ভুকা
ভুক্তভোগী
ভুখ
ভুখা
ভুগ্
ভুগনি
ভুগা
ভুগান
ভুজা
ভুট
ভুটা
ভুড়ভুড়
ভুড়ভুড়নি
ভুন
ভুনা
ভুনান
ভুনি
ভুরা
ভুল
ভুলনি
ভুলা
ভুলান
ভুলুআ
ভুসা
ভুসি
ভুষুণ্ডি

———

ভুঁড়ি
ভুঁড়িআ
ভেউ
ভেউভেউ
ভেক
ভেকা
ভেকান
ভেকানি
ভেকুআ
ভেঙ
ভেঙচ্
ভেঙচন
ভেঙচনি
ভেঙচান
ভেঙভেঙ
ভেঙভেঙা
ভেঙভেঙানি
ভেঙভেঙিআ
ভেঙানি
ভেজ্
ভেজান
ভেজাল
ভেট
ভেটেরাখানা
ভেড়া
ভেড়ি
ভেড়িআ
ভেড়ুআ
ভেদ

———

ভেনভেন
ভেনভেনান
ভেনভেনানি
ভেনভেনিআ
ভেল
ভেলকি
ভেলভেল
ভেলভেলান
ভেলভিলিআ
ভেঁউট
ভেঁপু
ভোগা
ভোগান
ভোগানি
ভোচকা
ভোচকানি
ভোজ
ভোজনা
ভোজানি
ভোড়
ভোমা
ভোম্বল
ভোর
ভোলা
ভোঁক
ভোঁতা
ভোঁদড়
ভোঁসা

———

ম

মই
মউ
মউআ
মকাই
মক্কা
মগ
মগাই
মগজ
মগজি
মগন
মজকুর
মজপুত
মজা
মজাড়িআ
মজান
মজাদার
মজিল
মজুদ
মজুদি
মজুমদার
মজুর
মজুরি
মটকা
মটকি
মটমট
মটর

মড়ক
মড়কান
মড়কানি
মড়মড়
মড়মড়ানি
মড়মড়িআ
মড়া
মড়াঞ্চি
মড়াঞ্চিআ
মড়ামড়ি
মড়ুইপোড়া
মত
মতন
মতমত
মতলব
মতলববাজ
মতামত
মতামতি
মতান্তর
মতি
মতিচুর
মথ্
মথন
মথা
মথান
মদ
মদত
মদরসা
মদিঅন
মদুআ
মন
মনকসা

মনাকির
মনক্কা
মনস্থ
মনহরা
মনাকসা
মনাকসাকসি
মনা
মনাকাটা
মনান্তর
•মনান্তরি
মনাসিব
মনিব
মনিবানা
মনিবি
মন্দিরা
মম
মমজামা
মমঢাল
মমতা
মমত্ব
ময়দা
ময়দান
ময়না
ময়রা
ময়লা
মর্
মরকটিআ
মর্জি
মরদ
মরদানি
মরস্ত
মরা

মরাই
মরিআ
মরক
মল
মলঙ্গি
মলদ্বার
মলমল
মলা
মলান
মলাহিজা
মলিদা
মসগুর
মসলা
মসলাদার
মসহারা
মসা
মসান
মসাপির
মসারি
মসাল
মসালচি
মসিল
মস্ত
মস্তাকি
মস্তাজির
মহত্তরান
মহন্ত
মহল
মহলা
মহরম
মা
মাই

মাইনা
মাকড়
মাকড়সা
মাকড়া
মাকড়ি
মাকুন্দিআ
মাখ্
মাখন
মাখা
মাখান
মাখামাখি
মাখাল
মাগ
মাগন
মাগনা
মাগা
মাগি
মাগুর
মাগোঁসাই
মাঙ্গা
মাছ
মাছরাঙা
মাছি
মাছিতা
মাছিমড়িআ
মাছুআ
মাছুআনি
মাজ
মাজন
মাজা
মাজান
মাজি

মাজুম
মাজুমি
মাজুর
মাজুরি
মাজুল
মাজুলি
মাঝ
মাঝার
মাঝারি
মাট
মাটকড়াই
মাটামট
মাটা
মাটাতোলা
মাটাম
মাটি
মাঠ
মাঠত
মাঠা
মাঠাল
মাড়
মাড়ন
মাড়া
মাড়ামাড়ি
মাড়ি
মাত
মাতকাটা
মাতকাটান
মাতন
মাতনি
মাতব্বর
মাতব্বরি

মাতা
মাতান
মাতাল
মাতালামি
মাথট
মাথা
মাথাল
মাথি
মাথুর
মাদক
মাদল
মাদার
মাদি
মাছর
মান
মানআর
মানআরি
মানকচু
মানত
মানসিক
মানা
মানান
মানিক
মাপ
মাপা
মাপান
মাপানি
মামলা
মামলাবাজ
মামা
মামাত
মামাশ্বশুর

মামি
মামিশাশুড়ি
মামু
মামুল
মায়
মায়না
মার্
মারকা
মারকিন
মারকামারা
মারকুতুআ
মারকুনি
মারখেকুআ
মারগিজ
মারণ
মারপিট
মারফত্
মারা
মারান
মারানিআ
মারামারি
মারী
মাল
মালকোম
মালখানা
মালঞ্চ
মালসা
মালসাভোগ
মালসি
মালাকার
মালামাল
মালাবদল

মালিক
মালিকানা
মালিকি
মালিস
মালিসি
মালিনী
মালী
মালুম
মাস
মাসক
মাসকাবারি
মাসকিআ
মাসচটক
মাসতত
মাসতদারক
মাসা
মাসাস
মাসি
মাসিত
মাসুর
মাসুরি
মাহ
মাহিআনা
মাহিয়ত্
মাহুত
মিআ
মিআদ
মিআদি
মিআমি
মিছরি
মিছা
মিছামিছি

মিছিল
মিজাজ
মিট
মিটমিট
মিটমিটিআ
মিটা
মিটান
মিঠ
মিঠা
মিঠাই
মিঠান
মিড়মিড়
মিতবর
মিতা
মিনতি
মিনা
মিনাহ
মিরগেল
মিল্
মিলন
মিলা
মিলান
মিলাপ
মিস
মিসমিসিআ
মিসান
মিসাল
মিসি
মিহি
মিহিদানা
মুআ
মুই

মুখড়
মুখাহার
মুখস
মুগ
মুগা
মুগি
মুগুর
মুচ্লকা
মুচি
মুছ্
মুছলন্দ
মুছলম্
মুছা
মুছান
মুছি
মুচ্ছুদ্দি
মুট
মুটমুট
মুটরি
মুটিআ
মুঠা
মুঠি
মুঠুম
মুড়
মুড়ন
মুড়মুড়
মুড়মুড়িআ
মুড়া
মুড়ান
মুড়ি
মুত
মুতফরক্কা

মুতা
মুতান
মুথা
মুদম
মুদ্দাই
মুদ্দার
মুদ্দারফরাস
মুনফা
মুনসি
মুনসিআনা
মুনসিগিরি
মুনসেফ
মুনসেফি
মুনসিবি
মুনিস
মুরগি
মুরব্বি
মুরব্বিগিরি
মুরব্বিআনা
মুল
মুলন
মুলতবি
মুলতানি
মুলা
মুলান
মুলুক
মুলুকজোড়া
মুসব্বর
মুসলমান
মুসলমানি
মুসাবিদা
মুসুর

মুহরি
মুহুরি
মুহুরিআন
মুহুরিগিরি
মেক
মেকদার
মেকনি
মেচকফের
মেজ
মেজমেজিআ
মেজষ্টর
মেজষ্টরি
মেজাজ
মেজাজি
মেজাজঠাণ্ডা
মেজাম
মেজিষ্ট্রেট
মেজে
মেটে
মেটেনি
মেড়
মেড়া
মেড়ে
মেথর
মেথরগিরি
মেথরানি
মেথি
মেদা
মেদামারা
মেনা
মেম
মেয়ে

মেরামত
মেরামতি
মেরিনো
মেল
মেলবন্ধ
মেলবন্ধন
মেলা
মেলানি
মেস
মেসক
মেহনত
মেহনতি
মেহরবান
মেহরবানি
মৈ
মোআ
মোক্তার
মোক্তারনামা
মোক্তারি
মোকাম
মোকামি
মোচা
মোছা
মোজা
মোট
মোটা
মোড়
মোড়া
মোড়াই
মোড়ান
মোড়াসা
মোতি

মোতিহারি
মোনা
মোনাকাটা
মোনাসিব
মোফ্‌ত
মোম
মোমজামা
মোরগ
মোরব্বা
মোলাহিজা
মোসাফির
মোসাহেব
মোসাহেবি
মোহনভোগ
মোহর
মোহানা
মৌজা
মৌজাদার
মৌত
মৌতা

র

রআ
রকম
রকমওআরি
রগ
রগড়
রগড়া
রগড়ারগড়ি
রগড়ানি
রঙ
রঙওআলা
রঙচঙ
রঙচঙিআ
রঙদার
রঙন
রঙান
রঙিন
রঙিল
রঙুআ
রচ্‌
রচা
রচান
রট
রটনা
রটা
রটান
রটানিআ
রতন
রতি
রদ
রদা
রদি
রনকুআসা
রপ্‌ট
রপটন
রপটান
রপটানি
রপ্‌তানি
রপ্ত
রফা
রফিয়ত্‌
রবরবা
রবার
রবাহুত
রম
রমজান
রমারম
রলা
রস্‌
রসকরা
রসগোল্লা
রসবড়া
রসভরা
রসমরা
রসা
রসান
রসানিআ
রসাল
রসি
রসিদ
রসুই
রসুইআ
রসুন
রাই
রাইঅত
রাইঅতি
রাখ
রাখন
রাখা
রাখান
রাখারাখি
রাখাল
রাখালি
রাখি

রাগ
রাগত
রাগিনী
রাগী
রাঘব
রাঙ
রাঙচিতা
রাঙচাল
রাঙতা
রাঙা
রাঙান
রাঙানি
রাজ
রাজকর
রাজগদি
রাজঘরানা
রাজজোটক
রাজডঙ্কা
রাজতক্ত
রাজদূত
রাজদ্বার
রাজি
রাজিনামা
রাঢ়
রাঢ়িয়
রাতি
রাতিকানা
রাণী
রান্না
রান্নাঘর
রাসি
রাহা

রাহাগির
রাহাজানি
রাঁড়
রাঁড়ি
রাঁধ
রাঁধনি
রাঁধনিআ
রাঁধা
রাঁধান
রাঁধাবাড়া
রিকাবি
রিগিড়
রিগিড়িআ
রিঙ
রিজ্
রিজান
রিঠা
রিফু
রিফুগর
রিম
রিস
রিসারিসি
রিহাই
রুআ
রুআন
রুই
রুইদাস
রুকিকথ
রুখ্
রুখা
রুগনি
রুগি

রুচ্
রুচা
রুজি
রুটি
রুটিওআলা
রুনুঝুনু
রুনুরুনু
রুপদস্তা
রুপস
রুপসি
রুপা
রুমাল
রুমালি
রুল
রুলি
রুস্তন
রুস্তম
রেও
রেক
রেকাব
রেজকি
রেজা
রেড়ি
রেত
রেতি
রেয়ত
রেয়তি
রেয়ো
রেল
রেলওএ
রেলরোড
রেসবত

রেসবতখোর
রেসম
রেসমি
রেসারেসি
রেহাই
রেহাইখোদ্ব
রোআ
রোআন
রোআনি
রোক
রোখ
রোখা
রোখারোখি
রোখাল
রোগা
রোজ
রোজগার
রোজগারি
রোজনামা
রোজনামাজ
রোজা
রোজান
রোজানি
রোজানিআ
রোড়া
রোদ
রোয়দাদ
রোয়দাদি
রোল
রোলা
রোসনাই
রোঁ

রে'াআ
রে'াদ
——

ল
ল'ওআ
ল'ওআন
ল'ওজিমা
লক
লকলক
লকলকিআ
লগন
লগা
লগি
লঙ
লঙ্কা
লচপচিআ
লজ্জত
লটঘটি
লড়াই
লড়াক
লত
লতানিআ
লহর
লহরা
লহরান
লাই
লাউ
লাক
লাকপতি
লাগ
লাগা
লাগান
লাগানি
লাগাপাড়া
লাগাম
লাগাল
লাগালাগি
লাঙল
লাজ
লাজুক
লাট
লাটবন্দি
লাটিম
লাটুদার
লাঠালাঠি
লাঠি
লাঠিআল
লাঠিআলি
লাড়ু
লাথ
লাথি
লাথিখোর
লাফ
লাফান
লাফানি
লাফানিআ
লালচ
লালচি
লালচিআ
লালবন্দ
লালায়িত
লালমোহন
লালা
লাস
লাহুড়ি
লিচু
লুচি
লুচ্চা
লুচ্চামি
লুট
লুটতরাজ
লুটতরাজি
লুটপাট
লুড়ি
লেখা
লেখাপড়া
লেঠা
লেন
লেনদেন
লেপ
লেপা
লেপান
লেবু
লেস
লোআ
লোআচুর
লোকলৌকতা
লোকালয়
লোচ্চা
লোচ্চামি
লোটা
লোড়া
লোড়াত্তিআ
লোনা
লোগা
লোহাচুর
লৌকতা
লৌকিকতা
——

শ
শশব্যস্ত
——

স
সই
সইস
সওআ
সওআন
স'ওগাত
সওদা
সওদাগর
স'ওদাগরি
সকরকন্দ
সকাল
সখ
সঙ
সঙিন
সঙ্গে
সচ্ছল
সজনি
সজাগ
সজারু
সজিনা
সড়
সড়ক
সড়কিআ
সড়সড়

সড়সড়ান
সড়সড়ানি
সড়সড়ি
সড়সড়িআ
সড়ুঙ্গিআ
সতর
সতরই
সতরঞ্চ
সতরঞ্চি
সত্তর
সদর
সদরি
সদ্দার
সদ্দারি
সদালাপ
সন
সনন্দ
সনসন
সনসনানি
সনসনি
সনসনিআ
সনাক্ত
সঞ্চ
সন্দ
সন্দেস
সপ
সপন
সপনাদা
সপাসপ
সপিনা
সফর
সফেদ

সফেদা
সব
সবজি
সবলোট
সবা
সবুজ
সবুর
সমন
সমিন্ডারে
সয়তান
সয়তানি
সয়াল
সর
সরকার
সরকারি
সরদি
সরম
সরা
সরাই
সরান
সরাসর
সরাসরি
সরিক
সরিকানা
সরিকানি
সরিপ
সরিফা
সরিসা
সরু
সরুকুটিআ
সরুঙ্গিআ
সরেস

সল
সলন
সলা
সলি
সলুই
সসা
সসাজ
সসেমিরা
সস্তা
সহ
সহজ
সহর
সহরতলি
সহরিআ
সহা
সহান
সহি
সহিস
সংস্থা
সংস্থান
সঁপ
সঁপা
সাঅড়া
সাইত
সাউকর
সাউকুরি
সাউড়ি
সাএব
সাএবি
সাএর
সাকিম
সাগ

সাঙ
সাঙড়
সাঙড়া
সাঙড়ান
সাঙা
সাজ
সাজন্ত
সাজা
সাজান
সাজানি
সাজি
সাট
সাড়
সাড়া
সাড়ি
সাড়ু ভাই
সাড়ে
সাত
সাতচল্লিশ
সাতনর
সাতনরি
সাতনালা
সাতসট্টি
সাতা
সাতাইস
সাতাস
সাতান্ন
সাতাত্তর
সাতাশী
সাতানব্বই
সাতু
সাথ

সাথি
সাদা
সাদের
সাধ
সাধা
সাধান
সধাসাধি
সাধে
সান
সানক
সানকি
সানা
সানাই
সানান
সাপ
সাপট
সাপুড়িআ
সাফ
সাফা
সাফাই
সাবর
সাবান
সাবালগ
সাবাস
সাবাসি
সাবু
সাবুদ
সাবুদানা
সাবেক
সামনে
সামল
সামলা

সামলান
সামাই
সামাল
সাম
সামুক
সায়
সায়ের
সার
সারকুড়
সারা
সারান
সারানি
সারাল
সারি
সারিন্দা
সাল
সালতামামি
সালন
সালা
সালাজ
সালি
সালিআনা
সালিক
সালিপতি
সালিপো
সালু
সালুক
সাস
সাসা
সাসান
সাসানি
সাসি

সাসুড়ি
সাসুড়িআ
সাহা
সাহেব
সাহেবগিরি
সাহেবি
সাঁইত্রিশ
সাঁক
সাঁকআলু
সাঁকার
সাঁকারা
সাঁকারান
সাঁখ
সাঁখচুন্নি
সাঁখা
সাঁখারি
সাঁচা
সাঁচি
সাঁঝ
সাঁঝান
সাঁঝুতি
সাঁড়
সাঁড়াসি
সাঁতল
সাঁতলন
সাঁতলা
সাঁতলান
সাঁপি
সাঁস
সাঁসাল
সিআ
সিআখত

সিআখতি
সিআন
সিআনা
সিআমত্তি
সিআল
সিউ
সিউনি
সিউর
সিউরা
সিউরান
সিউলি
সিকড়
সিকড়িআ
সিকল
সিকলদার
সিকলি
সিকা
সিকার
সিকারি
সিকি
সিকিম
সিখ
সিখা
সিখান
সিঙ
সিঙাড়া
সিঙার
সিঙি
সিজ
সিজান
সিজিল
সিডসিড়

সিড়সিড়ান	সীতাভোগ	সুধরা	সুসুক
সিড়সিড়ানি	সুঅর	সুধরান	সুঁট
সিড়ি	সুআ	সুধান	সুঁটি
সিধা	সুআন	সুধু	সুঁড়
সিন্ধুক	সুআর	সুন্নি	সুঁড়ি
সিপ	সুক	সুপারি	সুঁদরি
সিপি	সুকড়	সুপারিস	সে
সিম	সুকন	সুপারিসি	সেই
সিমানা	সুকনি	সুবচনি	সেউ
সিমুল	সুকরুখা	সুবদান	সেক
সিয়া	সুকা	সুবা	সেকরা
সিয়াখত	সুকান	সুবাদার	সেকরানি
সিয়াখতি	সুক্তা	সুবাদারি	সেকা
সির	সুক্তানি	সুবাস	সেকাইত
সিরখারা	সুগড়	সুম	সেকাইতি
সিরপা	সুঙ	সুমর	সেকান
সিরপেঁচ	সুঙল	সুমরণ	সেখ
সিল	সুজ	সুমরা	সেখা
সিলন	সুজা	সুমরান	সেখান
সিলাই	সুজি	সুরকি	সেগুন
সিলান	সুড়ঙ্গ	সুরখ	সেঙা
সিস	সুড়ি	সুরট	সেঙাত
সিসা	সুত	সুরতি	সেঙাতনি
সিসি	সুতলি	সুরথাল	সেজ
সিসু	সুতা	সুরব	সেজতুলানি
সিহর	সুতার	সুল	সেজা
সিহরন	সুদ	সুলন	সেজান
সিহরা	সুদখোর	সুলি	সেট
সিহরান	সুদি	সুলুপ	সেটারা
সিঁধ	সুদ্দ	সুসঙ্গ	সেতখানা
সিঁধিআল	সুধ	সুসাত	সেতার
সিঁধিআলি	সুধর	সুসার	সেতারি

সেদ
সেন
সের
সেরা
সেল
সেলাই
সেলাখানা
সেলাম
সেহা
সেঁকুআ
সেঁকুল
সেঁত
সেঁতসেঁতিআ
সেঁতা
সেঁতান
সোআ
সোআগ
সোআগা
সোআগি
সোআগিআ
সোআন
সোআনিআ
সোআর
সোআরি
সোথ
সোদ
সোদরা
সোদরান
সোনা
সোনান
সোনানি
সোর
সোল
সোলুই
সোসর
সোহাগ
সোহাগা
সোহাগি
সোহাগিআ
সোহাগিনি
সোঁতা
সোঁদা
সোঁদাল

হ

হক্‌
হকদার
হকনাহক
হকিঅত
হকিআতি
হক্কিকত
হকুক
হঙ্গাম
হঙ্গামিআ
হজরত
হজুর
হট
হটহট
হটা
হটান
হড়
হড়হড়
হড়হড়ানি
হড়হড়ি
হড়হাড়িআ
হদ্দ
হনহন
হনহনিআ
হন্দর

* * *

ভ্রম সংশোধন।

৭৩ পৃষ্ঠে তৃতীয় পংক্তিতে "হকারান্ত" স্থলে "হকারাদি" হইবে।—পঃ পঃ সঃ

সত্যদেব-সংহিতা।

(দ্বিজ-রামভদ্র-রচিত)

ভূমিতে করিয়া নতি বন্দ দেব গণপতি
বিঘ্ননাশ শিবের নন্দন।
দ্বিতীয়ে বন্দিব রবি, জবাপুষ্প জিনি ছবি
একচক্র রথে আরোহণ।
বন্দ দেব নারায়ণ, খগপতি আরোহণ
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
চতুর্থে বন্দিব হর, ভস্মভূষা দিগম্বর
ভালে ইন্দু শিরে সুরেশ্বরী॥
পঞ্চমে পূজিতা মাতা, প্রণমামি শৈল-সুতা
মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী।
সঙ্গে গুহ গণপতি, বন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী
দশভুজা কেশরি-বাহিনী॥
কলিতে কলুষভাঙ্গা, বন্দ ভাগীরথী গঙ্গা
নীলাচল তীর্থ বারাণসী॥
যতেক দেবতাবৃন্দ বন্দিয়া পদারবিন্দ
আনন্দে গোবিন্দলীলা ভাসি॥
যুগে যুগে অবতরি, অবনির ভার হরি
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামনে।
হলধর নরহরি, চরণ বন্দনা করি
জামদগ্ন্য ক্ষত্রিয়নিধনে॥
বন্দ দুর্ব্বাদলশ্যাম, জানকী সহিত রাম
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।
যাঁর কীর্ত্তি সেতুবন্ধ, বিনাশিতে দশস্কন্ধ
বুদ্ধ কল্কি করিয়া বন্দন॥
বন্দ কৃষ্ণ অবতার, পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার
বৃন্দাবনবিপিনবিহারী।
যদুবংশ অবতংস, কংসাসুরে করি ধ্বংস
অংশরূপে সত্য অবতরি॥
নাহি যাগ যোগ তপ, ভূতশুদ্ধি ন্যাস জপ
নাহি পুরশ্চরণ বিধান।
ভুবনে বিদিত যশ, কেবল ভক্তির বশ
ভকত বৎসল ভগবান॥
তুমি সে গোলোকধাম, সত্যনারায়ণ নাম
ধরিলে পাতকী তরাইতে।
দেখি দীন হীন জনে, দয়া কর নিজগুণে
কেবা জানে মহিমা কহিতে॥
তুমি দেব দীনবন্ধু, পার কর ভবসিন্ধু
কর মোর দুঃখ বিমোচন।
স্মরণে যাঁহার নাম, লভে চতুর্ব্বর্গ কাম
তুমি সর্ব্ব জীবের জীবন॥
তোমাতে যাহার ভক্তি, সেই জন পায় মুক্তি
আমি মূঢ় কি বলিতে জানি।
সেবি তব পাদপদ্ম, বিরচিল রামভদ্র
বিতরহ বিরহ অবনি॥

অবধানে সভাজনে শুন এক চিতে।
সত্যনারায়ণ নাম হৈল যেই মতে॥
হস্তিনাপুরেতে পুর পাণ্ডব ভূপতি।
একদিন যুধিষ্ঠির গোবিন্দ সংহতি॥
বিরলে বসিয়া বহু করে আলাপন।
করপুটে যুধিষ্ঠির করে নিবেদন॥
কলিকাল আরম্ভ কম্পিত কলেবর।
কি হবে জীবের গতি কহ গদাধর॥
গোবিন্দ কহেন রাজা কহি যে বিস্তারি।
জীবের লাগিয়া যুগে যুগে অবতরি॥
লক্ষগুণ পুণ্য যদি করে সত্যযুগে।
ত্রেতায় অযুত গুণ হয় সমভাগে॥
দ্বাপরে সহস্র গুণ শতেক কলিতে।
* * * *
কলির আরম্ভ পঞ্চ সহস্র বৎসর।
অবতীর্ণ হব আমি অবন্তী নগর॥

আমার কৃপায় লোক হবে স্বর্গবাসী।
হরিনাম হুতাশন কলি তুলারাশি ॥
কলি শেষে এক বর্ণ হইবে যবন।
কল্কি অবতারে তাহা করিব নিধন ॥
এত শুনি আনন্দিত রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দ ভাবিয়ে স্বর্গে গেল সশরীর ॥
হেনকালে শুন কিছু অপূর্ব্ব কথন।
অবন্তী নগরে অবতীর্ণ নারায়ণ ॥
সত্যনারায়ণ নাম হইল ভুবনে।
দেশে দেশে প্রচার হইল দিনে দিনে ॥
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি সত্যনারায়ণ।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ অগ্রে দিল দরশন ॥
প্রতিদিন ভিক্ষা আশে ফিরয় ব্রাহ্মণ।
ডাকিয়া সুধান তারে সত্যনারায়ণ ॥
কহ দ্বিজ কোথাকারে করিছ গমন।
প্রণাম করিয়া দ্বিজ কহে বিবরণ ॥
অবন্তী নগরে বাস ফিরি ভিক্ষা আশে।
দরিদ্র করিল বিধি পূর্ব্বকর্ম্মদোষে ॥
ভিক্ষা করি প্রতিদিন ফিরি দ্বারে দ্বারে।
সন্ধ্যাকালে দেড় সের লয়ে যাই ঘরে ॥
দোঁহার দু সের ভক্ষ্য দেড় সের মিলে ॥
ক্ষুধায় অন্তর মোর প্রতিদিন জ্বলে ॥
ইহা শুনি সত্যদেব হৈল কৃপাবান।
করিব তোমার দ্বিজ দুঃখ অবসান ॥
আমি সত্যনারায়ণ শুন দ্বিজবর।
আমাকে পূজিলে হয় সম্পদ বিস্তর ॥
নাহি লাগে ধন কড়ি নাহি যাগ যোগ।
পুষ্প জলে কর পূজা যথাশক্তি ভোগ ॥
নিবেদন করে দ্বিজ ধরিবে চরণে।
তুমি সত্যনারায়ণ জানিব কেমনে ॥
কৃপা করি নিজরূপ ধর মহাশয়।
তবে সে আমার মনে হইবে প্রত্যয় ॥
নিজরূপ ধরিলেন দেব নারায়ণ।
পূর্ব্বজন্ম তপোবলে দেখিল ব্রাহ্মণ ॥
বিরিঞ্চি বাসব ভব ভাবেন ধেয়ানে।
সেবেন নারদ আদি অতুল চরণে ॥
দ্বিজের ভাগ্যের কথা না যায় কথনে।
কমলাসেবিত পদ দেখিল নয়নে ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজ রূপ।
পরিধান পীতবাস গলায় কৌস্তুভ ॥
কিরীটী মুকুট মাথে শিখিপুচ্ছ চূড়ে।
মকরন্দ লোভে কত মধুকর উড়ে ॥
অলকা তিলকা ভালে শোভে শশিকলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা ॥
জিনি ইন্দীবর নয়ন ভুরুধনু।
কোটী চন্দ্র ছটা কিবা নবঘন তনু ॥
কলধৌত মুকুতা খচিত মরকতে।
অঙ্গের ভূষণ শোভা ধরে নানা মতে ॥
* * * *
নখরনিকর নিন্দা করে হিমকরে ॥
বাম পাশে কমলা গরুড় আরোহণ।
সম্মুখে করয়ে স্তুতি দেবঋষিগণ ॥
দ্বিতীয় গোলোকধাম হৈল সেই স্থানে।
অচেতন হয়ে দ্বিজ পড়িল চরণে ॥
পদরজ দিয়ে তারে করেন চেতন।
পূর্ব্বের সন্ন্যাসী বেশ হলেন তখন ॥
বিস্ময় হইয়ে দ্বিজ ধরিল চরণে।
কৃপা কর দীনবন্ধু অকিঞ্চন জনে ॥
আমি অতি পাতকী দুর্গতি দুরাচার।
কোন পুণ্য দেখি দয়া কৈলে গদাধর ॥
কৃপা করি কন তারে সত্য নারায়ণ।
* * * *
কলিতে পাতকী জীব করিতে উদ্ধার।
সত্য নারায়ণ নাম করিনু প্রচার ॥
যাগ যোগ ক্রিয়াহীন হইবে কলিতে।
সংক্ষেপে পূজিবে আমা কহি তার মতে ॥
দীর্ঘ পীঠ শ্বেত বস্ত্র করি আচ্ছাদন।
পুষ্পমালা দিয়ে তাহা করিবে রচন ॥
রাখিবি গুবাক পান তার চতুর্ভিতে।
পুষ্প গন্ধ ধূপ দীপ দিবে নানা মতে ॥
সন্দেশ মিষ্টান্ন আদি নৈবেদ্য বিধান।
সোয়াই করিয়া দিবে দীর্ঘের প্রমাণ ॥

গোরস শর্করা আটা করিবে মিলন।
ডাকিয়া আনিবে যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥
শুনিবে আমার কথা পাঁচালি বচন।
কথা অন্তে সবে করে প্রসাদ ভক্ষণ॥
মানস করিয়া যেবা লইবে প্রসাদ।
তুল পূর্ণকাম (?) সিদ্ধি ঘুচিবে বিষাদ॥
ইহা কহি সত্যদেব হইল অদর্শন।
আনন্দে গেলেন দ্বিজ ভিক্ষার কারণ॥
সেই দিন ভিক্ষা দ্বিজ প্রচুর পাইল।
গৃহে আসি ব্রাহ্মণীকে সকলি কহিল॥
যে কিছু পাইয়াছিল অগ্রভাগ লয়ে।
পূজে সত্য নারায়ণ আনন্দিত হয়ে॥
যেমত বিধানে আজ্ঞা দিলেন নারায়ণ।
সেই মত সত্য পূজে দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
দিনে দিনে সম্পদ বাড়িল বহুতর।
সেই দেশে ব্রাহ্মণ হইল নৃপবর॥
হেন কালে শুন কিছু অপূর্ব্ব কথন।
কাষ্ঠ বেচিবারে আইল কাঠুরিয়াগণ॥
ভ্রমিতে তপন তাপে তৃষ্ণাযুক্ত হয়ে।
জল পান জন্য যায় দ্বিজের আলয়ে॥
অশ্বগজ পদাতিক সম্পদ দেখিল।
পূর্ব্ব দশা ভাবি তারা বিস্ময় হইল॥
সত্যনারায়ণ পূজা তথা করয়ে ব্রাহ্মণ।
জ্ঞান পেয়ে তারা সবে করিল মনন॥
আমরা কামনা করি পূজা এই মত।
দুঃখ দূর কর প্রভু ঘুচাও দুর্গতি॥
মানস করিয়া করে প্রসাদ ভক্ষণ।
কাষ্ঠ বেচিবারে তারা করিল গমন॥
সেই দিন কাষ্ঠে কড়ি চতুর্গুণ হয়।
পূজার সামগ্রী কিছু করিল সঞ্চয়॥
নিত্য সত্যদেব পূজা করে নদীতীরে।
কৃপা দৃষ্টে কাঠুরিয়ার গেল দুঃখ দূরে॥
নানা দিবা নদী তীরে পূজে নানা মতে।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর যায় সেই পথে॥
ধনেশ্বর নাম সাধু গৌড়েতে বসতি।
পাঁচালির ফল শুনি কৈল অবস্থিতি॥
জিজ্ঞাসিল সদাগর কাঠুরিয়া স্থানে।
কার পূজা কর ভাই কহ বিবরণে॥
কাঠুরিয়া বলে সাধু কহি যে বিশেষ।
সত্যনারায়ণ পূজে দুঃখ হইল শেষ॥
সাধু বলে আমার নাহিক কোন দুঃখ।
সবে মাত্র নাহি দেখি হে পুত্রের মুখ॥
কিবা পুত্র কিবা কন্যা এক যদি হয়।
সহস্র তঙ্কার ভোগ দিব ত নিশ্চয়॥
কামনা করিয়া সাধু প্রসাদ লইল।
ত্বরায় তরণী বেয়ে দেশে উত্তরিল॥
জন্মিল নন্দিনী তার নারায়ণের বরে।
বিবাহ দিলেন চন্দ্রকেতু সদাগরে॥
অল্প কালে তার বিয়োগ পিতা মাতা।
পুত্র ভাবে রাখিল গৃহে সাধু সে জামাতা।
নিজ দেশে কতক দিন থাকি সদাগর।
বাণিজ্য করিতে গেল সুরত বন্দর॥
সত্যনারায়ণ পূজা হইল বিস্মৃত।
না যায় খণ্ডন দুঃখ দৈবের ঘটিত॥
দ্বিজ রামভদ্র বলে ভাবি ভগবান।
আপনার দোষে দুঃখ পাইল অজ্ঞান॥

সাজে সপ্ত তরি, নানা দ্রব্য ভরি
সাধু ধনেশ্বর যায়।
জামাতা সংহতি, বাহি ভাগীরথী
নদনদী সিন্ধু বায়॥
সুরত বন্দর, আইল সদাগর
আগে ভেটে নৃপমণি।
রাজ ভেট দিয়া, সাক্ষাৎ করিয়া
তথা করে বিকি কিনি॥
হীরা লাল চুনি, চন্দ্রকান্ত মণি
প্রবাল পরশশিলা।
রজত কাঞ্চন, চামর চন্দন
শঙ্খ মুকুতার মালা॥
গজমতি কিনি, পূরিল তরণি
বস্ত্র কেনে কুতুহলী।

আসমানি ভুষি, নানাবর্ণ মুশি
খাসা মলমল চেলি।
রাজরাণী ভুনি, সোণালি উড়ানি
রেশমি পশমি জুরি।
মালদহি চিরে, সেতুবন্ধ ডুরে
সফেদ পামরি বারি॥
ছিট গুজরাটী, বক্ষবি কর্ণাটী
জোড় ধুতি কৃষ্ণ চেলি।
চাকুলে বনাত, ভোট সকনাত
হাজিবেকা ধনেখালি॥
সাহল পামরি, পেষ পোষ জরি
বালা বন্ধ আতলসি।
অগোর আতর, লবঙ্গ কপূর
শম্বরস শিলারসি॥
অশ্ব নানা রঙ্গ, কিনিল তুরঙ্গ
তুরকি টাঙ্গন তাজি।
ইহা মহ হাল, মুস্কি মোজে চাল
নীল আবলখা বাজী।
বাণিজ্য করিয়া, বিদায় হইয়া
আইল সাধু রাজস্থানে।
রাজার মন্দিরে, চোরে চুরি করে
সেই দ্রব্য সাধু কিনে॥
ডাকিয়া কোটালে, কহে মহীপালে
আপন কুশল চাও।
রজনী সময়, চোরে দ্রব্য নয়
সেই চোরে ধরি দেও॥
নৃপতি আদেশে, ফিরিয়ে তল্লাশে
হেনকালে সত্যদেবে।
ভিক্ষুকের ছলে, কহেন কোটালে
সাধু ধর দ্রব্য পাবে।
এই বেটা চোর, নহে সদাগর
শুনিয়া কোটাল ধায়।
রাজকন্যাহার, সাধু জামাতার
গলায় দেখিতে পায়॥
তরণির দড়া, খুলি পিছমোড়া
বাঁধিলেক সদাগরে।
জিনিষ সহিতে, মারিতে মারিতে
রাজার সাক্ষাৎ করে॥
আদেশিল লোকে, তুলিল পলকে
মারয়ে চাবুক ছড়ি।
নাহিক বিচার, করে মার মার
সবে করে বেড়াগুড়ি॥
দুই সদাগরে, র'খে কারাগারে
নিগড় জেহাল দিয়ে।
বান্দিয়া কাণ্ডারী, লোটে সপ্ত তরি,
ভাণ্ডারে রাখিল নিয়ে॥
দ্বাদশ বৎসর, বন্দী সদাগর,
বার্ত্তা নাহি গেল ঘরে।
সাধুর বসতি, গৌড় পোড়ে তথি
অগ্নিদাহে ছারখারে॥
সাধুর বনিতা, সহিত দুহিতা,
দিনপাত নাহি হয়।
সাধুর নন্দিনী, রাখিয়া জননী,
ভ্রমিতে নগরে যায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, অতি দুঃখচিতে,
যায় নগরের মাঝে।
ভিক্ষা আসে যায়, দেখিবারে পায়,
লোকে সত্যদেব পূজে॥
আপনার কথা, পাঁচালিতে গাঁথা,
শুনিল জ্ঞান হৈল তার।
করিল মানস, পিতা পতি দেশ
আইলে শুধিব ধার॥
জননীর পাশে, কহিল বিশেষে,
সেব সত্যনারায়ণে।
পুষ্প গন্ধ দিয়া, নৈবেদ্য করিয়া,
পূজা করে প্রতিদিনে॥
ভক্তির কারণ, সত্যনারায়ণ,
সদয় হইল তারে।
সুরত ভূপালে, স্বপ্ন নিশাকালে,
দেখাইল ভয়ঙ্করে॥
আমার কিঙ্কর, দুই সদাগর,
বন্দী রাখ কি কারণে।

প্রাণ রক্ষা চাও, তারে ছাড়ি দাও,
সপ্ত তরি পূরি ধনে ॥
হৈল চমৎকার, সুরত রাজার
পাত্র সনে বিচারিয়া ।
সদাগরে আনি, কহে স্তুতি বাণী,
বসন ভূষণ দিয়ে ॥
সাধু কহে বাণী, শুন নৃপমণি,
দুঃখ পাই দৈবদোষে ।
রাজা সপ্ত তরি, ধনে দিল পূরি,
বিদায় হইল দেশে ॥
আসি নদীতীরে, দুই সদাগরে
রন্ধন ভোজন করে ।
ভাসাইল তরি, বাহ বাহ করি
সঘনে দামামা মারে ॥
সাধুকে ছলিতে, সত্যদেব পথে
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি,
কহেন ডাকিয়া, কি যাও লইয়া
কিছু দেহ ভিক্ষা করি ॥
সাধু কহে কথা, আছে লতাপাতা
শুনিয়া ব্রাহ্মণ রোষে ।
ভাব সিদ্ধ বলে, পথমধ্যে জলে
পতলা হইয়া তরি ভাসে ॥
নৌকার উপর, দেখে সদাগর,
ভরিয়াছে লতাপাতা ।
না দেখিয়া ধন হৈল অচেতন
সাধু করে অঙ্গ ক্ষতি ॥
জলে ঝাপ দিল, তাহে চড়াইল
কপালে আঘাত হানে ।
ব্রাহ্মণের বাক্য, হইল প্রত্যক্ষ
কি কাজ এছার প্রাণে ॥
সাধু চন্দ্রকেতু, কহে হিতহেতু
বিষাদ ভাবিহ কেনে ।
যথা সেই জন, করহ গমন
হত্যা দেহ সেই স্থানে ॥
যুক্তি করি সার, বাহিয়া পাথার
গেলেন ব্রাহ্মণ পাশে ।
চরণে ধরিয়া, কাঁদেন পড়িয়া
ক্ষম অপরাধ দাসে ॥
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি
দয়া কর নিজ গুণে ।
মোরে কর দয়া, দিয়ে পদছায়া
এই ভক্তিহীন জনে ॥
শুনি ভগবান, হৈল কৃপাবান
কহিছেন ধনেশ্বরে ।
আমা না ভজিয়া, বন্দী ছিলে গিয়া
দ্বাদশ বৎসর তরে ॥
অপত্য কারণ, ধরিলে মানন
নৈবেদ্য সহস্র তঙ্কা ।
ধনের বিহ্বলে, আমা পাসরিলে
তাহে নাই কোন শঙ্কা ॥
আমি নিরঞ্জন, সত্যনারায়ণ
অন্য না ভাবিহ মনে ।
কহিয়া কারণ, হৈল অদর্শন
তরণী পূরিল ধনে ।
সহস্র সুবর্ণ, তোরা করি পূর্ণ
রাখিল পূজার তরে ।
আনন্দিত হয়ে, রাত্রদিন বেয়ে
গেলেন গৌড় নগরে ॥
সাধুর নন্দিনী, সহিত জননী,
সত্যদেব পূজা করে ॥
প্রসাদ বাঁটিতে, শুনে আচম্বিতে
প্রাণেশ্বর আইল ঘরে ॥
সাধুর দুহিতা, হইয়া বিস্মিতা
ভূমিতে প্রসাদ ফেলে ।
আনন্দিত চিতে, জননী সহিতে
ডিঙ্গা বরিবারে চলে ॥
সত্যনারায়ণ, সক্রোধিত মন
চন্দ্রকেতু সদাগরে ।
তরণী সহিতে, ডুবিল জলেতে
লোকে হাহাকার করে ॥
জামাতার শোকে, শেল হানে বুকে
ডুবিয়া মরিতে চায় ।

সাধুর রমণী, সহিত নন্দিনী
ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
তিন জন মেলি, করি গলাগলি
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ।
রামভদ্র ভনে, প্রসাদ কারণে
বিড়ম্বিল মুরহরে ॥
হরি হরি কাঁদে রামা সাধুর কুমারী ।
মোরে বিড়ম্বিল বিধি, হারাইনু প্রাণনিধি
অকারণে পাপপ্রাণ ধরি ॥
না জানি কি কৈনু পাপ, কেবা দিল ব্রহ্মশাপ
বিবাদ সাধিল কোন দেবে ।
পতিব্রতা বিনা পতি, অন্য নাহি তার গতি
মোরে নাথ সংহতি করিবে ॥
আচম্বিতে বজ্রাঘাত, হারাইনু প্রাণনাথ
বিধবার জীবন বিফল ।
কহে পিতামাতা আগে, অভাগিনী বিদায় মাগে
কুণ্ড কাটি জ্বালহ অনল ॥
যথা গেল প্রাণনাথ, সেই স্থানে যাব সাত
কোন সাজে রহিব ভুবনে ।
নিশ্চয় সাধুর সুতা, হইবেক অনুমৃতা
হেনকালে দৈববাণী শুনে ॥
পতির আনন্দে ভুলি, প্রসাদ ভূমিতে ফেলি
এখন হতেছ অনুমৃতা ।
পতির জীবন চাও, প্রসাদ তুলিয়া খাও
সত্য বটে বলে সাধুসুতা ॥
মুক্তকেশী হয়ে ধায়, প্রসাদ তুলিয়া খায়
লইলেক মৃত্তিকা সহিতে ।
সত্যদেব কৃপা হেতু, উঠিলেন চন্দ্রকেতু
তরণি সহিত আচম্বিতে ॥
সদাগর কুতূহলে, জামাতা করিল কোলে
জয়ধ্বনি দিতেছে অঙ্গনা ।
আম্র রম্ভা সারি সারি, ঘটে শঙ্খপূর্ণ বারি
করে নানা মঙ্গল রচনা ॥
বসন ভূষণদানে, তুষিল কাণ্ডারিগণে
পূজা কৈল সকল তরণি ।
আরম্ভিল নৃত্যগীত, বাজে বাদ্য সুললিত
হরষিত সাধুর রমণি ॥
আনন্দে পূরিল মন, করে নানা বিতরণ
পঞ্চ শব্দে বাজয়ে বাজনা ।
শকটে পুরিয়া ধন, নিল নিজ নিকেতন
পূর্ণ হৈল মনের কামনা ॥
বাজে কত শঙ্খ জোড়া, মৃদঙ্গ মাদল কাড়া
সিঙ্গা ডম্বুর ভম্বুর ঝাঁঝরি ।
থমক ঠমক ধ্বনি সানাই সুরস শুনি
গান করে মঙ্গল গুঞ্জরি ॥
ভাঙ্গিয়া সহস্র স্বর্ণ, মিষ্টান্ন করিয়ে পূর্ণ
সত্যদেব পূজা সন্ধ্যাকালে ।
জিলাপি মিঠাই চিনি, মিছিরি নবাত ফেনি
কদ রম্ভা লাড়ু গঙ্গাজলে ॥
বাতাসা বঁদিয়া পেড়া, নারিকেল জোড়া জোড়া
আম্ররম্ভা কদলি পনসে ।
আনিলেক দ্রব্য যত, বর্ণনা করিব কত
তাম্বুল গুবাক অবশেষে ॥
আরতি মঙ্গল ঘটে, বস্ত্র আচ্ছাদিয়ে পীঠে
পাঁচালি পড়ায়ে দ্বিজবরে ।
প্রসাদ ব্রাহ্মণ খায়, শেষে সাধু স্বর্গে যায়
পুস্তক সমাপ্ত এত দূরে ॥
যে জন একথা শুনে, সর্ব্বদুঃখ বিমোচনে
অন্ন কষ্ট দরিদ্রতা নাশে ।
রাজ্যভ্রষ্ট রাজা লভে, রামভদ্র এই ভাবে
সত্যদেবসংহিতা প্রকাশে ॥

হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন ।
হরির চরণে মন রাখ অনুক্ষণ ॥

(সমাপ্ত)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

অষ্টম ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত।

(সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

প্রবন্ধ আরম্ভে বলা আবশ্যক, যে সকল বাঙলা শব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্ত্তমান কালে কলিকাতা ছাড়া বাঙলা দেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।

আজ পর্য্যন্ত বাঙলা অভিধান বাহির হয় নাই; সুতরাং বাঙলা শব্দের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার দোষ এই যে, স্মৃতি অনেক সময় অযাচিত অনুগ্রহ করে, কিন্তু প্রার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রবন্ধে পদে পদে অসম্পূর্ণতা থাকিবে। আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধীসাধারণের উপর।

আমার পক্ষে সঙ্কোচের আর একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশতঃ বাঙলা শব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাঙলার দুটা একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হই নাই। এ প্রবন্ধে পাঠকেরা আনাড়ির পরিচয় পাইবেন, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ক্রটি দেখিতে পাইবেন না। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে, আশা করিয়াই সাহিত্য-পরিষদে এই বাঙলা ভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা বাঙলা ব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞাতসারে পাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নূতন পরিভাষা নির্ম্মাণের ক্ষমতা নাই, অথচ না করিলেও লেখা অসম্ভব।

এইখানে একটা পরিভাষার কথা বলি। সংস্কৃত ব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে,

বাঙলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসঙ্গত হয়। কারণ সংস্কৃত ভাষায় ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়; বাঙলায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোন অর্থ নাই। অতএব অন্য ভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়।

ণিজন্তের প্রকৃতি কি? তাহাতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত দুইটি কর্ত্তা থাকে। "ফল পাড়িলাম;"—পতন ব্যাপারের অব্যবহিত কর্ত্তা ফল, কিন্তু তাহার হেতুকর্ত্তা আমি। "কারয়তি যঃ স হেতুঃ"—যে করায় সেই হেতু, সেই ণিজন্ত ধাতুর প্রথম কর্ত্তা, এবং যাহার উপর সেই কার্য্যের ফল হয়, সেই ণিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় কর্ত্তা। "হেতু"র একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত,—তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম।

বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত বাঙলা এবং কোন্‌গুলি সংস্কৃত, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাকে সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাঙলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেই জন্য তাহা সংস্কৃত পূর্ব্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোন অবস্থাতেই দাগিন্ হয় না। বাঙলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, কিন্তু তাহা শতৃপ্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদিরূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

যে সকল প্রত্যয়ের বাঙলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাঙলা প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত রঞ্জিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু বাঙলায় ত প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই, সেইজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না; অতএব ত প্রত্যয় বাঙলা প্রত্যয় নহে।

হিন্দি পারসী প্রভৃতি হইতে বাঙলায় যে সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমার ঐ একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবতঃ হিন্দি বা পারসি,—কিন্তু বাঙলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া টঁ্যাক্‌সই, প্রমাণসই, মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ওয়ান প্রত্যয় সেরূপ নহে। গাড়োয়ান, দরোয়ান, পালোয়ান শব্দ আমরা হিন্দী হইতে বাঙলায় পাইয়াছি, প্রত্যয়টি পাই নাই।

অর্থাৎ যে সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দ-সহযোগে বাঙলায় আসিয়াছে, বাঙলার সহিত কোন প্রকার আদান প্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাঙলা ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।

যে সকল কৃৎতদ্ধিতের সাহায্যে বাঙলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ থাকিবে; ক্রিয়াপদসম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা,—চলা, বলা, সাঁৎরান, বাঁচান ইত্যাদি। পদার্থ-

বাচক যথা,—হাতি ঘোড়া জিনিসপত্র ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন হয় নাই।

অ প্রত্যয়।

এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়। যথা, কট্‌মট্‌ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইয়া কটমট (কটমট ভাষা, কটমট দৃষ্টি)। টল্‌মল্‌ হইতে টলমল।*

আসন্ন প্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে বিশেষণ হয়, তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা পড়্‌ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্‌ধাতু হইতে পাক-পাক, মর্‌ধাতু হইতে মর-মর, কাঁদ্‌ধাতু হইতে কাঁদ-কাঁদ। অন্য অর্থে হয় না, যথা—কাটাকাটা (কথা), পাকা-পাকা, ছাড়াছাড়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাঙলা ব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাঙলায় বিশেষণপদ হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খ স বাঙলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে। বাঙলা উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে ভাল শব্দ ভাল্‌ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা অকারান্ত উচ্চারণ করি।† বস্তুতঃ বাঙলায় অকারান্ত শব্দ বিশেষ্যে অতি অল্পই দেখা যায়; অধিকাংশই বিশেষণে। যথা, বড়, ছোট, মাঝ (মাঝো, মেঝো), ভাল, কাল, খাট (ক্ষুদ্র), জড় (পুঞ্জীকৃত), ইত্যাদি।

বাকী অনেকগুলা বিশেষণই আকারান্ত; যথা, কাঁচা, পাকা, বাঁকা, তেড়া, সোজা, সিধা, শাদা, মোটা, নুলা, বোবা, কালা, ন্যাড়া, কানা, তিতা, মিঠা, উঁচা, বোকা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়।

পূর্ব্বোক্ত আকারান্ত বিশেষণগুলিকে আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া অনুমান করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাঙলায় বিশেষণ হইবার সময় কানা হইল, মৃত হইতে মড়া হইল, মহৎ হইতে মোটা হইল, সিত হইতে শাদা হইল। এই আকারগুলি উচ্চারণের নিয়মে আপনি আসে নাই। বিশেষণে হলন্ত প্রয়োগ বর্জ্জন করিবার একটা চেষ্টা বাঙলায় আছে বলিয়াই যেখানে সহজে অন্য কোন স্বরবর্ণ জোটাইতে পারে নাই, সেই সকল স্থলে আ প্রত্যয় যোগ করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার "স্বার্থে ক" বাঙলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘোটক,

---

* দ্রষ্টব্য এই যে ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতে সর্ব্বত্র এ নিয়ম খাটে না। যথা আমরা টক-টক লাল, বা খট-খট রৌদ্র, বা টন-টন ব্যথা বলি না; সেস্থলে টক্‌টকে খট্‌খটে টন্‌টনে বলিয়া থাকি। কট্‌মট্‌ টল্‌মল্‌, জ্বল্‌জ্বল্‌, শব্দ হইতে বিকল্পে, কটমট, কট্‌মটে; টলমল, টল্‌মলে; জ্বলজ্বল, জ্বল্‌জ্বলে হইয়া থাকে।

† বাঙলা অ অনেকস্থলেই হ্রস্ব ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি যত, উচ্চারণ করি যতো, লিখি বড়, উচ্চারণ করি বড়ো। উড়িয়ার বড় বাঙালীর বড়র সহিত তুলনা করিলে দুই অকারের প্রভেদ বুঝা যাইবে।

ঘোড়া ; মস্তক, মাথা ; পিষ্টক, পিঠা ; কণ্টক, কাঁটা ; চিপিটক, চিড়া ; গোপালক, গোয়ালা ; কুল্যক, কুলা।

বাঙলায় অনেক শব্দ আছে যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই। যেমন তক্ত, তক্তা ; বাঘ বাঘা ; পাট, পাটা ; ল্যাজ, ল্যাজা ; চোঙ, চোঙা ; চাঁদ, চাঁদা ; পাত, পাতা ; ভাই, ভাইয়া (ভায়া) ; বাপ, বাপা ; থাল, থালা ; কালো, কালা ; তল, তলা ; ছাগল, ছাগ্‌লা ; বাদল, বাদ্‌লা ; পাগল, পাগ্‌লা ; বামন, বাম্‌না ; বেল (ফুল), বেলা ; ইলিষ, ইল্‌ষা (ইল্‌ষে)।

এই আ প্রত্যয়যোগে অনেকস্থলে অবজ্ঞা বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করে। বিশেষতঃ মানুষের নামসম্বন্ধে। যথা, রাম, রামা ; শাম, শামা ; হরি, হরে (হরিয়া) ; মধু, মোধো (মধুয়া) ; ফটিক, ফট্‌কে (ফট্‌কিয়া)।

দ্রষ্টব্য এই যে, সকল নামে আ প্রত্যয় হয় না ; যাদবকে যাদ্‌বা, মাধবকে মাধ্‌বা বলেনা। শ্রীশ, প্রিয়, পরাণ প্রভৃতিও এইরূপ। বাঙলা নামের বিকার সম্বন্ধে কোন পাঠক আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে আনন্দিত হইব।

স্বার্থে আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া গেছে, তাহাতে অর্থের পরিবর্ত্তন হয় না। আবার, আ প্রত্যয়ে অর্থের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে, এমন উদাহরণও আছে। যেমন, হাত হইতে হাতা (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা, অর্থাৎ হাতের মত পদার্থ) ; ঠ্যাঙ হইতে ঠ্যাঙা (ঠ্যাঙের ন্যায় পদার্থ) ; ভাত হইতে ভাতা (খোরাকী) ; বাস হইতে বাসা ; ধোব হইতে ধোবা ; চাষ হইতে চাষা।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়। বাঁধ্‌ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া বাঁধা ; ঝর্‌ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ঝরা। ইহারা বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ, যেমন বাঁধা হাত ; বিশেষ্য, যেমন হাত-বাঁধা।

দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ monosyllabic ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে। যেমন, ধর্‌ মার্‌ চল্‌ বল্‌ হইতে ধরা মারা চলা বলা। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না। যেমন আঁচড় হইতে আঁচ্‌ড়া, আছাড় হইতে আছ্‌ড়া হয় না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিশেষণরূপে হইতে পারে। যেমন থ্যাৎলা মাংস, কোঁক্‌ড়া চুল। বাগ-আঁচ্‌ড়া গাছ, নেই-আঁক্‌ড়া লোক, (ন্যায়-আঁক্‌ড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল। আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দুই একটি মনে পড়িতেছে ;—তাওয়া (যাহাতে রুটিতে তা দেওয়া যায়) ; দাওয়া (দাবী, অর্থাৎ দাও বলিবার অধিকার) ; আছ্‌ড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে)।

বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা, তেলবিশিষ্ট তেলা ; বেতালবিশিষ্ট

বেতালা ; বেসুরবিশিষ্ট বেসুরা ; জলময় জলা ; নুন্ বিশিষ্ট নোনা (লবণাক্ত) ; আলো-কিত আলা ; রোগযুক্ত রোগা ; মলযুক্ত ময়লা ; চালযুক্ত চালা (ঘর) ; মাটিযুক্ত মাটিয়া (মেটে) ; বালিযুক্ত বালিয়া (বেলে) ; দাড়ি যুক্ত দাড়িয়া (দেড়ে)।

বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয় ; যথা, হাঁড়া (ক্ষুদ্র, হাঁড়ি) ; নোড়া (লোষ্ট্র হইতে ; ক্ষুদ্র, নুড়ি)।

আন্ প্রত্যয়।

আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত। যোগান্, চাপান্, চালান্, জানান্, হেলান্, ঠেসান্, মানান্।

এগুলি ছাড়া একপ্রকার বিশেষ পদবিন্যাসে এই আন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। ঠকা হইতে ঠকান্ শব্দ বাঙলায় সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আমরা বলি, ভারি ঠকান্ ঠকেছি, অথবা, কি ঠকান্টাই• ঠকিয়েছে। সেইরূপ, "কি পিটোন্টাই পিটিয়েছে," "কি চলান্টাই চলিয়েছে" এরূপ বিস্ময়সূচক পদবিন্যাসের বাহিরে "পিটান্" "চলান্" ব্যবহার হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পদার্থবাচকের দৃষ্টান্তও আছে ; যথা, বানান্, উঠান্, উনান্, উজান্ (ঊর্দ্ধ=উঝ+আন্), ঢালান্ (জলের), মাচান্ (মঞ্চ)।

আন্+অ প্রত্যয়।

আন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ অ প্রত্যয় করিয়া বাংলায় অনেকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, একমাত্রিক ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়াবাচক দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সিদ্ধ হয় ; যেমন ধরা মারা ইত্যাদি।

বহুমাত্রিকে আ প্রত্যয় না হইয়া আন্ ও তদুত্তরে অ প্রত্যয় হয়। যেমন চুল্কান (উচ্চারণ চুল্কানো), কাম্ড়ান (কাম্ড়ানো), ছট্ফটান (ছট্ফটানো) ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত নৈমিত্তিক ক্রিয়াকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত করিতে আন্+অ প্রত্যয়ের ব্যবহৃত হয়। যেমন, করা শব্দ হইতে নৈমিত্তিক অর্থে করান, বলা হইতে নৈমিত্তিক অর্থে বলান।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন, পড়া হইতে নৈমি-ত্তিক পাড়া ; চলা হইতে চালা ; গলা হইতে গালা ; নড়া হইতে নাড়া ; জ্বলা হইতে জ্বালা ; মরা হইতে মারা ; বহা হইতে বাহা ; জরা হইতে জারা।

কিন্তু পড়া হইতে পড়ান, নড়া হইতে নড়ান, চলা হইতে চলান, ইহাও হয়। এমন কি, নৈমিত্তিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ চালা, নাড়া, পাড়া প্রভৃতির উত্তর পুনশ্চ আন্+অ যোগ করিয়া চালান, পাড়ান, নাড়ান হইয়া থাকে।

কিন্তু তাকান, গড়ান (বিছানায়), আঁচান প্রভৃতি অনৈমিত্তিক শব্দ সম্বন্ধে কি বুঝিতে হইবে ? তাকা, গড়া, আঁচা হইল না কেন ?

তাহার কারণ, এইগুলির মূল ধাতু একমাত্রিক নহে। "দেখ্" একমাত্রিক ধাতু, তাহা

হইতে "দেখা" হইয়াছে; কিন্তু তাকান শব্দের মূল ধাতুটি তাক্ নহে, তাহা তাকা—সেই জন্যই উক্ত ধাতুকে বিশেষ্য করিতে আন্+অ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। নাম-ধাতুগুলিও আন্+অ প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে, যেমন লাথ্ হইতে লাথান, পিঠ্ হইতে পিঠান (পিটোনো), হাত হইতে হাতান।

মূলধাতু বহুমাত্রিক কিনা, তাহা পরীক্ষার অন্য উপায় আছে। অনুজ্ঞায় আমরা "দেখ্" ধাতুর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "দেখো," কিন্তু "তাকো" বলিনা; "তাকা" ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "তাকাও"। গঠন কর বলিতে হইলে গড়্ ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "গড়," কিন্তু "শয়ন কর" বুঝাইতে হইলে "গড়া" ধাতুর উত্তর "ও" প্রত্যয় করিয়া বলি "গড়াও"।

আমাদের বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি আকারান্ত, সেইজন্য পুনশ্চ তাহার উত্তর "আ" প্রত্যয় না হইয়া আন্+অ প্রত্যয় হয়। মূল শব্দটি "আট্কা" বা চম্কা না হইলে অনুজ্ঞায় "আট্কাও" হইত না, "চম্কাও" হইত না। হিন্দিতে "পাক্‌ড়্" শব্দের উত্তর "ও" প্রত্যয় হইয়া "পাক্‌ড়ো" হয়; সেই শব্দই বাঙলায় "পাক্‌ড়া" রূপ ধরিয়া "পাক্‌ড়াও" হইয়া দাঁড়ায়।

অন্ প্রত্যয়।

দৃষ্টান্ত—মাতন্, চলন্, কাঁদন্, গড়ন্ (গঠন ক্রিয়া), ইত্যাদি। ইহারা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ।

অন্ প্রত্যয়সিদ্ধ পদার্থবাচক শব্দের উদাহরণও মনে পড়ে:—যেমন, ঝাড়ন্, বেলুন্ (রুটি বেলিবার), মাজন্, গড়ন্ (শরীরের), ফোড়ন্, ঝোঁটন্ (ঝুঁটি হইতে); পাঁচন্।

অন্+আ প্রত্যয়।

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ আ প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন পাওন্ হইতে পাওনা, দেওন্ হইতে দেনা; ইহারা বিকল্পে বিশেষ্যও হয়; ফেলন্ হইতে ফেল্‌না; মাগন্ হইতে মাগ্‌না, শুকন্ হইতে শুক্‌না।

পদার্থবাচক বিশেষ্যেরও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন, বাট্‌না, কুট্‌না, ওড়্‌না, ঝর্‌না, খেল্‌না, বিছানা, বাজ্‌না, ঢাক্‌না।

ই প্রত্যয়।

ধর্ম্ম ও ব্যবসায় অর্থে:—গোলাপি, বেগুনি, চালাকি, চাক্‌রি, চুরি, ডাক্তারি, মোক্তারি, ব্যারিষ্টারি, মাষ্টারি। খাড়াই (খাড়া পদার্থের ধর্ম্ম); লম্বাই; চৌড়াই; ঠাণ্ডাই; আড়ি আড় অর্থাৎ বক্র হইবার ভাব।

অনুকরণ অর্থে:—সাহেবি, নবাবি।

দক্ষ অর্থে—হিসাবদক্ষ হিসাবি, আলাপদক্ষ আলাপি, ধ্রুপদদক্ষ ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে—দামবিশিষ্ট দামি, দাগবিশিষ্ট দাগি, রাগবিশিষ্ট রাগি, ভারবিশিষ্ট ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে—হাঁড়ি, পুঁটলি, কাঠি। (ইহাদের বৃহৎ হাঁড়া, পোঁটলা, কাঠ)।

দেশীয় অর্থে—মারাঠি, গুজরাটি, আসামি, পাটনাই, বস্‌রাই।

স্বার্থে—হাস, হাঁসি; ফাঁস ফাঁসি; লাথ, লাথি; পাড় (পুকুরের), পাড়ি। কড়া, কড়াই (কটাহ)।

দিননির্দ্দেশ অর্থে—পাঁচই, ছউই, সাতই, আটই, নওই, দশই, এইরূপে আঠারই পর্য্যন্ত

আ+ই প্রত্যয়।

ক্রিয়াবাচক,——বাছাই, যাচাই, দলাই মলাই (ঘোড়াকে), খোদাই, ঢালাই, ধোলাই, ঢোলাই, বাঁধাই, পালটাই।

পদার্থবাচক—মড়াই (ধানের), বালাই (বালকের অকল্যাণ), মিঠাই।

মনুষ্যের নাম—বলাই, কানাই, নিতাই, জগাই, মাধাই।

ধর্ম্ম। বড়াই (বড়ত্ব); বামনাই; পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম্ম)।

ই+আ।

জাল শব্দ ই প্রত্যয় যোগে জালি. স্বার্থে আ=জালিয়া (জেলে)। এইরূপ কোঁদলিয়া (কুঁদুলে), জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে), গোবরিয়া (গুবরে), স্যাঁৎস্যাঁতিয়া (স্যাঁৎসেতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়।

চালু (চলনশীল), ঢালু (ঢালবিশিষ্ট), নীচু (নিম্নগামী), কলু (ঘানিকলবিশিষ্ট), গাড়ু (গাগর শব্দ হইতে গাগরু), আগু পিছু (অগ্রবর্ত্তী পশ্চাদ্বর্ত্তী।

মানুষের নাম—যাদব হইতে যাদু, কালা হইতে কালু, শিব হইতে শিবু, পাঁচকড়ি হইতে পাঁচু।

উ+আ প্রত্যয়।

বিশিষ্টঅর্থে। যথা—জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো), জাঁকুয়া (জেঁকো), বাতুয়া (বেতো)। পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে। মাছুয়া (মেছো), বুনুয়া (বুনো), ঘরুয়া (ঘোরো), মাঠুয়া (মেঠো)।

নির্ম্মিত অর্থে। কাঠুয়া (কেঠো), ধানুয়া (ধেনো)।

আ+ও প্রত্যয়।

ঘেরাও, চড়াও, উধাও, ফেলাও (ফলাও)।

ও+আ প্রত্যয়।

বাঁচোয়া, ঘরোয়া, চড়োয়া, ধরোয়া, আগোয়া।

অন্+ই প্রত্যয়।

মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় কেবল একমাত্রিক ধাতুতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন ধর্ হইতে ধর্‌না (ধন্না), কাঁদ্ হইতে কাঁদ্‌না (কান্না)। কিন্তু বহুমাত্রিক শব্দের উত্তর এরূপ হয় না। আমরা কামড়ানা, কটকটানা

বলিনা, তাহার স্থলে কামড়ানি, কটকটানি বলিয়া থাকি। অর্থাৎ অন প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় না করিয়া ই প্রত্যয় করিয়া থাকি।

"অন্" প্রত্যয়ের উত্তর "ই" প্রত্যয় একমাত্রিকেও হয়। যথা, মাতনি (মাতুনি), বাঁধনি (বাঁধুনি), জ্বলনি (জ্বলুনি), কাঁপনি (কাঁপুনি), দাপনি (দাপুনি), আঁটনি (আঁটুনি)।

মূল ধাতুটি হলন্ত কিম্বা আকারান্ত, তাহা এই অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে জানা যাইতে পারে। তাকনি না হইয়া তাকানি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে মূল ধাতুটি তাকা। এই রূপ আছড়া, চট্‌কা, কাম্‌ড়া ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয় ভাব ব্যক্ত করে। যথা, বকুনি, ধমকানি, চমকানি, হাঁপানি, শাসানি, টাটানি, নাকানি চোবানি, কাঁদুনি, জ্বলুনি, কাঁপুনি, ফোঁস্‌লানি, ফোঁপানি, গেঙানি, ঘ্যাঙানি, খ্যাচ্‌কানি, কোঁচ্‌কানি (ভুরু), বাঁকানি (মুখ), খিঁচুনি (দাঁত), খ্যাঁকানি, ঘস্‌ড়ানি, ঘুরুনি (চোখ), চাপুনি, চেঁচানি, ভ্যাঙানি (মুখ), রগড়ানি, রাঙানি (চোখ), লাফানি, ঝাঁপানি।

ব্যতিক্রম—বাঁধুনি (কথার), শুনানি, দুলুনি, বুনুনি (কাপড় বা ধান), বাছনি (বাছাই)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে যেগুলি অসুখব্যঞ্জক, তাহার উত্তরেই অন্+ই প্রত্যয় হয়। যথা—দব্‌দবানি, ঝন্‌ঝনানি, কন্‌কনানি, টন্‌টনানি, ছটফটানি, কুট্‌কুটুনি ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার কয়েকটি পদার্থবাচক বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয়। দৃষ্টান্ত—ছাঁকনি, নিড়নি, চালুনি, বিননি (চুলের), চাট্‌নি, ছাউনি, নিছনি, তলানি (তরল-পদার্থের তলায় যাহা জমে)।

ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ ঃ—রাঁধুনি (ব্রাহ্মণ), ঘুম-পাড়ানি, পাট-পচানি ইত্যাদি।

না প্রত্যয়।

না প্রত্যয় যোগে বর্ণের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। পাখা, পাখনা; জাব (গরুর) জাবনা; ফাতা (ছিপের) ফাৎনা; ছোট ছোটনা (ধান)।

আনা।

বাবুয়ানা, সাহেবিয়ানা, নবাবিয়ানা, মুন্সিয়ানা। ই প্রত্যয় করিয়া হিঁদুয়ানি।

ল্ প্রত্যয়।

ছাগল, পুতুল, কাঁকুড়োল (কাঁকুড় হইতে), হাবল, খাবল, পাগল (পাকল, পাক অর্থাৎ ঘূর্ণাবিশিষ্ট), হাতল, মাতাল (মত্ত হইতে মাতা)।

র্ প্রত্যয়।

বাঙলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায়। যথা গজ্‌গজ্

হইতে গজর্ গজর্, বক্‌বক্ হইতে বকর্ বকর্, নড়্‌বড়্ হইতে নড়র্ বড়র্, কট্‌মট্ হইতে কটর মটর, ঘ্যান্‌ঘ্যান্ হইতে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুট্‌কুট্ হইতে কুটুর্ কুটুর্।

আল্ প্রত্যয়।

দয়াল্, কাঙাল্ (কাঙ্‌ক্ষালু), বাচাল্। লাঠিয়াল্। আড়াল্। মিশাল্।

ল্+আ।

মেঘলা, বাদ্‌লা, পাতলা, শামলা, আধলা, ছ্যাৎলা, একলা, দোকলা, চাকলা।

ল্+ই+আ।

দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে), আগ্‌লিয়া (আগলে), পাছলিয়া (পাছ্‌লে), ছুট্‌লিয়া (ছুট্‌লে)।

আড়্।

জোগাড়, লাগাড়্ (নাগাড়্), সাবাড়, লেজুড়, খেলোয়াড়, উজাড়।

আড়্+ই+আ।

বাসাড়িয়া (বাসাড়ে), জোগাড়িয়া (জোগাড়ে), মজাড়িয়া (মজাড়ে), হাতাড়িয়া (হাতুড়ে, যে হাতড়াইয়া বেড়ায়)। কাঠুরে, হাটুরে, ঘেসুড়ে, ফাঁসুড়ে, চাষাড়ে।

রা ও ড়া।

টুকরা, চাপড়া, ঝাঁকড়া, পেটরা, চামড়া, ছোকরা, গাঁঠরা, ফোঁপরা, ছিবড়া, থাবড়া, বাগড়া, খাগড়া।

বহু অর্থে। রাজারাজড়া, গাছগাছড়া, কাঠকাঠরা।

আরি।

জুয়ারি, কাঁসারি, চুনারি, পূজারি, ভিখারি।

আরু।

সজারু (শল্যবিশিষ্ট জন্তু); লাফারু (কোন কোন প্রদেশে খরগসকে বলে); দাবাড়ু (দাবা খেলায় মত্ত)।

ক্।

মড়ক্, চড়ক্, মোড়ক্, বৈঠক্, চটক্, ঝলক্, চমক, আটক।

আক্, উক্, ইক্।

এই সকল প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়ার বিশেষণগুলি হয়, তাহাতে দ্রুতবেগ বুঝায়। যথা :—
ফুড়ুক্, তিড়িক্, তড়াক্, চিড়িক্, ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক্+আ।

মট্‌কা, বোঁচ্‌কা, হাল্‌কা, বোঁট্‌কা, হোঁৎকা, উচক্কা। ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় করিয়া মট্‌কি, বুঁচ্‌কি ইত্যাদি হয়।

ক্+ই+আ।

শুট্কিয়া, (শুট্কে), পুঁট্কিয়া (পুট্কে), পুঁচ্কিয়া (পুঁচ্কে), ফচ্কিয়া (ফচ্কে), ছোট্কিয়া (ছুট্কে)।

উক্।

মিথ্যাক্, লাজুক্, মিশুক্।

গির্+ই।

গির্ প্রত্যয়টি বাঙলায় চলে নাই। তাগাদ্গির প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশী। কিন্তু এই গির্ প্রত্যয়ের সহিত ই প্রত্যয় মিশিয়া গিরি প্রত্যয় বাঙলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।

ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্ব্বত্র হয় না। কামারের ব্যবসায়কে কেহ কামারি বলে না, বলে কামারগিরি। এই গির্+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়। ডাক্তারগিরি, মোক্তার-গিরি, অ্যাটর্ণীগিরি, স্যাকরাগিরি, মুর্চিগিরি, মুটেগিরি।

অনুকরণ অর্থেঃ—বাবুগিরি, নবাবগিরি।

দার।

দোকানদার্, চৌকিদার্, রংদার্, বুটিদার্, জেল্লাদার্, ঝাচনদার্, চড়নদার্ ইত্যাদি। ইহার সহিত ই প্রত্যয় যুক্ত হইয়া দোকানদারি ইত্যাদি বৃত্তিবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি হয়।

দান্।

বাতিদান্, পিকদান্, শামাদান্, আতরদান্। স্বার্থে ই প্রত্যয় যোগে বাতিদানি, পিক-দানি, আতরদানি হইয়া থাকে।

সই।

হাতসই, মাপসই, প্রমাণসই, মানানসই, ট্যাঁকসই।

পনা।

বুড়াপনা, ন্যাকাপানা, ছিব্লেপনা, গিন্নিপনা।

ওলা বা ওয়ালা।

কাপড়ওয়ালা, ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর।

এমনতর, যেমন্তর, কেমনতর।

অৎ।

মানৎ, বসৎ, ঘুরৎ, ফেরৎ, গলৎ (গলদ্)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয়ে দ্রুতবেগ বুঝায়; সড়াৎ, ফুড়ুৎ, পটাৎ, খটাৎ।

অৎ+আ।

ধর্তা, ফের্তা, পড়্তা, জান্তা (সবজান্তা)।

তা।

বিশিষ্ট অর্থেঃ—যথা পান্‌তা, নোন্‌তা। তল্‌তা (তরল্‌তা, তরল বাঁশ)। আওতা, নাম্‌তা শব্দের বুৎপত্তি বুঝা যায়।

অৎ+ই।

ফির্‌তি, চল্‌তি, উঠ্‌তি, বাড়্‌তি, পড়্‌তি, চুক্‌তি, ঘাঁট্‌তি, গুন্‌তি।

অৎ+আ+ই।

খোলতাই। ধরতাই।

অন্ত।

জিয়ন্ত, ফুটন্ত, চলন্ত।

মন্ত।

লক্ষ্মীমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, আক্কেলমন্ত।

অন্‌দা (?)

বাসন্দা (অধিবাসী)। মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন)। বলা উচিত এ প্রত্যয়টির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই।

ট্‌।

চাপট্‌ (চৌচাপট্‌), সাপট্‌, ঝাপট্‌, দাপট্‌।

ট্‌+ই।

চিম্‌টি।

ট্ট।

ভরট্ট। (নদীভরট্ট, খালভরট্ট জমি)

আ+ট।

জমাট্‌, ভরাট্‌, ঘেরাট্‌।

টা।

চ্যাপ্‌টা, ল্যাঙ্‌টা, ঝাপ্‌টা, ল্যাপ্‌টা, চিম্‌টা, শুক্‌টা।

আট্‌+ই+আ।

রোগাটিয়া (রোগাটে), বোকাটিয়া (বোকাটে), তামাটিয়া (তামাটে), ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে), ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে), বামন্‌টিয়া (বেঁটে)।

অং, আং, ইং।

ভড়ং, ভুজং, ভাজাং, চোং (নল), খোলাং (খোলাং কুচি), তিড়িং। বড়াং (কোন কোন প্রদেশে অহঙ্কার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে)।

অঙ্গ, অঙ্গি, অঙ্গিয়া ।

সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গি, সুড়ুঙ্গে, কুলঙ্গি, খিঙ্গি, খেড়েঙ্গে, বিরিঙ্গি (বৃহৎ পরিবারকে কোন কোন প্রদেশে "বিরিঙ্গি গুষ্টি" বলে) ।

চ, চা, চি, ।

আলগচ (আল্গা ভাব), ল্যাংচা (খোঁড়ার ভাব), ভ্যাংচা (ব্যঙ্গের ভাব)। ভাংচি, খিম্চি, ঘামাচি। ত্যাড়্চা (তির্য্যক্ ভাব)। আধার অর্থেঃ—ধূনচি, ধূপচি, খুঞ্চি, চিলিম্চি, খাতাঞ্চি, মসাল্চি।

ক্ষুদ্র অর্থে—ব্যাঙাচি, নলচি (হুঁকার), কঞ্চি, কুচি। মোচা (কলার মোচা ; মুকুলচা হইতে মোচা, মোচার ক্ষুদ্র মুচি) ।

অস্ ।

খোলস্, মুখস্, তাড়স্, চ্যাপস্ ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়ে স্থূলতা ও ভার বুঝায়, ধপ্ হইতে ধপাস্। ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, ধড়াস্ করিয়া পড়া—অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া পড়া। খট্ এবং খটাস্, পট্ এবং পটাস্ শব্দের সূক্ষ্ম অর্থভেদ নির্দ্দেশ করিতে গেলে পাঠকদের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করি ।

সা ।

চোপ্সা, গোম্সা, ঝাপ্সা, ভাপ্সা, চিম্সা, পান্সা, ফেন্সা, এক্সা, খোল্সা, মাকড়্সা, কাল্সা ।

সা+ইয়া ।

ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে)। লাল্চে সম্ভবতঃ লাল্সে কথার বিকার। কাল্সিটে= (কাল্+সা+ইয়া+টা=কাল্সিয়াটা, কাল্সিটে)।

আম প্রত্যয় ।

অনুকরণ অর্থেঃ—বুড়াম, ছেলেম, পাগ্লাম, জ্যাঠাম, বাঁদ্রাম ।

ভাব অর্থে :—মাৎলাম, ঢিলেম, আল্সেম ।

আম+ই ।

বুড়ামি, মাৎলামি ইত্যাদি ।

স্ত্রীলিঙ্গে ই ।

ছুঁড়ি, ছুক্রি, বেটি, খুড়ি, মাসি, পিসি, দিদি, পাঁঠি, ভেড়ি, বুড়ি, বাম্নি ।

স্ত্রীলিঙ্গে নি ।

কলুনি, তেলিনি, গয়লানি, বাঘিনি, মালিনি, ধোবানি, নাপতিনি, কামার্নি, চামার্নি, পুরুতনি, মেতরানি, তাঁতনি, ঠাকুরানি, চাক্রানি, উড়েনি, কায়েতনি, খোট্টানি, মুসলমান্নি, জেলেনি ।

বাঙলা কৃৎতদ্ধিত আমার যতগুলি মনে পড়িল লিখিলাম। নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে; সে গুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, ততই কাজে লাগিবে।

প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করাও বাকি রহিল। এ সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার হর্ণ্‌লে রচিত Comparative Grammar of the Gaudian Languages পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন।

প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়াছেন, প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায়; তাহারা কেন যে কয়েটিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জ্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মন্ত প্রত্যয় কেনই বা "আক্কেল" শব্দকে আশ্রয় করিয়া "আক্কেলমন্ত" হইবে, অথচ "চালাকি" শব্দের সহযোগে "চালাকিমন্ত" হইতে পারিল না, তাহা কে বলিবে? "নি" যোগে বহুতর বাঙলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—কামারনি খোট্টানি ইত্যাদি; কিন্তু বদ্যিনি (বৈদ্যস্ত্রী) কেহত বলেনা;—উড়েনি বলে, কিন্তু পঞ্জাবিনি বা শিখিনি বা মগিনি বলেনা। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুর্‌নি বেড়াল্‌নি হয় না। প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়: পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঁঠি হয়; মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য।

কোন্ প্রত্যয় যোগে শব্দের কি প্রকার রূপান্তর হয় তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া লেখা আবশ্যক। নিতান্তই সময়াভাববশতঃ আমি সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রয়োগ করিলে হয় দেড়ে; টোল্ শব্দের উত্তর উ+আ প্রত্যয় করিলে হয় টুলো; মধু শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় মোধো; লুন্ শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় লোনা; জল্ শব্দের উত্তর অন্+ই প্রত্যয় করিলে হয় জলুনি, কোঁদল শব্দের উত্তর ই+আ প্রত্যয় করিলে হয় কুঁদুলে।

কতকগুলি প্রত্যয় আমি আনুমানিক ভাবে দিয়াছি। সেগুলিকে প্রত্যয় বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু শব্দ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রমাণ করিতে পারি নাই। যেমন, অং-প্রত্যয়। ভুজং ভড়ং প্রভৃতি শব্দের অং বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা বাঙলায় চলিত নাই। ভড়্ শব্দ নাই বটে, কিন্তু ভড়্কা আছে, ভড়ং এবং ভড়কের অর্থসাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, ভড়্ বলিয়া একটা আদি শব্দ ছিল, তাহার উত্তরে অক্ করিয়া ভড়ক্ ও অং করিয়া ভড়ং হইয়াছে। বড়াং শব্দে এই মত সমর্থন করিবে। আমার কালনা প্রদেশীয় বন্ধুগণ বলেন, তাঁহারা বড়াই শব্দের স্থলে বড়াং শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন; তাহাতে বুঝা যায়, বড় শব্দের উত্তর যেমন আ+ই প্রত্যয় করিয়া বড়াই হই-

য়াছে, তেমনি আং প্রত্যয় করিয়া বড়াং হইয়াছে—মূল শব্দটি বড়, প্রত্যয় দুইটি আই ও আং।

প্রত্যয়গুলি কি ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহাও বিচারের দ্বারা ক্রমশঃ স্থির হইতে পারিবে। যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ—বর্জ্জিত, সা প্রত্যয়টি স্+আ, অথবা সা, এ সমস্ত নির্ণয় করিবার ভার ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতদের উপর নিক্ষেপ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ।

(সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত)

আয়ুর্ব্বেদভাণ্ডারে চরক এবং সুশ্রুত এই দুই বিশাল গ্রন্থ দুইটী অমূল্য রত্ন। বহুকাল হইতে এই দুই রত্ন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু এখনও ইহাদের প্রভা মলিন হয় নাই। উভয় গ্রন্থে শারীর তত্ত্ব, রোগের নিদান, ভৈষজ্য তত্ত্ব, রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবৃত্তি, ধাত্রীবিদ্যা, প্রভৃতির মূলতত্ত্ব যথাসাধ্য আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞানলিপ্সু স্বাধীনচেতা ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনার যে পথ আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা যদি অবাধে চলিতে পারিত, তবে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞানোন্নতির এরূপ অবস্থা হইত না।

চরক সার্ব্বাঙ্গিক চিকিৎসার এবং সুশ্রুত শারীর তত্ত্বের * যে সমস্ত মূল সূত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী চিকিৎসকগণ যদি স্বাধীনভাবে তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষে চিকিৎসা শাস্ত্রের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইতে পারিত। দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীন চিন্তাস্রোত এবং অনুসন্ধানপ্রিয়তা এই দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া গেল।

চরক সুশ্রুতের চিকিৎসা ও শারীর তত্ত্ব বর্ণনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে চরক সুশ্রুত কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, যথাসম্ভব তাহারই আলোচনা করা যাইবে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকায় এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া একরূপ অসম্ভব। তথাপি পরবর্ত্তী শাস্ত্রাদির অলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে যতদুর অগ্রসর হওয়া যায়, তজ্জন্য চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম নহে।

তাম্রশাসন ও তিব্বতের ইতিহাস দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে চরক সুশ্রুতের টীকাকার এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ সংগ্রহকার মহামতি চক্রপাণি দত্ত খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে

* শারীরে সুশ্রুতঃ প্রোক্তশ্চরকস্তু চিকিৎসিতে।

বিদ্যমান ছিলেন। * সুতরাং ঐ সময়ে যে চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

চক্রদত্তের সংগ্রহ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৃন্দকৃত সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে† ; এই চিকিৎসক্রম মাধবকরকর্ত্তৃক সংগৃহীত নিদানের ক্রমানুসারে লিখিত হইয়াছে। নিদান গ্রন্থে যেরূপ প্রথমতঃ জ্বরনিদান, তৎপরে অতিসার ও অন্যান্য রোগের নিদান বিবৃত হইয়াছে, বৃন্দসংগ্রহেও সেইরূপ অগ্রে জ্বরের, পশ্চাৎ অতিসার ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়া অতি সহজে জনসমাজে প্রচারিত হয়। কিন্তু যে সময়ে পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া বা অন্য দ্বারা লেখাইয়া পাঠ করিতে হইত, তখন এক একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইতে যে সময় লাগিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতেপারে। সুতরাং বৃন্দসংগ্রহ চক্রপাণির বহুপূর্ব্বে এবং নিদান বৃন্দেরও অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ বোগদাদের বাদসাহ হারুণ আল রশিদের ‡ আদেশানুসারে সুশ্রুত এবং তাহার রাজত্বকালে নিদানগ্রন্থ খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে আরব্য ভাষায় অনুদিত হয়। অতএব এই পুস্তক অষ্টম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছিল, ইহা সপ্রমাণ হইল। যে সংগ্রহ অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বহুদূরে স্থিত বোগদাদ নগরে অনূদিত হইয়াছিল, তাহা যে সপ্তম শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এই নিদান চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, দৃঢ়বল ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থ অষ্টম এমন কি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে জনসমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সংশয় রহিল না।

সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ এবং পুনর্ব্বসুপ্রোক্ত ও চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ তন্ত্র যে বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ হর্ষচরিত হইতে পাওয়া যাইতেছে। হর্ষ হিয়াঙসাঙের (৬২৯—) সমকালবর্ত্তী এবং বাণভট্টও ঐ সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হর্ষচরিত

* অতীশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) who was born in 980 and died in 1053 A. D. "at the request of king নয়পাল of মগধ accepted the post of High Priest af বিক্রমশীলা" Journal of the A. S. of Bengal Part I. No. I. 1891.

† যঃ সিদ্ধযোগলিখিতাধিকসিদ্ধযোগান্
অত্রৈব নিক্ষিপতি কেবলমুদ্ধরেদ্ বা।
চক্রপাণির শ্লোক।
সিদ্ধযোগ ইতি বৃন্দকৃত সংগ্রহস্য সংজ্ঞা।
শিবদাসের টীকা।
নানামতপ্রথিতদৃষ্টফলপ্রয়োগৈঃ প্রস্তাববাক্যসহিতৈরিহ সিদ্ধযোগঃ।
বৃন্দেন মন্দমতিনা * * * সংলিখ্যতে॥
বৃন্দসংগ্রহের ২য় শ্লোক।

‡ উপাসকসম্প্রদায় ২য় ভাগ উপক্রমণিকা ১৩৩।৩৪ পৃষ্ঠার অধষ্টিপ্পনী।

"The চরক, the সুশ্রুত and the treatise called নিদান, were translated and studied by the Arabians in the days of Harun and Mansur (A. D. 773)". Dr. Wise P. xvii.

লিখিয়াছেন। এই হর্ষচরিতে পৌনর্ব্বসব অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদের পারগামী রসায়ন নামা একজন বৈদ্যকুমারের উল্লেখ আছে *।

টীকাকার শঙ্কর পৌনর্ব্বসব শব্দের দুইটী অর্থ করিয়াছেন—পুনর্ব্বসুর অপত্য বা পুনর্ব্বসুমুনিপ্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন †। এই অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ সুশ্রুত ‡, কেননা সুশ্রুতেই প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বেদ অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া উপদেশ দেওয়ার বিধি আছে এবং বাগ্‌টের অষ্টাঙ্গহৃদয় চরক হইতেই সঙ্কলিত হইয়াছে। আর পৌনর্ব্বসব শব্দে পুনর্ব্বসুপ্রোক্ত অগ্নিবেশ তন্ত্রের অধ্যেতাকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সুশ্রুত ও অগ্নিবেশ তন্ত্র বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাপ্তান্ বাওয়ার একখানি আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থ আবিষ্কৃত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎ হার্নলে সাহেব বহুবিধ সারগর্ভ যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ হস্তলিখিত পুস্তক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে যে যে শ্লোকে চ্যবনপ্রাশ ও শিলাজতু বর্ণিত হইয়াছে, চরকের শ্লোকের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায় এবং উহাতে সুশ্রুতেরও উল্লেখ আছে। অতএব চরক ও সুশ্রুতের নাম চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এ বিষয়ে আর সন্দেহ হওয়ার কোন কারণ নাই।

মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর পাতঞ্জল মহাভাষ্য, পুরাণ এবং পাশ্চাত্য ইতিহাস সবিশেষ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভাষ্যকার পতঞ্জলি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এ পর্য্যন্ত অকাট্য রহিয়াছে। চক্রপাণিকৃত চরকটীকার প্রারম্ভে দেখিতে পাই পতঞ্জলি চরকের প্রতিসংস্করণ দ্বারা লোকের কায়দোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং দশম শতাব্দীর ধারেশ্বর ভোজরাজ তৎকৃত ন্যায়বার্ত্তিকে পতঞ্জলিকে শারীরদোষনাশক বৈদ্যক শাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন §। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ নামে একখানি আধুনিক পুস্তকে দেখি-

* তেষাং ভিষজাং মধ্যে পৌনর্ব্বসবো যুবা * * * গতঃ পারমাষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদস্য * * রসায়নো নাম বৈদ্যকুমারকঃ * * অধোমুখোঽভূৎ। হর্ষচরিত ৫ম উচ্ছ্বাস।

† পুনর্ব্বসোরপত্যং পৌনর্ব্বসবঃ। পুনর্ব্বসুনা মুনিনা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদমধীতঃ পৌনর্ব্বসব ইতি। সঙ্কেত নামক হর্ষচরিতের টীকা।

‡ এবময়মায়ুর্ব্বেদোঽষ্টাঙ্গ উপদিশ্যতে।
তদ্যথা শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা
কৌমারভৃত্যা অগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণ-
তন্ত্রমিতি। সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ম অধ্যায়।

§ পাতঞ্জলমহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্ কায়দোষাণাং কর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ।
চক্রপাণি কৃত চরকটীকার প্রারম্ভ।
যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।
আলবেরুণীর সমকালিক ধারেশ্বর ভোজরাজকৃত ন্যায়বার্ত্তিক।

য়াছি পতঞ্জলি চরকের যে ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার নাম মঞ্জুষা। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনির সময়ে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্রের পুনঃসংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তাহার ভাষ্যও রচিত হইয়াছিল। যে গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে দ্বিতীয়বার পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল এবং যাহার বোধসৌকর্য্যের জন্য মঞ্জুষা নামক ভাষ্য করিতে হইয়াছিল, সেই গ্রন্থ যে অতীব প্রাচীন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান চরক ও সুশ্রুত যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া আধুনিক আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ঐ দুই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। চরকের শেষ ৪১ অধ্যায় দৃঢ়বল সংযোজিত করিয়াছেন। সুশ্রুতের শারীরস্থানে শাক্যসিংহের সাক্ষাৎ শিষ্য গৌতম সুভূতির মত উদ্ধৃত হওয়াতে উহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের পর পুনঃসংস্কৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বিশেষতঃ টীকাকার ডল্লনের উক্তি অনুসারে বুঝা যায়, নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা। তিনি লিখিয়াছেন "প্রতিসংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব"। মহাজ্ঞানী আচার্য্য সুভূতি যে বিশ্বহিতৈষী ভগবান্ শাক্যসিংহের সাক্ষাৎ শিষ্য ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী, তাহা বজ্রচ্ছেদিকা, মহাবস্তু অবদান, সুখাবতীব্যূহ, অষ্টসাহস্রী প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। যাহা হউক বর্ত্তমান চরক ও সুশ্রুত আধুনিক হইলেও আদিম চরকসুশ্রুত যে অতি প্রাচীন, তাহার কয়েকটী প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয় চরক, সুশ্রুত, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, পরাশর, হারীত, নিমি, প্রভৃতি ঋষিকৃত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে *। এই সংগ্রহ অতি পুরাতন। ইহাতে নাগার্জ্জুন বা অন্য কোন আধুনিক গ্রন্থকারের নাম দৃষ্ট হয় না। তথাপি মহাত্মা বুদ্ধদেবের পর যে এই সংগ্রহ রচিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করিবার অনেক কারণ ঐ গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বাগ্‌ভট তদীয় অষ্টাঙ্গহৃদয়ের প্রারম্ভে যে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়াছেন, তিনি ধন্বন্তরি, পুনর্ব্বসু, চরক, সুশ্রুত বা অন্য কোন প্রাচীন ঋষি নহেন, কিন্তু লেখার ভঙ্গীতে অনুমান হয়, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পরমকারুণিক ভগবান্ শাক্যসিংহই ঐ নমস্কারের লক্ষ্য। ললিতবিস্তর নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বুদ্ধদেবের যে জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে

---

* যদি চরকমধীতে তদ্ধ্রুবং সুশ্রুতাদি
প্রণিগদিতগদানাং নামমাত্রেঽপি বাহ্যঃ।
বাগ্‌ভট, উত্তর স্থান।
ইত্যগ্নিবেশস্য মতং হারীতস্য পুনঃ স্মৃতিঃ।
ঐ নিদান স্থান, ২ অ।

অগস্ত্যবিহিতং ধন্যং ইদং শ্রেষ্ঠং রসায়নম্।
রসায়নং বশিষ্ঠোক্তমেতৎ পূর্ব্বগুণাধিকম্॥
সৌপর্ণং লভতে চক্ষুরিত্যাহ ভগবান্ নিমিঃ।
ত্রীণ্যেতান্যঞ্জনান্যাহ লেখনানি পরং নিমিঃ॥
বাগ্‌ভট চিকিৎসিত স্থান।

তিনি বৈদ্যরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং বাগ্‌ভটও তাঁহার ইষ্টদেবকে অপূর্ব্ব বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ কীটপিপীলিকা প্রভৃতিকে নিজের ন্যায় দেখিবে, এই উপদেশ দিয়া তিনি যেন শাক্যসিংহপ্রচারিত "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই কথাই প্রকারান্তরে বলিয়াছেন। তবে বাগ্‌ভট পতঞ্জলির পূর্ব্বে কি পরে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা স্থির করিবার উপায় এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু বাগ্‌ভটের সময়ে চরক, সুশ্রুত, পরাশর,হারীত, প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদিকগণের গ্রন্থ যে বিশেষ সমাদৃত, অধীত ও অধ্যাপিত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নাই।

মহামতি শর্ম্মণ্য পণ্ডিত গোলডষ্টুকর পাণিনি সূত্র, বার্ত্তিক এবং পাতঞ্জল ভাষ্য অষ্টাদশ বর্ষ নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন পূর্ব্বক বহুবিধ সারগর্ভ যুক্তিপ্রভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যে জগতের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক অগাধবিদ্য মহর্ষি পাণিনি প্রাতঃস্মরণীয় ভগবান্ শাক্যসিংহের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণে বেদ, বেদাঙ্গ, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ঋষি, দেশ, নগর, গ্রাম, নদ নদী প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের, অর্থাৎ শাক্যসিংহপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের, কোন নিদর্শন নাই। এমন কি যে নির্ব্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বিশেষ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঐ নির্ব্বাণ শব্দ পাণিনিতে অন্য অর্থে বিশেষণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে †। বস্তুতঃ মহাবৈয়াকরণ পাণিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে খৃঃ পূঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করা যায় না। কারণ যাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাণিনি পাঠ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, এই মহর্ষি ভারত যুদ্ধের পর এবং শাক্যসিংহের পূর্ব্বে তদীয় জন্ম দ্বারা আফগানিস্থানের প্রান্তস্থিত শালাতুর নগর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

পাণিনির গণপাঠে "সৌশ্রুত পার্থিবাঃ" "ভার্য্যা সৌশ্রুতঃ" এবং বার্ত্তিকের গণে "কুতপ সৌশ্রুত" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় এবং পাণিনি সূত্রে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক চরক শব্দেরও উল্লেখ আছে *। গর্গাদি শব্দের উত্তর যঞ প্রত্যয় দ্বারা গার্গ্য, আগ্নিবেশ্য, পারাশর্য্য এবং জাতূকর্ণ্য শব্দ পাণিনিতে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে †। শাস্ত্রপ্রণয়ন বা জগতের হিতসাধনাদি কারণে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সূত্রে তাঁহাদেরই নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন নগণ্য লোকের কথা বিবৃত হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সুশ্রুত হইতে সৌশ্রুত, অগ্নিবেশ হইতে আগ্নিবেশ্য, পরাশর হইতে পারাশর্য্য, জতূকর্ণ হইতে জাতূকর্ণ্য এবং চরক হইতে চরকাঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ঐ ঐ মূল শব্দ চরকসুশ্রুতোক্ত তৎতৎ শব্দ হইতে অভিন্ন। অতএব পাণিনির সময়ে সুশ্রুত, অগ্নিবেশ, পরাশর, জতূকর্ণ এবং চরক যে জনসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

---

* কঠচরকাল্লুক্। ৪।৩।১০৭ এবং মাণব চরকাভ্যাং খঞ্। পা। ৫।১।১১

† গর্গাদিভ্যো যঞ। ৪।১।১০৫

চরকের সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, যে পরম দয়ালু ভগবান্ পুনর্বসু তাঁহার ছয় জন শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষার-পাণিকে আয়ুর্ব্বেদ দান করিয়াছিলেন*। পাণিনিসূত্রে এই ছয় জনের মধ্যে অগ্নিবেশ, পরাশর ও জতূকর্ণের নাম পাওয়া যাইতেছে। অতএব পাণিনিসূত্রোক্ত অগ্নিবেশ, পরাশর এবং জতূকর্ণ আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থকার তৎতৎ নামধেয় ঋষি হইতে অভিন্ন, ইহা অনুমান করা কোন মতেই অসঙ্গত নহে। অগ্নিবেশপ্রণীত আদিম গ্রন্থ কালক্রমে জনসমাজের অভাব পূরণ করিতে না পারাতে, তাহার পুনঃসংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই চরক মুনি উক্ত তন্ত্রকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাহার এক অভিনব আকার প্রদান করিয়াছিলেন। চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশতন্ত্র এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইয়াছিল যে, অবশেষে উহা চরক নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তাই চরকের নাম ভিন্ন আর কিছুই আমরা জানি না। তবে যে চরকের নাম খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পতঞ্জলি জানিতেন ও মঞ্জুষা নামক যাহার ভাষ্য করিয়া তিনি বৈদ্যকশাস্ত্র প্রণেতা বা চরকের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, সেই চরক যে পাণিনিসূত্রোক্ত চরক বা চরকপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি হইতে পারেন, ইহা সম্ভবপর।

সুশ্রুত, অগ্নিবেশ প্রভৃতি কয়েকজন মহামতি লোকহিতৈষী ঋষির গ্রন্থ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র জনসমাজে প্রচারিত হয়। পাণিনি আয়ুর্ব্বেদ-কুশল এই অর্থে আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ ব্যুৎ-পাদিত করিয়াছেন†। অতএব তাঁহার সময়ে আয়ুর্ব্বেদ প্রচলিত ছিল এবং যাঁহারা তাহা অধ্যয়ন করিতেন বা তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেন, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

কেবল চরক ও সুশ্রুতের নাম কেন, পাণিনিতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয়। পাণিনিসূত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ, মণি পরিভাষা, বৈদূর্য্যমণি, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, লৌহ, ধাতু উত্তপ্ত করার যন্ত্র ভস্ত্রা, অবস্থাপিতানুবাসনাদি আয়ুর্ব্বেদিক পরিভাষিক শব্দ এবং অনেক উদ্ভিদের নাম আছে। কোন কোন সূত্রে চরকসুশ্রুতোক্ত সততক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক এবং রোগিত, জ্বরিত, প্রবাহিকা ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি শব্দ ব্যুৎপাদিত ও অর্শঃ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ, অন্য স্থলে রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর

* অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্ব্বেদং পুনর্বসুঃ।
শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া॥
অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্বচঃ॥

† কথাদিভ্যঃ ঠক্ । ৪। ৪। ১০২ সূত্র দ্রষ্টব্য।

এই চারি প্রকার চিকিৎসকের এবং সুশ্রুতের উল্লেখ আছে(১)। সুতরাং মহাভারতের সময়ে আদিম বা বৃদ্ধ চরক ও সুশ্রুতগ্রন্থ বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর। বর্ত্তমান সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের ৬৬৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্রতনয় মহর্ষি সুশ্রুত ধন্বন্তরিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন(২)। অথচ এই সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত আছে। বেদসূক্তকার বিশ্বামিত্র পাণিনিসূত্রে বিশ্বের মিত্র বলিয়া ব্যুৎপাদিত। বিশ্বামিত্র অতি প্রাচীন ঋষি এবং রামায়ণের প্রমাণানুসারে শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষাগুরু। চক্রদত্তসংগৃহীত দ্রব্যগুণের টীকায় শিবদাস সেন বিশ্বামিত্রের একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনিও শারীরতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ বচনটী এই—"সূক্ষ্মাঃ কেশপ্রতীকাশা বীজরক্তবহাঃ শিরাঃ। গর্ভাশয়ং পূরয়ন্তি।" চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম বীজরক্তবহা শিরা দ্বারা গর্ভাশয় পরিপূর্ণ। রাজশেখরপ্রণীত বালরামায়ণের প্রমাণানুসারে জানা যায় যে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ্য লাভের পূর্ব্বে তাঁহার সুশ্রুত নামা পুত্র জন্মিয়াছিল, তিনিই চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি তদীয় সৈন্যদ্বারা দিগ্‌দিগন্তে ঘোষিত হইয়াছিল(৩)। ভাবপ্রকাশকার ভাবমিশ্র লিখিয়াছেন, বিশ্বামিত্র শারীর তত্ত্বশিক্ষার জন্য তদীয় তনয় সুশ্রুতকে মহামনস্বী ধন্বন্তরির নিকট প্রেরণ করেন। একাদশ শতাব্দীর চক্রপাণি দত্তও সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রতনয় বলিয়াই জানিতেন। (৪) এই সকল প্রমাণ দ্বারা সুশ্রুত যে বিশ্বামিত্রের পুত্র ও আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের প্রণেতা তাহা স্থিরীকৃত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিশ্বামিত্র রামের সমকালবর্ত্তী, তিনি বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন বৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রে বিশ্বহিতৈষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বালরামায়ণ পাঠে দেখিতে পাই, শ্রীরামতনয় কুশ সুশ্রুতকে কুশাবতী (কুশস্থলী) রাজ্য দিয়াছিলেন*; সুতরাং তিনি যে কুশের সমকালবর্ত্তী, ইহা আমাদের শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি বর্ত্তমান সুশ্রুতের চিকিৎসাস্থানে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীরাম, বিশ্বামিত্র ও কুশের অনেক পরে যে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অতএব আদিম সুশ্রুতগ্রন্থ নাগার্জ্জুন ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পুনঃ-

(১) আয়ুর্ব্বেদস্তথাষ্টাঙ্গো দেহবাংস্তত্র ভারত। সভাপর্ব্ব ১১।১৩।
জাবালিঃ সুশ্রুতস্তথা। বিশ্বামিত্রাত্মজাঃ সর্ব্বে॥
অনুশাসন পর্ব্ব।

(২) বিশ্বামিত্রসুতঃ শ্রীমান্ সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি। সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র, ৬৬ অ।

(৩) বিশ্বামিত্রমহামুনের্যদজনি ব্রাহ্মণ্যলাভাৎ পুরা
ক্ষাত্রং গোত্রময়ং তদাদিনৃপতির্দিগ্‌বিশ্রুতঃ সুশ্রুতঃ।
প্রোক্তং যেন নৃণাং মহাকরুণয়া চিত্রং চিকিৎসামৃতং
কীর্ত্তিস্তম্ভবিভূষণাশ্চ ককুভো যদ্‌বাহিনীশৈঃ কৃতাঃ।
বালরামায়ণ।

(৪) পরমকারুণিকো বিশ্বামিত্রসুতঃ সুশ্রুতঃ শল্যপ্রধানমায়ুর্ব্বেদতন্ত্রং প্রণেতুমারব্ধবান্।
চক্রদত্তের সুশ্রুত টীকা।

সংস্কৃত হওয়ার পর তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা ও তেজের বিষয় যে বিবৃত হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। (১) কেননা যে বচনে মহেন্দ্র (দেবরাজ ইন্দ্র), রাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ ও গোজন্তুর তেজ ও তপস্যার কথা লিখিত হইয়াছে, সেই বচন যদি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধগ্রন্থকার নাগার্জ্জুন সুশ্রুতে সংযোজিত করিতেন, তাহা হইলে মহাতপস্বী ভুবনবিখ্যাত মহাত্মা শাক্যসিংহের তপস্যা এবং তেজের বিষয়ও তাহাতে বিবৃত থাকা নিতান্ত সম্ভবপর হইত। সুতরাং সুশ্রুতও যে অগ্নিবেশতন্ত্রের ন্যায় অন্য কোন হিন্দু ঋষিকর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হওয়ার পর পুনরায় নাগার্জ্জুন কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে, তাহাও অনুমান করার কারণ লক্ষিত হইয়াছে। এই নাগার্জ্জুনও যে নিতান্ত আধুনিক নহেন, তাহার কয়েকটী কারণ নিম্নে নির্দ্দেশ করা গেল।

কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে নাগার্জ্জুন কাশ্মীরদেশীয় একজন মণ্ডলেশ্বর রাজা, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মুনি এবং তিনি ভগবান্ শাক্যসিংহের নির্ব্বাণলাভের ১৫০ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। যদি ইনি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হন, তবে বর্ত্তমান সুশ্রুতও ২৪০০ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ। বৌদ্ধমতাবলম্বী শূন্যবাদের পক্ষপাতী আর এক নাগার্জ্জুনও প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। (২) কেন না তৎকৃত তন্ত্রগ্রন্থ রসরত্নাকরের কোন কোন শ্লোকে দেখা যায়, শকাব্দপ্রবর্ত্তক শালিবাহনের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইতেছে। সপ্তম শতাব্দীর কবি বাণভট্ট লিখিয়াছেন, শাতবাহন (যিনি শালিবাহন হইতে অভিন্ন) নাগার্জ্জুনের বন্ধু (৩) এবং হিয়াংসাং (খৃঃ ৬২৯—৬৪৫) শাতবাহন ও নাগার্জ্জুন উভয়কেই প্রাচীন লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বার্গেস্ সাহেব অশোকের ঘোষণা লিপিদ্বারা উপপন্ন করিয়াছেন যে শাতবাহন (শালিবাহন) বংশীয় রাজগণ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। কামসূত্র নামে এক খানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই, কুন্তলেশ্বর শতকর্ণপুত্র শাতবাহন মহাদেবী মলয়বতীকে কর্ত্তরীদ্বারা হত করিয়াছিলেন। (৪) এই সকল প্রমাণ থাকিতে নাগার্জ্জুনকে দ্বিসহস্রবর্ষীয় লোক না বলিয়া আধুনিক গ্রন্থকার বলিতে পারা যায় না। অতএব প্রায় দ্বিসহস্র-

(১) মহেন্দ্ররামকৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥ সুশ্রুত, ৩০শ অধ্যায়।

(২) কাশ্মীররাজ অভিমনু্য ৪০ হইতে ৪৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্তদেশে বৌদ্ধগণ রক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপ্রমাণ রাজতরঙ্গিণী হইতে উদ্ধৃত হইল :—

আবির্ভূবাভিমন্যুঃ শতমন্যুরিবাপরঃ॥
তস্মিন্নবসরে বৌদ্ধা দেশে প্রবলতাং যযুঃ।
নাগার্জ্জুনেন সুধিয়া বোধিসত্ত্বেন পালিতাঃ॥

রাজতরঙ্গিণী ১। ১৭৪, ১৭৭।

(৩) সমতিক্রামতি চ কিয়ত্যপি কালে তামেকাবলীং তস্মান্নাগরাজান্নাগার্জ্জুনো নাম * * লেভে চ।
* * ত্রিসমুদ্রাধিপতয়ে সাতবাহননাম্নে নরেন্দ্রায় সুহৃদে স দদৌ তাম্। হর্ষচরিত ৮ম উচ্ছ্বাস।

(৪) কর্ত্তর্য্যা কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীং জঘান। কামসূত্র ২য় অধিকরণ, ৭ম অ।

বর্ব্বীয় নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত যে সুশ্রুত পুনর্ব্বার প্রতিসংস্কৃত হইয়াছে, সেই সুশ্রুত যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বৌদ্ধগ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদিক শব্দ।

মহাভগ্‌গ নামক পালি ভাষায় লিখিত প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে কালাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতাঞ্জন, গৈরিক, স্বেদন (স্বেদবিধি), দোষ (পিত্ত, কফ ও বায়ু), বৃদ্ধি, ভগন্দর, বত্তিকম্ম (বস্তিকর্ম্ম) প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে, ঐ সময়ে আয়ুর্ব্বেদ আলোচিত হইত। কেবল পারিভাষিক শব্দ কেন, যে বায়ু, পিত্ত, ও কফের বৈষম্য রোগের আদি কারণ বলিয়া চরকে ও সুশ্রুতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ঐ ত্রিধাতুর কথা মহাভগ্‌গ গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রদর্শনই পরম ধর্ম্ম * এই সারগর্ভ হৃদয়স্পৃক্ উক্তি সহৃদয় চরকপ্রতিসংস্কৃত চরকসংহিতায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধদিগেরও দয়াই পরম ধর্ম্ম। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে হিন্দুদিগের চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অশোকের ঘোষণা লিপিতেও মনুষ্যচিকিৎসা ও পশুচিকিৎসার বিবরণ আছে। চরকে আছে হস্তীর জ্বরের নাম পালক। * কালিদাসও লিখিয়াছেন "বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈঃ" সূত্রকার ঋষিগণ কর্ত্তৃক হস্তী শিক্ষিত হইত। পাণ্ডব নকুলের অশ্বচিকিৎসা মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব পশুচিকিৎসাও যে হিন্দু শাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পাণিনির এবং মহাভারতের সময়ে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যমান ছিল। মহাভারতেরও বহু পূর্ব্বে যে আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা ভারতবর্ষে হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ বেদবেদাঙ্গে রহিয়াছে। ঋগ্বেদে শত শত সহস্র সহস্র ভিষকের এবং ত্রিধাতুর (বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিনদোষের) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১) যজুর্ব্বেদে অস্ত্রব্যবহারের ও শারীরতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়; যথা, যজ্ঞার্থে নিহত পশুর হৃদয়, জিহ্বা, বক্ষ, যকৃৎ, বৃক্ক (বৃক্কক), বামহস্ত, দুই পার্শ্ব, শ্রোণি, বসা প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা বাহির করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার বিধি আছে। অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদের নানাতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যকে শারীরতত্ত্বের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায় *। তাহাতে লিখিত আছে, বৃক্ষ যেরূপ, পুরুষও সেইরূপ, বৃক্ষের পাতার ন্যায় ইহার লোম, বাহিরে ত্বক্, আহত বৃক্ষের ত্বক্ হইতে রুধিরস্রাবের ন্যায় পুরুষের ত্বগিন্দ্রিয় হইতে রক্ত ক্ষরিত হয় এবং বৃক্ষের সারদ্বারা

(১) শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টেহস্তু। ঋগ্বেদ ১।২৪।৯।
ত্রিধাতুশর্ম্ম বহতং শুভস্পতী। ১। ৩৪। ৬।

আয়ুর্ব্বেদ যে ঋগ্বেদের উপাঙ্গ তাহা চরণব্যূহ নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠেও জানা যায় যথা—"সর্ব্বেষাং বেদানাং উপবেদা ভবন্তি, ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদ উপবেদঃ * * অথর্ব্ববেদস্য শস্ত্রশাস্ত্রাণি। চরণব্যূহ।

যেরূপ বৃক্ষ ধৃত থাকে, সেইরূপ পুরুষেরও ভিতরে অস্থি রহিয়াছে। (১) এই বচন কয়েকটীর সহিত সুশ্রুতের শারীরস্থানের তিনটী বচন সম্পূর্ণ এক ভাবাপন্ন ; এমন কি, ঐ বচনগুলি যেন সুশ্রুতে মার্জ্জিত সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। (২) শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে চিকিৎসক ও শারীরিক তত্ত্বের বিষয় বর্ণিত আছে। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ যে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ এবং আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে উক্ত বেদের প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতেন, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন চরক ও সুশ্রুতে দেখিতে পাই (৩)। সুশ্রুতের শারীরস্থানে পঞ্চম অধ্যায়ে বেদোক্তির একটু সমালোচনাও দেখা যায়। মানবশরীরে কি সংখ্যক অস্থি আছে, তাহার আলোচনা উপলক্ষে সুশ্রুতকার বেদের মত হইতে ভিন্ন মত দিয়া অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদে নরদেহে অস্থির সংখ্যা ৩৬০ বলা হইয়াছে, কিন্তু সুশ্রুত বলিতেছেন শল্যতন্ত্রে অস্থি সংখ্যা ৩০০ (৪)। অথর্ব্ববেদ ও বেদাঙ্গাদিতে আয়ুর্ব্বেদের যে সমস্ত মূলসূত্র আলোচিত হইতেছিল, চরক ও সুশ্রুতের সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতে সেই সকল মৌলিকতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তন্ন তন্নরূপে বিবেচিত হইয়া অবশেষে উক্ত দুই গ্রন্থের ন্যায় যুক্তিপূর্ণ পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

ফলতঃ সুশ্রুত কর্ত্তৃক শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি, ধমনী, শিরা, ও রস সম্বন্ধে যে মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বহুদিন আলোচনা, পর্য্যাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা (experiment) ভিন্ন ঐ সকল বিষয় সহজে অবগত হওয়া যায় না। বেদ ও বেদাঙ্গ রচনাকালে অশ্ব, গো, মহিষ বা অন্যান্য জন্তুর শরীরচ্ছেদ করিয়া যাহা অবলোকিত হইত, আয়ু-

(১) যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষো মৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাদিকা বহিঃ।
ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎকটঃ।
তস্মাৎ তদাতৃণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ।
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাট স্নাব তৎস্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা।
যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক ৬ষ্ঠ অ।

(২) অভ্যন্তরগতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা।
শারীর স্থান ৫ম অ।
বৃক্ষাদ্ যথাভিপ্রহতাৎ ক্ষীরিণঃ ক্ষীরমাবহেৎ।
মাংসাদেবং ক্ষতাৎ ক্ষিপ্রং শোণিতং সংপ্রসিচ্যতে। ঐ ৪র্থ অ।

(৩) ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য।
সুশ্রুত সূত্রস্থান, ১ম অ।
তত্র ভিষজা * * আত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা।
চরক সূত্রস্থান, ৩০শ অ।

(৪) ত্রীণি ষষ্ঠ্যধিকানি শতান্যস্থ্নাং বেদবাদিনো ভাষন্তে।
শল্যতন্ত্রে তু ত্রীণ্যেব শতানি। সুশ্রুত, শারীরস্থান ৫ম অ।

র্ব্বেদে মৃত নর নারীর দেহে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎকৃষ্ট প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সুতরাং অথর্ব্ববেদের সহস্র বৎসর বা ততোধিক কাল পরে পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ফলতঃ ভারতবর্ষে খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে আয়ুর্ব্বেদের ভূয়সী আলোচনা হইয়াছিল, তাহা বেদ বেদাঙ্গ দ্বারা জানা যাইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই। অতীত সাক্ষী ইতিহাস ভিন্ন ভূত কালের বিবরণ জানিবার উপায় নাই। সুতরাং চরক ও সুশ্রুত কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা স্থিরীকৃত হওয়া অসম্ভব। মহাভারত ও পাণিনির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আদিম অগ্নিবেশ এবং সুশ্রুত তন্ত্র যে প্রতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা বলা অন্যায় নহে। আমাদের মনুসংহিতা যেরূপ অতি প্রাচীন মানবকল্পসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও অন্যান্য বেদাঙ্গাদির উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ যে সময়ে ঐ সংহিতা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তখন উহাতে তৎকালীয় আচার ব্যবহারের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেইরূপ আদিম অগ্নিবেশ ও সুশ্রুত তন্ত্র, ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, যজুরারণ্যক এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থোক্ত আয়ুর্ব্বেদিক উপাদান সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ যিনি যখন তাহার প্রতিসংস্করণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালবর্ত্তী বিষয়সকল তাহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। এইরূপে বর্ত্তমান চরক সুশ্রুতে অতি প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক মত এবং তৎ তৎমতের এক একটী সমালোচনা দৃষ্ট হয়।

চরক ও সুশ্রুতের সরল গদ্যও প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। কোন কোন স্থানে গদ্য এরূপ প্রাঞ্জল যে তাহা পাঠ করিলে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের গদ্যভাষা স্মৃতিপথে উদিত হয়। বিশেষতঃ চরকে অনুষ্টুভ, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, বংশস্থবিল প্রভৃতি ছন্দই ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্য কোনরূপ দীর্ঘ ছন্দঃ দৃষ্ট হয় না। সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে স্রগ্ধরা ছন্দে দুইটী ও শারীর স্থানে তোটক ছন্দের একটী এবং আর্য্যা ছন্দে একটী শ্লোক আছে। এই উত্তর তন্ত্র আদিম সুশ্রুতে ছিল না, তাহা অনুমান করার অনেক কারণ আছে। যাহা হউক ভাষা ও ছন্দ দ্বারা বিচার করিলেও চরক ও সুশ্রুত প্রাচীন বলিয়াই অনুমিত হইবে।

ফরাসী পণ্ডিত সিল্‌ভিয়ান্ লিভি চীন ভাষায় অনূদিত ত্রিপিটকে কনিষ্কের গুরু ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লিখিত চরক নামা এক ব্যক্তির বিষয় অল্পদিন হইল জানিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন এই চরকই চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা। অতএব ঐ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে লিখিত এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ধাতু ত্রয়ের বৈষম্যই রোগোৎপত্তির মূল, এই তত্ত্ব গ্রীকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। হজ্ (Haas) নামা জর্ম্মণ পণ্ডিত স্বদেশের এসিয়াটিক সোসাইটীতে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হিন্দুজাতির অবনতির এবং মুসলমানের উন্নতির সময়ে হইয়াছে। এমন কি মাধব নিদান, শার্ঙ্গধর সংহিতা, অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় একীভূত করিয়া জন সমাজের ভক্তি আকর্ষণ করার অভিপ্রায়ে

চরক ও সুশ্রুতের নাম যোজনা পূর্ব্বক এই দুই পুস্তক লিখিয়া কোন সুচতুর ব্যক্তি অদ্ভুত চাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন। বিবিধভাষাজ্ঞ সুপণ্ডিত হজ হিপক্রেটিস হইতে বুক্রাৎ, বুক্রাৎ হইতে আরব্য অপভ্রংশ সুশ্রুৎ এবং এই শেষোক্ত শব্দ হইতে সুশ্রুত এই নাম ব্যুৎপাদিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ত্রিধাতুবৈষম্য রোগের কারণ, এই অতি প্রাচীন মত যে হিন্দুরা গ্রীক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকল মতের প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন, কেন না পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই উক্ত সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। তথাপি সংক্ষেপে ঐ মতের বিরুদ্ধে কয়েকটী কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিয়া চরকের মঞ্জুষা নামে ভাষ্য প্রণয়ন পূর্ব্বক পতঞ্জলি মুনি উহার প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া চক্রপাণিদত্ত কর্ত্তৃক উল্লিখিত হওয়াতে কনিষ্কের সমকালবর্ত্তী অন্য কোন চরক যে চরকসংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা হইতে পারেন না, তাহা প্রতিপন্ন হইল। ত্রিধাতুর বৈষম্য রোগের কারণ, এই মত ঋগ্বেদে ও কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। * সুতরাং যে মত অতি প্রাচীন বেদে এবং পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিকে আছে, তাহা যে হিন্দুরা গ্রীক হইতে গ্রহণ করেন নাই, উহা বলা বাহুল্যমাত্র। বাগ্‌ভটে চরক ও সুশ্রুতের নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত থাকাতে এবং মাধবকর তদীয় গ্রন্থের প্রারম্ভে অল্পমতি ভিষক্‌দিগের বোধের জন্য নানা মুনির মত উদ্ধৃত করিয়া নিদান লিখিতেছি, এরূপ নির্দ্দেশ থাকায়, স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে চরক ও সুশ্রুত, বাগ্‌ভট এবং মাধবনিদানের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহণ পূর্ব্বক কোন সুচতুর বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ও লিখিত হয় নাই। †

"ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মৃতদেহ ছেদন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, শিরাদির গঠন ও স্বরূপ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে হিন্দু চিকিৎসকেরা অশ্মরী রোগ, প্রসব বাধা, মৃতগর্ভনিঃসারণ ইত্যাদি অনেক কঠিন কঠিন অস্ত্র চিকিৎসা করিতেন। সুশ্রুত ঐ প্রথমোক্ত ক্রিয়াটীর বিবরণ করেন, পশ্চাৎ সেলসস্ নামক লাটিন্ পণ্ডিত তাহা ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রচার করিয়াছেন। তিনি মিশরদেশীয়দিগের নিকট তাহা অবগত হন এবং মিশরদেশীয়েরা পূর্ব্বদেশীয় (অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়) চিকিৎসকদিগের সমীপে শিক্ষা করেন। অতএব গ্রীক্ হিপক্রেটিজ অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়েও ভারতবর্ষীয়দের নিকট ঋণবদ্ধ ছিলেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত।" ‡

---

* ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভস্পতী।
বাতপিত্তশ্লেষ্মভাঃ শমনকোপনয়োরুপসংখ্যানম্। সন্নিপাতাচ্চেতি বক্তব্যম্।

† নানামুনীনাং বচনৈরিদানীং সমাসতঃ সদ্‌ভিষজাং নিয়োগাৎ।
* * * নিবধ্যতে রোগবিনিশ্চয়োঽয়ম্॥
নানাতন্ত্রবিহীনানাং ভিষজামল্পমেধসাম্।
সুখং বিজ্ঞাতুমাতঙ্কময়মেব ভবিষ্যতি॥ মাধবনিদান।

‡ Transactions of the Second Section of the International Congress of Orientalists, for 1874, pp., 255-259. ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ টিপ্পনী ৩১৪ পৃঃ।

হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায়। আমরা "অন্নাভাবে শার্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ।" আমরা "ধীরে ধীরে যাই, ফিরে ফিরে চাই, গোরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই।" আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, শৌর্য্যবীর্য্য, সকলই গিয়াছে। সময়ে সময়ে মহিমান্বিত স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্মরণ করিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা পাই। দুঃখের কথা বলিব কি, সেই সুখময় স্মৃতিজাত শান্তি হইতেও আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য, হজ, লিভি, বেবের প্রমুখ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। জানি না আমাদের এ দুর্গতি কবে অন্তর্হিত হইবে। তবে ভরসা এই অতি আদরের বস্তু অতীতসাক্ষী ইতিহাস সাক্ষ্য দান করিতেছে,—"চিরদিন কখনও সমান না যায়।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।
শ্রীনবকান্ত কবিভূষণ।

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দ্দূ, পার্‌সী ও আর্‌বী শব্দের তালিকা।

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ উর্দ্দূ, পার্‌সী ও আর্‌বী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সকল শব্দের মধ্যে কতকগুলি অবিকল এবং কতকগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হইয়াছে। যেস্থলে শব্দটী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই স্থলে মূল শব্দটী = চিহ্নের পর বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইল। উর্দ্দূ, পার্‌সী ও আর্‌বী ভাষায় যেরূপ ইংরাজীভাষার z বর্ণের অনুরূপ বর্ণ আছে, বঙ্গভাষায় সেরূপ নাই। সেইজন্য উক্ত ভাষাত্রয়ের যে সকল শব্দে ইংরাজী z বর্ণের অনুরূপ বর্ণ আছে, উহা "জ্" দ্বারা প্রকাশিত হইল। বঙ্গভাষায় প্রচলিত কয়েকটী তুরুষ্ক শব্দও নিম্নের তালিকায় লিখিত হইল। উর্দ্দূ, পার্‌সী, আর্‌বী ও তুরুষ্ক এই চারি শব্দের পরিবর্ত্তে যথাক্রমে, উ, পা, আ, এবং তু এই চারিটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে।

অ

অড়র, অড়হর (উ)=অর্‌হর
অন্দর (পা)
অবোল (উ)
অবোলা (উ)
অস্তর (পা)
[ভিতরের কাপড়]

——

আ

আইন (পা)=আঈন
আওয়াজ (পা)=আওয়াজ্
আকসার (আ)=অক্‌সর
আঁকড়ান (উ)=পকড়্‌না
আঁকড়ী (উ)
আক্কেল (আ)=আক্‌ল্
আখের (আ)=আখির
আঙ্গুর (পা)=আঙ্গূর
আচ্ছা (উ)
আজব (আ)
আজাড় (উ)
আটক (উ)
আটকান (উ)=আটক্‌না
আটা (উ)
আটী (উ)=আঁটী

আঁটা (উ)=আঁটনা, অঁটোয়ানা
[সঙ্কুলান হওয়া]
আড্ডা (উ)
আড়গড়া (উ)
আড়ষ্ট (উ)=অড়্‌সটা
আড়াই (উ)=অঢ়াই
আড়ানী (উ)=অড়ানী
আতর (আ)=আৎর্
আতরদান (আ, পা)
আতসবাজি (পা)=আতষবাজী
আতসী (পা)=আতিষী
[কাচবিশেষ]
আদৎ, আদতে (আ)=আদতী
আদদ (আ)
আদব (আ)
আদালত (আ)=অদালৎ
আনাজ (উ)=অনাজ [শস্য]
আনাড়ী (উ)=অনাড়ী
আনার (পা)=অনার
আন্‌কা (আ)=অন্‌কা
আন্দাজ (পা)=অন্দাজ
আন্দাজী (পা)=অন্দাজী
আপন (উ)
আপনার (উ)=অপ্না, অপ্নী
আপনি (উ)=আপ
আফগান (আ)=অফঘান
আফসোস (পা)
আবওয়াব (পা)
আবকার (পা)
আবকারী (পা)
আবরু (পা)=আবরূ
আবলুস্ (পা)=আবনুস্

আবহাওয়া (পা)=
আব্ ও হওয়া
আবাদ (পা)
আবাদী (পা)
আবুড়া খাবুড়া (উ)=অড়বড়
খড়বড়, অবড় খাবড়
আমদানী (পা)=আমদনী
আমন (উ)
আম মুক্তার (আ)=
আমমুখ্‌তার
আমল (আ)
আমলনামা (আ, পা)
আমলা (আ)
আমানত (আ)=অমানত
আমীন (আ)
আমীর (আ)
আমীরী (আ)
আমেজ (পা)=আমেজ
আয়না (পা)=আঈনা
আয়মা (আ)
আয়মাদার (আ)
আয়েন্দা (পা)
আয়েষ (আ)=অইষ্
আরক (আ)
আরব (আ)
আর্জী (আ)=আর্জা
আরবী (আ)
আরিন্দা (পা)
আলকাতরা (আ)=কৎরান্
আলখোল্লা (আ)=অলখালক্
আলমারী (উ)=অলমারী
আলাদা (আ)=আলাহিদা

আশরফী (পা)
আসবাব (আ)=
অস্‌বাব
আসমান (পা)
আসমানী (পা)
আসল (আ)
আসান (পা)
আসাবরদার (আ, পা)
আসামী (আ)
আসা (আ) সোঁটা(পা)
আস্তীন (পা)
আস্তে (পা)=আহিস্তা
আহাম্মুক (আ)=
আহমক
আহম্মুকী (আ)=
আহমকী

ইআর (পা)
ইআরকী (পা)
=ইয়ারী
ইজমালী (আ)
ইজার (পা)=ইজার
ইজারা (পা)
ইজ্জৎ (আ)=
ইজ্জৎ
ইনাম (আ)
ইমন (উ)
ইমাম (আ)
ইস্হাদী (আ)=
ইষ্‌হাদ

ইষারা (পা)
ইষ্তিহার (পা)
ইসপগুল (পা)=ইস্পগুল
ইস্তিমরারী (আ)
ইস্ত্রী (উ)
ইস্পাত (উ)
ইল্লৎ (আ)
ইহুদী (আ)

উকীল (আ)=ওকীল
উজাড় (উ)
উজান (উ)
উজীর (আ)=ওজীর
উড়নী, উড়ানী (উ)=
ওঢ়্নী
উতলান (উ) =উবলনা
উতোলা (উ)=
উতাওলা, উতলা
উবচান (উ)=উভর্না
উমেদার (পা)=উম্মেদওয়ার
উমেদারী (পা)=উম্মেদওয়ারী
উলু (উ)=উলু
উসুল (আ)=ওসূল
উস্কান (উ)=উস্কানা

এ

একতরফ (আ)
এক্তার (আ)=ইখ্তিয়ার
এক্রার (আ)=ইক্রার
একুন (আ, পা)=ইয়কুন
এজলাস (আ)=ইজলাস
এজাহার (আ)=ইজ্হার
এতবার (আ)=ইতিবার
এত্লা (আ)=ইত্তিলা
এত্লানামা (আ, পা)=
ইত্তিলানামা
এবারৎ (আ)=ইবারৎ
এমারৎ (আ)=ইমারৎ
এয়াদ (পা)=ইয়াদ
এলাকা (আ)=ইলাকা
এলাচ (উ)=ইলাচী
এলেম (আ)
এলেমবাজ (আ, পা)=
এলেমবাজ্

ও

ও [সে] (পা)
ও [এবং] (আ, পা)
ওআকিফ্ (আ)
ওআক্ফ (আ)
ওআপস (পা)
ওআর (উ)
ওআরিস (আ)
ওআলা (উ)
ওআসিলবাকী (আ)
ওআসিলাত (আ)
ওআস্তা (আ)
ওকালতনামা (আ, পা)
ওকালতী (আ)=ওকালৎ
ওজন (আ)=ওজ্ন
ওজর (আ)=ওজ্র
ওজুহাত (আ)
ওঝা (আ)=ওজ্ঞাঃ
ওমরা (আ)
ওরফে (আ)=ওর্ফ
ওলা (উ)
ওস্তাদ (পা)
ওস্তাদী (পা)

ক

কওলা (আ)=কবালা
কচকচা (উ)=কচকচ
কচলান (উ)=কুচল্না
কচা (উ)
কচুরি (উ)=কচৌরী
কট্কট্ (উ)
কটোরা (উ)
কড়কড় (উ)=কড়কনা
কড়মড় (উ)=কিড়কিড়
কড়া [কঠিন] (উ)
কড়া [শক্ত ফোস্কা] (আ)
=কর্হা
কড়ার (আ)=করার
কড়ি (উ)=কৌড়ী
কতল (আ)=কৎল্
কপি (উ)=কোবী
কবর (আ)
কবুল (আ)=কবূল
কব্জা (আ)=কব্জা

কব্‌লুতি (আ) = কবূলিয়ৎ
কম (পা)
কমজোর (পা) = কমজোর
কমতী (পা)
কমবেষ (পা)
কয়লা (উ) = কোএলা
কয়েদ (আ)
কয়েদী (আ)
করকর (উ) = কিরকিরানা
কর্জ (আ) = কর্জ্
কলপ (উ)
কলাই (আ) = কলঈ
কলু (উ) = কোলূ
কল্‌মা (আ) = কলিমা
কব্‌জা (আ) = কব্‌জা
কষাকষী (পা)
কসা (উ)
কসাই (আ) = কসাঈ
কসুর (আ) = কসূর
কসুত (আ) = কসূদ্
কহন (উ)
কাই (উ) = কাঈ
কাকা (উ)
কাকাতুয়া (উ)
কাকী (উ)
কাগজ (পা) = কাঘজ্
কাগজী (পা) = কাঘজী
কাঙ্গাল, কাঙ্গালী (উ) = কঙ্গাল
কাচা [ধোতকরা] (উ) = কছ্‌না
কাঁচা (উ) = কচ্চা
কাঁচী (উ) = কৈঁচী
কাছারী (উ) = কছেরী
কাজি (আ) = কাজী
কাজিয়া (আ) = কজ্যায়া
কাট [তৈলাদির মল] (উ)
কাঠা (উ) = কট্‌ঠা
কাড়া (উ) = কাঢ়না
কাতার (আ) = কতার
কানাত (আ) = কনাত
কানুন (আ) = কানূন
কানুঙ্গো (উ)
কাফ্‌রী (আ) = কাফিরী
কাবাব (পা) = কবাব
কাবাবচিনি (পা) = কবাবচীনী
কাবু (তু) = কাবূ
কাবেল (আ) = কাবিল
কামরা = কম্‌রা
কামিজ (আ) = কমীস
কায়দা (আ) = কাইদা
কায়েম (আ) = কাইম
কায়েমী (আ) = কাইমী
কারখানা (পা)
কারপরদাজ (পা)
কারবার (পা)
কারবারী (পা)
কারসাজী (পা) কারসাজি
কারিকর (পা) = কারীগর
কারিকরি (পা) = কারীগরী
কার্চুবি (পা) = কারচোবী
কালবুট (পা) = কালবুদ
কালিয়া (আ) = কালিয়া
কাস্তে (উ) = কাস্তিয়া
কাহিল (আ)
কিংখাপ (পা) = কিংখ্বাব
কিচ্‌কিচ্ (উ)
কিনারা (পা)
কিষ্‌তি (পা) [নৌকা] = কিষ্‌তী
কিষ্‌মিষ্ (পা)
কিস্তি [instalment] (আ) = কিস্ত্
কিস্তি [দাবাখেলার] (পা) = কিষ্ৎ
কিস্তিবন্দী (আ, পা) = কিস্ত্‌বন্দী
কুচা, কুচি (পা) = কূচক
কুঁচি (উ) = কুঁচী
কুঁজ (পা) [জলপাত্র] = কূজা
কুট কুট (উ)
কুঠি (উ) = কোঠী
কুড় [উচ্ছিষ্ট] (উ) = কূড়া
কুড়ি (উ) = কোড়ী
কুঁদ (পা) = কুন্দা
কুর্ত্তি (পা)
কুল কুল (আ)
কুলি (উ) = কুলী
কুলুপ (আ) = কুফ্‌ল্
কুল্পী (আ) = কুল্‌ফী
কুচাকুচি (পা) = কুচক
কুস্তি (পা) = কুষ্‌তী
কেতা (আ) = কিতা
কেতাব (আ) = কিতাব
কেয়ারী (উ) = কিয়ারী
কেরাণী (উ) = ক্রানী

কেরামত (আ) = করামত
কেল্লা (আ) = কিলা
কৈফিয়ৎ (আ) = কৈফীয়ৎ
কোঁকড়ান (উ) = অকড়্না
কোটা [ঘর] (উ) = কোঠা
কোটা [ক্রিয়াপদ] (উ) = কূটনা
কোটাল (উ) = কটাল
কোড়া (উ)
কোতোয়াল (পা)
কোতোয়ালী (পা)
কোপা (পা) = কোবা
কোপ্তা (পা) = কোফ্তা
কোমর (পা) = কমর
কোমরপাটা (পা, উ) = কমরপট্টা
কোমরবাঁদ (পা) = কমরবন্দ
কোয়াসা (উ) = কুহাসা
কোরা (উ)
কোরান (আ)
কোর্ত্তা (পা) কুর্ত্তা
কোর্মা (উ)
ক্রোক (উ) কুর্ক্

খ

খচ্চর (উ)
খট্কা (উ)
খট্খট্ (উ)
খড়খড় (উ)
খড়ম (উ) = খড়াঁও
খৎ (আ)
খতম (আ)
খতিয়ান্ (উ) = খাতাওনী
খন্দক (আ)
খবর (আ)
খবরদার (আ, পা)
খবরদারী (আ, পা)
খবীস (আ)
খয়রা (উ) = খৈরা
খয়রাৎ (আ) (পা)
খরগোষ (পা)
খরচ (পা) = খর্চ্
খরমুজ (পা) = খর্বূজা
খরিদ (পা) = খরীদ
খরিদা (পা) = খরীদা
খরিদার (পা) = খরীদার
খর্‌রা (উ)
খসা (উ) খিস্না
খসান (উ) = খিসানা
খস্খসে (পা) = খস্খস্
খসড়া (উ) = খস্‌রা
খাঁ (পা)
খাক (আ)
খাকী (পা)
খাঁচা (উ)
খাজনা (আ) = খজানা
খাজাঞ্চী (আ) = খজাঞ্চী
খাড়া (উ) = খড়া
খাড়াই (উ) = খাড়াঈ
খাতা (উ)
খাতাবন্দী (উ)
খাতির (আ)
খাদ (উ)
খানসমা (পা) = খাঁসামান
খানকী (পা) = খান্‌গী
খাপ (আ) = ঘিলাফ্
খাম (উ)
খামার (উ) = খমার
খামখা (পা)
খামখেয়ালী (পা) = খম্খেয়ালী
খারাপ (আ) = খরাব
খারিজ (আ)
খাল (উ)
খালাস (আ) = খলাস
খালাসী (আ) খলাসী
খালি (পা) = খালী
খাল্‌সা (আ) = খালিসা
খাস (আ)
খাসখামার (আ, উ)
খাসবরদার (আ, পা)
খাসমহল (আ)
খাসা (আ) = খাস্‌সা
খাসী (আ) = খসী
খাস্তা (পা) = খস্তা
খিচান (উ) = খিঝ্না
খিট্খিটে (উ) = খট্খট্
খিরাজ (আ)
খিলখিল (উ)
খিলান (উ)
খুকী (উ) = খুখী
খুজ্‌রা (পা) = খুর্দা
খুঁট (উ) = খুঁট
খুঁটা [ক্রিয়াপদ] (উ) = খরোঁট
খুঁটি (উ) = খুঁটী
খুন (পা) = খুন

খুনখারাপি (পা)=খুনখরাবা
খুব (পা)=খুব্
খুরী (উ)=খুরিয়া
খুর্মা (পা)
খুষী (পা)
খেতাব (আ)=খিতাব
খেদমৎ (আ)=খিদমৎ
খেয়ানৎ (আ)=খিয়ানৎ
খেয়াল (আ)
খেলাৎ (আ)=খিলঅৎ
খেলাফ্ (আ)=খিলাফ্
খেষ (উ)
খেসারৎ (আ)=খিসারৎ
খেসারি (উ)=খিসারী
খোকা (উ) খোখা
খোঁচ (উ)
খোঁচা (উ)
খোজা (পা)
খোঁজা (উ)=খোজ, খোজনা
খোঞ্চা (পা)=খাঞ্চা, খুঞ্চা
খোঞ্চা পোষ (পা)
খোঁটা (উ)
খোদ (পা)=খুদ্
খোদকাস্ত (পা)=খুদ্‌কাষৎ
খোদা (পা)
খোঁপা (উ)
খোবানি (পা)=খুবানী
খোরপোষ (পা)
খোরাক (পা)
খোরাকী (পা)
খোলা (উ)=খুলা
খোলাসা (আ)=খুলাসা
খোষখবর (পা)
খোষ গল্প (পা, উ)=খোষগপ্
খোষপোষাক (পা)
খোষবয় (পা)=খোষ্‌বো
খোষা (পা)=ধান্যাদির শীর্ষ
খোষামোদ (পা)=
খোষামদ

গ

গচ (উ)
গজল (আ)=ঘজ্‌ল
গজা (উ)
গড়গড় (উ)
গঁদ (উ)=গোঁদ
গরজ (আ)=ঘরজ্
গরম (পা)=গর্‌ম্
গরহাজির (আ)=ঘয়ের হাজির
গরিব (আ)=ঘরীব
গরিবানা (আ)=ঘরীবানা
গর্দান (পা)=গর্দন
গর্ম্মি (পা)=গরমা
গলদ (আ)=ঘলৎ
গলি (উ)=গলী
গহনা (উ)
গাড়া (উ)=গড়্‌না
গাদ (উ)
গাদা (উ)=গাদ্‌না
গাফিল (আ)=ঘাফিল
গাফিলি (আ)=ঘাফিলী
গাব (উ)
গালিচা (পা)=
কালীচা, ঘালীচ
গির্‌গিটী (উ)=গির্‌গিট
গির্জ্জা (উ)
গুজরৎ (পা)=গুজারৎ
গুজরান্ (পা)=গুজ্‌রান্
গুজিয়া (উ)
গুদম (উ)=গুদ্দাম
গুদ্‌ড়ী, গুধ্‌ড়ী (উ)=
গূদ্‌ড়ী, গুধ্‌ড়ী
গুম্বজ (পা)=গুম্বজ্
গুলজার (আ)=গুলজার
[গোলাপের বাগান
গুলতন (পা)=ঘলতানী
[হাবুডুবু খাওয়া]
গেরো (পা)=গিরিঃ
গোটা (উ) [জরি]
গোড়া (উ)=গোড়
গোড়ালি (উ)=
[গোড় শব্দজ]
গোমাস্তা (পা)=গুমাষ্‌তা
গোঁয়ার (উ)=গড়িয়ার
গোয়েন্দা (পা) [বক্তা]
গোর (পা)
গোল [শব্দ] (পা)=ঘুল্
গোলন্দাজ (পা)=
গোলন্দাজ্
গোলাপ (পা)=গুলাব
গোলাপপাস (পা)
=গুলাবপাষ
গোলাপী (পা)=
গুলাবী

গোলাম (আ) = ঘুলাম
গোসলখানা (আ) = ঘুসুলখানা
গোসা (আ) = ঘুস্‌সা
গ্রেপ্তার (পা) = গিরিফ তার

———

ঘড়াঞ্চি (উ) = ঘড়োঁচী
ঘর (উ)
ঘরাও (উ) = ঘরানা
ঘরামী (উ)
ঘাজি (আ) = ঘাজী
ঘাঁটা (উ) = ঘেটনা, ঘেপনা
ঘাটোয়াল (উ)
ঘাবরান (উ) = ঘবরানা
ঘুঘু (উ) = ঘুঘু
ঘুম (আ) = নওম
ঘুষ (উ) = ঘূস্
ঘুষ (উ) = খোর (পা)
ঘুষা, ঘুষি (উ) = ঘুসা বা ঘূঁসা
ঘেরা (উ)
ঘেঁসা (উ) = ঘুস্‌না
ঘোচান (উ) = কোঁচনা, ঘচ, ঘচা

চওড়া (উ) = ,চৌড়া
চক্‌মকি (পা) = চক্‌মাক্ বা চখ্‌মাখ্

চট [শীঘ্র] (উ)
চটক [দীপ্তি] (উ)
চটকান (উ)
চট্‌চটে (উ) = চপট্‌না
চটপট (উ)
চটা (উ) = চটাক্
চড়চড় (উ)
চড়বড় (উ)
চড়ন্দার (উ) = চঢ়ন্দার
চড়া [আরোহণ] (উ) = চঢ়না
চড়া [দ্বীপ] (উ) = চর
চম্পট (উ)
চরবী (পা)
চরস (উ)
চল্কান (উ) = ছলক্‌না
চষমা (পা)
চা (পা)
চাউল (উ)
চাকর (পা)
চাকরানী (পা) চক্‌রাণী
চাকরী (পা)
চাকা [আস্বাদ] (উ) = চখনা, চীখনা
চাঙারি (উ) = চঙ্গেরী
চাটনী (পা) = চাষনী
চাটা (উ) = চাট্‌না
চাড় (উ)
চাড়ী (উ)
চাদর (পা) = চদ্দর
চাদান (পা)
চাপকান (উ) = চপকন্

চাপড়াসী (উ) = চপ্‌রাসী
চাপা (উ) = চাপনা
চাপা [আবরণ] (উ) = চপনী
চাবি (উ) = চাবী
চাবুক (পা)
চাম্‌চে (পা) = চম্‌চা
চারা [উপায়] (পা)
চারা [বৃক্ষ] (উ)
চাল (উ)
চালতা (উ) = চল্‌তা
চালাক (পা)
চালাকী (পা)
চালান্ (পা)
চাহা (উ) = চাহনা
চিড়িয়া (উ) = খানা (পা)
চিত (উ)
চিতাবাঘ (উ) = চীতা
চিতি [সর্প] (উ) = চিত্তী
চিনচিন (উ) = চঞ্চনানা
চিনি (উ) = চীনী
চিমটন (উ) = চিমট্‌না
চিম্‌টা (উ)
চিম্‌টা (উ)
চিম্‌টী (উ)
চীক (তু)
চুক (উ)
চুকতি (উ)
চুকলি (পা) = চুগ্‌লী
চুকান (উ)
চুটকী (উ)
চুনোট (উ) = চুনৌটা
চুপ (উ)

চুপচাপ (উ)
চুলকনা (উ)=চুল
চুলকান (উ)=চুল
চুলবুলা (উ)
চুআ [সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ](উ)
চুড়ী (উ)
চেটাই (উ)=চটাই
চেরা (উ)=চীর্‌না
চেলা (উ)
চেহারা (পা)=চিহ্রা
চোক্‌লা (উ)=চক্‌লা
চোগা (উ)=চোঘা
চোঙা (উ)=চোঙ্গা
চোট (উ)
চোবদার (পা)
চোয়াড় (উ)
চৌকীদার (উ)
চৌদানি (উ)=চৌদানী
চৌবাচ্চা (পা)=
চৌবচ্চা, চঃবচা
চৌরাস্তা (পা)
চৌহদ্দি (উ)
[আরবী 'হদ'=সীমা]

ছ

ছটাক (উ)
ছড়া (উ)=ছড়
ছড়ান (উ)=ছিৎরানা
ছড়ী (উ)
ছয়লাব (আ, পা)=সয়্‌লাব [(আরবী) অফ্‌লা, সিফ্‌লা]

ছপাৎ (উ)=ছপ্‌
ছাই (উ)=ছাঈ
ছাঁকা (উ)=ছাক্‌না
বা ছান্না
ছাঁচ (উ)=সাঁচা
ছাঁটা (উ)=ছাঁটনা
ছাড়া (উ)=ছোড়না
ছাড়ান (উ)=ছোড়ানা
ছাতী [বক্ষঃস্থল] (উ)
ছানা [দুগ্ধবিকার] (উ)
=ছেনা
ছানি [পুনর্বিচার] (আ)
=সানী (তজ্‌বীজ)
ছাপ (উ)
ছাপা (উ)
ছিট (উ)=ছীট্‌, ছীঁট্‌
ছিটকান (উ)=ছিড়ক্‌না
ছিটকিনি (উ)=ছিট্‌কনী
ছিটা (উ)=ছিড়কাও
ছিনান (উ)
ছিপ (উ)=ছীপ্‌
ছিপি (উ)=ঠেপী
ছিলা (উ)=চিল্লা
ছিলিম (উ)=চিলম্‌
ছুটা (উ)=ছুট্‌না
ছুটী (উ) ছুট্টী
ছুড়া, ছোড়া (উ)=ছোড়্‌না
ছেঁচড়, ছেঁচড়া (উ)=
ছিছোড়া
ছেনী (উ)
ছেবলা (উ)=চিবিল্লা

ছেলে (উ)=ছৈল বা ছৈলা
[খোষ পোষাকি
ছোকরা (উ)
ছোট (উ)=ছোটা
ছোবড়া (উ)=ছব্‌ড়া [ঝুড়ি]
ছোঁয়া (উ)=ছূনা
ছোঁয়ান (উ)=ছূআনা

জখম (পা)=জখ্‌ম্‌
জড়াও (উ)
জড়ান (উ)=জড়ানা
জবর (আ)
জবরদস্তী (পা)=জবরদস্তী
জবাই (আ)=জবে
জবাব (আ)=জওয়াব
জব্দ (আ)=জব্‌ৎ
জমকান (উ)=জমকানা
জমা (আ)
জমাওয়াশীলবাকী (পা, আ)
জমাখরচ (পা)=জমাখর্‌চ্‌
জমাদার (আ, পা)
জমান (উ)=জমানা
[আরবী 'জমা' হইতে]
জমাবন্দী (আ, পা)
জমি (পা)=জমীন্‌
জমিজারাৎ (পা, আ)=
জমীন্‌ জিরাৎ
জমিদার (পা)=জমীন্‌দার
জমিদারি (পা)=জমীন্‌দারী
জমিয়া যাওয়া (উ)=জম্‌না
জরি (পা)=জরী

জরিপ (আ) = জরীব
জরিমানা (আ)
জরুর (আ) = জরূর
জরুরী (আ) = জরূরী
জর্দা (পা) = জর্দ
জলপাই (উ)
জল্লাদ (আ)
জহর (আ) = জওহর্
জহরাৎ (আ) = জওহরাৎ
জহুরী (আ) = জওহরী
জাইগীর (পা) = জাগীর
জাইগীরদার (পা) = জাগীরদার
জাঁকড় (উ)
জাজিম (উ) = জাজম
জাদু (পা) = জাদূ
জাদুকর (পা) = জাদুগর
জানলা (উ) = জনেলা
জানোআর (পা) = জানোঅর্
জাফরান্ (আ) = জাফরান্
জাব (উ)
জাবেদা (আ) = জাবিতা
জামরুল (উ)
জামা (পা)
জামিন (আ) = জামিন
জায়গা (উ) = জগা
জায়দাদ (পা)
জারী (আ)
জাল [মিথ্যা] (আ)
জাহাজ (আ) = জহাজ্
জাঁহাপনা (পা)
জাহির (আ) = জাহির্
জাজিয়া (আ) = জিজিয়া

জিদ (আ) = জিদ
জিন (পা) = জীন
জিনিস (আ) জিন্স্
জিম্মা (আ) = জিম্মা
জিলিপি (উ) = জলেবী
জুতা (উ) = জুতা বা জুতি
জুয়া (উ)
জুলুম (আ) = জুলম্
জেয়াদা (আ) = জিয়াদা
জের (পা) = জের
জেরবার (পা) = জেরবার
জেলা (আ) = জিলা
জেল্লা (আ) = জিলা
জোআর (আ) = জজর [ভাটা]
জোঁকা (উ) = জোখনা
জোত (উ)
জোতদার (উ, পা)
জোনাকী (উ) = জুগনী
জোয়ান (পা) = জওয়ান
জোর (পা) = জোর
জোলাপ (আ) = জুল্লাব

ঝ

ঝক্‌ঝক্ (উ) = ঝকাঝক্
ঝক্কি (উ) = ঝক্কী [অতিশয় বাচাল ব্যক্তি]
ঝগড়া (উ)
ঝড় (উ) = ঝড়ী [বৃষ্টি]
ঝড়াঝড় (উ)
ঝপ (উ)
ঝপাৎ (উ) = ঝপাট
ঝপাস (উ)
ঝম্ ঝম্ (উ)
ঝল্‌সান (উ) = ঝুলস্‌না বা ঝুল্‌সানা
ঝাঁক (উ)
ঝাঁকড়া (উ) = ঝাঁকড়
ঝাঁজ (উ) = ঝাঁঝ
ঝাড় (উ)
ঝাড়ন (উ)
ঝাড়ণ (উ) = ঝাড়্‌না
ঝাড়ু (উ) = জারূব (পা)
ঝাড়ুবরদার (উ, পা)
ঝাপ্‌টা (উ) = ঝপট্টা
ঝাল (উ)
ঝালর (উ)
ঝালা (উ)
ঝিমান (উ) = ঝুম্‌না
ঝিল্‌মিলি (উ) = ঝিল্‌মিল্
ঝীল (উ)
ঝুম্‌কা (উ)
ঝুলা (উ) = ঝুল্‌না
ঝুলান (উ) (= ঝুলানা)
ঝুলি (উ) = ঝুল্লা
ঝুনা (নারিকেল) (উ)
ঝুল (উ)
ঝোঁকা (উ) = ঝুক্‌না, ঝোক্‌না
ঝোড় (উ) = ঝূড়
ঝোলা (উ)

টক্কর (উ)
টপ্ (উ)
টপ্পা (উ)
টপ্কান (উ)=টপ্না
টস্কান (উ)=টসক্না
টহলান (উ)
টাক (উ)=টাল
টাঁকা [সেলাই করা] (উ)
টাট্কা (উ)=টট্কা
টানা (উ)
টিক্টিকী (উ)
টিকা [ধূমপানে ব্যবহৃত] (উ)=টিকিয়া
টিকা [বসন্ত রোগ নিবারক] (উ)=টীকা
টিম্ টিম্ (উ)
টীপ (উ)
টুক্, টুকু (উ)
টুক্রা (উ)
টুক্রী (উ)=টোক্রী
টুপী (উ)=টোপী
টুটি (উ)=টোঁটী
টেঁকা [স্থায়ী হওয়া] (উ)= টিকাও, টিক্না
টেড়া (উ)=টেঢ়া
টেপা (উ)=টীপ্না
টোট্কা (উ)
টোপ (উ)
টোল (উ)

ঠ

ঠক্ ঠক্ (উ)
ঠকান (উ)=ঠগানা
ঠগ (উ)
ঠগী (উ)
ঠন্ঠন্ (উ)
ঠমক (উ)
ঠাওরান (উ)=ঠহরানা
ঠাট (উ)
ঠাট্টা (উ)=ঠট্ঠা
ঠাণ্ডা (উ)=ঠণ্ডা
ঠাসা (উ)=ঠুস্না
ঠিক্রা (উ=কোন মৃণ্ময় পাত্রের ভগ্নাংশ)
ঠিকানা (উ)
ঠিলি (উ)=ঠিলিয়া
ঠীক (উ)
ঠীকঠাক (উ)
ঠীকা (উ)
ঠুঁট (উ)=ঠুঁঠা
ঠুসা (উ)=ঠোস্না
ঠেকা, ঠেকো (উ)=ঠেক্
ঠেলা (উ)
ঠেস (উ)
ঠোকর (উ)
ঠোকরান (উ)=ঠুকরানা
ঠোকা (উ)

ড

ডগমগ (উ)
ডবডব (উ)
ডর (উ)
ডরান (উ)=ডর্না
ডাক (উ)
ডাকাইত (উ)
ডাকাইতি (উ)
ডাক্ (উ)
ডাঁটা (উ)=ডঠা
ডাঁটি (উ) ডাঁঠী
ডাব (উ)
ডাবর (উ)
ডাল (উ)
ডিপে (উ)=ডিব্বা, ডিবিয়া
ডিহি (পা)=ডীঃ
ডুকরান (উ)=ডকরানা
ডুব (উ)=ডুব
ডুবা (উ)=ডুবনা
ডুবান (উ)=ডুবানা
ডেক (পা)=দেঘ, দেগ
ডেড় (উ)=ডেঢ়
ডেমাক (আ)=দিমাঘ
ডেমাকে (আ)=দিমাঘী
ডেলা (উ)
ডোবা (উ)
ডোরা (উ)

ঢ

ঢঙ্ [প্রকার] (উ)
ঢপ (উ) ঢব
ঢপঢপ (উ)
ঢল (উ)=ঢলনা
ঢলক্ (উ) ঢলক্না

ঢাকনী (উ)=ঢকনী
ঢাকা (উ)=ঢাঁকনা, ঢকনা
ঢাল (উ)
ঢালা (উ)=ঢালনা
ঢালু (উ)=ঢালু
ঢিপি (উ)=ঢেপা
ঢিমা (উ)=ধীমা
ঢীল (উ)=[অমনোযোগ]
ঢীলা (উ)
ঢুকা, ঢোকা (উ)=ঢুকনা
ঢেউ (উ)
ঢেঁকি (উ)=ঢেঁকা
ঢেকুর (উ)=ডকার, ঢকার
ঢেঁড়স (উ)
ঢেঁড়া (উ)=ঢণ্ডোরা, ঢণ্ঢোরা
ঢেঁড়ি (উ)=ঢেঁড়ী, ঢেড়ী
ঢেম্‌না [সর্পবিশেষ] (উ)=ধামিন্‌
ঢের (উ)
ঢেলা (উ)

——

ত

তক্তপোষ (পা)=তখ্‌ৎপোষ
তক্তা (পা)=তখ্‌তা
তক্‌রার (আ)
তক্‌সীম (আ)
তখ্‌ত (পা)=তখ্‌ৎ
তজ্‌দী (আ)=তস্‌দী
তজ্‌বীজ্‌ (আ)=তজ্‌বীজ্‌
তদ্‌বীর (আ)
তদারক (আ)
তন্‌খা (পা)
তপসিল (আ)=তফসীল
তপিল (আ)=তহবীল
তপিলদার (আ, পা)=তহবীলদার
তফাৎ (আ)=তফাওৎ
তবক (আ)
তবলা (আ)
তমসুক (আ)=তমস্‌সুক্‌
তম্বী (আ)
তয়ফা (আ)=তওফ [চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করা
তর [প্রকার] (আ) তরঃ, তওর
তর্‌কারী (উ)
তর্জমা (আ)
তরতিব (আ)=তরতীব
তরফ (আ)
তরমুজ (পা)=তরবুজ
তলব (আ)
তলবানা (আ, পা)
তল্লাস (পা)=তলাষ
তস্কির (আ)=তক্‌সীর
তস্‌বী (আ)
তস্‌বীর (আ)
তস্‌রূপ (আ)=তসর্‌রুফ
তুহমৎ (আ)=তুহমৎ
তহসীল (আ)
তহসীলদার (আ, পা)
তাউস (আ)
তাওয়া (পা)=তাবা, তওয়া
তাক (আ)
তাকান (উ)=তকানা
তাকিয়া (পা)=তকিয়া
তাগা (উ)
তাগাড় (পা)=তঘার
তাগাদা (পা)=তাকীদ (আ) তকাজা
তাজ (পা)
তাজা (পা)=তাজা
তাজী (পা)=তাজী
তানপুরা (আ)=তম্বুরা
তাবিজ (আ)=তাবীজ
তাঁবু (উ)=তম্বু
তাবেৎ (পা)
তাবেদার (পা)
তাবেদারী (পা)
তামাদী (আ)=তমাদী
তামাম (আ)=তমাম
তামাষা (আ)=তমাষা
তামিল (আ)=তামীল
তার [wire] (পা)
তারিখ (আ)=তারীখ
তারিফ (আ)=তারীফ
তালিকা (আ)=তালীকা [list
তালিম (আ)=তালীম
তালুক (আ)=তাল্লুক
তালুকদার (আ, পা)তাল্লুকদার
তাস (উ)
তিখুর (উ)=তীকুর, তীখুর
তীরন্দাজ (পা)=তীরন্দাজ
তুড়ুকসোয়ার (পা) তুর্কসওয়ার
তুফান (আ)=তূফান
তুর্কী (আ, পা)=তুর্ক, তুর্কী
তুরপন (উ)
তুলতুল (উ)

তেউড়ান (উ) = টেঢ়া
তেজারতি (আ) = তিজারৎ
তেরিজ [আরবী আর্‌জ= সৈন্য একত্র করা]
তৈনিতি (আ) = তাঈনাতী
তৈয়ার (পা)
তৈয়ারী (পা)
তোক (আ) = তওক
তোড়া (উ)
[আরবী 'তুর্‌রা']
তোতলা (উ)
তোতা (পা) = তূতী
তোপ (তু)
তোফা (আ) তুহ্‌ফা
তোবড়া (উ)
তোবা (আ) = তওবা
তোরা [উষ্ণীষের ভূষণ] (আ) = তুর্‌রা
তোষক (পা)
তোষাখানা (পা)
তৌজী (আ)

থ

থক্ থক্ (উ)
থরথর (উ)
থান (উ)
থাপ্পড় (উ) = থপ্পড়
থাবড়া (উ) থপড়া
থাবা (উ) = থাপা
থোক (উ)
থোপ (উ)

দ

দখল (আ) = দখল
দখলদার (আ, পা)
দখলিকার (আ) দখীল
দগদগে (উ) = দগ্‌দগা
দঙ্গল (পা, তু)
দজ্জাল (আ)
দপ্তর (পা) = দফ্‌তর্
দপ্তরখানা (পা) দফ্‌তরখানা
দপ্তরী (পা) = দফ্‌তরী
দফা (আ)
দফাদার (আ, পা)
দম (পা)
দমপোক্তা (পা) = দমপোখৎ
দমবাজী (পা) দমবাজী
দয়েল (উ) = দহেল
দরইজারা (পা, আ)
দরকার (পা)
দরখাস্ত (পা) দরখাস্ত্
দর্‌গা (পা)
দরজা (পা) = দরওয়াজা
দর্‌জা (আ)
দরজী (পা) = দরজী
দরদ (পা) = দর্‌দ
দরদালান (পা)
দরপেষ (পা)
দরবস্ত (পা)
দরবার (পা)
দরবেষ (পা)
দর্‌মা (উ)
দর্‌মাহা (পা)
দরাজ (পা) = দরাজ
দরুণ (পা) = দরূণ
[মধ্যে, ভিতরে]
দলমচল (উ) = দলমসল
দলিল (আ) = দলীল
দশসালা (উ)
দস্তক (পা)
দস্তখৎ (পা)
দস্ত্‌বস্ত্ (পা)
দস্তা (উ)
দস্তানা (পা)
দস্তাবেজ (পা) = দস্তাবেজ
দস্তুর (পা, আ) = দস্তূর
দস্তুরি (পা) দস্তূরী
দাওয়া (আ)
দাওয়ান (পা) = দীওয়ান
দাখিল (আ)
দাখিলখারিজ (আ)
দাখিলা (আ)
দাগ (পা) = দাঘ
দাগা (পা) = দঘা
দাগাবাজ (পা) = দঘাবাজ
দাগাবাজী (পা) = দঘাবাজী
দাগী (পা) = দাঘী

দাঙ্গা (উ) = দঙ্গা

দাঙ্গাবাজ (উ, পা) = দঙ্গাবাজ

দাদন (পা)

দাদা (উ)

দাদ্‌রা (উ)

দানা (পা)

দাব (উ) = দবাও

দাবা [শাসন করা] (উ) = দব্‌না

দাম (উ)

দামামা (পা) = দমামা

দামাল (পা) = দমাল

দারুচিনি (পা) = দারচীনী

দারোগা (পা) = দারোঘা

দালান (পা)

দালাল (আ) = দল্লাল

দালালি (আ) = দল্লালী

দাবী (আ)

দাস্ত (পা) = দস্ত

দিক্, দেক্ [বিরক্ত করা] (আ)

দিক্‌দারী (আ, পা)

দিগর (পা)

দিলখোষ্ (পা)

দুনিয়া (আ)

দুরাহা (পা)

দুর্মুস (উ)

দুলাল (আ) = দলাল

দুলিচা [উর্দ্দু দুলীচা পারসী কালীচা]

দুষ্‌মন্ (পা)

দুষমনী (পা)

দেউড়ী (উ) = ডিওঢ়ী

দেউলে (উ) = দেওয়ালিয়া

দেওয়ানী (পা) = দীওয়ানী

দেড় (উ) ডেঢ়

দেনা (আ) = দইন্

দেনদার, দেনাদার (আ, পা) = দইনদার

দেমাগ (আ) = দিমাঘ

দেয়াল (পা) = দীওয়াল, দীওয়ার

দেরি (পা) = দের, দেরী

দেসেলাই (উ) = দিআসলাঈ দিএসলাঈ

দোকান (পা) = দুকান

দোকানদার (পা) = দুকানদার

দোকানদারী (পা) = দুকানদারী

দোকানী (পা) দুকানী

দোনা (উ)

দোয়া [আশীর্ব্বাদ] (আ)

দোয়াত (আ) = দওআৎ

দোয়াস্তা (পা) = দোআতষা

দোরস্ত (পা) দুরুস্ত্

দোরোখা (পা)

দোলাই (উ) দুলাঈ

দোশালা (উ)

দোস্ত্ (পা)

দোহাই (উ) = দোহাঈ, দুহাঈ

দৌড় (উ)

দৌড়াদৌড়ি (উ)

দৌলত (আ)

ধ

ধক্‌ধক্ (উ)

ধড় (উ)

ধপ (উ) = ধপ্পা

ধমক (উ)

ধমকান (উ) = ধমকানা

ধস (উ)

ধাঁধা (উ) = ধন্ধ্‌লা

ধাঙ্গড় (উ) ধঙ্গর [রাখাল অর্থে]

ধাড়া (উ) = ধড়া

ধামা (উ)

ধুকড়ী (উ)

ধুকধুকী (উ)

ধুমধাম (উ)

ধোঁকা (উ) = ধোখা

ধোসা (উ)

নওআবাদ (পা)

নওবৎ (আ)

নওবৎখানা (আ পা)

নক্‌দী (আ)

নকল (আ) = নকল্

নকলনবীস্ (আ, পা)

নকীব (আ)

নক্কা (ace) (উ)

নক্সা (আ) নক্‌ষা, নক্‌ষ্

নগত, নগদ, নগদা (আ) = নক্‌দ, নক্‌দা

নঙ্গর (পা)=লঙ্গর
নঙ্গগজ (উ)=লচক
নজর (আ)=নজ্‌র
নজরানা (আ,পা)=নজ্‌রানা
নজির (আ)=নজীর
নটকান (উ)=লটকন্
নটখট(উ)=[কপট বা দুষ্ট]
নটখটী (উ)=[কপটতা]
নটপট (উ)=লট্‌পট্
নথী (উ)
নফর (আ)
নবাত (পা)
নবাব (আ)=নওয়াব
নবাবী (আ) নওয়াবী
নবী (আ)
নমাজ (পা)=নমাজ্
নমুনা (পা)=নমুনা
নর্দামা(পা)=নাওদান,নাবদান
নবিস (পা)=নবীস্
নবীসন্দা (পা)
নসীব (আ)
নসীহৎ (আ)
নাকবুল (আ)
নাখুষী (পা)
নাগরা (আ)=নকারা, নক্কারা
নাচার (পা)
নাচারী (পা)
নাজিম (আ)=নাজ্‌িম
নাজির (আ)=নাজ্‌ির
নাট্টু (উ)=লট্টূ
নাতোয়ান (পা)=নতওয়ান্
নাতোয়ানি (পা)=নতওয়ানী

নাপাক (পা)
নাবালক (আ)=নাবালিঘ্
নাবালকী (আ) নাবালিঘী
নামজাদা (পা) নামজদ্
নামা [লিখন] (পা)
নায়েব (আ)=নাইব
নায়েবী (আ)=নাইবী
নারাজ (পা)=নারাজ্
নাল [ঘোড়ার]=(আ)
নালবন্দ (আ, পা)
নালায়েক (আ)
নালিষ (পা)
নাষপাতী (পা)
নাস্ত ও নাবুদ (পা)=
নীস্ত ও নাবুদ
নাহক (আ)
নিকা (আ)=নিকাহ্
নিক্তী (উ)
নিজ জোত (উ)
নিজাম (আ)=নিজ়াম
নিড়ন (উ)=নিরানা
[শস্যকাটা]
নিড়ানী [উর্দ্দূ নিরানা হইতে]
নিমক (পা) নমক্
নিমকহারাম (পা)=নমক্‌হরাম
নিমরাজী (পা)=নীমরাজী
নিরালা (উ)
নিরীখ (পা)=নির্খ্
নিলাম (উ)=নীলাম
নিলামি (উ)=নীলামী
নিষান্ (পা)
নিষানা (পা)

নিস্‌ফী (আ)=নিস্‌ফ্
নিহাই (উ)=নিহাঈ
নুল (উ)=লুলা
নুর (আ)
নেংড়া (উ)=লঙ্গড়া
নেকড়া (বোধ হয় উর্দ্দূ চিথড়া হইতে)
নেকড়ে (উ)=লক্‌ড়া
নেকাম, নেক্‌রা (পা)=নখ্‌রা
নেজা (বড় সা) (পা)=নেজা
নেটা (উ)=নাটা (খর্ব্ব)
নেবু (উ)=নীম্বু
নেষা (আ)=নষা, নষোয়া
নেষাখোর (আ, পা) নষাখোর
নেহাত (আ)=নিহায়ৎ
নোকর (পা)=নওকর
নোক্তা (আ)=নুক্তা
নোক্‌সান (আ)=নুক্‌সান
নোড়া (উ)=লোঢ়া
নোংরা (আরবী নজিস্ হইতে)

পচতান (উ)=পচ্‌তানা
পচ্‌পচ (উ)
পছন্দ (পা)=পসন্দ্
পঞ্জাব (পা)
পড়পড় (উ)
পত্তনিদার (সং পত্তন+ পারস্য দার)

পনীর (পা)
পয়গম্বর, পেগম্বর (পা) পয়গম্বর
পয়মন্ত, পয়মাষ (পা) পয়মাইষ
পয়লা (উ)=পহলে
পয়সা (উ)=পৈসা
পরকোলা (পা)=পরকালা
পরগনা (পা)
পরটা (উ)=পরাঠা
পরী (পা)
পরেশান (পা)
পরোয়র (পা)
পরোয়রিষ (পা)
পরোয়া (পা)
পরোয়ানা (পা)
পর্দা (পা)
পর্দানষিন্ (পা)=পর্দানিষীন্
পলক (পা)
পলা [তৈলাদি তুলিবার পাত্র] (উ)
পলটন (উ)
পল্‌তে (আ) ফলীতা, ফতীলা
পশম (পা)
পশমী (পা)
পঁহুছন (উ)=পহুঁচনা
পাইকস্তা (পা)=পায়কাষ্‌ৎ
পাইকার (পা)=পায়কার
পাইখানা (পা)=পায়খানা
পাউরুটি (উ) পাঁওরোটী
পাখোয়াজ (উ)=পখাওয়জ
পাগড়ী (উ)=পগড়ী
পাজা (পা)=পজাওজা
পাজামা (পা)
পাঞ্জা (পা)=পঞ্জা

পাটোয়ারী (উ)=পটোয়ারী
পাঁঠা (উ)=পাঠা
পাঠান্ (উ)=পঠান্
পাড়া [ক্রিয়াপদ] (উ) পাড়না
পাতলা (উ)=পৎলা
পান্না (উ)=পন্না
পান্‌সি (উ)=পন্‌সোঈ
পাঁপর (উ)=পাপড়
পাপোষ (পা)
পায়দা (পা)=পয়দা
পায়মাল (পা)=পায়েমাল
পারসী (পা)
পালোয়ান (পা)=
পহ্‌লোয়ান
পাল্‌কী (উ)
পালটান (উ)=পলটানা
পাল্লা (পা)=পল্লা
পাড়া (পা)=পড়া
পাহাড় (উ)=পহাড়
পিক (পানের) (পা)=পীক
পিক্‌দান } (পা)=পীক্‌দান
পিক্‌দানি }
পিচকিরি (উ) পিচকারী
পিটা, পেটা (উ)=পিটনা
পিটনা (উ)=পিটনী
পিরাণ (পা)=পীরাহন্
পিলপে (পা)=পীলপায়া
পিলসুজ (পা)=পতীলসোজ
(আ) ফতীলাসোজ
পীর (পা)
পুঁছা (উ)=পুঁছনা
পুটলী (উ)=পোটলী

পেঁচ (পা)=পেচ
পেঁজা (উ)=পীঞ্জনা
পেঁয়াজ (পা)=পিয়াজ
পেয়াদা (পা)=পিয়াদা
পেয়ালা (পা)=পিয়ালা
পেরু (উ)=পেরূ
পেরোজ (পা)=ফীরোজা
পেশ (পা)
পেশকবচ (পা, আ)=
পেশকবজ
পেশকশ (পা)
পেশকার (পা)
পেশা (পা)
পেশাদার (পা)
পেশোয়া (পা)
পেশোয়াজ (পা)=পেশোয়াজ
পেস্তা (পা)=পিস্তা
পোক্ত, পোক্তা(পা) পোখতা
পোক্‌রাজ (উ)=পুখরাজ
পোঁচড়া (উ)=পুচারা
পোটলা (উ)=পোটালা
পোদ্দার (পা)=পোদ্দার,
ফোতাদার
পোল (পা)=পুল
পোলাও (পা)=পুলাও
পোলাদ (পা)=পুলাদ
পোশাক (পা)
পোশাকী (পা)
পোস্ত (পা)=পোস্ত্
পোস্তা (পা)=পুষ্‌তা
পোস্তাবন্দী (পা)=পুষ্‌তাবন্দী

ফ

ফকীর (আ)
ফকীরী (আ)
ফক্কড় (উ)
ফটক (উ)=ফাটক
ফড়ে (উ)=ফড়িয়া
ফতে (আ)=ফতঃ
ফতুয়া (আ)=ফতুহী
ফতুর (আ)=ফুতুর
ফতোয়া (আ)
ফন্দী (পা)=ফন্দ্
ফয়সালা (আ)=ফয়সলা
ফরক্ (আ)=ফর্ক্
ফরমাচ (পা)=ফরমাইষ্
ফরমাচী (পা)=ফরমাইষী
ফরমান (পা)
ফরমাবরদার (পা)
ফরসা (উ)=ফর্চা, ফর্ছা
ফরাস (আ)=ফর্রাষ
ফরিয়াদী (পা)
ফর্দ (আ)=ফর্দ্, ফর্দী
ফল্সা (উ)=ফাল্সা
ফলানা (আ)=ফলাঁ,ফলানা
ফসল (আ)= ফস্ল্
ফস্লী (আ)
ফস্কা (আ)=ফস্খ্
ফস্কান (উ)=ফস্কানা
ফাঁক (উ)
ফাজিল(আ)=ফাজিল[পণ্ডিত]
ফাঁদ (উ)=ফান্দ, ফান্দা
ফানস (আ)=ফানুস
ফায়দা (আ)=ফাইদা

ফার্সী (পা)
ফালত (উ)=ফাল্তু
ফাঁস (উ)
ফাঁসী (উ)
ফিকির (আ)=ফিক্র্
ফিতা (পোর্ত্তুগীস)=ফীতা
ফির্কী (উ)
ফিরৎ, ফেরৎ (উ)=ফির্‌ৎ
ফিরা, ফেরা (উ)=ফির্না, ফের্না
ফিরান (উ)=ফিরানা
ফিরিঙ্গী (পা)=ফরঙ্গী
ফিরিবি (পা)=ফরেব,ফরেবী
ফিরিস্তি (পা)=ফিহরিস্ত্
ফী [প্রত্যেক] (আ)
ফুটকী (উ)
ফুরসৎ (আ)
ফুলকপি (উ)= ফুলকোবী
ফের (উ)
ফেরফার (উ)
ফেরা [চূর্ণ ইত্যাদি মাপিবার পাত্র] (উ)
ফেরাফেরী (উ)
ফেরার (আ)=ফিরার
ফেরারী (আ)=ফিরারী
ফেরীওয়ালা (উ)
ফেরোজ (পা)=ফীরোজ
ফেলাও (উ)=ফয়লাও
ফেসাদ (আ)=ফসাদ
ফৈজৎ (আ)=ফজীহৎ
ফৌটা (উ)=কোটা

ফোঁপরা (উ)=ফোফী
ফোয়ারা (আ)=ফওআরা
ফোস্কা (উ)=ফুট্কা
ফৌজ (আ)=ফওজ্
ফৌজদার (আ,পা)=ফওজ্‌দার
ফৌজদারী (আ,পা)=ফওজদারী
ফৌত (আ)=ফওৎ

———

ব

বই (উ)=বহী
বউনি (উ)=বহনী
বকরা (পা)=বখ্রা
বক্‌সি (পা)=বখ্সী
বক্‌সিস্ (পা)=বখ্শিশ্
বকেয়া (আ)=বকীয়া,বকায়া
বখিল (আ)=বখীল
বখেয়া (পা)=বখিয়া
বগল (পা)=বঘল
বগলী (পা)=বঘ্লী
বজ্‌রা (উ)
বজ্জাত [(পা)বদ্+(আ)জাত]
বদ্ (পা)
বদ্‌নাম (পা)
বদ্‌মায়েস [(পা) বদ্+(আ) মাষ]
বদল (আ)
বদলী (আ)
বনাত (উ)
বনেদ (পা)=বুনিয়াদ
বন্দর (পা)
বন্দা (পা)
বন্দুক (আ)=বন্দূক
বন্দোবস্ত (পা)=বন্দোবস্ত

বয়নামা (আ বয়+পা নামা)
বয়ান্ (আ)
বরকন্দাজ(আ বরক্=পা অন্দাজ)
বর্খাস্ত (পা)
বরগা (উ)=বর্গা
বরতরফ (পা, আ)
বরদাস্ত (পা)=বরদাশ্ৎ
বর্পি (পা)=বর্ফী
বরফ (পা)=বর্ফ্
বরবাদ (পা)
বরাৎ (আ)
বরাবর [সোজা] (পা)
বর্শা [অস্ত্র] (উ) বর্ছা, বর্ছী
বলা (উ)=বোল্না
বস্তা (পা)
বহর্ (আ) [নদী]
বহাল (পা, আ)
বাই (উ)
বাকী (আ)
বাগ, বাগান (পা)=বাঘ্
বাগাৎ (পা)=বাঘাৎ
বাগিচা (পা)=বাঘীচা
বাঁচা (উ) বচ্না
বাঁচান (উ)=বচানা
বাজ (আ)=বাজ্
বাজার (পা)=বাজার
বাজী (পা)=বাজী
বাজীগর (পা)=বাজীগর
বাজু (উ বাজু ; পা বাজু=হস্ত)
বাজুবন্দ (পা)=বাজুবন্দ্
বাজে [সাধারণ] (আ)=বাজে
বাজেয়াপ্ত (পা)=বাজইয়াফ্ৎ

বাঁট (উ)=বেঁট
বাটকারা (উ)=বট্খরা
বাটপাড় (উ)=বট্পাড়
বাটপাড়ী (উ)=বট্পাড়ী
বাঁটা (উ)=বট্টা
বাটালি=(উ)=বটালী
বাতাসা (উ)=বতাসা
বাতিল (আ)
বাদ (আ)
বাদশা (পা)=বাদশাঃ
বাদশাহী (পা)
বাদাম (পা)
বাদামী (পা)
বানান (উ)=বনানা
বাপ (উ)
বাফ্তা (পা)
বাব (আ)
বাবৎ (আ)
বাবু (উ)=বাবূ
বায়না (আ)=বয়ানা
বায়া (আ)=বয়
বার (উ)=বারঃ
বারুদ (পা)=বারূদ
বারেণ্ডা (পা)=বরামদা
বালতি (উ)=বালটী
বালাই (আ)=বলা
বালাখানা (পা)
বালাপোষ (পা)
বালিশ (পা)
বাবর্চি (পা)=বাওর্চী
বাবর্চিখানা (পা)=বাওর্চীখানা
বাস্ [যথেষ্ট] (পা)=বস্

বাসিন্দা (পা)
বাসী [পর্য্যুষিত] (উ)
বাহাদুর (পা)=বহাদুর্
বাহাদুরী (পা)=বহাদুরী
বাহার (পা)=বহার
বিঘা (উ)=বীঘা
বিচালি (উ)=বিচালী
বিছান (উ)=বিছানা, বিছাদনা
বিছানা (উ)=বিছোনা
বিটল (আ)=বয়তল্
বিদ্রূপ (উ)=বিরানা
বিবী (উ)=বীবী
বিমা (উ)=বীমা
বিমার,বেমার (পা)=বীমার
বিলকুল (আ)
বিলান (উ)=বিলানা
বিহীদানা (পা)
বুজন (উ) বুজানা
বুজ্রুগী (পা)=বুজর্গী[মহত্ত্ব]
বুট [কলাই](উ)= বূঁট
বুড়া [মগ্ন] (উ)=বুর্না
বুরুজ (আ)=বুর্জ্
বুলবুল (পা)
বুলী (উ)=বোলী
বেআক্কেল (পা,আ)বেআক্ল্
বেআদব (পা, আ)
বেআদবী (পা)
বেআন্দাজ (পা) বেআন্দাজা
বেআবরু (পা)
বেইজ্জৎ (পা,আ)বেইজ্জৎ
বেইমান (পা)=বেঈমান
বেএক্তার (পা)বেইখ্তিয়ার

বেওকুফ (পা, আ)=বেওকুফ
বেওয়া (পা)
বেওয়ারিস্‌ (পা, আ)
বেকায়দা (পা, আ) বেকাইদা
বেকার (পা)
বেগম (তু)
বেগানা (পা)
বেগার (পা)
বেগারী (পা)
বেচারা (পা)
বেজায় (পা)=বেজা
বেজার (পা)=বেজার
বেজী (উ)=বীজী
বেটা (উ)
বেঢপ (পা, উ)=বেঢব্‌
বেদম (পা)
বেদস্তুর (পা)=বেদস্তূর
বেদানা (পা)
বেদাব (পা, উ)
বেদীন (পা)
বেনামি (পা)=বনামে
বেবন্দোবস্ত (পা)=বেবন্দোবস্ত্‌
বেবাক (পা, আ)
বেরেশা (পা)
বেলোয়ারি (আ)=বিল্লোরী
বেশ [উত্তম] (পা)
বেশী (পা)
বেসম (উ)=বেসন
বেহদ্দ (পা, আ)=বেহদ্‌
বেহায়া (পা)=বেহয়া
বেহিসাব (পা, আ)
বেহোশ (পা)

বৈঠক (উ)
বোচ্‌কা, বুচ্‌কী (তু)=বুকচা
বোঁচা (উ)=বূচা
বোঝা (উ)=বোঝ, বোঝা
বোল (উ)
ব্যারাম (পা)=বেআরাম [আরামের অভাব]

ভ

ভক্‌ (উ)=ভভক্‌
ভড়ং (উ)=ভড়ক্‌
ভড়কান (উ)=ভরক্‌না
ভাওলী (উ)
ভাগান (উ)=ভগানা
ভাটা (উ)=ভাঠা
ভাটি (উ) ভাঠী
ভালাই (উ)=ভলাঈ
ভাশুর (উ)=ভয়্‌সুর্‌
ভিজন (উ)=ভীগ্‌না
ভিজা (উ)=ভীগা
ভিটা (উ)=ভীটা
ভিড় (উ)=ভীড়
ভিন্‌ভিন্‌ (উ)=ভিন্‌ভিনানা
ভুঁকান (উ)=ভোঁক্‌না
ভুঁড়ি (উ)=ভুণ্ডী [কদাকার]
ভুল (উ)=ভুল
ভুলা, ভোলা (উ)=ভুল্‌না
ভুলান (উ)=ভুলানা
ভুসি (উ)=ভুস্‌, ভুসা, ভুসি
ভেট (উ)
ভোঁতা (উ)=ভোঁথা
ভোর (উ)

ম

মই (উ)=মঈ
মকদ্দমা, মোকদ্দমা } (আ)=মুকদ্দমা
মকমল (আ)=মখমল
মক্কা [শস্য] (উ)=মকাঈ, মকঈ
মক্কেল (আ)=মুঅক্কিল
মক্স (আ)=মশক্‌
মখ্‌ম (আ)=মুহকম্‌
মগ (পা)=মুঘ্‌
মগজ (পা)=মঘজ্‌
মচকান (উ)=মচক্‌না
মচ্‌মচ্‌ (উ)
মজ্‌কুর (আ) মজ্‌কুর
মজবুত (আ) মজ্‌বুৎ
মজলিস্‌ (আ)
মজা (পা) মজা, মজাখ্‌
মজাদার, মজিদার } (পা)=মজাদার
মজুত (আ)=মৌ
মজুম্‌দার (আ, পা)=মজ্‌মু [আদার
মজুর (পা)=মজ্‌দুর
মজুরি (পা) মজদুরী
মঞ্জুর (আ)=মন্‌জূর
মট্‌কী (উ)
মটর (উ)
মৎলব (আ)
মতিচুর (উ)=মোতিচুর
মদৎ (আ)=মদদ্‌
মদ্দ, মদ্দা (পা)=মর্দ্‌
মদ্দানি (পা)=মর্দ্মী, মর্দানগী
মনক্কা (আ)=মুনক্কা

মনসবদার (আ, পা)
মনিব (আ) = মুনীব
মফস্বল (আ) = মুফস্‌সল
মবলগ (আ) = মব্‌লঘ্‌
ময়দা (পা)
ময়দান (পা)
ময়না (উ) = মৈনা
মরিচা, মর্চ্চা (পা) = মোর্চা
মর্জি (আ) = মর্জী
মসম (আ) = মোসম্‌
মলম (আ) = মর্হম
মলমল (উ)
মলম্বা (আ) = মুলম্মা
মশক [চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্র] (পা) = মশ্‌ক্‌
মশাল (আ)
মশালচী (আ)
মস্কারা (আ) = মস্খরা
মস্‌জিদ্‌ (আ)
মস্‌নদ্‌ (আ)
মস্‌লা (আ) = মসালিঃ
মহকুমা (আ) = মহকমা
মহম্মদ (আ) = মুহম্মদ
মহরম (আ) = মুহর্‌রম
মহল, মহাল (আ)
মহলৎ (আ) = মুহলৎ
মহল্লা (আ)
মহল্লাদার (আ, পা)
মহাপায়া (আ) = মুহাফা
মহাফেজ (আ) = মহাফিজ
মহাফেজখানা(আ)মহাফিজ্‌খানা
মাকড়ী (উ) = মুর্কী

মাকু (উ) = মাখূ
মাখন (উ) = মক্‌খন, মথন্‌
মাগা (উ) = মাঙ্গ্‌না
মাগী (উ) = মাঁগী
মাঝী (উ)
মাটা(উ)মাঠা, মট্‌ঠা[ঘোল অর্থে]
মাজুল (আ) = মাজূল
মাৎ (পা)
মাতব্বর (আ) = মোতবর্‌
মাতব্বরী (আ) = মোতবরী
মাতোয়ালী (আ) = মুতঅল্লী
মাদান, মাদোআন(পা)মাদিয়ান
মাদার (আ) = মদার
মাদী (পা) = মাদীন, মাদা
মাদ্রাসা (আ) = মদ্রসা
মানা [নিষেধ] (আ) = মনা
মানে (আ) = মানী, মানা
মাফ (আ)
মাফিক (আ) = মুআফিক্‌, মুআফকৎ
মামলা (আ)
মামুলি (আ) = মামূল
মায় (আ) = মা
মারফৎ (আ) = মারিফৎ
মাল (আ)
মালখানা (= আ, পা)
মালগুজার (পা) = মালগুজার
মালগুজারী (পা) = মাল-গুজারী
মালদার (আ, পা)
মালাই (উ) = মলাঈ
মালিক (আ)

মালিকানা (আ, পা)
মালিকী (আ)
মালিশ (পা)
মালুম (আ) = মালুম
মাসহারা (আ) = মুষাহ্‌রা
মাশুল (আ) = মহস্থূল
মাহা (পা) = মাঃ, মাহীনা
মাহিনা (পা) = মাহিআনা
মিছ্‌রি (আ) = মিস্‌রী
মিটমিট(উ) = মট্‌কানা, মটক্‌না
মিটান (উ) = মিটানা
মিনা (পা) = মীনা
মিয়াঁ (উ)
মিয়াঁজী (উ)
মির্জা (পা) = মির্জা, মীর্জা
মিসর (আ) = মিস্‌র্‌
মিসি (উ) = মিসী
মিহি (পা) = মিহীন্‌
মীর (আ)
মীরবখ্‌শী (পা)
মীরাস (আ)
মীরাসদার (আ, পা)
মীরাসী (আ)
মুক্তার, মোক্তার (আ) = মুখ্‌তার
মুক্তারী, মোক্তারী(আ) মুখ্‌তারী
মুচ্‌কান (উ) = মুস্কানা
মুচঙ্গ (পা) = মুচঙ্গ্‌
মুচড়ান, মোচড়ান(উ) = মচোড়্‌ন
মুচলম (আ) = মুৎলকন্‌
মুচি (উ) = মোচী
মুচ্ছুদ্দি (আ) = মুতসদ্দী
মুটে (উ) = মোটিয়া, মোঠিয়া

মুদি (উ)=মোদী
মুদ্দাই (আ)=মুদ্দঈ
মুনফা (আ)=মনাফি
মুন্‌শী (আ)
মুন্‌শীআনা (আ, পা)
মুন্‌সব (আ)=মুন্‌সিফ্‌
মুন্‌সবী (আ)=মুন্‌সিফী
মুনাসিব (আ)
মুফ্‌তী (আ)
মুরগী (পা)=মুর্ঘী
মুরুব্বি (আ)=মুরব্বী
মুলতবী (আ)
মুলুক, মুল্লুক (আ)=মুল্ক্‌
মুস্কিল (আ)
মুস্‌ড়ান (উ)=মুর্‌ঝানা
মুসলমান (আ)
মুসলমানী (আ)
মুসবিদা (আ)=মস্‌বদা,মুসব্বদা
মুসাফের (আ)=মুসাফির্‌
মুস্তফী (আ)=মুস্তওফী, মুস্তফা
মুস্তাজির (আ)
মুস্তাজরী (আ)
মুহুরি [কেরাণী] (আ)=মুহর্‌রির্‌
মুহুরি [নর্দামা] (পা)=মুহ্রী
মেওয়া (পা)
মেক (পা)=মেখ্‌
মেকদার (আ)=মিক্‌দার
মেকি (পা)=মেখী
মেজাজ (আ)=মিজাজ
মেতর / মেথর } (পা)=মিহ্‌তর,মেহ্‌তর্‌
মেদি (উ)=মেঁহদী

মেয়াদ (আ)=মীয়াদ্‌
মেরামত (আ)=মরম্মৎ
মেহনত (আ)=মিহনৎ
মেহনতানা(আ,পা)=মিহনতানা
মেহনুতে (আ)=মিহ্‌নতী
মেহেরবানী (পা)=মিহ্‌র্‌বানী
মোকরর (আ)=মুকর্‌রর্‌
মোকররী (আ)=মুকর্‌ররী
মোকাবেলা (আ)=মুকাবলা
মোকাম (আ)=মকাম, মকান
মোগল (পা)=মুঘল
মোচ (উ)=মুছ্‌
মোচড় (উ)=মচোড়
মোজা (পা)=মোজা
মোট (উ)=মোট, মোঠ
মোটা (উ)
মোড় (উ)
মোড়া [আচ্ছাদন করা] (উ) =মড়্‌না, মোড়্‌না
মোড়া [বসিবার] (উ)=মোঢ়া
মোতাএন (আ)=মুতাইন্‌
মোদ্দা (আ)=মাদ্দা, মুদ্দআ
মোপ্ত (পা)=মুফ্‌ৎ
মোম (পা)
মোমজামা (পা)
মোরগ (পা)=মুর্ঘ্‌
মোরব্বা (আ)=মুরব্বা
মোলায়েম (আ)=মুলাইম্‌
মোল্লা (আ)=মুল্লা, মৌলা
মোসাহেব (আ)=মুসাহিব
মোসাহেবী (আ)=মুসাহিবী
মোস্তায়েদ (আ)=মুস্তইদ্‌

মোহর (পা)=মুহ্‌র্‌
মৌজা (আ)=মৌজা
মৌতাত (আ)=মোতাদ্‌
মৌরুসি (আ) মৌরূসী
মৌলবী (আ)
মৌসল (আ)=মুহস্‌সিল্‌ [টেক্স আদায় কারক]

য়ুনান (আ)
য়ুনানী (আ)

র

রওয়ানা (পা)
রক (আ)=রুয়াক
রকম (আ)
রগ (পা)
রগড় (উ) [ঘর্ষণ অর্থে]
রগড়ান (উ)=রগড়্‌না
রদ (আ)
রদ্দী (আ)=রদ্দী
রপ্তানি (পা)=রফ্‌তনী
রফা (আ)
রফানামা (আ, পা)
রবাব (পা)
রবী [শস্য] (আ)
রসদ (পা)
রসিদ (পা)=রসীদ
রুসুম [court fee](আ)=রুসূম
রাই [শস্য] (উ)=রাঈ

রাইয়ৎ (আ)
রাইয়তী (আ)
রাজী (আ) = রাজী
রাজীনামা (আ,পা) = রাজীনামা
রাণ (পা)
রাঁদা, রেঁদা } (পা) = রন্দা
রাবড়ী (উ)
রায় [judgment] (আ, পা)
রাস [লাগাম] (উ)
রাস্তা (পা)
রাহা (পা) = রাঃ
রাহাখরচ (পা) = রাঃখর্‌চ্‌
রাহাজানী (পা) = রাঃজনী
রাহিন্‌ (আ)
রিকিবি, রেকাবি } (পা) রিকাবী, রিকেবী
রুজু (আ) = রুজু্‌
রুবকারী (পা)
রুমাল (পা) = রূমাল
রুলী (উ) = রোলী
রুষণচৌকী (পা) = রোষণচৌকী
রেউড়ী (উ)
রেওয়াজ (আ) = রাইজ্‌, রিওয়াজ্‌
রেকাব (আ, পা) = রিকাব
রেস্তা (পা) = রেখ্‌তা
রেজকি (পা) = রেজ্‌গী
রেজাই (আ, পা) = রজাঈ
রেয়াৎ (আ) = রিআয়ৎ
রেশম (পা)
রেশমী (পা)
রেশবৎ (আ) = রিশোওৎ
রেশা (পা)
রেহাই (পা) = রহাঈ
রেহেন্‌ (আ) = রিহন্‌
রোএদাদ (পা) = রূদাদ
রোক [রাগ] (পা) = রক্‌
রোক্‌সোত, রোক্‌সোদ } (আ) = রুখ্‌সৎ
রোজ (পা) = রোজ্‌
রোজগার (পা) = রোজ্‌গার
রোজগারী (পা) = রোজ্‌গারী
রোজনাম্‌চা (পা) = রোজ্‌নাম্‌চা
রোজনামা (পা) = রোজ্‌নামা
রোজা (পা) = রোজ়া
রোশনাই (পা) = রোশ্‌নাঈ

ল

লক্‌লক্‌ (আ) = লক্‌লকা
লক্ত (পা) = লখ্‌ৎ
লট্‌কান [ক্রিঃ] (উ) = লট্‌কানা
লট্‌কান্‌ [নৈবেদ্যাদি রাখিবার আধার] (উ) = লট্‌কন্‌
লড়া (উ) = লড়্‌না
লড়াই (উ) = লড়াঈ
লড়ালড়ী (উ)
লস্কর (আ)
লহমা (উ) = লম্‌হা
লাএক্‌ (আ) = লাইক্‌
লাওয়ারিস্‌ (আ)
লাখরাজ, লাখরাজী (আ)
লাগাম (পা) = লগাম, লঘাম
লাচার (আ)
লাচারী (আ)
লাটিম, লাট্টু (উ) = লট্টূ
লাতি, লাথি (উ) = লাৎ
লাল (পা)
লালা [উপাধি] (উ)
লাশ (পা)
লিচু (উ) = লিচু, লিচী
লুই (উ) = লোঈ
লুচি (উ) = লুচঈ
লূ (উ) = লূঃ, লূক্‌
লেই (উ) = লেঈ, লিহাঈ
লেঙ্গটি (উ) = লঙ্গোট, লঙ্গোটা, লঙ্গোটী
লেংড়া (উ) = লঙ্গ্‌ড়া
লেপ [গাত্রাবরণ] (আ) = লিহাফা
লেফাফা (আ) = লিফাফা
লোক্‌সান (আ) = নুক্‌সান্‌
লোচ্চা (উ) = লুচ্চা
লোটা (উ)
লোয়াজিমা (আ) = লওয়াজ়িমা

ব

বাঃ (পা)
বাহবা (পা) = বাঃ বাঃ
বিলাত (আ) = বিলায়ৎ
বিলাতী (আ) = বিলায়তী

শতরঞ্জী (আ) = শৎরঞ্জী
শয়তান (আ)

শয়তানী (আ)
শাম্‌লা (আ)=শম্‌লা
শিক্‌ (পা)=সীখ্‌
শিক্‌দার (আ, পা)
শিকার (পা)
শিকারী (পা)
শিশি (পা)=শীশী
শোরা (পা)
শোলা (উ)

ষ

ষষ্‌মাহী (পা)=শশ্‌মাহী

সই (আ)=সহীঃ
সইয়া (উ)=সঐয়া
সইস্‌ (আ)=সঈস্‌, সাঈস্‌
সওগাদ (পা)=সওঘাৎ
সওদা (পা)
সওদাগর (পা)
সওদাগরী (পা)
সওয়া (উ)
সওয়ায় / সেওয়ায় (আ)=সিওয়', সিওয়ায়
সওয়ার (পা)
সওয়ারী (পা)
সওয়াল (আ)
সক্‌ (আ)=শওক্‌
সক্ত (আ, পা)=সখ্‌ৎ
সঙ (পা)=শঙ্গ্‌

সঙ্গীন্‌ [bayonet] (পা)
সঞ্জাপ (পা)=সঞ্জাফ্‌
সট্‌কান (উ)=সটক্‌না
সড়া (উ)
সতরঞ্জ (আ) শৎরঞ্জ্‌
সদর (আ)=সদ্‌র্‌
সনদ (আ)
সনাক্ত (পা)=শিনাথ্‌ৎ
সপ (আ) সফ্‌
সপেটা (পা)=শফ্‌তালু
সফেদ (পা)=সুফৈদ্‌
সবুজ (পা)=সব্‌জ্‌
সবুড়, সবুর (আ)=সব্‌র্‌, সব্‌রী
সব্‌জী (পা)=সব্‌জী
সরকার (পা)
সরকারী (পা)
সরগরম (পা)=সর্‌গর্ম্‌
সরঞ্জাম (পা)
সরপোষ (পা)
সরফরাজ (পা)=সর্‌ফরাজ
সরফরাজী [পা] সর্‌ফ্‌রাজী
সরবৎ (আ) শর্‌বৎ
সর্‌বতী (আ) শর্‌বতী
সরবরাহ (পা)=সর্‌বরাঃ
সরবরাহকার (পা)সর্‌বরাঃকার
সরবরাহী (পা)
সরম (পা) শর্ম্‌
সরাই (আ) সরা, সরায়
সরাসীমা (পা)
সরিক (আ)=শরীক্‌
সরিফ (আ)=শরীফ্‌
সরিফা (আ)=শরীফা

সর্ত (আ) শর্ৎ
সর্দার (পা)
সর্দারী (পা)
সর্দী (পা) সর্দ, সর্দী
সস্তা (উ)
সহর (পা)=শহ্‌র্‌
সহুরে (পা) শহ্‌রী
সাএল্‌ (আ)=সাইল্‌
সাকিম (আ) সাকিন্‌
সাগ্‌রেদ (পা)=শাগির্দ্‌
সাগ্‌রেদী (পা)=শাগির্দী
সাগুরি [cup] (পা)সাঘর্‌
সাগূ (উ)
সাঁচ্চা (উ)=সচ্চা
সাজা [শাস্তি] (পা) সজা
সাজোয়াল (তু)=সজাওঅল্‌
সাজোষ (পা)=সাজিশ্‌
সাঁট (উ)=সাঁট, সাঁঠ
সাতনরী (উ)=সৎলড়া,সৎলড়ী
সাদা (পা)
সাফ্‌ (আ)
সাফা (আ)=সফা
সাফাই (আ)=সফাঈ
সাবান (আ)=সাবুন, সাবূন্‌
সাবালক (আ)=বালিঘ
সাবাস (পা)=শবাশ
সাবুদ (আ) সবূৎ
সাবেক (পা) সাবিক্‌,সাবিকা
সামলান (উ)=সম্ভাল্‌না
সামাদান (আ,পা)=শমদান
সামিয়ানা (পা)=শামিয়ানা
শমিয়ানা

সামিল (আ) = শামিল্
সার্খেল (পা) = সর্থ এল্
সারিজমি (পা) = সর্জমীন্
সাল (পা)
সালগাম (পা) = শলঘম্
সালসা (উ)
সালিয়ানা (পা) = সালানা, সালিয়ানা, সালীনা
সালিস, সালিসি (আ) সালিস্
সালিসিনামা (আ, পা) = সালিস্ নামা
সালিসী [মধ্যস্থতা] (আ)
সালু (উ) = সালু
সাহী (পা) = শাহী
সাহেব (আ) = সাহিব্
সাহেবী (আ) = সাহিবী
সিউলি [খর্জ্জুররস ও তাড়ী বিক্রেতা] (আ) = সীওলী
সিকি (উ) = স্ক', স্কী
সিক্কা (পা, আ)
সিটি (উ) = সিট্টি, সীটী
সিড়ি (উ) = সিড়ী, সীঢ়ী
সিন্দুক (আ) = সন্দুক্
সিন্নি, সিরণি (পা) = শীর্ণি শীরীণী
সিপাই, সিপাহী (পা) সিপাহী
সিয়ান, সেয়ানা (পা) সিয়ান্
সিরোপা (পা) = সরোপা
সির্কা (পা)
সিলাই, সেলাই (উ) সিলাঈ
সিহরাম (উ) সিহ্‌রানা, সিহর্না

সুজি (উ) = সূজী
সুড়সুড়ি (উ) = সুর্সুরী
সুদ (পা) = সূদ
সুপারিষ (পা)
সুপারী (উ)
সুবা (আ) = সুবঃ
সুবাদার (আ, পা) = সুবঃদার
সুবাদারী (আ, পা) = সুবঃদারী
সুরৎ (আ) = সূরৎ
সুরু (আ) = শুরূ
সুরুয়া (পা) = শোবা
সুর্কি (পা) = সুর্খী
সুর্তি (আ) = শর্তী
সুর্মা (পা)
সুল্‌তান্ (আ)
সেঁকা (উ) = সেঁক্না
সেখ (আ) = শইখ্
সেগুন (উ) = সাগূন্, সাগোয়ান্
সেতখানা (আ, পা) = সেদ্‌খানা, সিহৎখানা
সেতার / সেতারা } (পা) সিতার / সিতারঃ
সেরা [শ্রেষ্ঠ] (আ) = শিরা [কবিতা-রচনায় শ্রেষ্ঠ]
সেরেস্তা (পা) = সর্‌রিশ্‌তা
সেরেস্তাদার (প) = সর্‌রিশ্‌তাদার / সরিশ্‌তাদার
সেলাম (আ) = সলাম্
সেলামৎ (আ) = সলামৎ
সেলামী (আ) = সলামী

সেলী (উ)
সেহা (পা) = সিয়াহা
সৈয়দ (আ) = সৈয়িদ্
সোঁকা (উ) = সূঁঘ্‌না
সোজা (উ) = সীধা
সোঁটা (উ)
সোঁটাবর্‌দার্ (উ, পা)
সোঁদা (উ) = সোঁধা
সোনামুখী (আ) সনামক্কী
সোপরর্দ্দ (পা) = সুপুর্দ
সোবে (আ) = শুব্‌হ্
সোলে (আ) = সুল্‌হ্
সোলেনামা (আ) = সুল্‌হ্‌নামা
সোঁ সোঁ (উ) = সুম্ সুম্
সোহাগা (উ)
সৌখিন (আ) = শওকীন্
স্রেফ্ (আ) = সির্‌ফ্

হওয়া (উ) = হোনা
হক্ (আ)
হকিয়ৎ (আ) = হকীয়ৎ
হঙ্গামা, হেঙ্গাম (পা) = হঙ্গামা
হজম (আ) = হজ্‌ম্
হজরৎ (আ) = হজ্‌রৎ
হটা (উ) = হট্‌না
হটান (উ) = হটানা
হড়বড় (উ)
হড়হড় (উ)
হদ্দ (আ) = হদ্

হরকরা (পা) = হরকারা
হরজ্ (আ) = হর্জ্
হর্‌দম্ (পা)
হরফ (আ) = হর্ফ্
হরেক (পা) = হর্‌ইয়ক্
হলফ্ (আ) = হল্‌ফ্
হল্‌কা (আ)
হল্লা (উ) = আরবী হম্‌লা শব্দের অপভ্রংশ
হস্তবুদ্ (পা) = হস্ত্‌ওবুঁদ্
হাঁ (উ)
হাউই / হাওয়াই (আ, পা) = হওয়াঈ
হাওদা (আ) = হওদা, হওদজ্
হাওয়া (আ) = হওয়া
হাওলাৎ (আ) = হওয়ালাৎ
হাঁক (উ)
হাঁকান (উ) = হাঁক্‌না
হাকিম (আ) = হাকিম্ (বিচারক), হকীম্ (চিকিৎসক)
হাকিমী (আ) = হকীমী
হাঙ্গর (উ)
হাজৎ (আ)
হাজরী (আ) = হাজিরী
হাজার (পা) = হজার্
হাজি (আ) = হাজী
হাজির (আ) = হাজির
হাজিরজবাব (আ) হাজির্‌জওয়াব্
হাজিরজামিন্ (আ) হাজির্‌জামিন্
হাড়্‌গিল (উ) = হড়্‌গীলা
হাতকড়া (উ) = হথকড়া
হাতিয়ার (উ) = হথিয়ার

হাতুড়ি (উ) = হতোড়া, হতোড়ী, হথৌড়ী
হাতোল (উ) = হথল্
হাঁপান (উ) = হাঁপ্‌না, হাঁফ্‌না
হাব্‌ষী (আ) = হব্‌শী
হামানদিস্তা (পা) = হাওয়ন্‌দস্তা
হামেষা (পা) = হমেশা
হায়রান্ (আ) = হয়্‌রান্
হায়া (আ) = হয়া
হারাম (আ) = হরাম্
হারামজাদা (আ, পা) = হরামজাদা
হাল [অবস্থা] (আ)
হালকা (উ) = হল্কা
হালদার (আ) = হওয়ালাদার
হালাক (আ) = হলাক
হালাল (আ) = হলাল
হালি (আ) = হালী
হালুইকর (আ) = হলোয়াঈ
হালুয়া (আ) = হলোয়া
হাবেলী (আ) = হবেলী
হাঁসিয়া (আ) = হাশিয়া
হাসিল (আ)
হাঁসুলি (উ) = হস্‌লী
হিঁচড়ান (উ) = খীঁচ্‌না, খেঁচ্‌না
হিজ্‌ড়া (উ)
হিজ্‌রী (আ)
হিড়্‌হিড়্ (উ)
হিন্দী (পা)
হিন্দু (আ, পা) = হিন্দু
হিসাব (আ)
হিসাবী (আ)

হিস্‌সা (আ)
হিস্‌সাদার (আ, পা)
হীরামন্ (উ)
হীহী (উ)
হুঁকা (আ) = হুক্কা
হুকুম (আ) = হুক্‌ম্
হুকুমনামা (আ, পা) = হুক্‌ম্‌নামা
হুজুর (আ) = হুজূর্
হুজ্জৎ (আ)
হুড় [কলহ] (উ) = হূড়
হুড়াহুড়ী (উ) = হূড়াহূড়ী
হুণ্ডী (উ)
হুবহু (আ) = হূবহূ
হুল (উ) = হূল
হুঁষ (পা) = হোশ্
হুঁষিয়ার (পা) হুশিয়ার, হোশিয়ার
হুঁষিয়ারী (পা) হুশিয়ারী, হোশিয়ার
হেঁচ্‌কা (উ) হচ্‌কা, হচ্‌কোলা
হেঁচ্‌কান (উ) = হিচ্‌কানা
হেঁট (উ) = হেঠ
হেন (পা) = হমীঁ
হেবা (আ) = হিবা
হেবানামা (আ, পা) = হিবানামা
হেম্মৎ (আ) = হিম্মৎ
হেলা (উ) = হিল্‌না
হেলান (উ) = হিলানা
হোজ্ / হৌজ্ (আ) = হওজ্

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

✓ ১। শ্রীগীতচন্দ্রোদয় (পূর্ব্বরাগ)—নরহরি।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ২০৫।

আরম্ভ—

৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রে।
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্ দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥

জয় ২ গৌরকৃষ্ণ রসিকশেখর।
রাইরূপে ঢাকা অঙ্গ অতি মনোহর ॥
কে বুঝে দুর্গম চেষ্টা ভক্ত গোষ্ঠী বিনে।
জাহারে করয়ে কৃপা সেই মাত্র জানে ॥

শেষ ॥ ১১ ॥ ইতি শ্রীগীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগরসোদগারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একবিংশতমো আস্বাদঃ ॥ ৩১ ॥ ২৭৮ ॥ পূর্ব্ব ॥ ১০৩ ॥ ৩৮২ ॥ শ্রীরাধিকায়া ॥ ৭৯৪ ॥

শুন ওহে পরমবান্ধব শ্রোতাগণ।
পূর্ব্বরাগ গীত এই অতি রসায়ন ॥
ইথে ক্রমভঙ্গ যে বুঝিতে তাহা নারি।
সুধিয়া লইবে মোরে অনুগ্রহ করি ॥

মুই মহা অজ্ঞ তাহা জানাইব কত।
এই কর ইথে জেন হই অনুরত ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম শিরে ধরি।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষেপে গাইল নরহরি ॥

ইতি শ্রীপূর্ব্বরাগ বর্ণন সমাপ্ত ॥

মন্তব্য—এই নরহরি, শ্রীখণ্ডের নরহরি দাস। নরহরি ও তদীয় শিষ্য লোচন দাসের পরিচয় ও জীবনচরিত সংক্রান্ত কয়েকটি কথা, যাহা পরিষদের অবিদিত আছে, তাহা আমার বিশ্বালোক সংহিতায় লিখিয়াছি ; এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ হইতেছে।

২। ভাবাদিরস-সংগ্রহ—গ্রন্থকারের নাম নাই।

পুঁথির বিবরণ—ইংরাজী ফুলস্কেপ কাগজ। দেখিতে পুরাতন। পত্র সংখ্যা ১০।

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজীঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতয়ে নমঃ।

নিত্যানন্দমনোরাম প্রকটা জিব তারনে।
জগদাত্মা জত ক্ষাত পঞ্চরসাধিকারিনি ॥ ইতি ॥ তত্রৈব ॥
গোষ্ঠে শ্রষ্ট বালকঞ্চ সুখিমর্দ্ধে চ মুঞ্জরি।
অলঙ্গাক্ষা থ্যাতে সর্ব্বে কৃষ্ণস্য শুখদাইনি ॥২॥

নিত্যানন্দ হন পঞ্চরসাধিকারি।
তেঞি ইথে সিক্ষার ব্যবস্থা স্থির করি ॥
ঞিহাতে বুঝিবে তবে জার সেই রস ভাব।
ভজন পর্কোতা তাহার রাধাকৃষ্ণ লাভ ॥

শেষ—

(গদ্য অংশের কতকটা গোবিন্দচন্দ্র গীতের ৪৬ পৃষ্ঠায় ধৃত করিয়াছি ; তৎপরে—)

নানা গ্রন্থানুসারেন ভাবাদিরস সংগ্রহং। গুরুপ্রিয়োদা সাক্ষাতা বম্নন ॥ ইতি ॥ ইতি পুস্তক খানি গ্রহস্ত সামাপ্ত লিখীতং শ্রীগুরুচরণ দাস সাহা সাকিম কালিকাপুর ॥

৩। রসপুষ্পকলিকা—নন্দকিশোর দাস।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৫১

আরম্ভ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ াভ্যাং নমঃ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

অজ্ঞানতিমির নাশ দিপ্তি করি পরকাশ
সেই গুরু করুণার নিধি॥

অবতীর্ণ স্বকারুণ্যা শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুং।
রাধাভাবাস্বাদনায় উদ্দীপন নবদ্বীপে॥
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ অবতীর্ণ মহিতলে।
সদা প্রেমরসে মগ্ন কীর্ত্তনানন্দবিগ্রহঃ॥
অস্যার্থ যথা রাগঃ॥
প্রথমে বন্দিব গুরু　　বাঞ্ছাকল্পতরু
যাহার স্মরণে সর্ব্ব সিদ্ধি॥

শেষ—

আমি বড় দুরাচার অতি বড় হীন।
রস কিছু নাহি বুঝি কেবল নবীন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
রসপুষ্পকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি রসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগবর্ননং নাম ষোড়শ দলে॥ ১৬॥ উজ্জ্বল গ্রন্থানুসারে কিঞ্চিৎ পয়ার বচনং রসপুষ্পকলিকা নাম গ্রন্থ সংপূর্ণঃ॥ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর প্রসীদঃ॥

৪। অয়ি দীন শ্লোকার্থ সিন্ধুর বিন্দু প্রকাশ— কিশোরী দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৯। গ্রন্থ রচনা কাল ১৭০২ শক।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রী গুরুবে নমঃ।
জয় জয় গুরু গোশাঞি চরণারবৃন্দ।
ভক্ত অলি পিয়ে যাতে ভক্তিমকরন্দ॥

শেষ—

স্বরূপ রূপ রঘুনাথ কৃষ্ণদাস পদ।
হৃদএ ধরিয়া কহি এই সুসম্পদ॥

জয় জয় রুদ্রদেব বক্রেশ্বর নাম।
তাহার নিকটে যেই বৈষ্ণবের গ্রাম॥
সপ্তদশ দুই শকে গ্রন্থ পূর্ন হৈল।
ব্রজবাসী দ্বারে গ্রন্থ সমর্পণ কৈল॥
অয়ি দিন শ্লোকার্থ সিন্ধুর বিন্দু প্রকাশ
অতি দীন হীন কহে এ কিশোরী দাস॥

৫। শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর শাখা বর্ণন—নরহরি

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৭।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ॥

কলি পন্নগতমথণ্ডনময়নিমণ্ডল পদদ্বন্দং।
স্ফুট চম্পকচয়সুন্দরমহমবলম্বে শচীসূন॥ ১॥
সনাতনপ্রেম পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যে ম বিলক্ষিতাখিলং।

জয় শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস ভক্তিভূপ।
ভট্টের করুণাপাত্র প্রেমের স্বরূপ॥
চাখন্দি শ্রীজাজিগ্রাম বাস বিষ্ণুপুরে।
তথায় বিলাস তাহা কে বর্ন্নিতে পারে॥

নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদং ॥ ২ ॥
শ্রীরাধারমণং শ্রেষ্ঠং রসশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকং।
শ্রীনিবাসপ্রভুং বন্দে পরকীয়া রসার্থিনং ॥ ৩ ॥
বন্দে শ্রীল শ্রীনিবাস প্রভোঃ সখাগণান্ মহান্।
যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ কৃষ্ণপ্রেমোদয়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর।
ভক্তপ্রিয় ভুবনমোহন কলেবর ॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট বেঙ্কটনন্দন।
সর্ব্বভাবে গৌরচন্দ্র যার প্রাণধন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যারে শক্তি দিয়া।
প্রকাশিল ভক্তিশাস্ত্র ভুবন ভরিয়া ॥

শেষ—

কামক্রোধাদিক রিপু করিল অধীন।
অসৎ সঙ্গতি রসে গেল রাতি দিন ॥
যত অপরাধ কৈনু লেখা নাঞি তার।
মো সম অধম কি হইতে আছে আর ॥
হেন নরহরি দিন দুঃখিরে হেরিয়া।
এবার উদ্ধার কর করুণা করিয়া ॥
ইতি শ্রীমদাচার্য্য প্রভোঃ শাখাবর্ণনং সম্পূর্ণং।

মন্তব্য—ভক্তবৃন্দের পরিচায়ক এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব হেতু ইহা প্রকাশের যোগ্য।

৬। প্রহ্লাদচরিত্র—কৃষ্ণদাস।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ প্রহ্লাদ চরিত্র লিক্ষ্যতে ॥
হিরণ্যকশ্যপের হৈল কয়াপ কুমার।
চারি পুত্র হৈল তার পরম সুন্দর ॥
রূপের তুলনা নাহি গুণে অনুপাম।
প্রহ্লাদ অনুজ তার থুইল এই নাম ॥
কয়াধুর রমণি হইতে এ চারি নন্দন।
প্রহ্লাদ বালক হইল কৃষ্ণপরায়ন ॥

শেষ—

গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গান।
প্রহ্লাদচরিত্র এতো দূরে সমাধান ॥

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ১২। লিপিকাল সন ১২৩৫ সাল।

ইতি প্রহ্লাদচরিত্র সমাপ্ত হয়ং ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখ্যকং দোষ নাস্তি। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ ইতি সন ১২৩৫ শাল তারিখ ৩০শে কার্ত্তিক সমাপ্ত হইল ॥ শ্রীমদ্রাধামাধব জয়তাং।

৭। গোপী উপাসনা—ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৪৬। লিপিকাল ১৬৪৬ শাক।

আরম্ভ—

৭ শ্রীশ্রীহরি রাধামাধবঃ।

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং ॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদাম্বুসহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

বন্দিব গোকুলচান্দ চরণারবৃন্দ।
ব্রজ অলিকুল পান কৈল মকরন্দ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামির পাদপদ্ম করি আস।
গোপী উপাসনা কহে ব্রজেন্দ্র কৃষ্ণদাস ॥

রক্তোপতলা জিনি কিবা সাজে পদতল।
কনক পাদুকা তাথে করে ঝলমল॥

শেষ—

হেলায় শ্রদ্ধায় জেবা রাধাকৃষ্ণ ভজে।
জন্ম জন্মান্তরে কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥

গোবিন্দপদাম্ভোজদ্বন্দ মকরন্দ সাধনং
বন্দে বৃন্দাবন ধূলিং মকরন্দ মনোহরং॥ ১॥
ত্বং বেদসাস্ত্রপরিনিষ্টীত সুদ্ধি বুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমনিন্দ্র নুতং কবিন্দ্রং
ব্যাসং নমামি সিরসা তিলকং মনিনাং॥ ১॥

ইতি শ্রীগোপি উপাসনা শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিলাস বর্ন্নো নাম দসম পরিচ্ছেদঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীগোপি উপাসনা গ্রন্থ সম্পুর্ন্ন॥

সকাব্দা ১৬৯৬ সন ১১৩১ মাহ ফাল্গুন ২৮শে রোজ বৃহস্পতিবার॥

৮। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল—লোচন দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ৩৫।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতচন্দ্র শ্রীগুরবে নম সর্ব্ব বৈষ্ণবভ্যাং নমঃ॥

তবে লীলাচলে প্রভু সবজন সঙ্গে।
কীর্ত্তনবিলাস করি আছে মহাঁরঙ্গে॥
অনেক ভকতজন মিলিল তথায়।
প্রেমবিলাস রসে নাচয়ে নাচায়॥
আনন্দে আছএ নীলাচলে করি বাস।
কহিব সকল কথা আনন্দ প্রকাস॥

শেষ—

দিবানিসী করে প্রভু কীর্ত্তন বিলাস।
গোরা গুণ গায় সুখে এ লোচন দাস॥ ১৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে ইঃ শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা নাঃ শ্রীনবদ্বীপ হইয়া শ্রীনীলাচলে বাস প্রসংঙ্গ সংপুর্ণং॥ সকাব্দা ১৭১৫ বিতারিখ ২০শে পোষ রোজ বুধবার তিথি অমাবস্যা রাত্রি ছয়দণ্ড সমএ সমাপ্ত॥

৯। উপাসনা পটল—নরোত্তম দাস।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠায় লেখা। পত্র সংখ্যা ১১।

আরম্ভ—

শ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ॥
নির্ণীয় সাধ্যং বহু সাধনানি
কুর্ব্বন্তি বিজ্ঞা পরমাদরেণ।
শ্রীরূপপাদাম্বুজজোভিষেকং
ব্রতঞ্চ মে তন্মম সাধনানি॥ ১॥
এই মত গুরু শিষ্য দুহেঁ এক ঠাঞি।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠি করে আনন্দিত হই॥
শিষ্য নিবেদন করে শ্রীরূপ গোসাঞি।
সুনিয়ম জে করিল শ্রীদাস গোসাঞি॥
তাহাই সুনিতে মোর হরিস অন্তরে।
সাধন নির্ন্নয় জেই কহিবে আমারে॥

শিষ্যের বচন সুনি গুরু মহাশয়।
কহিতে লাগিলা সাধ্য সাধন নির্ণয়॥
সুন সুন ওহে শিষ্য আমার বচন।
সাধ্য সাধন কহি করহ শ্রবণ॥
যে বস্তু সাধন করি সেই হয় (সা) ধ্য।
পকাপক মাত্র হয় শাস্ত্র বাক্য॥
অনন্য হইয়া করি কৃষ্ণের ভজন।
প্রেমাঙ্কুরে প্রেমলতায় ধরে প্রেম ধন॥

শেষ—

শ্রীলোকনাথ চরণ স্মরণ অভিলাস।
গুরু শিষ্য সম্বাদ কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীগুরুশিষ্যসম্বাদে উপাসনাপটলনিরুপনং নাম দশমপটল সংপুর্ন্নঃ ইতি শ্রীমতি প্রিয়ারী দাষ্যা পঠিতা পাঠিতা জজিতা যাজিতা কেনচিৎ লিখিতা।

১০। ভ্রমর গীতা—যদুনাথ দাস।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা পত্র সংখ্যা ১৫।

আরম্ভ—

শ্রীহরিঃ। বন্দেহং করুণাসিন্ধুং শ্রীচৈতন্য দয়ানিধিং
শ্রীনিত্যানন্দং শ্রীঅদ্বৈতং বন্দে শ্রীগুরুং বৈষ্ণবং।
বন্দে বৃন্দাবনভূমিং শ্রীগোবিন্দমদনমোহনৌ।
শ্রীগোপীনাথগোপালং বন্দে গোপাঙ্গনাবৃতং ॥ ২ ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহে গোপী রোদন্তী রজনী দিবা।
নানাভাব সমাযুক্তা ভ্রমন্তি ভ্রমর দৃশঃ। ৩ ॥
শুন ২ ভক্তগণ করহ শ্রবণে।
ভ্রমর দেখিয়া জেবা করিল গোপীগণে।
কৃষ্ণ মধুপুরে গেলা হেথা গোপীগণ।
দিবানিশি (নাহি) জানে করয়ে রোদন।
শ্রীরাধা গোবিন্দ কথা মনে করি আস।
মাথুর বর্ন্নন কহে যদুনাথ দাস।

অষ্টরাগ রাগপ্রধানশ্চ প্রথমঃ পূর্ব্বরাগ চ। অন্তে চ মথুরা প্রোক্তা তাসাং ইথং প্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ অস্যার্থঃ ॥

শেষ—ইতি ভ্রমরগীতায়াং গোপীকাভক্তি মাথুরবর্ন্নং নাম পঞ্চমো অধ্যায়ঃ ॥ ইতি শ্রীভ্রমরগীতা সংমাপ্তা।

১১। প্রেমবিলাস—নিত্যানন্দ দাস।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ১৬৭।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবো জয়তি।
নারাধিতং কলিযুগে তব পাদপদ্মং
নালোকিতং কলিযুগে তব গৌরদেহং।
নাকর্ণিতা কলিযুগে তব তত্ত্বগাথা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভবতা পরিবঞ্চিতোহং।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
জয় ২ শ্রীজাহ্নবা জয় বিরচন্দ্র।
জয় ২ কলিযুগে হরিনাম মন্ত্র।
শ্রীনিবাস জয় জয় আচার্য্য ঠাকুর।
তাঁর শিষ্য রামচন্দ্র প্রেমের অঙ্কুর।
জয় ২ কবিরাজ ঠাকুর গোবিন্দ।
জাঁর গুণে সপ্তদ্বীপা জীবের আনন্দ।
জয় ২ শ্রোতাগণ কর অবধান।
রাধা কৃষ্ণ লীলা জার হইবেক প্রাণ।
আচার্য্য ঠাকুরের জন্ম হৈল যেন মতে।
ভক্তি করি শুন ভাই দৃঢ় করি চিত্তে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়ে দিলা পাঠাইয়া।
তিঁহো গৌড় ভাসাইনা প্রেম ভক্তি দিয়া।

শেষ—

শ্রীজাহ্নবা বীরচন্দ্র পদে জার আশ।
প্রেমবিলাস কহে নিত্যানন্দ দাস।
শাকেন্দো সিন্ধো চ বেদে ভাদ্রপদে তথা।
বুধবারে দ্বিতীয়ায়াং গ্রন্থোহয়ং পূর্ন্নতাং গতঃ।

ইতি শ্রীপ্রেমবিলাসে চাঁদরায় উদ্ধারঃ সমাপ্ত ॥

ইতি সন ১২০৩ সাল তারিখ ১৩ই শ্রাবণস্য লিপিরিয়ং শ্রীনিমাঞিচরণ দাস বৈরাগী ॥

মন্তব্য—উল্লিখিত শ্লোকের দ্বারা ১৭০৪ শাক লব্ধ হয়; উহা গ্রন্থ রচনার কাল নহে। উহা পুঁথির লিপিকাল। কিন্তু ১৭০৪ শাকে ১১৮৯ সন হয়—১২০৩ সন হয় না আবার

১২০৩ সনে ১৭১৮ শাক হয়, ১৭০৪ শাক হয় না। এই পুঁথির বিষয়ঃ—শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক নীলাচল হইতে প্রেমভক্তি প্রচারার্থ নিত্যানন্দকে গৌড় দেশে প্রেরণ; গৌড়দেশে অদ্বৈত আচার্য্য ভক্তি ছাড়িয়া পঞ্চবিধ মুক্তিকে প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—গৌড়দেশ ভক্তি-শূন্য হইয়াছে, শুনিয়া শ্রীচৈতন্যের ক্রোধ; সর্ব্বভৌমের সহিত পরামর্শ; শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি এক এক পত্র প্রেরণ; চাখন্দি গ্রামে চৈতন্য দাস নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে তৎপত্নী বলরাম দাসাত্মজা লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে শ্রীনিবাসের জন্ম; সনাতনের পত্রে সংবাদ আসিল গোপালভট্ট বৃন্দাবনে গিয়াছেন; শ্রীনিবাসের জন্মের পূর্ব্বে চৈতন্যদাসের বাটীতে জমিদার দুর্গাদাসের আগমন; যবনের ভয় ও রাজপীড়ার অবসান; শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন যাত্রা। পদ্মাবতী নদীর তুবতিপুরের ঘাটে পার হওয়া; গৌড়ের নিকটে চত্বরপুর গ্রামে শ্রীচৈতন্যের উপস্থিতি; সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ; নাটশালা গ্রামে উত্তরণ; সংকীর্ত্তন; শ্রীচৈতন্যের প্রেমাবেশ। কুতোদরপুরে প্রত্যাগমন; গড়ের হাটের নিকট দিয়া পদ্মা পার হইয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন; গড়ের হাটদেশে খেতরী গ্রামে বিপ্রকুলে নরোত্তমের জন্ম; প্রভৃতি। এই গ্রন্থ প্রকাশের যোগ্য।

১২। শ্রীভাগবতপাঞ্চালিকা,—প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ—ভাগবত আচার্য্য

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। পত্র সংখ্যা ১৬৪। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা।

১৩। —শ্রীভাগবত পাঞ্চালিকা—দশম স্কন্ধ—ভাগবত আচার্য্য।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। পত্র সংখ্যা ২০১। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। ১৪৫ হইতে ১৪৮ পত্র নাই।

১৪। শ্রীভাগবত পাঞ্চালিকা—একাদশ স্কন্ধ—ভাগবত আচার্য্য।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। পত্র সংখ্যা ৬৩।

১৫। শ্রীভাগবত পাঞ্চালিকা—দ্বাদশ স্কন্ধ—ভাগবত আচার্য্য।

পুঁথির বিবরণ—তুলোট কাগজ। পত্র সংখ্যা ২১। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। লিপিকাল সন ১১৯৩।

মন্তব্য—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সপ্তম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৷৶০ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থকে 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' বলা হইয়াছে। ইহার ঐ নাম যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে ইহাকে 'শ্রীগোবিন্দ কথামৃত' ও বলা যাইতে পারে—প্রথম স্কন্ধের ১ পত্রে—

শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যৈঃ প্রেমভক্তিবিবৃদ্ধয়ে।
গীয়তে পরমানন্দং শ্রীগোবিন্দকথামৃতং।

গ্রন্থের নাম ভাগবত পাঞ্চালিকা বলিয়া বোধ হইল। পুঁথির পূর্ব্বাধিকারী সেবারাম দে, চুঁচুড়ার একজন গণ্য মান্য ধনী লোক ছিলেন।

১৬। ভাগবত পাঞ্চালিকা—ভাগবতাচার্য্য।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ৫৮। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। প্রথম হইতে পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত।

প্রথমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষ—

এবে শুন কহি ভাই হরিগুণ গাথা। ধীর শিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহি ভাগবত কথা॥ ভাগবত আচাযোর মধুরস গান॥

শেষ—

চিন্তিয়া চৈতন্ত গদাধর পদদ্বন্দ। আনন্দে প্রকাস খণ্ডে গায় জয়ানন্দ॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রেমতরঙ্গিণী নাম প্রথম অধ্যায়।

মন্তব্য—অন্যান্য স্কন্ধের প্রায় সকল অধ্যায়ই প্রেমতরঙ্গিণী নামে লিখিত আছে।

১৭। পদাবলী—বাসুদেব ঘোষ।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ৩ হইতে ১০।

১৮। চৈতন্যমঙ্গল—প্রকাশ খণ্ড—জগন্নাথমঙ্গল—জয়ানন্দ।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ১৬। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। লিপিকাল সন ১১৮৫।

আরম্ভ—৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণে প্রণাম। শ্রীশ্রীস্বরেস্বতি চরণে প্রণাম। শ্রীচৈতন্তমঙ্গল প্রকাস খণ্ডে জগন্নাথ মঙ্গল বিরচিত।

আনন্দে প্রকাস খণ্ডে ষুন সাবধানে।
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য গোসাঞী কহেন জথাক্রমে॥

ইতি চৈতন্ত মঙ্গলে প্রকাস খণ্ড শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল সমাপ্ত। জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে দোসক নাস্তি। ভিমস্যাপী রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রম। এই পুস্তক শ্রীমথুরা দাষ মল্লীক সাং বেলাডা সন ১১৮ ৮৫ সাল বিতারিখ ২২ আসাঢ় রোজ শনিবার দিনমানাগাহ দুই দণ্ড।

মন্তব্য—১১৮ ৮৫কে ১১৮৫ বলিয়া বোধ হইল।

১৯। মহাভারত—বিজয়।

পুঁথির বিবরণ—দুই ভাঁজ করা বাঙ্গালা কাগজের দুই দিকে লেখা। প্রথম পত্রের এক পৃষ্ঠে লেখা। পত্র সংখ্যা ১৪০। আদি পর্ব্ব হইতে শান্তি পর্ব্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত।

এই বিজয় বা 'বিজয় পণ্ডিত' কাশীরাম দাসের অপেক্ষা প্রাচীন।

আরম্ভ—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শহায়ঃ॥

প্রণমহ নারায়ণ পুরুষ নিরঞ্জন।
প্রণমহ ব্যাসদেব গুণের নিধান॥

হুলুতা আধী হইলা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
ত্রপুরার পুরে সৌপিল তাঁহার বরাবর॥
রাঙ্গা টুপি সানা দিল রাঙ্গাত কাপড়া।
সোনার পালঙ্গ দিল য়েক সত ঘোড়া॥

অস্ত্রে সাস্ত্রে বিসারদ মহিমা আপার। স্থলতান খান মহামতি।
কলিযুগে প্রভু হইলা বামন অবতার। দারিদ্র খণ্ডন নাম অনাথের গতি॥
প্রতাপে তপন রাম বিপক্ষের জম। কুতুহলে ভারথের পুছেন কাহিনি।
পৃথিভি ভরিল জার জসে অনুপাম॥ কেমতে পাণ্ড পুত্র হইলা রাজধানি॥

২০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ৫৭। অতঃপর খণ্ডিত।

মন্তব্য—বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থে গণেশ, গুরু, মুরারি প্রভৃতির বন্দনা নাই।

২১। মহাভারত—উদ্যোগ পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ২৪। প্রথম পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠে লেখা।

২২। মহাভারত—দ্রোণ পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ৩০। প্রথম পৃষ্ঠা এক পৃষ্ঠে লেখা।

মন্তব্য—এখানি অসম্পূর্ণ।

২৩। মহাভারত—আশ্রমিক পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্রসংখ্যা ২২। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লেখা। লিপিকাল সন ১১৩৫ সাল।

২৪। মহাভারত—মৌষল পর্ব্ব—কাশীরাম দাস।

পুঁথির বিবরণ—বাঙ্গালা কাগজ। পত্র সংখ্যা ১৭। প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠায় লেখা।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল।
চুঁচুড়া।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

(দ্বিজ বিশ্বেশ্বর বিরচিত।)

এই পুঁথিখানি আমি শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি,এ, মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হই। রাজসাহী "সাহিত্যসমিতির" প্রথম অধিবেশনে ইহা মৎকর্ত্তৃক পঠিত হয়।

গ্রন্থের নাম, গ্রন্থরচয়িতার নাম ব্যতীত অন্য পরিচয় এবং গ্রন্থ রচনার সময় পুঁথির কোথাও নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পুঁথিতে "২রা বৈশাখ" তারিখ লিখিত আছে, কিন্তু সনটি লেখা নাই।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির নিয়মানুসারে এই পুঁথিতেও বর্ণাশুদ্ধির কিছুমাত্র অভাব নাই।

তিন সকার (শ, ষ, স), দুই ন (ন ও ণ), দুই জ (জ ও য), 'আ' ও 'য়' প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। 'আমার' লিখিতে 'আ' স্থানে 'য়' এবং 'হৃদয়ে' লিখিতে 'য়ে' স্থলে 'এ' ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা বোধ হয় লেখকের দোষ। যাহা হউক আমি সে সকল ভুল আধুনিক বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে সংশোধন করিয়াছি।

কবি 'এ' কার (ে) দিতে বিশেষ কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি অনেক স্থলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী স্থল উল্লেখ করিতেছি:—আমাক উদ্দেশিয়া; গৃহেত আইলা; পুরেত প্রবেশ; বন্দীখানাত রাখ; মনেত ভাবিল।

[প্রাচীন পুঁথির এরূপ সকল বানানকে বর্ণাশুদ্ধি বিবেচনা করা সঙ্গত নহে। তৎকালে বানানের প্রচলিত নিয়মই ঐরূপ ছিল। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহকেরা ঐরূপ প্রাচীন নিয়মানুযায়ী বানানে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।—পঃ পঃ সঃ]

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ।

প্রণমহো নারায়ণ সত্য ভগবান।
যাঁহাকে সেবিলে লোক পায় পরিত্রাণ॥
হেন প্রভু শিরে বন্দো সর্ব্বলোকের গতি।
তার দুই ভার্য্যা বন্দো লক্ষ্মী সরস্বতী॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দো রাবণনিধন।
করপুটে প্রণমহোঁ সত্য ভগবান॥
কলিযুগে সত্যনারায়ণ অবতার।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ হৈতে হইল প্রচার॥
পূর্ব্বে কাশীপুরে এক ব্রাহ্মণ আছিল।
অন্নবস্ত্র না যোড়য়ে ভিক্ষা করি খাইল॥
নিত্য নিত্য সেহি বিপ্র করিয়া মাঙ্গন।
পুত্র পরিবার সেহি করয়ে পালন॥
আর দিন সেহি বিপ্র ভিক্ষাতে যাইতে।
সত্যনারায়ণ সঙ্গে দেখা হৈল পথে॥
প্রসন্ন হইল তাগে ত্রিদিশের ঈশ্বর।
জিজ্ঞাসিল কোথাতে চলিছ দ্বিজবর।
ব্রাহ্মণ বোলয়ে আমি ভিক্ষা অর্থে যাই।
অক্ষেম ব্রাহ্মণ আমি ভিক্ষা করি খাই।
এত শুনি দয়া উপজিল নারায়ণে।
উপদেশ কহি আমি শুনহ ব্রাহ্মণে॥
আমি সত্যনারায়ণ কহিল তোমারে।
এক মনে সেবা করহ আমারে॥
দরিদ্রতা দূর হবে মহিমা অপার।
ঘরে ঘরে আমার সেবা করাহ প্রচার॥
শুনি বিপ্র সাবধানে পুলকিত হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈল গলে বসন বান্ধিয়া॥
আজি সুপ্রভাত মোর পোহাইল রজনী।
নয়নে দেখিনু প্রভু তোমার চরণ দুখানি॥
আমি অকিঞ্চন ব্রাহ্মণ কি আছে আমার।
কি দিয়া করিব প্রভু সেবন তোমার॥
ঈষৎ হাসিয়া বোলে প্রভু নারায়ণ।
আমাকে সেবিতে না লাগে বহুধন॥
সওা সের আনি করিবে সঞ্চিত।
সওা সের দুগ্ধ দিয়া করিবে মক্ষিত॥
দধি ঘৃত গুড় চিনি কলা যে যোড়ে যাহার।
সকল একত্র করি করিবা সম্ভার॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ আনিবে ডাকিয়া।
সন্ধ্যাকালে সব দ্রব্য একত্র করিয়া॥
পাঁচালি প্রবন্ধে কথা কহিবা তখন।
আমার যতেক কথা কহিল বিবরণ॥

কথা শুনিবে সভাই ভক্তিযুক্ত হৈয়া।
দণ্ডবৎ হবেক সবে আমাকে উদ্দেশিয়া॥
আমার প্রসাদ সবে ভক্তি করিয়া লইবে।
যার যেবা মনে লয় তেমতি করিবে॥
সেবার যতেক কথা কহিয়া সত্বর।
অন্তর্যামী ভগবান হইলা অন্তর॥
এহি সব সাক্ষাতে দেখিয়া অদ্ভুত।
নগরে ভিক্ষাতে গেলা ব্রাহ্মণের সুত॥
সেহি দিনে ভিক্ষাতে মিলিল বহুধন।
আনন্দে গৃহেত আইলা চিন্তান্বিত মন॥
সকল বৃত্তান্ত কহিল ব্রাহ্মণির স্থানে।
যেই মতে আজ্ঞা কৈল সত্যনারায়ণে॥
শুনি আনন্দিত হইল ব্রাহ্মণের নারী।
সেবার যতেক দ্রব্য আনিল সজ্জ করি॥
ইষ্ট মিত্র ডাক দিয়া আনিল ব্রাহ্মণে।
সন্ধ্যাকালে বসিলেক সত্যের সেবনে॥
যেই মতে আজ্ঞা কৈল সত্যনারায়ণে।
সেই মতে নানা দ্রব্য থুইল স্থানে স্থানে॥
পাঁচালি প্রবন্ধে কথা কহিল তখন।
অধিষ্ঠাতা হৈল তথা দেব নারায়ণ।
তুষ্ট হৈয়া বর দিল দেব গদাধর।
কুবের সমান হৈল ধনের ঈশ্বর॥
দেখিয়া সকল লোকের লাগিল চমৎকার।
ভূমিতে পড়িয়া লোক হৈল নমস্কার॥
কিছু কিছু করি সভে প্রসাদ লইল।
যাহার যে নিজপুরে প্রবেশ করিল॥
এহি মতে নিত্য সেবা করএ ব্রাহ্মণ।
দরিদ্রতা দূরে গেল হৈল বহু ধন॥
দ্বিজ বিশ্বেশ্বরে বোলে শুন সভাজন।
দুর্গতি নাশের হেতু সেব নারায়ণ॥

সংসার যুড়িয়া হৈল সেবার প্রচার।
দৈবযোগে মিলিল সাত পাঁচ কাঠিয়ার॥
সাত পাঁচ কাঠিয়ার একত্র হইয়া।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল কাষ্ঠের লাগিয়া॥
কাষ্ঠ কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছে ঘরে।
সর্ব্বে আসি মিলিল সেই কাশীপুরে॥
তাথে এক কাঠিয়ার তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া।
ব্রাহ্মণের বাড়ী গেল পথে কাষ্ঠ থুইয়া॥
দেখে বিপ্র বসিয়াছে সত্যের সেবনে।
করযোড়ে জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণের স্থানে॥
কিবা ব্রত কর গোসাঞী কহ তত্ত্বসার।
কিরূপে দুর্গতি নাশ হইল তোমার॥
ব্রাহ্মণ বোলয়ে ভাই শুনহ শ্রবণে।
দুর্গতি নাশিল মোর সত্যনারায়ণে॥
সেহি সেবা পূরে মোর আর নাহি মন।
এতেক সম্পদ মোর এহি সেবার কারণ॥
কাঠিয়ার বোলে শুন ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
কভু নাহি শুনি এমন অপূর্ব্ব কথন॥
সেবাতে যে দ্রব্য লাগে তাহা জিজ্ঞাসিল।
সকল তত্ত্ব বিচারিয়া ব্রাহ্মণ কহিল॥
দণ্ডবৎ করি তবে করিল গমন।
সত্বরে মিলিল যথা কাঠিয়ারগণ॥
শুনিয়াছ ভাই সব আশ্চর্য্য কথন।
নয়নে দেখিনু আজি সত্যের সেবন॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাঙ্গি খাইত ঘরে ঘরে।
নারায়ণ সেবি রাজা হইল কাশীপুরে॥
এত কথা কহি আমি শুন ভাই সব।
আমরা করিব সেবা কোন অসম্ভব॥
দৃঢ় মনে করি তারা যুক্তি কৈল সার।
বেচিব আজিকার কাষ্ঠ সেবা করিবার॥
এহি যুক্তি করি তারা ভাবিয়া মনে মন।
শিরে কাষ্ঠ করি তারা করিল গমন॥
কাষ্ঠ লঞা কাঠিয়ার মিলিল বাজারে।
বেচিল দ্বিগুণ কড়ি এক এক ভারে॥
সেবার যতেক দ্রব্য লইল কিনিঞা।
নিজপুরে প্রবেশিল আনন্দিত হইয়া॥
ভার্য্যার নিকটে যায়া সকলি কহিল।
সেবার সম্ভার তারা করিতে লাগিল॥
সত্বরে মিলিল আসি সব কাঠিয়ার।
সন্ধ্যাকালে সব দ্রব্য করিল সম্ভার॥

ইষ্ট মিত্র বন্ধুবর্গ মিলিল আপার।
কহিতে লাগিল কথা করিয়া বিস্তার;
যেই মতে দ্বিজবরে কহিছে কথন।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহিল সকল বিবরণ॥
কথা সাঙ্গ করি সভাই ভক্তিযুক্ত হৈয়া।
দণ্ডবৎ হৈল গলে বসন বান্ধিয়া॥
প্রসাদ লইল সর্ব্বে শিরেত বন্দিয়া।
যাহার যে নিজ পুরে গেল প্রণমিয়া॥
এহি মতে কাঠিয়ার করিল সেবন।
কাষ্ঠ কর্ম্ম দূরে গেল হৈল বহু ধন॥
গন্ধর্ব্ব সমান পুরি হৈল তা সভার।
রথ হস্তী অশ্ব হৈল নানা হাতিয়ার॥
সংক্ষেপে রচিল কবি দ্বিজ বিশ্বেশ্বর।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহিল পদ মন-হর॥

এহি মতে নানাবিধ সেবে সর্ব্বজন।
মন দিয়া শুন ভাই সাধুর বিবরণ॥
উল্কামুখ নামে রাজা নৃপতি নন্দন।
নদীতীরে করেন তেঁহো সত্যের সেবন॥
নিজ সৈন্য সংহতি নৃপতি করিয়া।
করেন সত্যের সেবা পাঁচালি পড়িয়া॥
তাহাতে এক সদাগর নৌকা বাহি যায়।
সৈন্য শব্দ শুনি তারা নৌকা রহায়॥
জিজ্ঞাসিল সদাগর প্রতি জনে জনে।
কি কর্ম্ম করেন রাজা কাহার সেবনে॥
লোক বলে সেবা করি সত্যনারায়ণ।
বহুল আরম্ভে সেবে নৃপতি নন্দন॥
পুনঃপি সদাগর লাগিল পুছিবার।
ইহার সেবিলে হয় কোন্ উপকার॥
তবে তারা কহিল বচন করি সার।
সত্য প্রভুর গুণ কহিতে শক্তি আছে কার॥
পুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধে চক্ষুদান পায় বন্দী বিমোচন॥
যোড় হস্তে সদাগর শুনিল স্তবন।
যে যে বর মাঙ্গে তাথে দিবেন নারায়ণ॥

কর পুটে সদাগর বুলিল বচন।
আমিহ কামনা করি শুন দিয়া মন॥
পুত্র কন্যা মোর ঘরে কিছুই না হইল।
অপুত্র করি মোরে বিধাতা সৃজিল॥
এতেক তোমার স্থানে করিয়ে বিনয়।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা মোর ঘরে হয়॥
তবে সে জানিব আমি সত্যনারায়ণ।
সুবর্ণ পতাকা দিয়া করিব সেবন॥
লোকে বলে শুন সাধু বচন আমার।
কর নারায়ণ পূজা হইবে কুমার॥
দণ্ডবত করি সাধু কামনা করিয়া।
দেশেরে চলিলা সাধু নৌকা বাহিয়া॥
সত্বরে মিলিল আসি আপন নগরে।
আগে পুজিয়া ডরা লয়া গেল ঘরে॥
আনন্দিত সদাগর আসিয়া আলয়।
পুরেত প্রবেশ কৈল প্রসন্ন হৃদয়॥
এহি মতে নানা রসে বঞ্চে লক্ষ পতি।
গর্ভের লক্ষণ হৈল নারী লীলাবতি॥
কথোক দিনে সাধুর ঘরে কন্যা উপজিল।
নানা বাদ্য ভাণ্ড করি মঙ্গল রচিল॥
দশচন্দ্র শোভা করে করের উপর।
সিংহ জিনিয়া কটি দেখিতে সুন্দর॥
ত্রৈলোক্য মোহন রূপ অতি অনুপম।
মনের সন্তোষে থুইলা কলাবতি নাম॥
শিশুকাল গিয়া কন্যা উদিত যৌবন।
চিন্তিত হইলা সাধু বিবাহ কারণ॥
কাঞ্চননগর পুরি অতি অনুপম।
বণিক কুলেতে জন্ম শঙ্খপতি নাম॥
মদনসমান রূপ অতি মনোহর।
বরিয়া আনিল লক্ষপতি সদাগর॥
বহুল আরম্ভে কন্যা বিভা দিল লক্ষপতি।
যেন সুন্দরি তেন অনুরূপ পতি॥
সত্যের সেবা না করিয়া কন্যা বিভা দিল।
জামাতারে সঙ্গে করি সাধু বাণিজ্যে চলিল॥
সম্মুখে দেখিল এক রাজার নগর।
সেহি রাজ্যে নৌকা লাগাইল সদাগর॥

সেহি খানে বাসা ঘর করিল নির্ম্মাণ।
বিকি কিনি করিবারে ছান্দিল দোকান॥
তাহাতে পাষণ্ড হইল সত্যনারায়ণ।
কামনা হইয়াছে সিদ্ধি না করে সেবন॥
চোর পাঠাইয়া দিল রাজার নগরে।
রাজার সর্ব্বস্ব চুরি করিলেক চোরে॥
রাজার ঘর চোরে গেল কোতাল কাঁপে ডরে।
চর পাঠাইয়া দিল রাজা বাজারে বাজারে॥
লক্ষপতি শঙ্খপতি দুই বসিয়াছে দোকানে।
রাজার ঘরের দ্রব্য পাইল সেইখানে॥
সত্যের কপট তারা না কৈল বিচার।
বুলিলেক ধন আন চোরের নৌকার॥
কুপিত হইল রাজা রাজরাজেশ্বর।
বন্দীখানাত রাখ চোরকে দ্বাদশ বৎসর॥
একেত দারুণ চর আর আজ্ঞা পায়।
কোন পোঁতা ঘরে সাধুরে লয়া যায়॥
নিগড় বন্ধনে থুইল অনেক প্রবন্ধে।
ভাবিয়া বিষাদ সাধু রাত্রি দিবা কান্দে॥
এহি মতে সাধু বন্দি দ্বাদশ বৎসর।
লোক বুঝাবারে বোলে দ্বিজ বিশ্বেশ্বর॥
সাধুর যতেক কথা হৈল এহি হৈতে।
লীলাবতির কথা কিছু শুন করি চিত্তে॥
যত ধন দিল সাধু বাণিজ্যে যাইতে।
সকলি খাইল তারা পথ নিরখিতে॥
থাল ঝারি কটোরা আদি যতেক আছিল।
সাধুর বিলম্বে তারা বেচিয়া খাইল॥
পরিধান বস্ত্র আদি অঙ্গের আভরণ।
সকলি বেচিয়া তারা করিল ভক্ষণ॥
জিজ্ঞাসিল স্থানে স্থানে প্রতি জনে জন।
কেহ নাহি কহে সাধু আসিবে এখন॥
পরের কর্ম্ম করি তারা যে পায় মজুরি।
এইমতে দিন কাটে নানা বৃত্তি করি॥
উদ্দেশ না পায় তারা কান্দিয়া বিকল।
কড়িটেকের দ্রব্য নাহি ঘরের সম্বল॥
একদিন প্রাতঃকালে সাধুর কুমারী।
মনোদুঃখে চলিলেন ব্রাহ্মণের বাড়ী॥
দেখে বিপ্র বসিয়াছে সত্যের সেবনে।
কৌতুক দেখিতে রামা রহিল সেইখানে॥
প্রসাদ লইয়া শিরে ভক্তিযুক্ত হৈয়া।
আপনার দুঃখ সকল কহিল কান্দিয়া॥
বাপ আর স্বামী মোর আসুক আলয়।
এহি মতে সেবা আমি করিব নিশ্চয়।
তাহার করুণা শুনি বুলিল ব্রাহ্মণ।
একমনে চিত্তে সেব সত্যনারায়ণ।
ভক্তবৎসল প্রভু সেবহ সত্বর।
বাপ আর স্বামী তোমার আসিবেক ঘর॥
এহি সব কথা যদি কহিলা ব্রাহ্মণে।
দণ্ডবৎ হৈয়া গেলা আপনার স্থানে॥
দেখিয়া জননী তারে বুলিল কটুবাণী।
কাহার মন্দিরে ছিলে এতেক রজনী॥
কি হেতু বিলম্ব আজি কৈলে কোন খেলা।
কোন রস পায়া তুমি কোথাতে আছিলা॥
কলাবতি বোলে মাত শুনহ উত্তর।
যে কারণে বাজ হৈল অবধান কর॥
এক অদ্ভুত আজি দেখিনু নয়নে।
সত্যনারায়ণ সেবা করে ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥
কলিযুগে সত্যনারায়ণ অবতার।
যে যেহি কামনা করে সিদ্ধ হয় তার॥
আমিহ কামনা আজি করিলাম তথাতে।
বাপ আর স্বামী মোর আসুক গৃহেতে॥
যাবত শরীরে মোর থাকএ জীবন।
তাবত পুজিব আমি সত্য নারায়ণ॥
এহি কথা লীলাবতি শুনিল শ্রবণে।
করিতে সত্যের সেবা ভক্তি হৈল মনে॥
মায়ে ঝিয়ে দুই জনে ভিক্ষাতে চলিল।
সত্যনারায়ণ প্রভু মনেত ভাবিল॥
পাইল যতেক দ্রব্য কি কহিব তারে।
বেলা অবসানে আইলা আপনার ঘরে॥
সেবার সম্ভার লইল যে হয় উচিত।
ইষ্টমিত্র ডাক দিল আর কুল পুরোহিত॥
করিল সেবন তারা যোড় দুই কর।
লীলাবতি কলাবতি করিল নমস্কার॥

প্রসাদ বাটিয়া দিল প্রতি জনে জনে।
দণ্ডবৎ করি গেল যার যেহি স্থানে॥
এহি মতে সেবা তারা করে চিরদিনে।
ভকত বৎসল প্রভু কৃপা হৈল মনে॥
কেদার মাণিকাপুরে রাজা সত্যবান।
স্বপ্ন কহিলা প্রভু তার বিদ্যমান॥
রাত্রিভাগ শেষে রাজা পালঙ্কে নিদ্রা যায়।
ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু স্বপ্ন দেখায়॥
উঠ উঠ সত্যবান কত নিদ্রা যাও।
আমি সত্যনারায়ণ চক্ষু মেলি চাও॥
লক্ষপতি শঙ্খপতি দুই সদাগর।
বন্দি করি রাখিয়াছ দ্বাদশ বৎসর॥
রাজ্য প্রাণ রক্ষা যদি চাহত রাজন।
বন্দি হৈতে ছাড় দেহ চোর দুইজন॥
স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে উঠিয়া নৃপমণি।
চর সম্বোধিয়া রাজা কিছু কহে বাণী॥
শুন ভাই কোতোয়াল আমার বচন।
বন্দিশালা হৈতে আন চোর দুইজন॥
এত শুনি কোতোয়াল চলিল সত্বর।
সাধু বিদ্যমানে গিয়া সকলি কহিল॥
কথা শুনি আনন্দিত সাধুর নন্দন।
রাজার নিকটে যায় ত্বরিত গমন॥
লক্ষপতি বোলে শুন শঙ্খপতি।
আজি সুপ্রভাত হৈল দুঃখ দুর্গতি॥
প্রসন্ন হইল আজি সত্যনারায়ণ।
রাজ বিদ্যমানে গেলা বণিক নন্দন॥
রাজা বলে সদাগর কহ তত্ত্ব সার।
কোন দেশে বসতি সাধু কি নাম তোমার॥
সাধু বোলে রত্নপুরে বসতি আমার।
শঙ্খপতি নাম এহি জামাতা আমার॥
বাণিজ্য করিতে আইলাম নগরে তোমার।
বণিককুলেতে জন্ম লক্ষপতি নাম মোর॥
সাধুর বচনে লজ্জা পাইল রাজন।
নাপিত আনিয়া দুহার করাইল প্রয়োজন।
তৈল আমলকি দিয়া করাইল স্নান।
রন্ধন ভোজন করি হরষিত হৈল॥

রাজার বিদ্যমানে বোলে বণিক নন্দন।
আজ্ঞা কর দেশে মোরা করিব গমন॥
রাজা বলে শুন ওহে ভাণ্ডারি মদন।
নৌকা ভরিয়া দেহ যত লাগে ধন॥
পূর্ব্বের যতেক ধন আনিয়াছ হরিয়া।
শীঘ্র করি দেহ গিয়া নৌকাত ভরিয়া॥
এত শুনি নৌকাতে ধন তুলিল নানামতে।
বিদায় হইতে গেল রাজার সাক্ষাতে॥
রাজাকে প্রণাম কৈল ভূমিতে পড়িয়া।
সম্ভাষণ কৈল রাজা করযোড় হৈয়া॥
গলা ধরি সত্যবান বুলিল রাজারে।
না জানি করিলাম দোষ ক্ষেমহ আমারে॥
সাধু বলে তুমি রাজা রাজরাজেশ্বর।
তোমাকে কি দোষ দিব কর্ম্মদোষ আমার॥
আলিঙ্গন করি সাধুরে বিদায় করিলা।
নৌকা বাহিয়া সাধু দেশেরে চলিলা॥
মিনতি করিয়া বোলে দ্বিজ বিশ্বেশ্বরে।
এহিরূপে দয়া যেন হয় সেবকেরে॥
বাহ বাহ করি সদাগর ডাকে উচ্চস্বরে।
নৌকা বাহিয়া সাধু দেশেরে চলিলা॥
মধ্যাহ্নে স্নান করি কিছুমাত্র খাএ।
রাত্রি দিবা ভেদ নাহি নৌকা বাহি যায়॥
নক্ষত্র সঞ্চার যেন নৌকার চলন।
দেখিয়া কুপিত হৈলা সত্য নারায়ণ॥
শীঘ্রগতি নদী তীরে করিলেক আসন।
সন্ন্যাসীর বেশে তথা রহিলা নারায়ণ॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া নৌকা বাহে আস্তে ব্যস্তে।
ডাকিয়া পুছিলা প্রভু ত্রিদশের নাথে॥
কিবা দ্রব্য ভরিয়াছ কহ উচ্চস্বরে।
সাধু বলে লতাপতা ভরিয়াছি নৌকার উপরে॥
যে বলিলে সেহি হউক বুলিল বচন।
সেইক্ষণে লতাপতা হইল সেই ধন॥
কথোদূর সাধু নৌকা বাহি গেল।
ভরা নাহি নৌকা সব ভাসিতে লাগিল॥
অকস্মাৎ বজ্র যেন পড়ি গেল মুণ্ডে।
স্তব্ধ হইল সদাগর বাক্য নাহি তুণ্ডে॥

নৌকা লাগাইলা গিয়া সাগরের তীরে।
দাড়ি আদি মাঝি পাইট কান্দে উচ্চস্বরে ॥
হাহাকার করি কান্দে ভাবিয়া গোসাঞি।
গলা ধরাধরি কান্দে শ্বশুর জামাঞি ॥
বজ্রপাত প্রায় যেন মুদিত নয়ন।
ভূমিতে পড়িয়া সাধু হরিল চেতন ॥

কান্দে কান্দে লক্ষপতি ভাবিয়া গোসাঞি।
মাথে হাত দিয়া কান্দে শ্বশুর জামাঞি ॥
শুদ্ধ স্বর্ণ আদি ভরিলাম নৌকায়।
দেখায়া বঞ্চিত মোরে করিল দয়াময় ॥
কি ধন লইয়া যাব আমি আপনার দেশে।
ভাগি সাজ কি করিবেক মোর কর্ম্ম দোষে ॥
কোন গোসাঞি হও প্রভু কোন অবতার।
কি দোষে ভরা নাশ করিল আমার ॥
চরণে ধরিয়া বোলে বণিক নন্দন।
কৃপা কর প্রভু মোরে লইনু শরণ ॥
সত্যনারায়ণ বোলে শুন লক্ষপতি।
কি কারণে কর তুমি এতেক প্রণতি ॥
সত্যনারায়ণ বোলে আমি কি করিয়াছি কহত কথন।
সাধু বোলে লতাপতা হইল সব ধন ॥
ঈষৎ হাসিয়া বোলে সত্যনারায়ণ।
পূর্ব্বকার কথা কিছু আছয়ে স্মরণ ॥
উল্কামুখ নামে রাজা আমা সেবে নদীতীরে।
তথাতে কামনা করি চলিলেন ঘরে ॥
পুত্র কন্যা মোর ঘরে কিছুই না হইল।
অপুত্রক করি মোরে বিধাতা সৃজিল ॥
এতেক তোমার স্থানে করিয়ে বিনয়।
কিবা পুত্র কিবা কন্যা মোর ঘরে হয় ॥
তবে সে জানিব আমি সত্যনারায়ণ।
সুবর্ণ পতাকা দিয়া করিব সেবন ॥
বর দিল কন্যা হৈল বিভা দিলে তারে।
সে কথা স্মরণ নাহি না পূজিলে মোরে ॥
সেহি মহাদুঃখ হৈল আমার অন্তরে।
বন্দিখানাত দুঃখ পাইলা দ্বাদশ বৎসরে ॥
তবে লীলাবতি আমা সেবে নিরন্তর।
স্তুতিয়ে বশ হৈঞা তারে দিলাম বর ॥
বর চাহে লীলাবতি যুড়ি দুই কর।
জামাতা সহিতে সাধু আসুক মোর ঘর ॥
তুষ্ট হৈয়া আমি তারে দিলাম বর।
স্বামী জামাতা তোমার আনি দিব ঘর ॥
তে কারণে স্বপ্ন কইনু রাজার গোচরে।
প্রসন্ন হইয়া ছুটি করি দিল তোমারে ॥
নৌকা মেলি দেশে যাহ পরম হরিষে।
কৌতুক দেখিতে আইলাম সন্ন্যাসীর বেশে ॥
জিজ্ঞাসিল তোমারে শুন সদাগর।
কিবা বস্তু ভরিয়াছ নৌকার উপর ॥
কপটে হরিয়া ধন দিলাম লতাপতা।
তোমারে কহিলাম আমি পূর্ব্বকার কথা ॥
এতেক কহিল যদি সত্যনারায়ণ।
পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত তবে পড়িল স্মরণ ॥
কথোক্ষণ থাকি সদাগর বুলিল বচন।
আপনার দোষে হইলাম এত বিড়ম্বন ॥
গলে বস্ত্র বান্ধিয়া বোলেন সদাগর।
লক্ষ মুদ্রা বান্ধণ থুইলাম প্রভু তোমার গোচর ॥
দেশে যায়া আগে তোমার করিব সেবন।
তবে সে পুরেত নিব নৌকার সব ধন ॥
সাধুর বচনে তুষ্ট হৈল নারায়ণ।
কমণ্ডলুর জল দিয়া কারল অভ্যুক্ষণ ॥
পূর্ব্বমত হইল নৌকার যত ধন।
কৃপা করিলা মোরে প্রভু সত্যনারায়ণ ॥
দণ্ডবৎ হইয়া নৌকা মেলিল সদাগর।
রক্ষা করিলে প্রভু মোরে জগত ঈশ্বর ॥
সত্বরে আইলা সাধু আপন নগরে।
চর পাঠাইয়া দিল সাধু আপনার পুরে ॥
মায়ে ঝিয়ে দুইজনে করেন সত্যের সেবন।
সেহি কালে চর যায়া কহিল কথন ॥
ঘাটে আইল সাধু ধন মান লৈয়া।
প্রসন্ন হইল দুহে হর্ষযুক্ত হয়া ॥
জামাতা আইল শুনি হর্ষ হইল মনে।
কলাবতি প্রসাদ ত্যাগিল সেইক্ষণে ॥
ত্বরিত গমনে কৈলে অঙ্গের সাজন।
খঞ্জন গমনে যায় স্বামী দরশন ॥
মনেতে সন্তোষ হইল অপার।
পরম আনন্দে যায় স্বামী দেখিবার ॥
সুরধনি সাধুর রমণি নাম কলাবতি।
প্রসাদ ত্যাগিয়া গেল যথা নিজ পতি ॥
তাহতে সত্যনারায়ণ পাতিলেন ছল।
শঙ্খপতি সাধুর নৌকা ঘাটে হৈল তল ॥
ডগমগি ডাহিনে বামে চাহে সদাগর।
জামাতাকে না দেখিয়া হইল ফাঁপর ॥
জামাতা জামাতা বলি ডাকে ঘনে ঘন।
পড়িল ভূমিতে সাধু হইয়া অচেতন ॥
মনে অনুমান করি কহে দ্বিজ বিশ্বেশ্বর।
কহিব নাচারি এক পদ মনোহর ॥
কান্দে কান্দে ওহে সাধু হইয়া বিষাদ।
নানারত্নে ভরাভরি আইনু অবিলম্বে তাতে এক
ফলিল প্রমাদ ॥
কন্যা মোর শিশুমতি, পতি বিনা নাহি গতি
কেনে হেন কৈলে নারায়ণ।
কলাবতি বোলে বাপ শরীরে না সহে তাপ
প্রাণ দহে স্বামী না দেখিয়া।

সেবিনু সত্য নারায়ণ সব হৈল অকারণ
মরিব সাগরে ঝাঁপ দিয়া॥
মায়ে ঝিয়ে দুই নারী, কান্দয়ে জামাতা বুলি
কোন্ হেতু অকালে মরণ।
কলাবতি বোলে মাও তোমরা ঘরেতে যাও
আমি এথা তাজিব জীবন॥
কলাবতির করুণা শুনি, লীলাবতি বোলে বাণী
স্থির কর না কর ক্রন্দন।
বোলে দ্বিজ বিশ্বেশ্বর, জীবে তোর প্রাণেশ্বর
কৃপাযুক্ত হবে নারায়ণ॥
লীলাবতির ক্রন্দনে বৃক্ষের ঝরে পাত।
কলাবতি বোলে প্রভু পাইব কোথাত॥
যখন আছিল প্রভু দেশের অন্তরে।
মনেতে ভরসা ছিল আসিবেন ঘরে॥
আনন্দিত হৈনু শুনি প্রভু আইল দেশে।
চক্ষু ভরি না দেখিনু মোর কর্ম্মদোষে॥
হেন লয় মোর মনে পক্ষী হইয়া জাঁও।
যথা গেলে প্রাণপতির নাগ পাওঁ॥
মুঞি অভাগিনী বড় খণ্ডব্রত কৈনু।
তাহার কারণে প্রভু তোমা হারাইনু॥
কন্যার বিলাপে কান্দে নারী লীলাবতি।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে সাধু লক্ষপতি॥
হাহারে দারুণ বিধি কেন হেন কৈলে।
হরিষের মধ্যে কেন প্রমাদ ফেলাইলে॥
মাথে হাত দিয়া কান্দে বণিক্-নন্দন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সান্ত্বাইল নারায়ণ॥
না কান্দ না কান্দ সাধু স্থির কর মতি।
তোমার কন্যার দোষে মরিল তার পতি॥
কলাবতি ত্যাগিয়াছে প্রসাদ আমার।
তেকারণে তল গেল জামাতা তোমার॥
স্বর্গে উপজিল হুহুঙ্কার ধ্বনি।
প্রসাদ তুলিয়া খাউক তোমার নন্দিনী॥
আমার প্রসাদ তুমি না খাও যাবত।
কহিল তাহার পতি না জীবে তাবত॥
আকাশেতে ধ্বনি শুনি সচকিত মন।
লক্ষ মুদ্রা ভাঙ্গিয়া তোমার করিব সেবন॥
এতেক কহিল যদি সাধু লক্ষপতি।
আজ্ঞা কৈলা প্রসাদ খাউক কলাবতি॥
এত শুনি সদাগর কন্যা পাঠাইল।
সত্যের প্রসাদ আনি তুলিয়া খাইল॥
প্রসাদ খাইল যদি সাধুর দুহিতা।
আচম্বিতে ঘাটে নৌকা ভাসিলেক তথা॥
জামাতার নৌকা যদি ভাসিল সত্বর।
মঙ্গল করিল লক্ষপতি সদাগর॥
শ্বশুর জামাতা দুহে একত্র হইয়া।
নৌকার ধন দিল পুরে চালাইয়া॥
লক্ষ মুদ্রা ভাঙ্গি সেবে সত্য নারায়ণ।
সুবর্ণ পতাকা দিল দেখিতে সুশোভন॥
শ্বশুর জামাতা দুহে পুরে প্রবেশিল।
সাধুর সেবনে প্রভু বড় তুষ্ট হৈল॥
ভক্তি ভাবে এই রূপে সেবে যে যে জন॥
ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
কামনা করিয়া যদি পূজে চিরকাল।
সত্যের প্রসাদে বাঢ়ে নানা ঠাকুরাল॥
ইঙ্গিত করয়ে যেবা অবজ্ঞা করিয়া।
আচলেতে অগ্নি বান্ধে মরিতে পুড়িয়া॥
বংশধ্বজ নৃপতি প্রসাদ না খাইল।
মুখে রক্ত উঠি তারা সবংশে মরিল॥
কহিল সকল কথা শুন বুধগণ।
তরিতে বিপদ হৈতে সেব নারায়ণ॥
অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধে চক্ষু দান পায় বন্দি বিমোচন॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে সত্যের পাঁচালি।
সংসার সাগর তরি যায় বিষ্ণুপুরী॥
দ্বিজ বিশ্বেশ্বর বোলে ভাবিয়া নারায়ণ।
হরি চরণে সদা রহুক মোর মন।

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রবন্ধে দুই একটি সংস্কৃত প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃত শব্দ উদাহরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে। যথা—ছাগল, বাচাল। প্রত্যেক শব্দ ধরিয়া বিচার করিলে ঐরূপ উদাহরণ আরও মিলিতে পারে। তাহাতে মূল প্রবন্ধের অঙ্গ হানি হইবে না। পঃ পঃ সঃ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বাঙ্গলা ব্যাকরণ।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক বাঙ্গলা ব্যাকরণ আলোচনার ফলে সাহিত্যসমাজে অনেকের মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা আশঙ্কা করেন, বুঝি বা বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধিনাশই সম্প্রদায়বিশেষের অভিপ্রায়। বাঙ্গলাব্যাকরণঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ-সভায় পঠিত বা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের দুইজন সহকারী সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রণী হইয়া এই আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রবিবাবুর লিখিত ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাঙ্গলা শব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা হইয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা, যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। পত্রিকাসম্পাদকও এই শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহের জন্য পাঠকবর্গকে আহ্বান করিয়াছেন।

এই সকল শব্দের অধিকাংশই চলিত ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তাহাদের অধিকাংশেরই সাধুভাষায় অর্থাৎ সাহিত্যের ভাষায় সম্প্রতি স্থান নাই। হয় ত অনেক শব্দ এরূপও আছে, যাহা প্রকৃতই slang; অর্থাৎ ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তার সময়ে তাহা বর্জ্জনীয়। এই সকল "অসাধু" শব্দের আলোচনা সকলের প্রীতিকর হয় নাই এবং সম্প্রতি পণ্ডিতগণের মধ্যে যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তিও বোধ করি ইহাই।

সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান সম্পাদক ব্যাকরণবিষয়ে অব্যবসায়ী। উপস্থিত বিতণ্ডায় আমার কোন কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু যেখানে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এই আন্দোলন উপস্থিতির জন্য বিশেষতঃ দায়ী, তখন সম্পাদকেরও আত্মসমর্থন স্বরূপে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। পরিষৎ-পত্রিকার দ্বারা যদি ভাষার বিশুদ্ধিহানি বা সৌষ্ঠব হানি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে পত্রিকার সেই দোষ মার্জ্জনীয় হইবে না; এবং সাহিত্য-পরিষৎও যদি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রবৃত্ত হইয়া ভাষার অবনতি ঘটান, তাহা হইলে পরিষদের অস্তিত্বও বাঞ্ছনীয় হইবে না। সুতরাং যখন এরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত

হইয়াছে, তখন তাহার কোন মূল আছে কি না দেখা আবশ্যক, এবং যদি মূল থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার উৎপাটন বাঞ্ছনীয়।

সৌভাগ্যক্রমে এই আতঙ্কের কোনই মূল নাই। বাদী ও প্রতিবাদী যাঁহারা বিতণ্ডায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে, ইহার কোন মূল নাই। সাহিত্যপরিষদে উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে সকলেই একমত; একমত না হইয়া উপায় নাই; অথচ সম্পূর্ণ ঐকমত্য সত্ত্বেও অবান্তর প্রসঙ্গ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিতণ্ডায় বুঝি ইহাই সনাতন নিয়ম।

আমাদের সাহিত্য-সমাজের সুধীগণ স্থূলতঃ দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক পক্ষ সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী; তাঁহারা সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় পার্থক্য বজায় রাখিতে ও এমন কি সেই পার্থক্য বাড়াইতে চাহেন। লৌকিক ভাষাকে তাঁহারা কতকটা কৃপার ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; না হইলে সংসারযাত্রা চলে না, তাই লৌকিক ভাষাটা চলুক। কিন্তু সাহিত্য তাহার আক্রমণ হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থান করুক, তাহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। লৌকিক ভাষাটা গৃহকর্ম্মে ও সংসার যাত্রায় আবশ্যক হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে ও ভদ্র সমাজে উহাকে বাহির করিতে নাই। যে সকল খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ লৌকিক ভাষার সম্পত্তি, উহা সংস্কৃতমূলক হউক আর দেশজই হউক, উহাদের যথাসাধ্য বর্জ্জন কর, নতুবা সাহিত্যের ভাষা সাধু ভাষা হইবে না।

অপর পক্ষ সাহিত্যের ভাষা ও লৌকিক ভাষার এই পার্থক্য রাখিতে চাহেন না। ইহাঁরা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল বাঙ্গলা ভাষার প্রতি বিরূপ। ইহাঁদের প্রধান যুক্তি যে ভাষার উদ্দেশ্যই যখন লোকশিক্ষা, তখন যে ভাষায় লোকশিক্ষা সুচারুরূপে সাধিত হয়, তাহাই সার্থক ভাষা। যে ভাষা কেবল পণ্ডিতেই বুঝিবে, আর মুর্খে বুঝিবে না, সে ভাষার অস্তিত্ব অজাগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক। কাজেই সাহিত্যের জন্য একটা স্বতন্ত্র অবোধগম্য ভাষা ও দৈনিক ব্যবহারের জন্য আর একটা সর্ব্বজনবোধ্য ভাষা, এই দুই ভাষা রাখিবার দরকার নাই।

উভয় পক্ষের যুক্তিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। এবং বোধ করি উভয় পক্ষ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর হইতে পারে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসই কতকটা এইরূপ মধ্য পথ অবলম্বনের সমর্থক। প্রাচীন সাহিত্য সাধারণ লোকের জন্য লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও রামপ্রসাদ সেন সর্ব্ব সাধারণের জন্যই তাঁহাদের গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যও সর্ব্ব সাধারণের জন্যই লিখিত হইয়াছিল। আর সে কালের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ ছিলেন; প্রাকৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের বিরূপ থাকাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা বাঙ্গলা স্পর্শ করিতেন না. কাজেই যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতেন, তাঁহারা সকলের জন্যই লিখিতেন, এবং সরল লৌকিক ভাষাতেই যথাসাধ্য

লিখিতেন। প্রাদেশিক শ্রোতা ও পাঠকের জন্য লিখিত হইত বলিয়া উহা প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিতও হয় নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের ছাত্রদের জন্য প্রাদেশিকত্ববর্জ্জিত সাধু বাঙ্গলা পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছিল; যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই সময়ে বাঙ্গলা রচনার ভার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দ্বারা একটা নূতন ভাষারই যেন সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। উহা সাধু ভাষা হইল বটে, ও সর্ব্বতোভাবে প্রাদেশিকত্বরহিত হইল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধ্য হইল না। প্রধানতঃ উহা স্কুলের পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যাভিমান স্ফীত করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিল।

এই সময়ে যাঁহারা বঙ্গভাষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণকে অগ্রণী দেখিতে পাই। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নাম এই ব্যাপারে স্মরণীয় হইয়াছে। ইহাঁদের হস্তে বাঙ্গলা ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।

পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের জন্য এই সকল মনস্বী ব্যক্তি যথেষ্ট বিদ্রূপ ও তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, যে বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যের ভাষার ইঁহারাই জন্মদাতা ছিলেন, ও পরে ভাষার শৈশবকালে বিনয়াধান রক্ষণ ও ভরণের জন্য ইহাঁরাই সর্ব্বতোভাবে পিতৃস্থলীয় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম এতন্মধ্যে অগ্রগণ্য।

সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃতশব্দবাহুল্য সম্বন্ধে দুই মত থাকিবারই কথা; এবং যাঁহারা তজ্জন্য দায়ী, তাঁহারা বিপক্ষ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবেন, তাহাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই; গদ্যরচনায় বাক্যবিন্যাসের ও বাক্যমধ্যে পদবিন্যাসের প্রণালী, ইংরাজিতে যাহাকে Syntax বলে, সেই পদবিন্যাসপ্রণালীর সংস্কার এই সকল পণ্ডিতের প্রতিভা হইতেই ঘটিয়াছিল; এবং এই মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস ও পদসন্নিবেশপ্রণালীর সাহায্য ব্যতীত উত্তরকালে বাঙ্গালা গদ্য রচনা উৎকর্ষ লাভ করিত না। ইহার অভাবেই রাজা রামমোহন রায়ের রচনা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে নাই; এবং তজ্জন্যই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির সারগর্ভ প্রবন্ধসকল সাধারণের নিকট স্থায়ী সমাদর পায় নাই।

পক্ষান্তরে টেকচাঁদ ঠাকুরের ও হুতোমের বাঙ্গালা লৌকিক বাঙ্গালা হইতে অভিন্ন; কিন্তু উহাও যে সাহিত্যের বাঙ্গালা হইতে পারে না, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গিয়াছে।

উত্তর কালের লেখকগণ মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া যে সাহিত্যের ভাষা প্রচলিত করিয়াছেন, তাহাই এখন সর্ব্বত্র গৃহীত ও আদৃত হইয়াছে। এই মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলা ভাষার ক্ষমতা যে কত দূর-প্রসারী হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

ফলে সাহিত্যের ভাষা কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া চলিবে, তাহা কার্য্যতঃ মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে; এবিষয় লইয়া এখন বাদবিতণ্ডা কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র। তবে জীবের স্ফূর্ত্তি অন্য কাজ না পাইলে ক্রীড়াচ্ছলেও আপনাকে ব্যয় করিতে চায়; তাই আমাদের সুধীগণের পাণ্ডিত্য যখন কোন সদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ না পায়, তখন এই উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়াবিতণ্ডার আশ্রয় লইয়া আপনার চাঞ্চল্য ও ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রকাশ করে মাত্র। বর্ত্তমান কালে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ কিরূপে ও কি পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে, এবিষয়ে কার্য্যতঃ যে বিশেষ মতভেদ আছে, তাহা বোধ হয় না; কেন না উভয় পক্ষই প্রয়োগকালে এক রকমের ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সামান্য প্রভেদ থাকে, তাহা ব্যক্তিগত। তবে যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হন, তাহা প্রকৃত যুদ্ধ নহে, যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

সম্প্রতি সংস্কৃত কালেজের অন্যতর ধীমান্ ছাত্র ও বর্ত্তমান অধ্যক্ষ তাঁহার পূর্ব্বগামীদের অপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্তবিধানের জন্যই যেন সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত-শব্দ-প্রয়োগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ চেষ্টা বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মহা-মহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্যাকরণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন, খাঁটি বাঙ্গালা "তেল" শব্দ ব্যবহার করিলে যখন সকলেই বুঝে, এবং লৌকিক প্রয়োগে যখন সর্ব্বদা "তেল" শব্দেরই ব্যবহার আছে, তখন সাহিত্যের ভাষায় "তৈল" ব্যবহার করিয়া লেখকের ও মুদ্রাকরের ও প্রুফরীডারের পরিশ্রম অকারণে বাড়ান হয় কেন?

আমরাও বলি ঠিক্ কথা; অকারণে ভাষাকে দুর্গম ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া লাভ কি? অথবা অকারণে পরিশ্রম বাড়াইবারই বা সার্থকতা কি? "তেল" শব্দ অশ্লীলও নহে, অশ্রাব্যও নহে; ভদ্র সমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না; সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও "তেল"ই ব্যবহার করিব। তবে যদি কেহ স্থলবিশেষে লালিত্যের বা সৌষ্ঠবের অনুরোধে "তৈল" শব্দেরই ব্যবহার করেন, তাহাতেই যে শাস্ত্রী মহাশয়ের আপত্তি ঘটিবে, বোধ হয় না।

কেননা সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা হইলেও আর একটা উদ্দেশ্য আছে; উহাকে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বলিতে পারা যায়। সাহিত্যের একটা অংশ আছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে; উহা গুণীর জন্য ও অভিজ্ঞের জন্য ও কলাবতের জন্য ও সমজদারের জন্য। সেক্সপীয়রের কাব্য সর্ব্ব সাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই; সর্ব্বসাধারণ উহার রসাস্বাদনে অধিকারী নহে। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া তৎকালের পণ্ডিতসমাজের জন্য লাটিনে লিখিত হইয়াছিল। বড় বড় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পারিভাষিক-শব্দ-বহুল ভাষায় লিখিত হয়; উহা সাধারণের সম্পূর্ণ অবোধ্য। কালিদাস তাঁহার কাব্যগ্রন্থ তৎকালে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সমজদারের জন্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। কুমার-সম্ভবের "ইয়ং মহেন্দ্রপ্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দ্দিগীশানবমত্য মানিনী।" ইত্যাদি শ্লোক-

সপ্তক যতবার পড়িয়াছি, কি কারণে জানি না অন্তরিন্দ্রিয় মোহগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ কয়েকটি শ্লোকে বিশেষ কোন ভাবগাম্ভীর্য্য আছে কি না বলিতে পারি না; কিন্তু ইহার ললিতগম্ভীর পদবিন্যাসজাত ধ্বনি যে এই অবসাদোৎপত্তির একটা অন্যতম প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ করি না।

সাহিত্যের একাংশের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, এবং আধুনিক লেখকগণ মুখ্যতঃ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দসম্পত্তির সাহায্য লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, সুনির্ব্বাচিত ও সুবিন্যস্ত সংস্কৃত শব্দের যেমন উন্মাদনা আছে, তাহা প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দের নাই। ইহার মূল অনুসন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন; সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক উৎকর্ষ ইহার মুখ্য কারণ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি আমাদের জাতীয় প্রকৃতি ও জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতির সহিত অন্যতর কারণসকল অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত আছে সন্দেহ নাই।

সুতরাং সাহিত্যের ভাষার বলবিধানার্থ ও সৌষ্ঠবসাধনার্থ সংস্কৃতশব্দসম্পদের গৌরব আছে ও চিরকালই থাকিবে, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ কিংবা দুঃখিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। সেই অপরিমেয় ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। যথেষ্টপরিমাণে অকুণ্ঠিতচিত্তে ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া আমাদের ভাষার শরীরে অলঙ্কার পরাও, কেহই চৌর্য্যবৃত্তির জন্য দণ্ডিত করিবে না।

কিন্তু এইখানে একটু তর্ক আসিয়া পড়িবে। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার দ্বারা ভাষার সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য সাধন হইতেই পারে না, ইহা স্বীকারে অনেকে কুণ্ঠিত হইবেন। ইংরাজির উদাহরণ সম্মুখে আছে। অনেক ইংরাজি লেখক ভাষার সৌষ্ঠবের জন্য মুখভরা গালভরা বিজাতীয় লাটিন শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়া থাকেন—প্রচলিত দৃষ্টান্ত জনসনের ভাষা। কিন্তু অনেকে আবার খাঁটি ইংরাজি, যাহাকে নিতান্ত homely আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াও মধুর ললিত সুন্দর রচনা করিয়াছেন। এমন কি ইংরাজি বাইবেলের ভাষা, যাহাতে গালভরা লাটিন শব্দের স্থান নাই বলিলেই চলে, সৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্য্যে সেই ভাষা ইংরাজি সাহিত্যে অদ্বিতীয়। লাটিন শব্দের আড়ম্বর অসত্ত্বে ও স্যাকসন শব্দের বাহুল্য সত্ত্বেও টেনিসনের লক্‌স্‌লি হলের ভাষার ধ্বনি কাণে মেঘগর্জ্জনের মত বাজিতে থাকে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দ অনেক সময় তাহার নিকট হারি মানে। যাঁহারা প্রতিভাবান্, যাঁহারা ক্ষমতাবান, যাঁহারা ওস্তাদ, তাঁহাদের হাতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজন নাই; চলিত বাঙ্গালা শব্দেরই সাহায্য লইয়া তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন। সৌন্দর্য্য কেবল যে শব্দের গুণে হয় এমন নহে, শব্দনির্ব্বাচন ও শব্দ বিন্যাসের গুণেও হয়। ক্ষমতাশালী লেখকের হাতে সকলই সম্ভব। উদাহরণও যথেষ্ট আছে। চণ্ডীদাস অথবা কৃত্তিবাস সাধু সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় যাঁহারা সৌন্দর্য্য দেখিতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা অন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীতে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষা হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গলায় যথেষ্ট পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ চলে; হিন্দী প্রভৃতিতে চলে না। ভাষার এইরূপ স্থিতি-স্থাপকতা আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরের জিনিষ লইয়া যদি সম্পত্তি বাড়ান চলে ও তাহাতে কোন বিঘ্ন না থাকে, সে মন্দ কি? কিন্তু অনেকে হয়ত বলিবেন, উহা বাঙ্গালা ভাষার দুর্ব্বলতার চিহ্ন। যে ভাষা অন্য ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ না করিয়া কাজ চালাইতে পারেনা, সে ভাষা সেই পরিমাণে দুর্ব্বল। বাঙ্গালা ভাষা যে দুর্ব্বল, তাহার নানা লক্ষণ আছে। বাঙ্গলায় রাগ করা চলেনা, গালি দেওয়া চলেনা। রাগ করিতে হইলেই আমরা হিন্দির সাহায্য লই, শিক্ষিত লোকে ইংরাজি চালান। ইহা বাঙ্গালার পক্ষে উৎকর্ষের চিহ্ন নহে। শাস্ত্রী মহাশয় বোধ হয় এরূপ আবদার করিবেন না, যে সাহিত্যের ভাষায় গালি দিবার কোনকালে প্রয়োজন হইবেনা। যদি প্রয়োজন হয়, তখন সংস্কৃতশব্দভূষিত সাধু ভাষা কতটা সফল হইবে, বিবেচ্য বটে।

বিশুদ্ধিবিচারের পূর্ব্বে বিশুদ্ধি কাহাকে বলে, বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষায় বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে সাহিত্যের ভাষাতেও আছে, কথা-বার্ত্তার ভাষাতেও আছে। এই সকল শব্দ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ; বাঙ্গলা ভাষা তাহা সংস্কৃতের নিকট পাইয়াছে। কতক উত্তরাধিকারসূত্রে অতি পুরাকাল হইতে দখল করিয়া আসিতেছে, কতক আধুনিক কালে ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। ঋণগ্রহণ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই অব্যাহত ভাবে চলিবে; অব্যাহত ভাবে—কেননা ইহাতে সুদও লাগে না, ও পরিশোধেরও প্রয়োজন নাই; উত্তমর্ণের দ্বার উন্মুক্ত, অধমর্ণেরও আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই।

কিন্তু এই সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত আরও অনেক শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় বর্ত্তমান, এই গুলিকে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ বলা যাইতে পারে। এবং এই সকল শব্দ বাঙ্গলা ভাষার শরীরে অস্থি মজ্জা ধমনী সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, ইহাদিগকে পরিত্যাগের উপায় নাই। বাঙ্গলা লিখিতেই হউক আর কহিতেই হউক, ইহাদিগকে ত্যাগ করিবার উপায় নাই। বরং যে সকল শব্দ বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগের অনেকটা বর্জ্জন করা চলিতে পারে; তাহাদিগের স্থলে সংস্কৃত শব্দ বসাইতে পারা যায়। কিন্তু সর্ব্বনাম ও অব্যয় ও ক্রিয়ার স্থলে উপায় নাই, এখানে তাহাদের আশ্রয় লইতেই হইবে; নতুবা বাঙ্গলা, এমন কি, "বিশুদ্ধ" বাঙ্গলাও রচিত হইবে না।

"আমি মাছ খাইতেছি" এ স্থলে মাছকে মৎস্যে ও খাইতেছিকে ভোজন করিতেছিতে রূপান্তরিত করিয়া ভাষাকে 'বিশুদ্ধতর' করা যাইতে না পারে এমন নহে। কিন্তু এই 'আমি' ও 'করিতেছি' এতদুভয়ের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কোন পণ্ডিতই নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না। কেবল কথাবার্ত্তার সময়েই নহে, বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার সময়েও অব্যাহতির

আশা নাই। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষাতে কতকগুলি শব্দ থাকিবেই, যথা 'আমি' ও 'করিতেছি' যাহা সংস্কৃত মূলক বটে, কিন্তু সংস্কৃত নহে, যাহা খাঁটি বাঙ্গলা।

এইরূপ খাঁটি বাঙ্গলা ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে আমাদের আধুনিক ভাষা গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলা অভিধানের শব্দরাশিকে এই দুই প্রধান ভাগে সাজাইতে পারা যায়। প্রশ্ন যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণী বিশুদ্ধ বাঙ্গলা?

কেহ হয়ত বলিবেন, সংস্কৃতশব্দগুলিই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা, আর খাঁটি বাঙ্গলা শব্দগুলি অবিশুদ্ধ। প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সাধিতে পারা যায়; এই হিসাবে উহারা বিশুদ্ধ বটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সাধিতে পারা যায় না; এ বিষয়ে কোন মত দ্বৈধ নাই। এই হিসাবে কি উহারা অবিশুদ্ধ? কনখই না—'আমি' ও 'করিতেছি' সংস্কৃত শব্দ নহে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় উহাদের বিশুদ্ধিপক্ষে কেহ এ পর্য্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত করেন নাই, কেন না উহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া কেহই এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লিখিতে সমর্থ হন নাই।

কাজেই অসংস্কৃত শব্দও বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় স্থান পাইতে পারে। সংস্কৃত না হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় না, এমন নহে।

আবার অন্য পক্ষ হয়ত বলিবেন, 'আমি' ও 'করিতেছি' এই দুইটি শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শব্দ; 'মাছ' ও 'খাইতেছি' এই দুইটাও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শব্দ। কিন্তু 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুইটি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা নহে। এমন কি, 'মৎস্য' ও 'ভোজন' এই দুই শব্দ বাঙ্গলাই নহে; উহা বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত হইতে উহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। এই যুক্তি ফেলিবার নহে: 'মৎস্য' ও 'ভোজন' শব্দ বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গলা, এমন কি, বিশুদ্ধ বাঙ্গলা লেখা ও কহা চলিতে পারে, কিন্তু 'আমি' ও 'করিতেছি' ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে কোন বাঙ্গলারই অস্তিত্ব থাকে না।

এই ত গেল সাহিত্যের ভাষা বা রচনার ভাষা সম্বন্ধে। তার পর আছে কথাবার্ত্তার ভাষা। কথাবার্ত্তার ভাষাতেও দুই শ্রেণীর শব্দ বর্ত্তমান আছে; খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ নহিলে কথা কহা অসাধ্য হয়; এবং খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সম্পূর্ণ বর্জ্জনও বোধ করি অসাধ্য। যদি কাহারও সেরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকে, একবার বাজি রাখিয়া চেষ্টা করিবেন। বস্তুতঃ কথাবার্ত্তার ভাষায় উভয় শ্রেণীর শব্দেরই প্রচলন আছে, তবে উভয়ের সংখ্যার তারতম্য স্থানভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন।

প্রভেদ এই যে কথাবার্ত্তার ভাষায় সর্ব্বত্রই খাঁটি সংস্কৃতের অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গলার প্রচলন অধিক। অবশ্য স্থানভেদে ও কালভেদে ইতরবিশেষের কথা মনে রাখিতেই হইবে। সে কালের অপেক্ষা বোধ হয় একালে খাঁটি সংস্কৃতের প্রচলন বাড়িয়াছে। বোধ হয় মাত্র, কেন না, নিশ্চয় জানি না। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা দেখিয়াই ও কালের গতি দেখিয়াই সেকালের চলিত ভাষার অবস্থা অনুমান করিয়া লইতে হয়। আবার একালেও

শিক্ষিতসমাজে ও ভদ্রসমাজে কথাবার্ত্তার ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, অশিক্ষিত সমাজে বা নিম্নসমাজে তত হইতে পারে না। আবার পরদার বাহিরে যত হয়, পরদার আড়ালে তত হয় না। আবার এক প্রদেশে যত হয়, পণ্ডিতপ্রধান স্থানে যত হয়, অপণ্ডিতপ্রধান প্রদেশে তত হয় না। স্থানভেদে ও কালভেদে ও সমাজের স্তরভেদে ও বক্তার সাময়িক অবস্থাভেদে এরূপ ইতরবিশেষ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ হইবারই কথা। এদেশেও এইরূপ, অন্য দেশেও এইরূপ। ইহা সার্ব্বভৌমিক, সনাতন নিয়ম।

নিশ্চয় বলিতে পারি না, তবে ঘোর সংশয়ের বিষয়, যে শিষ্টসমাজে শিষ্ট সুধীগণ যখন শিষ্ট ভাষায় শিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করেন, তখনও বোধ করি তাঁহাদের কথাবার্ত্তায় খাঁটি সংস্কৃত অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গলাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অশিক্ষিত সমাজে অশিষ্ট লোকে যখন জ্ঞানতঃ অসাধু ভাষা ব্যবহার করে, তখন যে খাঁটি বাঙ্গলারই নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কথাবার্ত্তার ভাষায় খাঁটি বাঙ্গলারই প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা এজন্য দুঃখিত, তাঁহারা হয়ত আশা করেন—প্রাচীনা বঙ্গভূমির এই পুরাতন সমাজের ভবিষ্যজ্জীবনে ঈদৃশ শুভদিন আগমন করিবেক, যখন নিরক্ষর কৃষকবালক অবাধ্য ধেনুবৎসকে তিরস্কারকল্পে সাধু ভাষার প্রয়োগ করিবেক, হট্টমধ্যে পণ্যবীথিকাপার্শ্বে উপবিষ্টা মৎস্যজীবিনী কলহব্যপদেশে অসাধ্বী ভাষা ব্যবহারে কুণ্ঠিতা হইবেক, এবং কোষগ্রন্থসকল প্রাকৃত গৌড়ীয় শব্দের দুর্ব্বহভারবহনের শ্রমস্বীকারে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেক। কিন্তু যতদিন সেই সুদূরপরাহত শুভদিন উপাগত না হইতেছে, ততদিন আমাদিগকে ম্লানমুখে স্বীকার করিতেই হইবে, যে অস্মদীয় কথোপকথনের ভাষায় গৌড়ীয় শব্দের প্রাধান্য শোচনীয় রূপে বিদ্যমান।

এই কথাবার্ত্তার ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের সংখ্যা কত? কেহই বলিতে পারেন না? সংখ্যানিরূপণের চেষ্টাই এপর্য্যন্ত হয় নাই। সংখ্যানিরূপণ অতি বৃহৎ ব্যাপার; কেন না অসংখ্যেয় প্রাদেশিক শব্দ, যাহা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, যাহা সঙ্কীর্ণ প্রদেশ মধ্যে আবদ্ধ, তাহাও এই শ্রেণীর মধ্যে আসিবে। আবার অসংখ্যের পারিভাষিক শব্দ, যাহা চাষার ব্যবসায়ে, তাঁতির ব্যবসায়ে, মুদির ও ময়রার ব্যবসায়ে, আদালতে, জমিদারি সেরেস্তায় প্রচলিত, তাহা শ্রেণিবিশেষের ও সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যেই আছে, সাধারণের নিকট সেই সকল শব্দরাশি পরিচিতও নহে ও দুর্ব্বোধ্যও নহে। কিন্তু সেই শব্দরাশিও এই শ্রেণীর বাঙ্গলা শব্দের মধ্যেই আসিবে। এই বিশাল শব্দসমূহের সীমানির্দ্দেশ অল্প জনের বা অল্প দিনের কাজ নহে। বহুকালের বা বহুজনের সমবেত চেষ্টায় এই কার্য্য কতক পরিমাণে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্য সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের বাঙ্গলা ভাষার ধাতু কি, মজ্জা কি, শোণিত কি, অস্থি কি, তাহার নিরূপণ হইবে না।

এই শব্দরাশির মধ্যে কতিপয় শব্দ বিদেশ হইতে বিজাতীয় লোকের সংস্রবে বাঙ্গলার প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প না হইলেও সাহিত্যের মধ্যে তুলনায়

মুষ্টিমেয়। অবশিষ্ট সমস্ত শব্দ আবার দুই শ্রেণীর। কতক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়া ঐ সকল শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দই একবারে বিকৃত হইয়াছে, অথবা সংস্কৃত শব্দ প্রাচীন প্রাকৃতে ও প্রাকৃত হইতে ক্রমে আধুনিক প্রাকৃতে বা বাঙ্গলায় পরিণত হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মতে সংস্কৃত ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা, যাহা পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ নিয়মবদ্ধ করিয়াছেন ও যাহা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শরীরবদ্ধ হইয়াছে, সেই সংস্কৃত ভাষা কস্মিন্ কালে জনসমাজে লোকমুখে কথাবার্ত্তার ভাষারূপে প্রচলিত ছিল না। কাজেই ঠিক সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া প্রাকৃত বা বাঙ্গলা উৎপন্ন হয় নাই, প্রাচীন কালে প্রচলিত কোন লৌকিক ভাষা বিকৃত হইয়াই প্রাকৃত ও বাঙ্গলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সে বিচারে প্রয়োজন নাই। প্রাচীন কালে একটা প্রাচীন ভাষা ছিল সন্দেহ নাই, সেই ভাষাই কালসহকারে বিকৃত হইয়া প্রাচীন প্রাকৃতে ও আধুনিক প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার কেহ করিবেন না। এবং আমরা যাহাকে সংস্কৃতমূলক বাঙ্গলা শব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার অধিকাংশই এইরূপে উৎপন্ন।

কিন্তু এই সংস্কৃতমূলক খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ ব্যতীত আর একশ্রেণীর বাঙ্গলা শব্দ আছে, সংস্কৃতের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নির্ণয় করিতে পারা যায় না; সংস্কৃত কোন শব্দের সহিতই তাহাদের জাতিগত সম্বন্ধ নাই; এই সকল শব্দকে দেশজ শব্দ বলা হয়। ইহার মূল কি আমরা জানি না। হয়ত সংস্কৃত শব্দই এত বিকার লাভ করিয়াছে, যে এখন আর তাহাদের চেনা কঠিন। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইরূপ অনেক দেশজস্বরূপে গৃহীত শব্দের সংস্কৃত মূল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি এমন শব্দ অনেক আছে, যাহা প্রকৃতই দেশজ অর্থাৎ যাহা সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। উদাহরণের অভাব নাই।

হইতে পারে বাঙ্গলা দেশের অনার্য্য আদিম নিবাসী যাহারা ছিল, তাহাদেরই ভাষা হইতে এই সকল শব্দ গৃহীত। সেই আদিম নিবাসী কাহারা, তাহা নিরূপণের এখন উপায় নাই। আর্য্যাধিকারের সহিত তাহাদের অস্তিত্ব আর্য্যগণের অস্তিত্বে মিশ্রিত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হয়ত এখনও নিম্নশ্রেণীর লোকের ভাষা ও আরণ্য ও পার্ব্বত্য লোকদিগের ভাষা আলোচনা করিলে অনেক খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই।

কোন্ শ্রেণীর শব্দ সংখ্যায় অধিক, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। দেশজ শব্দের ব্যবহার কেবল লোকমুখেই চলিত নহে, সাহিত্যের ভাষাতেও উহারা প্রচুর পরিমাণে স্থান পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে। সাহিত্যে উহাদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু স্থান যে পাইয়াছে তাহা সত্য কথা; এবং প্রবেশ নিষেধেরও যে কোন উপায় আছে তাহা বোধ হয় না।

ফলে আমাদের সাহিত্যের ভাষা ও কথোপকথনের ভাষা উভয়ত্রই খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ বিদ্যমান। কোথাও বেশী, কোথাও কম। আবার খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের মধ্যে কতক সংস্কৃতমূলক, এবং কতক দেশজ; এবং এই উভয় শ্রেণীর বাঙ্গলা শব্দই সাহিত্যের ভাষায় ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়; কোথাও বেশী, কোথাও কম। তদ্ভিন্ন প্রাদেশিক বাঙ্গলা শব্দের প্রভুত্ব চলিত ভাষায় বেশী, সাহিত্যের ভাষায় উহাদের বড় প্রাধান্য নাই, থাকা উচিতও নহে। আধুনিক কালের যে সকল গ্রন্থকার স্বকার্য্যে সাবধান, তাঁহারা সাধ্যমত প্রাদেশিকত্ব বর্জ্জনেরই চেষ্টা করেন, কেন না, একালে সকলেই সমগ্র দেশের জন্য লিখিতে ইচ্ছুক, প্রদেশবিশেষের জন্য কেহ লেখেন না।

সাহিত্যের ভাষায় ও লৌকিক ভাষায় আর একটা তফাত আছে, উহা উচ্চারণ লইয়া। যেমন 'করিতেছি' 'খাইতেছি' দুইটি খাঁটি বাঙ্গলা ক্রিয়া পদ, ইহারা সাহিত্যে ঐ আকারে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কহিবার সময় আমরা সুবিধামত উচ্চারণের জন্য 'করছি' 'খাচ্ছি' প্রভৃতি বলিয়া থাকি। এই উচ্চারণ আবার প্রদেশভেদে বিভিন্ন, সুতরাং সাহিত্যের ভাষায় এই প্রাদেশিকত্বের বর্জ্জনই প্রার্থনীয়।

আমরা দ্বিবিধ বাঙ্গলার উল্লেখ করিলাম, সাহিত্যের বাঙ্গলা ও লৌকিক বাঙ্গলা। লৌকিক বাঙ্গলা অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত কথাবার্ত্তার বাঙ্গলা। উভয় ভাষাতেই যথেষ্ট মিল আছে, আবার কতক তফাতও আছে। সাহিত্যের ভাষায় খাঁটি সংস্কৃত শব্দ যত ব্যবহৃত হয়, লৌকিক ভাষায় তত হয় না। সংস্কৃতমূলক ও দেশজ উভয়বিধ খাঁটি বাঙ্গলা শব্দেরই লৌকিক ভাষায় প্রাধান্য আছে। তদ্ব্যতীত প্রাদেশিক শব্দের ও প্রাদেশিক উচ্চারণের ভেদ লৌকিক ভাষায় যতটা বর্ত্তমান, সাহিত্যের ভাষায় ততটা নাই, এবং থাকা উচিতও নহে।

উভয় শ্রেণীর শব্দ ভাষায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয় না। খাঁটি সংস্কৃত শব্দ আধুনিক বাঙ্গলায় সাহিত্যের ভাষায় ও সম্ভবতঃ কথাবার্ত্তার ভাষায় পূর্ব্বাপেক্ষা বহুতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, দুঃখের বিষয়। অনেকে আবার বলিবেন, সুখের বিষয়। আমিও বলি—সুখের বিষয়। যাহাই হউক সে সুখ দুঃখের কথা সম্প্রতি তুলিবার প্রয়োজন নাই। আধুনিক ভাষায় খাঁটি সংস্কৃতের ব্যবহার বাড়িয়াছে, ইহা প্রকৃত কথা; ইহাতে কাহারই সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের এত প্রচলন ছিল না, ইহাও সত্য কথা।

প্রাচীন সাহিত্যের ধ্বংসাবশেষ যাহা আধুনিক কালে সম্মার্জ্জনীসংস্কৃত হইয়া মার্জ্জিত বা অর্দ্ধমার্জ্জিত ও অমার্জ্জিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহাই তাহার সাক্ষী। সেদিন পরিষৎ-সভায় কোন সদস্য বলিয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ইতর সাধারণের জন্য পুস্তক লিখিতেন, পণ্ডিত সম্প্রদায়ের জন্য লিখিতেন না, এই জন্যই তাঁহারা ঐ সকল অসাধু শব্দের প্রশ্রয় দিয়াছেন। কারণটা খুব সঙ্গত; বস্তুতই চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস ও কবিরাজ পণ্ডিত সাধারণের জন্যেই সাধারণের বোধ্য ভাষাতেই রচনা করিয়াছিলেন; এমন কি ভারতচন্দ্রেরও

সেইরূপ অসাধু প্রবৃত্তি যে একবারেই ছিল না, এমন বলা যায় না। কারণ যাহাই হউক, প্রাচীন সাহিত্যে সংস্কৃতেতর খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচুর প্রয়োগ ছিল, একালের অপেক্ষা বহুলতর প্রয়োগ ছিল। তাঁহাদের ভাষা বর্ত্তমানে অনুকরণীয় না হইতেও পারে; কিন্তু সেই প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সেই অসাধু-ভাষাবহুল সাহিত্যের লোপ হউক, এ ইচ্ছা বোধ হয় কেহই করেন না। বরং তাহার স্থায়িত্ব বিধানের জন্যই আজকাল একটা তীব্র তৃষ্ণা দেখা যাইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের জীবনের বোধ করি মুখ্যতম কর্ত্তব্যই উহাই।

আর একটু কথা বলা ভাল। বাঙ্গলার প্রাচীন লেখকেরা যে পণ্ডিতসেবিত সাধুভাষা ব্যবহার না করিয়া ইতরজনসেবিত ইতরজনবোধ্য অসাধু ভাষার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, সেজন্য আমরা যতই পরিতপ্ত হইনা কেন, তাঁহাদের রচনা অধুনা সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে কেহই চাহিবেন না। আধুনিক সাধুশব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না; কিন্তু চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের গানের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আমরা ক্ষমতা পাইলে তাঁহাকে তুষানলে পোড়াইয়া মারিব।

ফলে আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা যত শব্দের ব্যবহার আছে, সকলেই বাঙ্গলা ভাষার সম্পূর্ণ অভিধানে প্রবেশাধিকারী; অভিধান সঙ্কলন কালে ইহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন চলিবে না।

কেহ হয়ত বলিবেন, অভিধানের উদ্দেশ্য ত অর্থ বুঝান। দুর্ব্বোধ্য শব্দই অভিধানে স্থান পাইবে। সুবোধ্য শব্দ, সকলেই যাহার অর্থ বুঝে, অর্থাৎ অধিকাংশ খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ, অভিধানে প্রবেশ করাইয়া অভিধানের কলেবর অকারণে স্ফীত করার প্রয়োজন কি?

এ প্রশ্নেরও বোধ করি উত্তর আবশ্যক। এ দেশে যে কি আবশ্যক নহে, বলা কঠিন। প্রথমতঃ সকল শব্দ সকলের নিকট সুবোধ্য নহে; আপনার নিকট যাহা সুবোধ্য, আমি তাহা বুঝি না। এস্থলে সকল শব্দের সমাবেশই নিরাপৎ; অভিধানসঙ্কলনকর্ত্তার বিবেচনার উপর ভার দিলে অনেক শব্দ এড়াইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সঙ্কলন কালে আপত্তি উঠে না; তখন সরল ও দুরূহ সকল শব্দই নির্ব্বিশেষে গৃহীত হয়। সংস্কৃত কোষকারেরাও সরল সর্ব্বজনবোধ্য শব্দগুলিকে কোষগ্রন্থে স্থান দিতে আপত্তি করেন নাই। তৃতীয়তঃ, কেবল কথার মানে বোঝানই অভিধানের উদ্দেশ্য নহে। অভিধানে অর্থবিচারের সহিত ব্যুৎপত্তিবিচারেরও প্রথা আছে। যে শব্দের অর্থ সকলেই জানে, যে শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে কিরূপে হইল, তাহা সকলে না জানিতে পারে। চতুর্থতঃ অভিধানের আরও একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। ভাষার সর্ব্বাঙ্গ বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ না করিলে ভাষার অবস্থা প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শব্দরাশির সঙ্কলন আবশ্যক। সেনসাস্ ব্যাপারে যেরূপ রাজাধিরাজ হইতে

ভিক্ষুক পর্য্যন্ত মনুষ্যমাত্রেরই একই মূল্য, লাট সাহেবকে যেমন একজন লোক বলিয়াই ধরা যায় ও লোকগণনার তালিকায় তিনি অধিক স্থান পান না, এখানেও সেইরূপ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকলেরই সমান আদর।

কাজেই প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য নামে পরিচিত সমগ্র সাহিত্যে খাঁটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা যত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার সঙ্কলন আবশ্যক; সকলেই বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত। অর্থবিচার ও ব্যুৎপত্তি বিচারকালে অপক্ষপাতে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ তালিকাসঙ্কলন অসাধ্য ব্যাপার; তবে যথাসাধ্য সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টা বিধেয়। কোন শব্দকেই বাদ দিলে চলিবে না। সকলেরই আদর সমান।

মাইকেল অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহই তাহার ব্যবহার করেন নাই, তাঁহার পরেও কেহ ব্যবহারে সাহসী হন নাই। 'ইরম্মদ' ও 'মহেষ্বাস' শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে অনেককেই স্থির নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। কিন্তু কি করা যাইবে। মাইকেল যখন মেঘনাদবধে তাহার ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মেঘনাদবধের নাম বাঙ্গলা বহির তালিকা হইতে যখন আমরা উঠাইতেও সম্মত নহি, এবং ভবিষ্যতেও অপর কোন পদ্যলেখক বা গদ্যলেখক কর্তৃক ঐ ঐ শব্দের ব্যবহার নিবারণের জন্য আমরা কোন আইনই খাটাইতে পারিব না, তখন উহাকে বাঙ্গলা ভাষায় গৃহীত খাঁটি সংস্কৃত শব্দ স্বরূপে বাঙ্গলা অভিধানে স্থান দিতেই হইবে। সেইরূপ প্রাচীন কিংবা আধুনিক কোন লেখক যদি কোন বাঙ্গলা নামে পরিচিত পুস্তকে 'গলদ' ও 'বলদ' ও 'গতর' শব্দের ব্যবহার করিয়া ভাষাকে কলঙ্কিত করিয়াই থাকেন, তাঁহার এই সাধুবিগর্হিত কার্য্য যতই নিন্দনীয় হউক না, ঐ সকল শব্দকে অভিধানে স্থান না দিলে উপায় নাই। কে বলিতে পারে রামপ্রসাদ সেন তাঁহার কোন্ গানে ঐ ঐ অসাধু শব্দের ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং সমগ্র পণ্ডিতসমাজের বিগর্হনা সত্ত্বেও বাঙ্গালী পাঠক সেই গানটাকে সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে সম্মত হইবে না।

বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ একখানি সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলিত না হইলে পর বলিতে পারা যাইবে না, কোন্ শ্রেণীর শব্দের সংখ্যা আমাদের সাহিত্যের ভাষায় অধিক।

ফলে এইরূপ কথাকাটাকাটি যুগ ব্যাপিয়া চালান যাইতে পারে। এস্থলে 'বিশুদ্ধ' শব্দটা উভয় পক্ষ এক অর্থে ব্যবহার করিতেছেন না। আপন আপন অর্থে উভয় পক্ষই ঠিক্। বিবাদের হেতু না থাকিলেও বিবাদ চালান যায়। আমরা 'বিশুদ্ধ' শব্দটাকেই বর্জ্জন করিয়া 'খাঁটি' শব্দ ব্যবহার করিব। আশা করি 'খাঁটি' শব্দের অবিশুদ্ধির জন্য পণ্ডিতেরা ক্ষমা করিবেন।

দাঁড়াইল এই। বাঙ্গালা ভাষার সম্পূর্ণ অভিধানে দুই শ্রেণীর শব্দ আছে (১) 'খাঁটি' সংস্কৃত ও (২) 'খাঁটি' বাঙ্গালা। রচনার ভাষায় ও কথার ভাষায় উভয় শ্রেণীর শব্দই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। চেষ্টা করিলে বরং 'খাঁটি' সংস্কৃতকে কতক পরিহার করা যাইতে

পারে, কিন্তু 'খাঁটি' বাঙ্গলার সম্পূর্ণ পরিহার একবারে অসাধ্য। খাঁটি সংস্কৃত পরিহার কতক চলিতে পারে বটে; কিন্তু সেইরূপ পরিহার কর্ত্তব্য বা প্রশংসনীয় বটে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

তার পরের কথা, কোন্ শ্রেণীর শব্দ ভাষামধ্যে সংখ্যায় অধিক? হঠাৎ বলা কঠিন; বাঙ্গলা ভাষার শব্দসমূহের সংখ্যা গ্রহণে এপর্য্যন্ত কেহ সাহসী হয়েন নাই। বাঙ্গলার সম্পূর্ণ অভিধান সঙ্কলিত হয় নাই। যে সকল অভিধান প্রচলিত আছে, তাহা সংস্কৃত কোষ গ্রন্থ হইতে গৃহীত; তাহাতে এমন খাঁটি সংস্কৃত শব্দের সমাবেশ আছে, যাহা আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার, 'বিশুদ্ধ' বাঙ্গলা ভাষার রচনায় বা কথনে কোনও প্রাণিকর্ত্তৃক কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের যেগুলি নহিলে আমাদের দৈনিক জীবনযাত্রা অচল হয়, অথবা বিশুদ্ধ বাঙ্গলা রচনাও অসাধ্য হয়, তাহাদের অধিকাংশই প্রবেশানুগ্রহে বঞ্চিত রহিয়াছে। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আক্ষেপোক্তি অনেকেরই মনে আছে সন্দেহ নাই।

সাহিত্যের ভাষার ও লৌকিক ভাষার একটা পার্থক্য থাকিবেই। এই পার্থক্য বিলোপের চেষ্টায় কোন ফল নাই; যে অংশের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা, তাহা লৌকিক ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে; এবং যে অংশের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি, অথবা অভিজ্ঞের সহিত জ্ঞানালোচনা, তাহাও লৌকিক ভাষা হইতে দূরবর্ত্তী হইবে। ইহা সাধারণ নিয়ম। কেবল এদেশে কেন; উহা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। সকল দেশেই এই প্রভেদ আছে, ও থাকাই উচিত, ও থাকিবে। তজ্জন্য বাদানুবাদ বৃথা। লেখকগণও ব্যক্তিগত শিক্ষা দীক্ষা ও রুচি অনুসারে কেহবা সাহিত্যের ভাষাকে লৌকিক ভাষার অভিমুখে, কেহবা বিমুখে লইয়া যাইবেন; সে বিষয়েও বাদানুবাদ বৃথা। সকলের ভাষা এক ছাঁচে ঢালা হইবে না; কখনও হয় নাই ও হওয়া প্রার্থনীয়ও নহে। তাহা হইলে সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্যের নাশ হইবে মাত্র। ব্যক্তিগত রুচিভেদের জন্য কোন নিয়ম বন্ধন চলে না। যাঁহারা নিয়মের বন্ধনে ব্যক্তিগত রুচিকে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই নিষ্ফল শ্রম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত প্রতিভাকে নিয়মরজ্জুতে আবদ্ধ করিতে চান, তাঁহারা নিতান্তই মৃণালতন্তু দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধিতে চাহেন।

সুতরাং এ বিষয়ে নিয়মস্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক, উপদেশদান নিরর্থক, ও বাদানুবাদ নিতান্তই নিরর্থক। আপনার রুচি ও আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে, পাঠকের রুচি ও পাঠকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, কেহ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের, কেহবা বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী হইবেন, ইহাই নিয়ম। ইহাতে অন্য সঙ্কীর্ণ নিয়ম জারি করিলে তাহা কেহ মানিবে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মানিবেন না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীও মানিবেন না।

যদি কোন সাধারণ নিয়ম স্থাপন করা চলে, তাহা এইরূপ। ভাষার মধ্যে শ্রুতিকটুতা ও অশ্রাব্যতা দোষ যথাসাধ্য পরিহার করিবে, ও নিতান্ত অকারণে ভাষাকে অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য করিবে না।

এই সকল দোষ কেবল যে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগেই খাটে তাহা নহে, খাঁটি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগেও খাটে। আর বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগকালে যাহা প্রকৃতই গ্রাম্য অর্থাৎ slang, ভদ্রসমাজ যাহার উচ্চারণে কুণ্ঠিত হন, যাহা প্রকৃতই অসাধু, অশিষ্ট, ও অশ্লীল, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। এই নিয়মের প্রতিও কোন পক্ষেরই আপত্তি হইবে না। কেন না গ্রাম্য ও অশিষ্ট শব্দের ব্যবহার ভাষার প্রাঞ্জলতা বা সরলতা সাধনের জন্যও আবশ্যক নহে, এবং উহাতে ভাষার সৌষ্ঠববর্দ্ধন ও করে না।

এতটা বাক্যব্যয়ের পর বোধ করি আমি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, যে এতটা বাক্যব্যয়ের কোন প্রয়োজনই ছিল না; কেন না যাহা এতটা পরিশ্রমের পর প্রতিপন্ন করা গেল, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য; তাহাতে কাহারও কোন মতভেদ নাই।

তদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে বাক্যব্যয় আরও অপ্রাসঙ্গিক। যে মূল বিষয় লইয়া বর্ত্তমান বিতণ্ডা উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই অবান্তর কথাটার প্রসঙ্গ মাত্র তুলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কেন না মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ব্যাকরণের অভাব দেখিয়া সেই ব্যাকরণরচনার প্রসঙ্গমাত্রই উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র। কোন্ ভাষা ভাল, কোন ভাষা মন্দ, সে প্রসঙ্গই তাঁহারা উঠান নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের অনুকূল, এইরূপ একটু আভাস আছে বটে। কিন্তু তাহা ব্যক্তিগত কথা ও অবান্তর কথা। তিনি স্বয়ং খাঁটি বাঙ্গালায় অনুরাগী হইতে পারেন ও অন্য লেখকগণকে সেই পথ অবলম্বনে উপদেশ দিতে পারেন, অন্যে সেই পথ অবলম্বন করিলে তিনি সুখী হইতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহার সহিত অন্যের মত না মিলিতে পারে। কিন্তু এই অবান্তর প্রসঙ্গের বিবাদে নিরত হইয়া তাঁহার উত্থাপিত মূল প্রসঙ্গকে বাক্যকুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন ও আবৃত করা উচিত নহে। মূল প্রসঙ্গ বাঙ্গালা ব্যাকরণের গঠনপ্রণালী লইয়া, সাহিত্যের ভাষার গঠনপ্রণালী লইয়া নহে।

অন্যতর বন্দী রবীন্দ্র বাবু ভাষার সৌষ্ঠব বিচারের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নাই। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার কোন স্থলে এমন আভাস মাত্র নাই, যাহাতে সংস্কৃতের পক্ষপাতীদের মনে কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে। তিনি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কোন স্থলে বলেন নাই, যে সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিবে, বা সংস্কৃত শব্দের প্রতি বিরাগ দেখাইবে। তিনি স্বয়ং রচনাস্থলে সংস্কৃত শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার আধুনিক রচনায়—গদ্য ও কবিতা রচনায়—সংস্কৃত-শব্দ-বাহুল্য দেখিয়া হয়ত তাঁহার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভীত হইয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান বিবাদক্ষেত্রে, অর্থাৎ সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় ও সাহিত্যপরিষৎ সভায় তাঁহার যে মত এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধচ্ছলে বা বক্তৃতা-

চ্ছলে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার কুত্রাপি এমন কোন কথা নাই, যে তোমরা সংস্কৃত শব্দ সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহার করিও না; বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করিও না। তিনি কেবল মাত্র কতিপয় বাঙ্গলা শব্দ, খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ, সঙ্কলন করিয়া সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং ঐ সকল শব্দের অর্থ লইয়া ব্যাখা ও উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, ও অপরকে সেইরূপ অর্থগত ও উৎপত্তিগত আলোচনার জন্য আহ্বান করিয়াছেন মাত্র। ঐ সকল শব্দের সকল গুলিই খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ; কতক সংস্কৃতসূচক, কতকবা দেশজ। কতকগুলি সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, সাধু ভাষায় স্থান পাইয়াছে, কতক হয়ত সাহিত্যে স্থান পায় নাই; কতকগুলি হয়ত প্রকৃতই গ্রাম্য slang, উহাদের সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিতও নহে। কিন্তু তিনি তাহাদের অর্থ বিচার করিয়াছেন; তাহারা কোথা হইতে আসিল, কিরূপে সিদ্ধ বা নিষ্পন্ন হইল তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ কথা বলেন নাই, যে তোমরা সাহিত্যে ও সাধু ভাষায় এই সকল শব্দের প্রয়োগ করিও। তাঁহার সমস্ত রচনা অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ দুরভিসন্ধির স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চিহ্ন আমি কোথাও পাই নাই। যদি কেহ পাইয়া থাকেন, দেখাইয়া দিলে উপকৃত হইব।

কিন্তু ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে রবি বাবু পরিষৎ-পত্রিকাতে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দেরই ব্যাকরণ-বিষয়ক আলোচনা করিয়াছেন; এবং ইহাও স্বীকার্য্য যে সেই সকল শব্দের মধ্যে অনেক অসাধু শব্দ আছে, অনেক গ্রাম্য শব্দ আছে, তাহা সাধু সাহিত্যে আদৃত হয় না ও আদৃত হইবে না। বস্তুতই তন্মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রকৃতই slang অপভাষা ও গ্রাম্য ভাষা। এই অপভাষার আলোচনাই অনেকের প্রীতিকর হয় নাই। তাঁহারা হয়ত মনে ভাবিয়াছেন, এই সকল শব্দের প্রতি রবি বাবুর একটা আন্তরিক টান আছে ও অনুরাগ আছে; তিনি ব্যাকরণ আলোচনা উপলক্ষ করিয়া ইহাদিগকে সাহিত্যে চালাইতে চাহেন, এবং যদিও স্বয়ং ইহাদিগকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে সাহসী হন না, ভবিষ্যতে কোন্ দিন ব্যবহার করিয়া ফেলিবেন। অর্থাৎ তিনি যখন মাছের তেলের সম্বন্ধে রাসায়নিক প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তখন কোন্ দিন মাছের তেল মাখিয়াই ফেলিবেন; যখন শেয়ালের জীবতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তখন কোন্ দিন শেয়াল পুষিয়া দরজায় রাখিবেন। লেখকের তীব্র ও স্পষ্ট ভাষা সত্ত্বেও যদি কাহারও এইরূপ আশঙ্কা থাকে, সেই আশঙ্কা দূর করিবার অন্য উপায় নাই। পরিষৎ সভায় তিনি যে প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, যাহা তৎপরে বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে, এবং পরিষদে বাদপ্রতিবাদের উত্তরে তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেরূপে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার পর যে ওরূপ সন্দেহ কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে কুলায় না। অথচ দেখিতেছি, অনেকেরই সন্দেহ যায় নাই। এখনও অনেকেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তর্ক করিতেছেন, সাহিত্যের ভাষায় গ্রাম্য শব্দের সমাবেশ বাঞ্ছনীয় নহে; যেন রবি বাবু গ্রাম্য শব্দের ব্যবহারেই সমর্থন করিয়াছেন।

এস্থলে কোন উপায় দেখি না। রবি বাবু অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন; তথাপি তাঁহাদের যদি অনুভূতির সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে বস্তুতই উপায় নাই। ত্বগ্‌ভেদাৎ-শোণিতস্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি, আত্মনো যে ন জানন্তি, তাঁহাদের প্রতি বাক্য প্রয়োগ নিরর্থক।

সাহিত্যে অপভাষার ব্যবহার করিব কি না, এ কথাটাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কেন না কেহ তাহা বলে নাই। কিন্তু অপভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করিব কি না, ইহা প্রাসঙ্গিক বটে। এবং এতক্ষণ পরে যে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিবার অবসর পাইলাম, ইহাও সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় ভারতী পত্রে বলিয়াছেন, এই সকল শব্দগুলির অর্থাৎ রবীন্দ্র বাবুর আলোচিত শব্দগুলির অধিকাংশই অতি অকিঞ্চিৎকর। কেন না সাধু ভাষায় ও সাধু সাহিত্যে উহাদের ব্যবহার দোষাবহ। কাজেই উহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।" পরবর্ত্তী সংখ্যার ভারতীতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ন্যায় বিবিধভাষাবিৎ পণ্ডিতও বলিয়াছেন, চলিত ভাষার ব্যাকরণ রচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না ব্যাকরণ রচনা দ্বারা চলিত ভাষার স্বাধীন গতি ও উন্নতি প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে।

ফলে দুইজন সুবিজ্ঞ ভাষাবিৎ পণ্ডিত দুই বিভিন্ন হেতুবাদ দর্শাইয়া বলিতেছেন, চলিত বাঙ্গালার অর্থাৎ লৌকিক বাঙ্গলার ব্যাকরণ আলোচনা আবশ্যক নহে। রবিবাবু যেদিন পরিষৎসভায় কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেদিন মাননীয় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকটা আভাসে বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ ব্যাকরণ আলোচনার এখনও সময় হয় নাই। ইহাকে একটা তৃতীয় হেতুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ হেতুবাদের সারবত্তার আলোচনা আবশ্যক।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কি, তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা আবশ্যক বোধ করিতেছি। কেন না ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি, সেইটা নির্দ্ধারিত হইলে বিচারের পথ অনেকটা সোজা হইতে পারে। এবং ব্যাকরণ শব্দের অর্থেও একটু গোল আছে।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ পদের বিশ্লেষণ, অর্থাৎ প্রত্যেক পদকে ব্যবচ্ছেদ দ্বারা দেখাইতে হইবে, কিরূপে কোন্ মূল ধাতু হইতে পদটি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ উহার উপাদানগুলি কি প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়া উহার শরীরটি গঠিত হইয়াছে, তাহা দেখানই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে Etymology বলে, ব্যাকরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ তাহাই। কিন্তু আজ কাল ব্যাকরণ শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়; উহা ইংরাজি গ্রামার শব্দের প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে; তন্মধ্যে Etymology ভিন্ন Syntax বা বাক্যনির্ম্মাণ প্রকরণ, ছন্দঃপ্রকরণ এমন কি অলঙ্কার প্রকরণ পর্য্যন্ত স্থান পাইয়া থাকে। আমরা ব্যাকরণ শব্দ এই ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করিলাম। তাহাতে বক্তব্যের কোন ক্ষতি হইবে না।

মনুষ্যের ভাষা ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে, ভাষার গঠনপ্রণালীতে কতকগুলি নিয়ম আছে। শব্দের গঠনে, পদের গঠনে ও বাক্যের গঠনে এইরূপ নিয়মের আবিষ্কারই ব্যাকরণের (অর্থাৎ গ্রামারের) উদ্দেশ্য। এইরূপ নিয়ম যে ভাষা-মাত্রেই বর্ত্তমান, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না; কেননা কোন নিয়ম না থাকার নাম বিশৃঙ্খলা; এবং যে ভাষা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, কোন নিয়মই যাহা মানে না, তাহা মনুষ্যের ব্যবহার্য্য নহে। অতি অসভ্য জাতির ভাষাকেও বিশ্লেষণ করিলে সেই ভাষার অবস্থানুরূপ নিয়মের আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

অসভ্য জাতির ভাষারও ব্যাকরণ তৈয়ার হইতে পারে। যে ভাষায় নিয়ম আদৌ নাই, সে ভাষা কেহ শিখিতে পারে না, কাহাকেও শিখান যায় না; তাহা ভাষাই নহে। এবং নিয়ম থাকিলেই সেই নিয়মের আবিষ্কার যিনি করিবেন, তিনিই সেই ভাষার বৈয়াকরণিক।

ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে একটি বিজ্ঞান শাস্ত্র; ব্যাপক অর্থে ইহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই ভাষাবিজ্ঞানের এক অংশ, বোধ করি সর্ব্ব-প্রধান অংশ, যাহা Etymology অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাকরণ, তাহা আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহর্ষি পাণিনির হস্তে ইহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনিই জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক, তাঁহার তুল্য আর কেহ জন্মায় নাই। মেকলের ভাষায় বলা যাইতে পারে একলিপ্‌স্‌ সকলের অগ্রণী; অন্যের স্থান বহুদূরে। পাণিনির বহু পূর্ব্ব হইতে ঋষিগণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষাবিজ্ঞান গঠিত করিতেছিলেন, পাণিনি সেই বিজ্ঞানকে প্রায় সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতা দান করেন। তার পর যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা তাঁহারই বার্ত্তিক ও ভাষ্য ও টীকা। আধুনিক বৈয়া-করণেরা যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সেই প্রাচীনকালের বিজ্ঞানের বালকপাঠ্য পুস্তক মাত্র।

পাণিনি প্রভৃতি মহর্ষিরা ভাষা ব্যবচ্ছেদ করিয়া যে সকল নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষার পক্ষে প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞান; তাহাই প্রকৃত ব্যাক-রণ। আমরা বালকগণকে ও অনভিজ্ঞকে ভাষা শিখাইবার জন্য যে সকল ব্যাকরণ-ঘটিত পুস্তক লিখি, তাহা বৈজ্ঞানিক পুস্তক বটে, কিন্তু তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র নহে।

আর একটা কথা বলা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস ব্যাকরণকারেরা যে নিয়ম বাঁধেন, ভাষা সেই নিয়মে চলে। মিথ্যা কথা। কোনও ব্যারকণকারের সাধ্য নাই যে কোন নিয়ম বাঁধেন, কোন আইন জারি করেন। ভাষার নিয়ম ব্যাকরণকারের বৃদ্ধপিতামহগণের জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকে; তিনি সেই গুলি আবিষ্কার করিয়া অন্যকে দেখাইয়া দেন মাত্র। নিয়ম বাঁধার কথা উঠিতেই পারে না।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলা ব্যাকরণ নামে যে কয়েকখানি শিশুবোধক পুস্তক প্রচলিত আছে, উহা প্রকৃত বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। নহে, কেন না বাঙ্গালা ব্যাকরণই এখন নির্ম্মিত হয় নাই,

কোন্ ভবিষ্যতে হইবে তাহাও কেহ জানে না। উহা সংস্কৃত আদর্শে লিখিত, একথার এই অর্থ, যে উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে, উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা অনুবাদ।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল বালকপাঠ্য ব্যাকরণ লইয়াই যেন ব্যাকুল। যেন ব্যাকরণ শাস্ত্র বালক ভিন্ন বৃদ্ধের জন্য আবশ্যক নহে। প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ গ্রন্থগুলি বালকেরই পাঠ্য; উহা বালকগণকে ভাষা শিখাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু আমি ব্যাকরণ নামে যে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উল্লেখ করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য ভাষা শেখান নহে। উহার উদ্দেশ্য নিজে শেখা, ভাষার ভিতরে কোথায় কি নিয়ম প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, তাহাই আলোচনা দ্বারা আবিষ্কার করা। আগে সেই নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে; অর্থাৎ ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া তাহার সহিত স্বয়ং পরিচিত হইবে; তাহার পর উহা অন্যকে শেখান যাইতে পারিবে। বাঙ্গলা ভাষার সেই ব্যাকরণ এখনও রচিত হয় নাই, কেননা বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে কি নিয়ম আছে না আছে, তাহার কেহই আলোচনা করেন নাই। সে সকল নিয়মের যখন আবিষ্কারই হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই, তখন বাঙ্গলার ব্যাকরণ এখন বর্ত্তমানই নাই। বাঙ্গলার ব্যাকরণ কি পদার্থ তাহা কেহই জানে না, রবীন্দ্র বাবুও জানেন না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীও জানেন না। কেহই যখন জানেন না, তখন অন্যকে শিখাইবেন কি? কাজেই পরকে শিখাইবার জন্য ব্যাকরণ রচনার প্রসঙ্গ এখন উঠিতেই পারে না; এখন নিজে ব্যাকরণ শিখিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত। (এখন যাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ বলা হয়, উহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে। বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের নিকট যাহা পাইয়াছে, সংস্কৃতের নিকট যে অংশ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, সেই অংশের ব্যাকরণ। উহা সংস্কৃত ব্যাকরণ; বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে। সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনার জন্য আমাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না। পাণিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন; আমরা যদি তাহা শিখিতে চাই, তাঁহাদের পুঁথি পড়িলেই হইবে।) অন্যে যদি শিখিতে চায়, সেইখানে বরাত দিলেই হইবে। ছেলেরা যদি শিখিতে চায়, ছেলেদিগকে মূল সংস্কৃত হইতে অথবা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে শিখাইলেই চলিবে। ছেলেদিগকে উহা পড়াইও না, এ কথা কেহ বলে না। কিছু পড়াইতেই হইবে; কেননা, বাঙ্গালা যখন সংস্কৃতের সম্পত্তি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন সেই অংশটুকু বুঝাইবার জন্য পড়াইতে হইবে। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনার জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। সে ক্ষেত্রে সাহিত্যপরিষৎ নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন না। সংস্কৃতের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ব্যাকরণ সাহিত্য পরিষদের জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্যপরিষদের তজ্জন্য চিন্তিত হইবার কিছুমাত্র হেতু নাই। সাহিত্য-পরিষদের কোন সভ্যের যদি সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিতে ইচ্ছা হয়, তিনি পণ্ডিত রাখিয়া শিখুন; তাহাতে কেহ বাদী হইবে না।

কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাঙ্গলার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সেই অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে; খাঁটি বাঙ্গলার আলোচনা করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিতে হইবে। ইহাই সাহিত্যপরিষদের কার্য্য; ইহাই পরিষদের কর্ত্তব্য। পরিষৎ যদি তাহা কিঞ্চিৎ সম্পাদন করিয়া যহেঁতে পারেন, পরিষদের জীবন সার্থক হইবে।

এই কথাটা অত্যন্ত সহজ; অথচ কি কারণে ইহা পণ্ডিতগণের মাথায় আসিতেছে না বলা কঠিন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ভারতীতে প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রবন্ধের ফুট নোটে আমার প্রতি যে সকল বাক্য আরোপ করিয়াছেন, আমি তাহা বলি নাই। অথবা আমি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম, তিনি ঠিক তাহার উল্টা বুঝিয়াছেন। হয়ত আমার বলিবার দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে; উহা আমার দুর্ভাগ্য। তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইলে যে বিচার উপস্থিত হয়, আমি তখন যাহা বলিয়াছিলাম তাহার স্থূল মর্ম্ম এই। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ বিন্যাস হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। অন্যের তাহাতে রুচিগত আপত্তি থাকিতে পারে; আমি সে আপত্তি নাই বা করিলাম। অন্যের মতে সীতার বনবাসের ভাষা উৎকৃষ্ট ভাষা না হইতে পারে; আমি যেন স্বীকার করিলাম উহা আদর্শ ভাষা ও উৎকৃষ্ট ভাষা। এবং সংস্কৃতবহুল এই আদর্শ ভাষা বুঝিতে হইলে ও বুঝাইতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তাহাও স্বীকার করিলাম। যাঁহারা এই ভাষা পছন্দ করেন না, ঐরূপ ভাষা কখনও ব্যবহার করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার ধারিবেন না ইহা সঙ্গত। কিন্তু যাঁহাদের সেরূপ প্রতিজ্ঞা নাই, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধির নিয়ম ও সমাসের নিয়ম ও পদ সাধিবার নিয়ম শিখিতেই হইবে। তাঁহারা শিখুন, তাহাতে কে আপত্তি করিবে? তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণসমুদ্র সাঁতার দিয়া পার হউন, কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। তাঁহারা গ্রীক লাটিনের ব্যাকরণ শিখিতে গেলে ত কেহ আপত্তি করে না; তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিলেই বা কে বাদী হইবে? তবে ছেলেদের কথা; তাহাদের বয়সের প্রতি ও দেশের ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যতটা শেখান দরকার বোধ কর, শেখাও; তাহাতেই বা আপত্তি কি? হীরেন্দ্র বাবু তাহাদের প্রতি দয়ালু; শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের ততটা দয়া নাই; বেশ কথা; তাঁহারা আপন আপন ছেলের প্রভু; যতটুকু শেখান দরকার বোধ করেন শিখাইবেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তজ্জন্য কাতর হইবার বা ব্যাকুল হইবার আমি কোন প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু একটা বিষয়ে সাহিত্যপরিষদের ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন আছে। সীতার বনবাসেও খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রয়োগ আছে। সেই সকল শব্দ কোথা হইতে আসিল, তাহারা কি নিয়মের অনুসারে ব্যবহৃত হয়, তাহা কেহই জানেন না। হীরেন্দ্র বাবু বা রবীন্দ্র বাবু বা পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কেহই জানেন না। সেইগুলির আলোচনা সাহিত্য-পরিষদেরই কাজ। সাহিত্য-পরিষদের কাজ, কেন না সে আলোচনা কেহ

করে নাই; সাহিত্যপরিষৎ সেই আলোচনার যোগ্য পাত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত আছে। সাহিত্যপরিষৎ তজ্জন্য কিছুমাত্র ভাবিবেন না। বাঙ্গলা ব্যাকরণ নাই। সাহিত্যপরিষদকে তাহা গড়িতে হইবে।

বাঙ্গলা ভাষায় অনেক খাঁটি সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে; কালে আরও হইবে; হউক ইহাই প্রার্থনা করি। এই সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা আবশ্যক। সীতার বনবাসের প্রথম বাক্য "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন", ইহা বাঙ্গলা বাক্য, সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গলা বাক্য। কেহ বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে, কাজেই উহা অপকৃষ্ট বাঙ্গলা। তথাস্তু। কেহ বা বলিবেন, ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য আছে; কাজেই ইহা উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা। তথাস্তু। উৎকৃষ্টই হউক বা অপকৃষ্টই হউক, উহা বাঙ্গলা। উহার মধ্যে কতক শব্দ খাঁটি বাঙ্গলা; কতকগুলি খাঁটি সংস্কৃত; কিন্তু উভয়বিধ শব্দ বাঙ্গলা ভাষার বাক্যগঠনের নিয়মানুসারে গ্রথিত হইয়াছে। উহা ইংরাজি নহে, পারসী বা আরবী নহে, সংস্কৃতও নহে, প্রাচীন প্রাকৃতও নহে; উহা বাঙ্গলা। এই বাক্যটির অন্তর্গত সমুদয় শব্দের ব্যাকরণ অর্থাৎ ইটিমলোজি না জানিলে এই বাক্যের বৈয়াকরণিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। এইজন্য তদন্তর্গত সংস্কৃত শব্দগুলির ব্যাকরণ জানা আবশ্যক। 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দের উপাদান যে প্রতি+স্থা+ত, উহা না জানিলে 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দটি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, কেন উহার অর্থ ঐরূপ হইল, তাহা বুঝা যাইবে না। 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দটিকে তজ্জন্য ভাঙ্গিয়া উহার উপাদানগুলি বাহির করা আবশ্যক। এইরূপে বিশ্লেষণ কার্য্য সমাধানের পর ঐ শব্দটির অর্থ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ এই বিশ্লেষণ কার্য্যের বহু কাল হইল সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহারা কিছুই রাখেন নাই। আমাদের তজ্জন্য মস্তিষ্ক আলোড়নের কোন অবকাশ নাই। কোন সংস্কৃত ব্যাকরণের পাতা উলটাইলেই দেখিতে পাইবে 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি। এই ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণে আছে। বাঙ্গলা ভাষা এই শব্দটি সংস্কৃতের নিকট গ্রহণ করিয়াছে; যাঁহারা বাঙ্গলা ব্যাকরণ লেখেন, তাঁহারাও সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে সেই অংশটুকু অনুবাদ করিয়া আপন গ্রন্থ মধ্যে বসাইয়া দেন ও তাহার নাম দেন, বাঙ্গলা ব্যাকরণ। কিন্তু ইহা বাঙ্গলা ব্যাকরণ নহে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের বাঙ্গলা অনুবাদ।

এইরূপ অনুবাদকারের সবিশেষ কৃতিত্ব নাই; সবিশেষ অপরাধও যে আছে তাহা বলি না। তবে যদি তাঁহারা অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আস্ফালন করেন, তাহা হইলে নীরব অবজ্ঞাই তাহার যথেষ্ট তিরস্কার। যে সকল ছাত্রকে সীতার বনবাস পড়িতে হয়, অথচ যাহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে না, তাহাদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া দিলে সংস্কৃত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি তাহারা

বুঝিতে পারে। এই পরিমাণে এই সকল শিশুবোধক গ্রন্থের সার্থকতা বা উপকারিতা আছে।

এইরূপে 'অপ্রতিহতপ্রভাব' ও 'অপত্যনির্ব্বিশেষ' শব্দ দুইটি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বহুদিন হইল স্থির করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষা কিরূপ দর্পের সহিত পঞ্চাশটা শব্দ একত্র সমাসে গাঁথিয়া একটা পদ নির্ম্মাণ করে, তাহা তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। উহা ছাত্রগণকে তর্জ্জমা করিয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি দেখি না। সুতরাং শিশুবোধের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটা পরিচ্ছেদ অনুবাদ করিয়া দিলে গর্হিত কাজ হয় না।

কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের যে সকল অংশের বাঙ্গলায় প্রয়োগ হয় না, তাহারও যেন অনুবাদ করা না হয়। তাহা হইলে বালকদের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ইহার প্রচুর উদাহরণ দিয়াছেন।

কিন্তু সীতার বনবাসের ঐ বাক্যমধ্যে সংস্কৃত শব্দগুলি ছাড়া কয়েকটি বাঙ্গলা শব্দ আছে; যথা 'হইয়া' এবং 'করিতে লাগিলেন'। সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইহারা না থাকিলে বাক্যটি সম্পূর্ণ হইত না। বরং সংস্কৃত শব্দগুলির স্থানে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ বসাইলে উৎকৃষ্ট না হউক, চলনসই বাঙ্গলা হইতে পারিত; কিন্তু এই খাঁটি বাঙ্গলা শব্দগুলির স্থান লইতে পারে এমন কোন সংস্কৃত শব্দই নাই। ইহা-দিগকে বাদ দিলে বাক্যটা বাঙ্গলা হইত না। সুতরাং এই গুলিকে লইয়াই বাঙ্গলা ভাষার প্রাণ। এই গুলির অস্তিত্বই বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই শব্দগুলি কিরূপে সাধিতে হইবে, তাহা কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থে নাই। কেন না এই শব্দগুলি সংস্কৃতমূলক হইলেও সংস্কৃত নহে। ইহারা বাঙ্গালার খাস সম্পত্তি। অন্য ভাষার ইহাদিগের উপর স্বত্ব বা অধিকার নাই। ইহাদিগের গঠনপ্রণালীর বিচার যাহা করিবে, তাহাই **বাঙ্গলা ব্যাকরণ**। কিন্তু সেই বাঙ্গলা ব্যাকরণ এখন কোথায়?

প্রচলিত শিশুবোধক বাঙ্গলা ব্যাকরণগুলি খুলিয়া দেখিলে উহাদের ব্যুৎপত্তির কোন তথ্য পাওয়া যাইবে না। কোন ব্যাকরণকার যদি বাঙ্গলা শব্দের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া উহা-দিগকে সাধিবার কোন চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে জানি না। কেন না এই শব্দকয়টির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বাঙ্গলা দেশের সপ্তকোটি অধিবাসীর ও তাঁহাদের বহু-কোটি পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করি না।

যদি শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, ঐ সকল শব্দ অতি অকিঞ্চিৎকর, উহাদিগকে লইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সাধিত হয় না, তাহা হইলে অবশ্য নিরুত্তর হইতে হইবে। উহারা ভাষার প্রাণ; উহাদিগকে ত্যাগ করিলে ভাষা থাকিবে না।

'হইয়া' শব্দ সংস্কৃত 'ভূত্বা' শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে, খুব সম্ভবই তাহাই। কিন্তু

এই পরিণতি কার্য্য কখনই সহসা সাধিত হয় নাই। 'ভূত্বা' শব্দ নানা রূপপরিবর্ত্তের পর অবশেষে 'হইয়া' তে দাঁড়াইয়াছে। সেই সকল মধ্যবর্ত্তী রূপ কি? কোন বাঙ্গলা ব্যাকরণে তাহার উত্তর নাই; অথচ তাহার উত্তর দেওয়াই বাঙ্গলা ব্যাকরণের কার্য্য। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যাহার সাহায্য লইতে হয়, লও। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ভগ্নাবশেষ যেখানে যাহা বর্ত্তমান আছে, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ। বঙ্গদেশের দূর দূরান্তের প্রাদেশিক ভাষায় কোন্ কোন্ রূপ বর্ত্তমান আছে, খুঁজিয়া দেখ। তাহার পর উত্তর দিবার চেষ্টা করিও। তৎপূর্ব্বে একটা অনুমানিক উত্তর দিলে তাহা গ্রহণ করিব না—কিছুতেই না। হর্ণলী সাহেব বলিয়াছেন 'কর্ত্তব্য' হইতে 'করিব' উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন, 'করিষ্যামি' হইতে 'করিব' হইয়াছে। 'করিষ্যামি' কিরূপে 'করিব' তে পরিণত হইয়াছে, তাহার প্রমাণের জন্য সমগ্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ঘাঁটিয়া দেখা আবশ্যক; প্রাদেশিক ভাষা সমস্ত খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক, শাস্ত্রী মহাশয় যত সহজে প্রমাণ করিতে চাহেন, তত সহজে প্রমাণ হইবে না। অর্থসাদৃশ্য প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভাষার ইতিহাসে। সে প্রমাণ কোথায়? শাস্ত্রী মহাশয় যত সহজে তুষ্ট হইয়াছেন, আমরা তত সহজে তুষ্ট হইব না।

'হইয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে সমর্থ হইলে তখন 'যাইয়া' 'করিয়া' 'খাইয়া' প্রভৃতির উত্তর দেওয়ার পথ সুগম হইবে। তখন বাঙ্গলা ব্যাকরণের একটা সূত্র আবিষ্কৃত হইবে। সেই সূত্র একটা নবাবিষ্কৃত তথ্য; এইরূপ তথ্য সমষ্টি লইয়া নূতন বাঙ্গলা ব্যাকরণের দেহ রচিত হইবে। সে বহু দূরের কথা; এখন মজুরি কর।

বাঙ্গলা ভাষার মহাসমুদ্র আলোড়ন কর। ডুবুরির মত অন্ধকার সাগর বক্ষে ঝাঁপ দাও। সমুদ্রগর্ভে শামুক, ঝিনুক, কঙ্কাল, প্রস্তর, মুক্তা, প্রবাল যেখানে যাহা আছে, তুলিয়া আন। কাহাকেও বাদ দিও না, কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না; কাহাকেও অগ্রাহ্য করিও না। কি জানি কোন্ অবজ্ঞেয় জঞ্জাল হইতে কি নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইবে। কি জানি কোন্ অগ্রাহ্য কঙ্কর মাজিয়া ঘসিয়া দেখিলে কোন্ রত্নে পরিণত হইবে। ডুবুরির মত যাহা পাও, কুড়াইয়া আন। সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞের হাতে অর্পিত কর। জহুরি কোন্ উপলখণ্ড হইতে কি জহর খুঁজিয়া বাহির করিবেন কে জানে? যত দিন জহুরির ও বিশেষজ্ঞের হাতে না পড়ে, তত দিন জাতীয় মিউজিয়মে সযত্নে উপাদানসকল সংগ্রহ করিয়া রাখ। সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে পার উত্তম; তোমার পরিশ্রম বিশেষজ্ঞের পরিশ্রম লাঘব করিবে। সাজাইতে না পার, রাখিয়া দাও। কিন্তু কাহাকেও অবহেলা করিও না। অবহেলার অধিকার তোমার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। 'গ্রাম্য ভাষা' বলিয়া অবজ্ঞার অধিকার তোমার নাই। Slang 'অপভাষা' বলিয়া নাসিকাকুঞ্চনে অধিকার তোমার নাই। যদি সেরূপ অবহেলা কর, বা অবজ্ঞা কর, তুমি দয়ার পাত্র; তদপেক্ষা তীব্র বিশেষণ ব্যবহার করিব না।

আমি যে ব্যাকরণের কথা বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য নিয়মরচনা নহে; নিয়মপ্রণয়ন নহে; নিয়ম আবিষ্কার। ভাষার মধ্যে অজ্ঞাত অপরিচিত নিয়ম বর্ত্তমান আছে; সেই নিয়ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। নিয়ম সকল ভাষাতেই আছে। সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, লাটিনে, হিন্দীতে, বাঙ্গালাতে, ধাঙ্গড়ের ভাষায় ও সাঁওতালের ভাষায় সর্ব্বত্র আছে। কেননা অনিয়ত, শৃঙ্খলারাহিত ভাষা চিন্তার অগোচর। নিয়ম আছে; তবে বিনা অন্বেষণে তাহা বাহির হইবে না। আবার নিয়ম সাহিত্যের ভাষাতে আছে, লৌকিক ভাষাতেও আছে। কথাবার্ত্তার ভাষা অনেকটা বন্ধনশূন্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতই কি তাহা শৃঙ্খলাবর্জ্জিত? অসম্ভব। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষার মধ্যেও নিয়ম আছে। অন্বেষণ কর বাহির হইবে। অবজ্ঞা করিওনা; পরিশ্রমে কাতর হইওনা।

ব্যাকরণ যখন নিয়ম বাঁধেনা, যখন উহা নিয়ম আবিষ্কার করে মাত্র, তখন যে উহা লৌকিক ভাষার উন্নতি প্রতিরোধ করিবে, ইহা বুঝিলাম না। ভাষা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত হইবে, ব্যাকরণও নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিবে, তাহাতে ভয় কি?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও ত তাহাই দেখি। আমাদের এই অতি প্রাচীনা বসুন্ধরার মূর্ত্তি যুগ ব্যাপিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের নিয়ম আবিষ্কার যে বিজ্ঞানের কার্য্য, সেই বিজ্ঞানের নাম ভূবিদ্যা। লক্ষ বর্ষ বা কোটি বর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ঠিক সেরূপ নাই। সে সময়ে পার্থিব ঘটনা যে যে নিয়মে সঙ্ঘটিত হইত, এখন সে সে নিয়মে হয় না; আবার বহু বৎসর পরে, যখন সূর্য্যের তাপ মন্দীভূত হইবে, যখন দিবাভাগের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, যখন চন্দ্রের আকর্ষণ মন্দ হইবে, তখন আর ঠিক বর্ত্তমান নিয়মে পার্থিব ব্যাপার ঘটিবে না। কিন্তু ভূতাত্ত্বিকেরা বর্ত্তমান কালের নিয়ম আবিষ্কার করেন বলিয়া ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের রোধ হয় না। ভাষার পক্ষেও সেই কথা। পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তন রোধ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত ভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে; অথবা রূপান্তরিত হইয়া অন্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন বৈয়াকরণ এই স্বাভাবিক বিকারের জন্য দায়ী নহেন।

যাহাই হউক নিয়ম বাঁধা যখন ব্যাকরণকারের উদ্দেশ্য নহে, নিয়ম আবিষ্কারই যখন উদ্দেশ্য, তখন, এ আপত্তি টিকিতেই পারে না। বাঙ্গালা ভাষাতে যদি নিয়ম থাকে, সেই নিয়মগুলি জানা আবশ্যক। কেবল সাহিত্যের ভাষা কেন, লৌকিক ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষাও অনিয়ত বা শৃঙ্খলারহিত নহে। ঐ সকল ভাষারও ব্যাকরণ আলোচনা অসাধ্য নহে। অবশ্য সাহিত্যের ভাষা যত সুশৃঙ্খল ও যত সুনিয়ত, লৌকিক ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা ততটা সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ত নহে। উহার ব্যাকরণও তদনুরূপ জটিলতাযুক্ত হইবে। হউক তাহাতে ক্ষতি কি? ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্র যদি আলোচ্য হয়, ভাষার কোন অবস্থাকে অবহেলা করিলে চলিবে না।

প্রধানতঃ ভাষাবিজ্ঞানের Etymology অংশ লইয়া এত কথা বলা গেল। ভাষাবিজ্ঞা-

নের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেই কথা প্রযোজ্য। বাঙ্গলা ভাষার বাক্যগ্রন্থন প্রণালী সংস্কৃত বাক্যগ্রন্থন প্রণালীর সহিত সর্ব্বাংশে সমান নহে। কাজেই বাঙ্গলা ব্যাকরণের এই অংশেও সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত পার্থক্য থাকিবেই। সাদৃশ্যও আছে, পার্থক্যও আছে। বাঙ্গলা ব্যাকরণে সাদৃশ্য ও পার্থক্য উভয়েরই বিচার করিতে হইবে। নতুবা ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। সংস্কৃতের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে; কিন্তু ইহা সংস্কৃত ভাষা নহে। বহুকোটি মনুষ্যে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহে; বহুশত লোকে বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এই সকল লোকে সংস্কৃত বুঝে না। সংস্কৃত ভাষা ইহাদিগকে চেষ্টা করিয়া শিখিতে হয়। বাঙ্গলা ভাষা ইহারা মাতৃস্তন্য পানের সহকারে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত শিখিয়া থাকে। সকল ভাষাতে যেমন নিয়ম আছে; বাঙ্গলা ভাষারও সেইরূপ নিয়ম আছে। নিয়ম না থাকিলে ইহা মনুষ্যের ভাষা হইত না। মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগিত না।

কিন্তু সেই সকল নিয়মের এখনও কেহ আলোচনা করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষাকে বিশ্লেষণ ও ব্যবচ্ছেদ করিলে যে সকল নিয়ম বাহির হইতে পারে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই নিয়মের আবিষ্কারের জন্য সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করা হইয়াছে মাত্র। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য-পরিষৎ-সভার মুখপাত্র স্বরূপে পণ্ডিতজনকে এই কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন মাত্র।

বালকগণের জন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণরচনা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ এখনও গঠিত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম সকল অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। এই সকল নিয়ম যখন আবিষ্কৃত হইবে, তখন ভবিষ্যতের পাণিনি নিজ প্রতিভাদ্বারা পূর্ব্বাচার্য্যগণের আবিষ্কারসকল সমন্বয় করিয়া বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্র গঠন করিবেন। তার পর সেই ব্যাকরণ বালকদিগের জন্য প্রচারিত হইবে সেই পাণিনির জন্মে এখন অনেক বিলম্ব। এখনও তাঁহার জন্মের সময় হয় নাই। আমাদিগকে তাঁহার আবির্ভাবের জন্য আয়োজন করিতে হইবে। আমরা আপন আপন ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগে বহুদিনে সোপানাবলি নির্ম্মাণ করিয়া যদি রাখিতে পারি, তাহা হইলে তিনি যখন আবির্ভূত হইবেন, তখন সেই সোপানের সাহায্যে আরোহণ করিবেন। অথবা তিনি যে সৌধ নির্ম্মাণ করিবেন, আমাদিগকে তাহার জন্য 'খড় খুঁটি চুণ কাঠ ইষ্টক প্রস্তর' প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। যদি কাহারও সাধ্য থাকে, অট্টালিকার নক্সাটাও তৈয়ার করিয়া রাখিবেন; কাহারও সাধ্য থাকে, দুই একটা ভিত্তি পত্তন, বা দুই একটা প্রাচীর বা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিবেন মাত্র।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই অর্থে যথার্থ।

ব্যাকরণশাস্ত্র নির্ম্মাণের এখনও সময় হয় নাই, কিন্তু উপাদান সংগ্রহের সময় হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎ কোন কালে ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন, এরূপ কেহ আশা করেন না ; সাহিত্যপরিষদের কোন বর্ত্তমান বা ভাবী সদস্য যদি নক্সা টা প্রস্তুত করিতে পারেন বা অট্টালিকার কোন ভগ্নাংশের অবয়ব গড়িয়া দিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কৃতিত্ব ধন্য হইবে। তাহাও যদি না পারেন, উপাদান সংগ্রহ সাহিত্যপরিষদের সাধ্য। কেননা উপাদান সংগ্রহ মজুরের কাজ ; ইহাতে কেবল পরিশ্রম আবশ্যক। সংগৃহীত উপাদানগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে যে বুদ্ধিটুকু দরকার, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে যিনি নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে যেন সংগৃহীত মশলা খুঁজিয়া লইতেই দিনক্ষেপ না করিতে হয়।

আমরা যত দূর বুঝিয়াছি, রবিবাবু সেই মশলা সংগ্রহের জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছেন মাত্র, এবং এই মজুরের কার্য্যে যদি কেহ অপমান বোধ করেন, এই কর্ম্মকে হেয় কার্য্য জ্ঞান করেন, সেই জন্য স্বয়ং মজুরবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অন্যের অনুকরণীয় হইয়াছেন মাত্র। তজ্জন্য তিনি ধন্য ; তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞতার ভাজন ; তজ্জন্য সাহিত্য-সমাজ তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ। তিনি পাণিনিস্থলাভিষিক্ত হইবার স্পর্দ্ধা করেন নাই ; তবে ভবিষ্যতের পাণিনি যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার কোন ক্ষুদ্র অংশের নক্সার আঁচড় ফেলিবার চেষ্টা করিয়া যদি সফল হন বা কোন ক্ষুদ্র অংশের ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হন, তাহা হইলেই তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসার্হ হইবে।

ব্যাকরণ এখনও রচিত ও নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং কিরূপ বাঙ্গালা ব্যাকরণ স্কুলের ছাত্রদিগকে পড়াইতে হইবে, সে বিষয়ে বাদানুবাদ বৃথা।

সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতিদ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য আমি এইরূপ বুঝিয়াছি ; এবং পরিষদের অনুগৃহীত কর্ম্মচারী স্বরূপে উপাদান সংগ্রহের জন্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছি। ইন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই, যথেষ্ট উপাদানসংগ্রহ না হইলে ব্যাকরণ রচিত হইবে না। সেই উপাদানসংগ্রহই পরিষৎ-পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। এবং যতদিন এই ক্ষুদ্র ব্যক্তি পরিষদের অনুগ্রহভার বহনে বাধ্য থাকিবে, আশা করি ততদিন ইহাই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

যে অর্থে ব্যাকরণ শব্দ আমি ব্যবহার করিতেছি, এবং সাহিত্যপরিষৎ যে অর্থে ব্যাকরণ আলোচনার প্রস্তাব করিতেছেন, সেই ব্যাকরণ আমাদিগকে এখন আলোচনা করিয়া বাহির করিতে হইবে। অন্যকে সে ব্যাকরণ শিখাইবার অধিকার আমাদের নাই। ব্যাকরণই যখন নাই, তখন শিখাইব কি ? আমরাই এখন বালকাবস্থ, আমাদিগকেই শিখিতে হইবে, আমরা এখন অন্য বালককে শিখাইব কিরূপে ? ব্যাকরণ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ; ব্যাকরণ রচনা ভবিষ্যতের কাজ ; ব্যাকরণ অধ্যাপনা আরও দূরের কথা।

কিন্তু এই যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বহীন, এবং যাহা ভবিষ্যতে গঠিত হইবে, ইহা সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে হইবে কি না? এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বাদানুবাদ ও কোলাহল হইয়াছে। অথচ অধিকাংশই অর্থশূন্য বাগ্‌জালমাত্র।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতের আদর্শে হইবে কি না, এ প্রশ্নে এত গণ্ডগোল কেন হয় বুঝিলাম না। এক অর্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ কেবল বাঙ্গালায় কেন, সকল ভাষাতেই গ্রহণ করা চলিতে পারে। বস্তুতঃ ভাষাবিজ্ঞান সংস্কৃত বৈয়াকরণদের হাতে যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা তৎপূর্ব্বে আর কোথাও হয় নাই শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞা- নের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আবিষ্কারের পর পাশ্চাত্যেরা ভাষাবিজ্ঞান কিরূপে অনুশীলন করিতে হয় শিখিয়াছেন। তৎপরে বিবিধ ভাষার তুলনায় সমালোচনা দ্বারা ভাষাবিজ্ঞান তাঁহাদের হাতে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাতেই যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, তখন বাঙ্গালা ব্যাকরণে হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

কিন্তু এই আদর্শ কিরূপ? ইহা প্রণালীগত আদর্শ। বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্ব্বত্রই একরূপ। কেবল ভাষায় কেন; ভাষাবিজ্ঞানেও যে পদ্ধতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ও জীববিজ্ঞানে, জ্যোতিষে ও রসায়নেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিবিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তাই বলিয়া পদার্থবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নহে; জ্যোতিষও রসায়ন নহে। সেইরূপ বিবিধ ভাষার আলোচনাতে একই পদ্ধতি একই আদর্শ গৃহীত হইলেও সেই সেই ভাষা এক হইয়া যায় না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উন্নত আদর্শ বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনাকালে অবলম্বিত হউক ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে। উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য যথেষ্ট আছে। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই সাদৃশ্যের নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে। আবার উভয় ভাষার প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্যও যথেষ্ট আছে। রবীন্দ্র বাবু বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধে তাহার প্রচুর উদাহরণ দিয়াছেন। উভয় ভাষা তুলনা করিয়া সেই বৈসাদৃশ্যের নিয়মগুলিও আবিষ্কার করিতে হইবে। সম্পূর্ণ ব্যাকরণে এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয় পক্ষেরই যথাযথ আলোচনা হইবে। কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি তর্জ্জমা করিয়া দিলে উহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইবে না।

বর্ত্তমান শিশুপাঠ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণে এই সকল বৈসাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা যে একবারে হয় না এমন নহে। কিন্তু সে চেষ্টার কোন মূল্য নাই। যে পরিমাণ পরিশ্রম ও চিন্তার পর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে কখনও কেহ হস্তক্ষেপ মাত্র করেন নাই। সাহিত্য-পরিষৎ সেই চেষ্টার জন্য সুধীগণকে আহ্বান করিতেছেন। সুধীগণ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া কার্য্যের গৌরবানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই প্রার্থনা। বিজ্ঞান গঠন তাঁহাদের কার্য্য; বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য সহকারে তাঁহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

অনর্থক বাদবিসংবাদে সময়নাশের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রীয় বিচারে বাদ বিসংবাদ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সেই বিবাদে যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটা অবান্তর কথা আসিয়াছে, সেটারও একটু আলোচনা আবশ্যক। বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল শব্দ ব্যবহার কালে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন উচিত কি না? এ প্রশ্নও যে কেন উঠে তাহা জানি না। অথচ উঠিয়াছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝিবা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে স্বেচ্ছাচার অবলম্বিত হয়। কিন্তু হরপ্রসাদ বাবু বা রবি বাবু কোন স্থানে এরূপ কোন কথা বলিয়াছেন কি, যে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিবে না? আমি ত কোথাও সেরূপ উক্তি দেখি নাই। আশঙ্কা অমূলক; কিন্তু আশঙ্কার অবশ্য একটা ভিত্তি আছে। আজ কাল অনেক লোক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কালে ব্যাকরণ ভুল করিয়া ফেলেন। কেবল যে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ লোকেই ভুল করেন এমন নহে; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেও করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতার অথবা অনবধানের ফল। 'কেশ বিনাশিনী তৈল' অথবা 'কৃতান্তাকর্ষণী মহৌষধ' কেবল যে বিজ্ঞাপনেই দেখা যায় এমন নহে। সাহিত্যেও ইহার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। যে সকল লেখক অনবধানতা বা অনভিজ্ঞতা বশে এইরূপ ব্যাকরণ ভুল করেন, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দাও। তাঁহাদিগকে ছেদন, ভেদন, কৃন্তন কর; তাঁহাদিগকে তপ্ত তৈলে প্রক্ষেপ করিয়া ভাজিয়া ফেল; অথবা ডালকুত্তার ব্যবস্থা কর। পুলিশ ভিন্ন অন্য কেহ আপত্তি করিবে না। এই অধম লেখক করিবে না। রবি বাবু ও শাস্ত্রী মহাশয়ও আপত্তি করিবেন না। কেন না ইহা অতি সহজ কথা। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃতের নিয়ম চলিবে; সে নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আমাদের গবেষণা ও মস্তিষ্কব্যয় নিষ্ফল। কিন্তু বাঙ্গলা শব্দের ব্যবহার বাঙ্গলা ব্যাকরণের নিয়মে চলিবে। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ অগ্রাহ্য। যদি এই নিয়ম অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত থাকে, উহা আবিষ্কার কর। তার পর প্রকাশ করিও। নিয়ম নাই ইহা বলিতে পার না।

বোধ হয় এ বিষয়েও মতদ্বৈধ বর্ত্তমান নাই। বিবাদ উঠে প্রয়োগের বেলায়। দু একটা উদাহরণ লইব। 'শুভ্র-বসন-পরিহিতা' নাকি ব্যাকরণসম্মত নহে; অথচ অনেকে এরূপ লিখিয়া থাকেন। ইহা হয় অনভিজ্ঞতা না হয় অনবধানের ফল। তাঁহাদিগকে 'পরিহিত-শুভ্র-বসনা' লিখিতে বল। কেননা উহা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী সংস্কৃত শব্দ। উহাতে হাত খেলা চলিবে না। 'অপ্সরাগণ' লিখিব কি 'অপ্সরোগণ লিখিব? সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অপ্সরাগণ ভুল হয়। সাধুসাহিত্যে স্থানবিশেষে যেখানে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সমাসঘটালঙ্কৃত পদাবলির ব্যবহার হইতেছে, সেখানে 'অপ্সরোগণ' লিখিতেই হইবে। কিন্তু 'অপ্সরা' একটি বাঙ্গলা শব্দ; উহা সংস্কৃত মূলক; সংস্কৃত 'অপ্সরস্' শব্দ ভাঙ্গিয়া বাঙ্গলা আকারান্ত অপ্সরা শব্দ বহু দিন হইল প্রচলিত হইয়াছে।

সংস্কৃত চক্ষুঃ, ধনুঃ, প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া বাঙ্গলায় উকারান্ত চক্ষু, ধনু শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। 'চক্ষুষ্মান্' 'ধনুর্ব্বাণ' প্রভৃতি স্থলে খাঁটি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু 'চক্ষু দ্বারা' 'ধনু ধরিয়া' প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গলা শব্দেরই ব্যবহার আছে। দুই রকমই লেখা চলিতে পারে। সেইরূপ অপ্সরা এই বাঙ্গলা শব্দের ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক। 'অপ্সরাগণ' লিখিব কি না এখনও মীমাংসা হইল না। সংস্কৃত সমাসের নিয়মানুসারে ইহা হয় না; কিন্তু বাঙ্গলা সমাসের নিয়মে ইহা হয়। বাঙ্গলাতে সমাসই নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে সহসা উপনীত না হইলে বোধ করি বিশেষ ক্ষতি নাই। মনে হইতেছে ভারতচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, 'যক্ষ বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, অপ্সরাগণের বাস'। তিনি বাঙ্গলা সমাস করিয়াছেন; সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করেন নাই। ভালই করিয়াছিল; 'অপ্সরোগণ' এখানে ভাল শুনাইত না। বাঙ্গলায় যখন অপ্সরা শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তখন বাঙ্গলা সমাসে এমন আপত্তি কি?

'সৃজন' ও 'সর্জ্জন' একটা পুরাতন আপত্তির ক্ষেত্র। সর্জ্জন শব্দ ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু উহা বাঙ্গলায় এপর্য্যন্ত চলে নাই। বিসর্জ্জন চলিয়াছে, সর্জ্জন চলে নাই; চলা প্রার্থনীয়ও নহে। সংস্কৃত শব্দ এখন অনেক আছে, যাহা বাঙ্গলায় চলে নাই; জোর করিয়া চালাইলেও সাধারণে গ্রহণ করিবে না। মাইকেল তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'সৃজন' শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নহে। উহা বাঙ্গলা শব্দ; হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন উহা বহুকাল হইতে প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ; বৈষ্ণব লেখকেরা উহা চালাইয়া গিয়াছেন। মৎস্য স্থলে মাছ লিখিলে যদি ভুল না হয়, তৈল স্থলে তেল লিখিলে যদি ভুল না হয়, বহু কালের প্রচলিত 'সৃজন' লিখিলেই বা এমন সাংঘাতিক ভুল কি হইবে? তবে সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তিনি 'সৃষ্টি' লিখুন; অনুগ্রহ পূর্ব্বক 'সর্জ্জন' লিখিবেন না।

কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বাদানুবাদে কোন ফল নাই। মূল বিষয়টা ইহাতে লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যায়। বাঙ্গলা নামে একটা ভাষা আছে। ইহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধ্য দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বা বলেন কোন অনার্য্য ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পরিচ্ছদ পরিয়া, সংস্কৃত ও প্রাকৃত অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া বাঙ্গলা রূপ ধারণ করিয়াছে। হয়ত এ সিদ্ধান্তের সম্যক ভিত্তি নাই, হয়ত ইহা অশ্রদ্ধেয়। কিন্তু প্রমাণ আবশ্যক। বাঙ্গলা ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, বিনা অনুসন্ধানে মিলিবে না। বিনা যথোচিত পরিশ্রমে ইহার সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। ঘরে বসিয়া কাগজ কলমের সাহায্য লইয়া উত্তর মিলিবে না। আনুমানিক উত্তর অগ্রাহ্য।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে বাঙ্গলা ভাষাকে কাটিয়া, ছিন্ন করিয়া, ভিন্ন করিয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া, দেখিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ যেমন শবদেহ ছুরিকা প্রয়োগে ছিন্ন করেন, সেইরূপে ভাষার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিৎ

যেমন অণুবীক্ষণ যোগে প্রত্যেক কোষকে পরীক্ষা করেন, সেইরূপ যুক্তির অণুবীক্ষণ যোগে প্রত্যেক শব্দকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কোন শব্দকে অবহেলা করিলে চলিবে না। শরীর তত্ত্ববিৎ কোন অঙ্গ কিছুই বাদ দেন না। সেই রূপ এ শব্দটা slang, এটা প্রাদেশিক, এটা অকিঞ্চিৎকর, এই বলিয়া অবহেলা করিলে চলিবে না। এইরূপ প্রবৃত্তিকে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তি বলে না। তত্ত্বান্বেষীর নিকট কিছুই অবহেলার বিষয় নহে; কিছুই অকিঞ্চিৎকর নহে। ধূলি-কণায় যে তত্ত্ব নিহিত আছে, সৌরজগতের তত্ত্ব তাহা অপেক্ষা শিক্ষাপ্রদ না হইতেও পারে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, প্রভৃতির সহিত বাঙ্গলাকে তুলনা করিতে হইবে। আসামী, উড়িয়া, ছেকাছেকির সহিত তুলনা করিতে হইবে। প্রাদেশিক লৌকিক ভাষা সমুদয় পরস্পর তুলনা করিতে হইবে। পারিভাষিক শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলন পরীক্ষা করিতে হইবে। ধাঙ্গড়ের ভাষা সাঁওতালের ভাষা খুঁজিতে হইবে; কে বলিতে পারে, ঐ ভাষার সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ কি; কে জানে উহার কাছে কতটা ঋণ আছে।

কার্য্য অতি বৃহৎ। দশ জনের বা দশ বৎসরের চেষ্টায় ইহা সম্পন্ন হইবে না। কোন দেশে হয় নাই। কোন কালে হয় নাই। বিজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানের গতি কেবল পূর্ণতার অভিমুখে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যদি সেই কার্য্য কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইতেই সাহিত্যপরিষদের জন্ম নিরর্থক হইবে না।

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পত্রিকার ক্ষুদ্র শরীর অযথাপরিমাণে অধিকার করিল, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক বোধ করি। প্রবন্ধের ভাষায় যদি সর্ব্বত্র যথোচিত সংযম প্রকাশ করিতে না পারিয়া পত্রিকাসম্পাদকের অধিকারসীমা লঙ্ঘন করিয়া থাকি, তজ্জন্য বাদী প্রতিবাদী ও পাঠকগণের নিকট বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত।

গত ১২ই আশ্বিন তারিখে সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার গত সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে। সেই প্রবন্ধেই তিনি সাধারণকে এবিষয়ে আলোচনা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এবিষয়ে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে দু একটা বক্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, এ প্রবন্ধে তাহাই বলিব। সভাস্থলে সেদিন আমিও একটা বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিতের তালিকা উপস্থিত করিয়াছিলাম। সে তালিকাও এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। অবশ্য, রবীন্দ্র বাবুর তালিকার অতিরিক্ত যে কয়টা প্রত্যয়ের পরিচয় আমার তালিকায় বেশী ছিল, সেই কয়টাই ছাপান হইল। এই সঙ্গে কয়েকটা বাঙ্গালা উপসর্গের পরিচয়ও দিলাম উপসর্গ আরও খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, "যে সকল বাঙলা শব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্ত্তমান কালে কলিকাতা ছাড়া বাঙলা দেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সঙ্গত।" কেহ কেহ ইহাতে সম্মত নহেন। তাঁহারা বলেন, নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী উচ্চারণ প্রথাই চিরকাল এদেশে সুসঙ্গত উচ্চারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।*

আমার প্রথম কথা, রবীন্দ্র বাবু প্রত্যয় গুলির যেরূপ স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বত্র তাহাই গ্রহণীয় কি না? কয়েকস্থলে আমার সন্দেহ আছে, একে একে উল্লেখ করিতেছি।

১। রবীন্দ্র বাবু আকারান্ত বিশেষণের উদাহরণ মধ্যে সিধা, নুনা, মিঠা, তিতা, উচা—প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলির উচ্চারণ আমায় মতে ঠিক কলিকাতার ন্যায় হয় নাই, কলিকাতায় বলে—সিদে (সিধে), নুলো (নুলা), মিঠে (মিঠা), তিত (তিতা), উচু (উচা)। এগুলি লিখিবার সময় লেখকের ইচ্ছানুসারে উভয় প্রকারের বানানেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

২। রবীন্দ্র বাবু "আ" প্রত্যয়ের উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন সংস্কৃত ভাষার স্বার্থে "ক" প্রত্যয় বাঙলায় "আ" হইয়াছে। তাহার উদাহরণ তিনি দিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র একথা খাটে না, যেমন শৌণ্ডিক শুঁড়ী, লড্ডুক লাড়ু, জালিক জেলে, হালিক হেলে। বালক বালা হয় না। এতদ্ভিন্ন প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে "চিপিটক" শব্দ কলিকাতার উচ্চারণে "চিড়া" না হইয়া "চিঁড়ে" হয়।

৩। "পাগলা", "বাম্‌না", "ছাগলা" প্রভৃতি দুই চারিটি শব্দের "আ" প্রত্যয় দ্বারা স্বার্থ প্রকাশ না করিয়া তত্তৎ বস্তুর প্রতি একটু অবজ্ঞা সূচনা করে।

৪। রবীন্দ্র বাবু বিশিষ্ট অর্থে "আ" প্রত্যয়ের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন তন্মধ্যেও দুই চারিটীর বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হয় নাই। যেমন, বেসুরা হবে "বেসুরো"। বর্ত্তমান গদ্য সাহিত্যে লেখকের ইচ্ছানুসারে "বেসুরা" পদও দেখা যায় তবে তাহা কলিকাতায় উচ্চারণ নহে, পূর্ব্ব বঙ্গের উচ্চারণের কাছাকাছি বটে। পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণে শেষের আকারের উচ্চারণে একটু যফলার ভাব আসে। রবীন্দ্র বাবু বিশিষ্টার্থ "আ"

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগৃহীত যে শব্দ তালিকা বাহির হইয়াছে, উহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির প্রথা অনুসারে শব্দের শেষ ভাগে "য়', কারের ব্যবহার বর্জ্জিত হইয়াছে দেখা গেল। ইহার জন্যও অনেক শব্দকে হঠাৎ চিনিতে পারা গেল না। বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির সর্ব্বত্র বা সর্ব্বকালের পুঁথিতেই যে "য়', কারের ব্যবহারের অভাব আছে, তাহা নহে। দুই শত বর্ষের প্রাচীন পুঁথিতে শব্দের শেষ ভাগের "য়', কারের স্থানে "য়', ও 'অ', উভয়েরই ব্যবহার দেখা যায় এমন কি একই পুঁথির বিভিন্ন স্থানে বা একই কবিতায় উভয় বিধ বর্ণের ব্যবহার হইয়াছে, দেখা যায়। এরূপ স্থলে কোন্‌টি গ্রাহ্য তাহা নির্ণয় করা বিচার সাপেক্ষ।

প্রত্যয়ের উদাহরণগুলির মধ্যে মাটিয়া (মেটে), বালিয়া (বেলে), দাড়িয়া (দেড়ে) প্রভৃতি শব্দগুলিকে কেন ধরিয়াছেন বুঝা গেল না। তিনি পরে একটি বিশিষ্টার্থ ই+আ প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে), গোবরিয়া (গুবরে), ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় মাটিয়া বলিয়া প্রভৃতিকে সেই শ্রেণীতে ফেলিলে ভাল হইত।

৫। রবীন্দ্র বাবু আন্‌ ও আন্‌+অ নামে দুইটি প্রত্যয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রাখিবার নিমিত্ত উচ্চারণ অনুসারে কতকগুলি শব্দের প্রচলিত বানান ত্যাগ করিয়াছেন, যেমন,—বানান্‌, উঠান্‌; উনান্‌, উজান্‌, চালান্‌, মাচান্‌ ইত্যাদি—এগুলি লিখিবার সময় এ পর্য্যন্ত কাহাকেও হস্‌ চিহ্ন ব্যবহার করিতে দেখি নাই। উচ্চারণ অনুসারে যদি এ সকল শব্দে প্রথা বিরুদ্ধ হস্‌ চিহ্ন ব্যবহারে প্রত্যয়ান্তর কল্পনা করিতে হয়, তবে তাঁহার "অন" প্রত্যয় নিষ্পন্ন "মাতন, চলন, ধরণ, কাঁদন, গড়ন" ইত্যাদি শব্দের প্রত্যয়টিকে উচ্চারণ অনুসারে "অন" না বলিয়া অন্‌ বলিতে হয় এবং শব্দ গুলিও হসন্ত করিয়া লিখিতে হয়।

৬। রবীন্দ্র বাবু অনুজ্ঞার 'ও' প্রত্যয় করিয়া ধাতু একমাত্রিক কি না তাহা স্থির করিবার এক সহজ সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা সকল স্থলে ঘটে না। তাঁহার যুক্তি—আমরা যেমন "দেখো" বলি, তেমন "তাকো" বলি না তাকাও বলি ; অতএব তাক ধাতু নহে "তাকা" ধাতু এবং ইহা বহুমাত্রিক, কিন্তু অনুজ্ঞার ও প্রত্যয় করিলে একমাত্রিক ধাতু কাল ভেদে অন্যরূপ হয় যেমন দেখ, দেখো ও দেখিও।

৭। রবীন্দ্র বাবু "অন্‌+আ" নামে যে প্রত্যয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার উদাহরণ স্থলে তিনি যে শব্দ গুলির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার একটিতেও উক্ত প্রত্যয়টীর বর্ত্তমানতা দেখিতে পাইলাম না,—দেনা, পাওনা ফেলনা, মাগ্‌না, শুক্‌না, খেল্‌না, বাট্‌না, বাজ্‌না, চাক্‌না ইত্যাদি,—ইহার কোনটীতেই "অনা" প্রত্যয় নাই। "পাওনা" শব্দে যদি প্রত্যয়ের আদিস্থিত অকারের উচ্চারণ "ও" হইয়া গিয়াছে ধরা যায় তবেই রক্ষা হয়। আমার বিবেচনায় রবীন্দ্র বাবু যদি এই শব্দগুলিকে "অনা" প্রত্যয়ের উদাহরণ স্বরূপ না ধরিয়া "ফাৎনা, জাব্‌না, পাখনা" প্রভৃতি শব্দের সহিত উচ্চারণগত সাদৃশ্য ধরিয়া "না" প্রত্যয়ের শ্রেণীতে ফেলিতেন তাহা হইলে চলিতে পারিত। "বিছানা" শব্দের কলিকাতায় উচ্চারণ "বিছ্‌না" বা "বেছ্‌না" আর "পাওনা" শব্দের পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ "পা-না"। যাহা হউক এই শ্রেণীর অন্য সকলগুলিকে "না" প্রত্যয়ের মধ্যে ধরিয়া "বিছানা" ও "পাওনা" শব্দ সাধিবার জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম করিলেই চলিতে পারে। বাজ্‌না, খেল্‌না প্রভৃতি শব্দের বাজনা, খেলনা প্রভৃতি রূপই লিখনে ব্যবহৃত হয় বটে, সুতরাং "অনা" প্রত্যয়ের অস্তিত্ব নাই এ কথা না বলিলেও চলে। তবে আমাদের নাকি কলিকাতার উচ্চারণ ধরিয়াই কাজ করিতে হইবে। শুক্‌না শব্দ লিখনে ব্যবহৃত হয়, কথনে

কলিকাতায় শুক্‌নো বলে এবং অর্থান্তর ঘটাইলে "শুকনো" "শুকোনো" লিখন ও কথনে ব্যবহৃত হয়।

৮। "ই" প্রত্যয় সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু সমস্ত শব্দকে এক শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে লিঙ্গভেদে বা অর্থভেদে কোন প্রত্যয়েই "ইর" হ্রস্ব ছাড়া দীর্ঘরূপ নাই। এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ভারতীতে তাহার কয়েকটি তুলিয়াছেন। তাঁহার সকল যুক্তি আমার অনুমোদিত নহে। আমি আমার যুক্তি তর্ক এখানে তুলিব না। তবে মনে হয় যে প্রত্যয়াদি যখন অর্থবোধক চিহ্নমাত্র, তখন তাহা যত স্পষ্ট হয় ততই ভাল। যদি চিহ্নের হ্রস্বত্বে দীর্ঘত্বে শব্দের লিঙ্গাদিজ্ঞানে সাহায্য করে, করুক না। তাহাতে বাদী হইবার প্রয়োজন কি? আরও একটা দেখিবার বিষয় আছে,—এই "ই" প্রত্যয় নিষ্পন্ন কতকগুলি বৈদেশিক ভাষার শব্দ বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, সেগুলির আকার আমাদের ভাষায় প্রবেশকালে পরিবর্ত্তিত হইয়া না থাকিলে, ইচ্ছা করিয়া বিকৃত করিবার আবশ্যকতা বোধ হয় কিছুই নাই, বরং আকারটা ঠিক রাখিয়া দিলে জিনিসটাকে ঠিক চেনা যাইবে এবং ঋণটাও স্বীকার করা যাইবে। এই কারণে "দাগী" শব্দের "ঈ"কে আমি রবীন্দ্র বাবুর মতে হ্রস্ব করিতে প্রস্তুত নহি বা শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে সংস্কৃত "অস্ত্যর্থ ঈ" প্রত্যয় বলিতেও প্রস্তুত নহি। উহা হিন্দী শব্দ, হিন্দী ভাষায় ঐ "ঈ" সম্বন্ধে যাহা বলে, বাঙ্গালাতেও তাহাই বলা হউক! এই হিসাবে কলুনী, তেলিনী, মালিনী প্রভৃতি স্ত্রীবাচক শব্দের, নবাবী, আমীরী, হিসাবী, জমীদারী, পাঁচহাজারী, উকীলী, ওকালতী, পিকদানী, নাসদানী প্রভৃতি শব্দের এবং কেরাণীগিরী, বাবুগিরী, মুটেগিরী প্রভৃতি শব্দের বানান ঠিক করিয়া প্রত্যয়ের রূপ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। আমার মতে এখানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথিত রবীন্দ্র বাবুর অতিসাবধানতা বিশেষ কার্য্যকারী হয় নাই।

৯। ই+আ নামে রবীন্দ্র বাবু যে প্রত্যয়টি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কলিকাতার উচ্চারণে তাহা আদৌ বর্ত্তমান নাই। রবীন্দ্র বাবুও সেই জন্য এই প্রত্যয়ের প্রত্যেক উদাহরণ পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে কলিকাতার উচ্চারণটি লিখিয়া দিয়াছেন, তবে কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে এই শব্দগুলি লিখনের ভাষায় লিখিত হয় না বলিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যয়টি নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রদেশবিশেষে এই সকল শব্দের শেষের আকার যফলার উচ্চারণের ন্যায় ঈষৎ বক্র। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ স্থলে পদান্তে "এ" এর প্রয়োগ দেখা যায়, আমার বিশ্বাস সেই শব্দগুলির উচ্চারণ স্বরের বিকৃতি ঘটিয়া ঐ "্য া" "ইয়া" রূপ ধারণ করিয়াছে যথা, ছেলে—ছেল্যা—ছেলিয়া,—কুঁদুলে—কুঁদুল্যা—কোঁদলিয়া, জঙ্গুলে—জঙ্গুল্যা—জঙ্গলিয়া, জেলে—জেল্যা—জেলিয়া ইত্যাদি। এই স্থলে রবীন্দ্র বাবু না বলিলেও প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলিয়া যাই; এখনকার বাঙ্গলা ভাষার লিখিতরূপের মধ্যে বলিয়া, শুনিয়া, ধরিয়া, ছাড়িয়া, কহিয়া, যাইয়া,, রাখিয়া, ইত্যাদি যাবতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া আছে, সে গুলিরও প্রাচীন সাহিত্যে বল্যা, শুন্যা, ধর্যা, ছেড়্যা, কয়্যা, যায়া বা যেয়্যা,

রাখ্যা বা রেখ্যা ইত্যাদিরূপ আকৃতি বা বানান দেখা যায়। এই সকল স্থলেও পূর্ব্বোক্তমত "া + া" আধুনিক গদ্য সাহিত্যে "ই+আ" এবং কালে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া "ইয়া" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বা এই সিদ্ধান্তটিকে ঠিক বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যা করেন; তাঁহারা বলেন "ই+আ" ইহাই প্রকৃত রূপ, সন্ধির নিয়মানুসারে উহাই সংযুক্ত হইয়া প্রাচীন সাহিত্যে "া+া" হইয়াছে এবং কথোপকথনেও গৃহীত হইয়াছে। হিন্দী ভাষার প্রত্যয়,—যথা বড়িআ চিজ, বড়িআ আদমী ইত্যাদি।

১০। রবীন্দ্র বাবুর বিশিষ্টার্থ "উ" প্রত্যয় সম্বন্ধেও ঐ কথা। এই অর্থে খাঁটি "উ" প্রত্যয়ের উদাহরণ রবীন্দ্র বাবু দেন নাই। যেগুলি দিয়াছেন, সেগুলি "উ+আ" প্রত্যয়ের, জলুয়া, পাঁকুয়া ইত্যাদি। ইহাদের এই উচ্চারণও কলিকাতার নহে; কলিকাতার উচ্চারণ রবীন্দ্র বাবু বন্ধনীর মধ্যে দিয়াছেন। সম্বন্ধ ও তন্নির্ম্মিত অর্থে রবীন্দ্র বাবু যে উ বা উ+আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছেন, সেগুলিও ঐরূপ। কলিকাতার উচ্চারণে ওগুলির অন্তে উ+আ না হইয়া "ও" হয় এবং ঐ ওকার ঈষৎ বক্রভাবে উচ্চারিত হইলে ঐ শব্দগুলির পূর্ব্ব বঙ্গের উচ্চারণও ঠিক হয়।

১১। রবীন্দ্রবাবুর ল্+ই+আ, ক্+ই+আ, ট্+ই+আ, আড়্+ই+আ প্রভৃতি যতগুলি ই+আ প্রত্যয়ের প্রকারভেদ আছে, সে সমস্তগুলি সম্বন্ধেই আমার বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত ই+আ প্রত্যয় সম্বন্ধে কথিত মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

১২। রবীন্দ্র বাবুর "অৎ" প্রত্যয়টী বুঝা গেল। কিন্তু তাঁহার অৎ+আ ও অৎ+ই প্রত্যয় দুটি কিরূপ, তাহা বুঝা গেল না। ধরতা শব্দ রবীন্দ্র বাবুর মতে প্রথমে ধর্+অৎ= ধরৎ, পরে ধরৎ+আ=ধরতা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে ইহার উচ্চারণ "ধরতা" নহে, "ধর্‌তা"। এতদ্ভিন্ন রবীন্দ্র বাবু এই ত্রিবিধ প্রত্যয়ের রূপ নির্ণয় করিয়াও নোনতা, নামতা, আওতা প্রভৃতি শব্দ সাধিতে পারেন নাই। আমার বোধ হয় এই প্রত্যয়গুলিকে তিন ভাগ না করিয়া (রবীন্দ্র বাবু অৎ+আ, অৎ+ই করিয়া সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয়ের সাদৃশ্য রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কি না বুঝিলাম না) যদি "ত" ও "তি" এইরূপ দুটি ভাগ করা যায়, তাহা হইলে ধর্‌তা, ফের্‌তা, পড়্‌তা, জান্‌তা (জান্তা) প্রভৃতি ধাতুজ শব্দগুলির উচ্চারণগত প্রত্যয় ঠিক হয়, ও সঙ্গে সঙ্গে আওতা, নামতা, নোন্‌তা, পান্তা (পান্‌তা) প্রভৃতি শব্দগুলিরও একটা গতি হয়। "বাল্‌তি" শব্দটি বাদ দিলে রবীন্দ্র বাবুর অৎ+ই প্রত্যয়ের ফর্দ্দের সব কাটিয়া ধাতুজ শব্দের প্রতি "তি" প্রত্যয় ধরিয়া আরও সহজ হয়। বাল্‌তি কথাটা বিদেশী, উহার সৃষ্টিরহস্য "আক্কেলমন্ত" কথাটার ন্যায় একটা কিছু থাকা সম্ভব। উঠ্‌তি, পড়্‌তি, ফির্‌তি প্রভৃতি শব্দগুলিকে আরও একরূপে সাধা যায়, তাহা হইলেও রবীন্দ্রবাবুর অৎ+ই প্রত্যয়কে বাঁচাইতে পারা যায়। হঠৎ, পড়ৎ, ফিরৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ভাবার্থে যদি ই প্রত্যয় করা যায়, তাহা হইলে চলে বটে, কিন্তু এই ই পরে অৎ প্রত্যয়ের অকারের লোপের ব্যবস্থা করিতে হয়। তার অপেক্ষা ভাবার্থে "তি" করিলেই চলিতে পারে।

১৩। রবীন্দ্রবাবু অনাস্থার সঙ্গে একটা প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার রূপ অন্‌দা—যথা বাসন্দা। ইহা স্থানভেদে এন্‌দা (বাসেন্দা), ইন্‌দা (বাসিন্দা), উন্‌দে (বাসুন্দে) হয়। কেহ কেহ স্পেনীয় verandah শব্দজ বাঙ্গালা বারণ্ডা বা বারেন্দা শব্দকে এই অন্‌দা বা এন্‌দা প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন বলিতে চাহেন; কেহ বা বলেন বার (বাহির)+এন্‌দা (স্থানার্থে)=বারেন্দা; অর্থ গৃহের বহিঃস্থান।

রবীন্দ্রবাবুর যে সকল প্রত্যয় সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা বলিলাম। তিনি তাঁহার প্রবন্ধশেষে যে বলিয়াছেন—"নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে; সেগুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষায় রহিলাম।"—এক্ষণে তাঁহার সেই আহ্বানমতে কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ দিতেছি।

আই—রবীন্দ্রবাবু লম্বাই, চৌড়াই প্রভৃতি শব্দে কেবলমাত্র "ই" প্রত্যয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আর ক্রিয়াবাচক—বাছাই, যাচাই, দলাইমলাই, খোদাই, ঢালাই ইত্যাদি শব্দে, পদার্থবাচক—মরাই, বালাই, মিঠাই ইত্যাদি শব্দে, নামবাচক—কানাই, বলাই, নিতাই ইত্যাদি শব্দে এবং ধর্ম্মবাচক—বড়াই, বামনাই, পোষ্টাই ইত্যাদি শব্দে আ+ই প্রত্যয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমার মতে সবগুলিই "আই" প্রত্যয় হইলেই ভাল হয়। দেশবাচক শব্দের উত্তর "আই" প্রত্যয় করিলে, "তদ্দেশোৎপন্ন" এইরূপ অর্থও প্রকাশ করে, যথা—ঢাকাই, আগ্‌রাই, খাগ্‌ড়াই; (রবীন্দ্রবাবুও পাটনাই ও বসরাই শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন)। সম্বন্ধ অর্থেও আই প্রত্যয় হয়, যথা—চোরাই, (চুরি সম্বন্ধীয়), মোগ্‌লাই, বাদ্‌শাই।

আনি—রবীন্দ্রবাবু আন্‌+ই প্রত্যয়ের মধ্যে এই প্রত্যয়টিকে ধরিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিচার আবশ্যক। আমার বোধ হয়, তলানি, রসানি, লাগানি, নাসানি (ভারতচন্দ্র) প্রভৃতি শব্দে আন্‌+ই অপেক্ষা "আনি"র উপযোগিতা অধিক। পারসী আমদানি রপ্তানি (আমদ্‌ ও রপ্ত্‌ হইতে) এই প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন।

আল—রবীন্দ্রবাবু তাঁহার "ল্‌" প্রত্যয়ের উদাহারণের মধ্যে "মাতাল" শব্দটিও ধরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার বোধ হয় "আল" বলিয়া আর একটি প্রত্যয় কল্পনা করা যাইতে পারে; কারণ মাতাল, দাঁতাল, ভয়াল, ছাবাল, ছিনাল, কোটাল, বাঙ্গাল, প্রভৃতি অনেক-গুলি শব্দ পাওয়া যায়।

আলী—মিতালী, চতুরালী, ঠাকুরালী, নাগরালী প্রভৃতি।

আলো—তেজালো, ঝাঁজালো, ধারালো, শাঁসালো, সারালো, মাথালো, গোছালো, জাঁকালো, রাগালো, গোলালো ইত্যাদি। লেখকের ইচ্ছানুসারে এই শব্দগুলির অন্ত্যবর্ণে বিকল্পে ওকার যোগ করা হয়। যাঁহারা ওকার না দিয়া অকার দিয়া থাকেন, তাঁহারা উচ্চারণ করিবার সময় সেই অকারকে ওকারবৎ উচ্চারণ করেন। এরূপ স্থলে উভয় প্রত্যয়ের আকৃতিগত পার্থক্য থাকে না, অথচ অর্থগত এবং উচ্চারণগত পার্থক্য না

রাখিলে চলে না। আরও একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, "আল" প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি অর্থগত বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু "আলো" প্রত্যয়ান্ত পদগুলি নিরবচ্ছিন্ন বিশেষণই হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে প্রত্যয় দুটার রূপ একটু পৃথক্ রাখিলে বোধ হয় ভালই হয়।

ঈ—রবীন্দ্রবাবু কোথাও ঈকারের অস্তিত্ব রাখেন নাই, কিন্তু ঈ প্রত্যয়টি অন্যান্য ভাষা-তেও আছে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলিতে এবং আরবী পারসী ভাষাতেও এই ঈ প্রত্যয় ঈ দ্বারাই লিখিত হয়। রবীন্দ্রবাবু যে সকল অর্থে ঈ প্রত্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত অর্থেও ঈ প্রত্যয় হয়,—

সম্বন্ধ অর্থে—সরকারী, পোষাকী, জমীদারী, তালুকদারী, ইজারাদারী, পত্তনীদারী, গাঁতিদারী, হাওলাদারী, আয়মাদারী ইত্যাদি। "জমীদারী" শব্দে, জমীদারসম্বন্ধীয়, ভূসম্পত্তি ও জমীদারের, এই ত্রিবিধ অর্থ প্রকাশ পায়।

ভাবার্থে—নবাবী, আমীরী, বাদশাহী, উকীলী, পণ্ডিতী, মাষ্টারী ইত্যাদি। এই সকল শব্দে তৎপদ বা তৎকার্য্যও বুঝায়। নবাবী, আমীরী, বাদসাহী প্রভৃতি পারসীতে আছে, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরী, ডাক্তারী, মাষ্টারী, প্রভৃতি কথাগুলি ইংরাজীতে নাই। ইংরাজী শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া এইরূপে বাঙ্গালা পরিচ্ছদ পরিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ওকালতী শব্দের ঈ প্রত্যয়টা বাঙ্গালা, বাকীটুকু খাঁটী পারসী, কিন্তু তাহার অনুকরণে বাঙ্গালীরা "জজ" এই ইংরাজী শব্দটি হইতে "জজিয়তী" বলিয়া একটি নূতন শব্দ গড়িয়া ফেলিয়াছে। দেশবাচক শব্দের উত্তর ঈ প্রত্যয় বিকল্পে ইয়া হয়, ভাগলপুরী—ভাগলপুরিয়া, বেনারসী—বেনারসিয়া ইত্যাদি। হিন্দীতে এরূপ প্রয়োগ অসম্ভ্রমসূচক।

বিশিষ্টার্থে—ঈ প্রত্যয়ান্ত পদের মধ্যে রেশমী, সূতী, পশমী, সুদী প্রভৃতি শব্দ অনেক আছে। "তেজীমন্দী" কথাটি কথিত ভাষায় "তেজীবন্দী" হইয়া পড়িয়াছে।

চাকুরী ও উপজীবিকা বুঝাইতে ঈ প্রত্যয়ান্ত মুন্সেফী, ব্যারিষ্টারী, ম্যাজিষ্ট্রেটী, প্রভৃতি শব্দের সহিত ঢাকী, ঢুলী, দোকানী, পসারী, কাগজী, দপ্তরী প্রভৃতিকে স্থান দিতে হয়।

উড়ে—সাপুড়ে, ফাঁসুড়ে, ঘেসুড়ে, গেছুড়ে। "ঘেসুড়ে" শব্দ "ঘেসেড়া"ও হয়। লিখিত ভাষায় এই প্রত্যয়ের পদান্ত একার বিকল্পে ইয়া হইয়া যায়,—সাপুড়িয়া।

এ—রবীন্দ্রবাবু "এ" বলিয়া কোন প্রত্যয় ধরেন নাই। তিনি এ-প্রত্যয়ান্ত অধিকাংশ শব্দকে ই+আ প্রত্যয়ের মধ্যে পুরিয়াছেন।

দেশবাচক শব্দের উত্তর তদুৎপন্ন বা তদ্দেশসম্বন্ধীয় অর্থে এ প্রত্যয় হয়—সহুরে, উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে, বর্দ্ধমেনে, ভাগলপুরে, কটুকে, শান্তিপুরে, ঘাটালে, চীনে ইত্যাদি। হিন্দী ভাষায় "ইয়া" হয়—ভাগলপুরিয়া, শান্তিপুরিয়া; তদনুসারে বাঙ্গালা ভাষাতেও এই অর্থে লেখকের ইচ্ছানুসারে লিখিত ভাষায় ঐরূপ রূপও দেখা যায়।

আছে অর্থে—অহঙ্কেরে, দেমাকে (দেমাগে), একগুঁয়ে (একগোঁ+এ)।

কর্ত্তা অর্থে—(খোসামুদে, ফলারে, হাভাতে, হাঘরে, ছট্‌ফটে ইত্যাদি। এগুলিও বিকল্পে "ইয়া" প্রত্যয়ান্ত হয়।

তদ্ভাবঅর্থে—চড়্‌চড়ে, টন্‌টনে, টল্‌টলে, ঢল্‌ঢলে, ধব্‌ধোবে, রঙ্‌চোঙে, কুর্‌কুরে, হড়্‌-হড়ে, ন্যালনেলে, তর্‌তরে, গল্‌গলে, হল্‌হলে, তল্‌তলে, ট্যাবটেবে ইত্যাদি।

তন্নির্ম্মিত অর্থে—পাথুরে।

তদ্ব্যবসায়ী—জেলে, হেলে, কাঠুরে। এগুলিও বিকল্পে ইয়া প্রত্যয়ান্ত হয়।

দিননির্দ্দেশে পূরণবাচক অর্থে পাঁচ হইতে আঠার পর্য্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর যেমন "ই" প্রত্যয় হয় সেইরূপ দিন, বয়স ইত্যাদি উল্লেখকালে উনিশ হইতে পঞ্চাশ এবং সত্তর হইতে উনসত্তর শব্দের উত্তর এ হয়—উনিশে, একুশে, ত্রিশে, চল্লিশে, পঞ্চাশে, বাহাত্তুরে ইত্যাদি।

এল—কয়টি বিশেষ শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে এই প্রত্যয়টি হয়—গেঁজেল, সিঁধেল, শিঙেল।

ও—এটিও রবীন্দ্রবাবু ধরেন নাই। তিনি উ প্রত্যয়ের রূপান্তরে ও প্রত্যয়ের কল্পনা করিয়াছেন। আমি ইহাকে নানা অর্থে নানা শব্দে বর্ত্তমান দেখিতেছি যথা,—

তদ্বাসী বা তৎসম্বন্ধীয় অর্থে—বুনো, মেঠো, হেঠো, ঘেটো, জোলো।

তন্নির্ম্মিত অর্থে—কেঠো, কেটো।

আছে অর্থে—জেঁকো, অনামুখো, কোটরচোখো, রুখো, (রুক্ষ+ও), রুটো।

তদ্ব্যবসায়ী অর্থে—মেছো, গেছো, সেখো।

বিশেষার্থে—কালোকোলো, ডুবোডুবো, রোসোরোসো, পোষোপোষো ইত্যাদি।

করা—প্রতি অর্থে শব্দের উত্তর "করা" শব্দের যোগ হয়,—মণকরা, সেরকরা, শতকরা, জনকরা।

কাটা—তদ্বিশিষ্ট বুঝাইতে শব্দের উত্তর "কাটা" শব্দের যোগ হয়,—তেলকাটা, জলকাটা।

কুটো—তদ্বিশিষ্ট বা তদর্তিশয্য বুঝাইতে শব্দের উত্তর কুটো প্রয়োগ হয়; নুনকুটো, ঝালকুটো, তিতকুটো। হাঁসকুটে শব্দ মর্কুটে (মর্কটিয়া) শব্দের অনুকরণে কুটে শব্দ যোগে নিপাতনে নিষ্পন্ন বোধ হয়।

কে—প্রতি অর্থে কে প্রত্যয় হয়—আজকে, কালকে জনকে, শতকে, কোটিকে—

"কোটিকে গুটিক যদি পাই।"

গণ্ডাকে, বুড়্‌কে, পণকে, সেরকে, কড়াকে শব্দের "কে" স্বার্থে প্রযুক্ত। "কড়ানে (কড়ানিয়া)" "কড়ান্‌কে" পদ নিপাতনে সিদ্ধ বোধ হয়।

খন—কয়েকটি সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর খন প্রত্যয় হয়,—এখন, তখন, যখন, কখন

খানা—খানি—নানা অর্থে এই দুই প্রত্যয় হয় যথা,—

১। বিশেষার্থে—বাড়ীখানা, মুখখানি, ঘরখানি। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ও বিশেষ অর্থে খানা শব্দের প্রয়োগ হয় যথা, একখানি, একখানা, পাঁচখানা। সম্ভ্রমসূচনা স্থলে "খানি" ও অসম্ভ্রমসূচনা স্থলে "খানা" প্রত্যয় হয়। কখন কখন লেখকের ইচ্ছানুসারে "খানা" স্থলে "খান" আদেশ হয়।

২। স্থান বুঝাইতে "খানা" প্রত্যয় হয়—হিন্দীতে ও পারসীতে এই অর্থেই এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। এই অর্থে "খানা" স্থলে খানি হয় না যথা,—কসাইখানা, জেলখানা, দপ্তরখানা, গরীবখানা, দেওয়ানখানা, দওয়াইখানা, তোষাখানা, ইত্যাদি। "ডাক্তারখানা" শব্দও চলিত হইয়াছে।

গাছা—গাছি—খণ্ড ও বিশেষার্থ বুঝাইতে ইহাদের প্রয়োগ হয়। সম্ভ্রম সূচনায় "গাছি" ও অসম্ভ্রমে "গাছা" শব্দের প্রয়োগ হয়, যথা লাঠিগাছা, দড়িগাছি। লেখকের ইচ্ছানুসারে "গাছা" স্থলে "গাছ" আদেশ হয়।

গুলা—গুলি—কেবল বহুবচন প্রকাশার্থ প্রযুক্ত হয়। "গুলা" অসম্ভ্রমসূচক এবং "গুলি" সম্ভ্রমসূচক যথা—লোকগুলা, লোকগুলি।

চে—লাল ও কাল শব্দের উত্তর তদ্ভাব প্রকাশার্থে "চে" প্রত্যয় হয়, যথা—লাল্‌চে, কাল্‌চে।

ছড়া—খণ্ড বুঝাইতে কতকগুলি শব্দের উত্তর ছড়া প্রত্যয় হয় যথা,—মালাছড়া, হারছড়া, একছড়া।

জাৎ—সন্নিবেশ অর্থে "জাৎ" প্রত্যয় হয় যথা,—গৃহজাৎ, গুদামজাৎ, ঘরজাৎ, গোলাজাৎ, গড়জাৎ।

টা—টী—খণ্ড ও বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় যথা,—গাছটা, ঘটীটা, বাটীটা। টা অসম্ভ্রমসূচক এবং টী সম্ভ্রমসূচক। কোন সংখ্যাবাচক শব্দ কোন বস্তুর বা প্রাণীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র টা প্রত্যয়ের যোগে বা জন শব্দের যোগে ব্যবহৃত হয় যথা,—তিনটা গরু, পাঁচটা লোক, সাতজন মানুষ। "টী" প্রত্যয় দ্বারা অল্পত্ব ক্ষুদ্রত্ব সূচিত হয়।

উকারান্ত শব্দের উত্তর "টা" বিকল্পে "টো" হয় এবং আকারান্ত শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের উত্তর "টা" বিকল্পে "টে" হয় যথা—গরুটা-গরুটো, বউটা-বউটো, দুটা-দুটো এবং বাটীটা-বাটীটে, পাখীটা-পাখীটে, কিন্তু নৌকাটা, ডালাটা ইত্যাদি।

টুক—টুকি—টুকু—অল্পার্থে এই প্রত্যয়গুলি প্রযুক্ত হয়; যথা, জলটুক, জলটুকু, মিছরিটুকি। উড়িষ্যা ভাষার চলিত কথায় অল্পার্থপ্রকাশক "টিকে" বলিয়া একটি শব্দ আছে, তাহার সহিত এই প্রত্যয়গুলির সাদৃশ্য আছে।

টে—তদ্ভাব অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা,—কাল্‌টে, ঘোলাটে, সাদাটে, বকাটে, বোকাটে, কাদাটে, রোগাটে।

ত—পরিমাণ অর্থে কতকগুলি সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হয় যথা,—যত, তত, কত, এত, অত।

থা—স্থানার্থে কয়টী সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর থা প্রত্যয় হয় যথা,—কোথা, তথা, যথা, সেথা, ওথা। এই "ওথা" শব্দটি ভাষায় "হেথা" শব্দরূপে চলিয়া গিয়াছে।

পনা—পানা—ভাবার্থে এই দুই প্রত্যয় বিকল্পে হয় যথা,—ধূর্ত্তপনা, গিন্নীপনা, গুণপনা, ছেনালপানা, নেয়াতিপানা, ন্যাংটোপনা।

পারা—বাঙ্গলা প্রত্যয়। সাদৃশ্য অর্থ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় যথা,—পাগলপারা।

পিছু—প্রতি অর্থে প্রযুক্ত হয় যথা—জনপিছু, লোকপিছু, মণপিছু।

বে—কয়টী সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর কালার্থে "বে" প্রত্যয় হয় যথা,—যবে, তবে, কবে, এবে।

বাজী—বিশেষ বিশেষ অর্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হয়, যথা গলাবাজী, ফাঁকীবাজী, দিক্‌বাজী (ডিগ্‌বাজী)।

বন্ত—মন্ত—আছে অর্থে এই দুই প্রত্যয় হয়, ইহারা মূলতঃ সংস্কৃত বৎ ও মৎ প্রত্যয় জাত এবং তদনুসারে আকারান্ত শব্দের উত্তর বন্ত এবং অন্যস্বরান্ত শব্দের উত্তর মন্ত প্রত্যয় হয়—লক্ষ্মীমন্ত, ভাগ্যবন্ত, দয়াবন্ত।

এতদ্ব্যতীত কতকগুলি হিন্দী পারসী প্রত্যয় বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে রবীন্দ্রবাবু আনা (বাবুআনা সাহেবীআনা মুন্সীআনা ইত্যাদি), দার—(দোকানদার, চৌকিদার, জমীদার, চড়নদার ইত্যাদি) দান (বাতিদান, পিকদান, আতরদান কলমদান ইত্যাদি) এবং গিরি (মুটেগিরি, বাবুগিরি, মুচিগিরি, ডাক্তারগিরি ইত্যাদি) ওয়া (ঘরোয়া কাটোয়া) ওয়ালা (বাড়ীওয়ালা ইত্যাদি), প্রত্যয় ধরিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও কয়টি আছে,—

আত—পারসী প্রত্যয়। বহুবচনে ব্যবহৃত হয়—কাগজাত, দলীলাত, ইত্যাদি।

আন্—পারসী প্রত্যয়। বহুবচনে ব্যবহৃত হয়—নাবালকান, সাকীনান, জমিদারান ইত্যাদি।

আন্দাজ—পারসী প্রত্যয়। অস্ত্রবাচক শব্দের উত্তর নিক্ষেপক অর্থে ব্যবহৃত হয়,—তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, বর্‌কন্দাজ। পারসী যে আন্দাজ শব্দে অনুমান বুঝায়, তাহার সহিত এই আন্দাজের বানানের একটু প্রভেদ আছে। অনুমানার্থক আন্দাজ শব্দ লিখিতে শেষে একটি ছোট হে দিতে হয় (আন্দাজ্‌ হ্‌), ইহাতে তাহা দিতে হয় না।

খোর—পারসী প্রত্যয়। তৎপ্রিয় এই অর্থে এই প্রত্যয় হয় যথা,—নেশাখোর, মদখোর, গুড়ুকখোর, নিমকখোর, মিষ্টিখোর, হারামখোর।

হায—হায়ের—পারসী প্রত্যয়। বহুবচনে ব্যবহৃত হয় যথা—গ্রামহায়, জমাহায়, প্রজাহায়ের।

হারা—হিন্দী প্রত্যয়। আবৃত্তি বুঝাইতে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর হারা প্রত্যয় হয়; যথা—একহারা, দোহারা, তেহারা, চৌহারা, মাসহারা (মুশারা)। কেহ কেহ "দশহরা" শব্দকে এই হারা প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ মনে করিয়া "দশহারা" বলেন তাহা নহে, উহা দশহরা শব্দ।

তদ্ধিত ও কৃৎ সম্বন্ধে আমার আর বলিবার কথা বিশেষ কিছু নাই। এই স্থলে কয়েকটি বাঙ্গলা উপসর্গের কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

উপসর্গের মধ্যে সংস্কৃত "প্রপরাপসম্" প্রভৃতি কুড়িটি খাঁটি সংস্কৃত ভাষার উপসর্গ ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গলায় বড় বেশী পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহারও সকলগুলিই যে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষার শব্দ তাহা নহে; তবে প্রচলিত বাঙ্গালায় তাহাদের অবাধ-প্রয়োগ আছে বলিয়া এবং সেগুলি সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হইলেও সেগুলিকে বাঙ্গালা বলিয়াই গ্রহণ করা গেল। এবং করিবার কারণ সেগুলি মূলতঃ যে যে ভাষার সম্পত্তি, অনেক স্থলে তাহাদের সেই সেই ভাষাগত উচ্চারণ বা বানান করিবার প্রণালী বাঙ্গালায় অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

অ—অকষ্টবদ্ধ, অকাজ, অবেলা, অমান্নি (অস্বীকার)। অকষ্টবদ্ধ শব্দে "অ" স্বার্থে প্রযুক্ত; আমার বোধ হয় কথাটা আকষ্টবদ্ধ হইলেই চলে। অপরত্র "অ" নঞর্থবাচক।

আ—খাঁটী বাঙ্গালা উপসর্গ। প্রধানতঃ ইহাদ্বারা নঞর্থ প্রকাশ পায় যথা,—আভাঙ্গা, আধোয়া, আকাচা, আমাজা। এই সকল উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই উপসর্গ ক্রিয়াবাচক বাঙ্গালা বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসিলে বিশেষ্যের নঞর্থ অর্থাৎ বিপরীতার্থ প্রকাশ করে এবং শব্দ সংগঠনে কোন পরিবর্ত্তন ঘটায় না।

"আনাড়"—এই শব্দে "নাড়া" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে এই "আ" উপসর্গ বসিয়া অন্ত্যস্বরকে হ্রস্ব করিয়াছে। "আনাচ-কানাচ" কথার মধ্যে যে "আনাচ" শব্দ আছে, উহা আ+নাচ (সদর বা প্রকাশ্য স্থান) এই দুই শব্দ যোগে উৎপন্ন। এখানে "আ" উপসর্গ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের পূর্ব্বে না বসিলেও নঞর্থ প্রকাশ করিতেছে।

"আঘাটা"—আ+ঘাট এই দুই শব্দের যোগে উৎপন্ন। এখানেও উপসর্গটী নঞর্থ বাচক, কিন্তু পদগঠনে অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে দেখা যাইতেছে। এইরূপ—আগাছা।

"আকাল"—শব্দের "আ" কে কেহ কেহ এই নঞর্থ উপসর্গ বলিতে চাহেন। আমার বিবেচনায় তাহা নহে। "আকাল" শব্দের অর্থ হইতে কালের বা সময়ের ভাব পরিস্ফুট হইলেও, উহা আমার বিবেচনায় আ+কাল এই দুই শব্দ যোগে উৎপন্ন নহে; অথবা সংস্কৃত "অকাল" শব্দের সহিত উহার অর্থগত বা প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্যই নাই। আমার মতে

এই "আকাল" শব্দটি "সকাল" ও "বিকাল" শব্দের ন্যায় রূঢ় শব্দ। কোন বন্ধু বলেন, "সকাল" শব্দের "স" এবং "বিকাল" শব্দের "বি" সংস্কৃত "সম্" ও "বি" উপসর্গেরই প্রকার-ভেদ। তাঁহার মতে "সকাল" অর্থে সম্ (সম্যক প্রকারে) কাল (প্রবৃত্ত হয় যখন) এবং বি (বিগত হয়) কাল (যখন)।" এরূপ অর্থ একটু কষ্টকল্পনায় আনিতে হয় না কি ?

না—খাঁটী পারসী উপসর্গ। ইহাদ্বারা নঞর্থ প্রকাশ পায়, যথা,—নাবালক (না-বালগ্), নামঞ্জুর (না-মঞ্জুর্), না-লায়ক, (না-লায়ক) না পছন্দ (না-পসন্দ্) নাপাক, নাহক্। এই সকল শব্দ খাঁটী পারসী শব্দ, ইহাদের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া ইহারা বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা "নাকাচ" কথাটী পারসী "না কস্" শব্দের বিকৃত রূপ। এই "না" পারসী উপসর্গটী দু একটী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা না-পার্য্যমান।

"নাকাল"—শব্দটীকে যেন কেহ এই "না" উপসর্গযুক্ত নঞর্থবাচক শব্দ বলিয়া মনে না করেন। ঐটী খাঁটী আরবী শব্দ; উহার অর্থ যন্ত্রণা দেওয়া বা পীড়ন করা, সুতরাং বাঙ্গালায় এই শব্দে যে অর্থ তাহার হানি হইতেছে না; বরং নঞর্থ না+কাল এইরূপে অর্থ ঘটাইলে কোন অর্থই হইবে না।

বে—খাঁটী পারসী উপসর্গ। ইহাদ্বারা নঞর্থ প্রকাশ করে, যথা,—বেনাম, বেহিসাব, বেতরিবৎ, বেবন্দোবস্ত, বেদম, বেজায়, বেহায়া। এই সকল শব্দ খাঁটী পারসী হইলেও বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এই উপসর্গটীও অবাধে কতকগুলি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—বেজুত, বেসভ্য, বেরসিক, বেচাল, বেদাগ। এই উপসর্গটী আজকাল বাঙ্গালায় দু একটী ইংরাজী শব্দের সঙ্গেও ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে যথা,—বেটাইম, বেহেড্, বেনুটীস্।

লা—খাঁটী পারসী উপসর্গ। ইহাও নঞর্থবাচক যথা,—লাদাবী, লাখেরাজ। এই উপসর্গযুক্ত বাঙ্গালা শব্দ দেখা যায় না।

কম্—বদ্—খাঁটী পারসী শব্দ। সংস্কৃত "দুর্" উপসর্গের অর্থ প্রকাশ করে যথা,—কমবক্ত্ (দুর্ভাগ্য), বদ্নাম (দুর্নাম)।

সব্—খাঁটী ইংরাজী উপসর্গ। অধীনতা বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা এখনও বাঙ্গালা হয় নাই, কেবল ইংরাজী কথার সহিতই ব্যবহৃত হয়,—সব্ জজ, সব্ ইন্‌স্পেক্টার, সব্ ডেপুটী।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের অর্থ বিচার ও ব্যুৎপত্তি বিচার কোন একটা প্রদেশের উচ্চারণ ধরিয়া বিচার করিতে গেলে চলিবে না। সম্ভবতঃ এরূপ শব্দের অধিকাংশই কোন মূল প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। সেই প্রাকৃত উচ্চারণ কি ছিল, তাহা এখন বলা কঠিন। হয়ত কোন স্থানে পূর্ব্ব বঙ্গের উচ্চারণ সেই মূল উচ্চারণের নিকটবর্ত্তী; কোন স্থানে হয়ত পশ্চিম বঙ্গের উচ্চারণ অধিক নিকট। বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ একত্র মিলাইলে সেই মূল উচ্চারণ ধরা পড়িতে পারে। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। মনে কর জালিয়া শব্দ। 'জেলে' লিখিলেও ইহার ঠিক্ চলিত উচ্চারণ প্রকাশ পায় না; কেহ হয়ত 'জে'লে' এইরূপ লিখিয়া, অর্থাৎ মাঝে একটা ; চিহ্ন দিয়া উহার উচ্চারণ প্রকাশ করিতে চাহিবেন। প্রদেশভেদে ইহার উচ্চারণ 'জেলো' 'জোলো' বা 'জো'লো'। সম্ভবতঃ মূল শব্দ 'জালিক'। সংস্কৃত 'ক' প্রাকৃত 'অ' হইয়া যায়। বাঙ্গালায় আবার শব্দের শেষ স্বরটা দীর্ঘ হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রচীন বাঙ্গলা 'জালিআ' হওয়াই সম্ভব। প্রচীন পুঁথির সাক্ষ্য এই অনুমানের পক্ষে। প্রাচীন 'জালিআ' আধুনিক কালে প্রদেশভেদে 'জেলে' 'জোলো' প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে। শেষের স্বরটা অর্থাৎ 'আ' যে লোপ পাইয়াছে, তাহা আধুনিক উচ্চারণেও প্রকাশ পায়; সেই লোপটা বুঝাইবার জন্য মাঝে একটা স্বরলোপের চিহ্ন ' দিতে হইতেছে। ফলে এই শ্রেণীর শব্দের চলিত উচ্চারণ প্রদেশভেদে ভিন্ন; ও বানান করিয়া ঠিক প্রকাশও চলে না। এই গোলযোগ হইতে অব্যাহতির জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ই আ' প্রত্যয় দিয়া 'জালিআ' এইরূপ বানান করিয়াছেন। তাহার কারণ যে এইরূপ লিখিলে কোন প্রদেশবিশেষের প্রতি পক্ষপাত হইবে না, এবং অনেকটা মূল অর্থাৎ প্রাচীন উচ্চারণের আভাস পাওয়া যাইতে পারিবে।

বর্ত্তমান কালে যে সকল লেখক এই সকল শব্দ লইয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহারা আপন আপন প্রদেশের চলিত উচ্চারণ ধরিয়াই আলোচনা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে ভ্রমের আশঙ্কা অধিক থাকিবে না; ও বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ মিলাইয়া প্রাচীন মূল উচ্চারণটার নিকট পৌঁছিবার সুবিধা হইবে। মূল উচ্চারণটি যতক্ষণ না পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ প্রত্যয়টি কি, ঠিক জানা যাইবে না। প্রত্যেক শব্দের যত প্রাদেশিক উচ্চারণ, তত প্রত্যয় নির্দ্ধারণ করিলে চলিবে না। মূল উচ্চারণ বাহির করিয়া মূল প্রত্যয়টি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; তার পর সেই মূল বাঙ্গলা প্রত্যয় কোন্ প্রাকৃত বা সংস্কৃত প্রত্যয় হইতে আসিয়াছে, তাহা স্থির হইবে।

মিঠা, তিতা, উচা—এই মূল প্রত্যয় স্পষ্টতই আ। বাঙ্গলা বিশেষণ শব্দের আকারান্ত

হওয়াই স্বভাব। বিশেষতঃ যখন শেষ অক্ষরটা যুক্ত অক্ষর ভাঙ্গিয়া উৎপন্ন। 'মিষ্ট' 'তিক্ত' 'উচ্চ' এই তিনের যুক্ত বর্ণ ভাঙ্গিয়া আকার আসিয়াছে। সেই আকার মোলায়েম হইয়া 'এ' 'উ' প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, ও বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছে। 'সিধা' যদি 'শুদ্ধ' হইতে আসিয়া থাকে, তবে এখানেও ঐ কথা। 'মুলা' কোথা হইতে আসিল, তাহা জানি না, কিন্তু ইহার প্রত্যয় যে বাঙ্গলার প্রচলিত 'আ'; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'আ' মোলায়েম হইয়া 'ও' হইয়াছে মাত্র।

স্বার্থে 'ক' বাঙ্গলায় 'আ' হইয়াছে, ইহার অর্থ 'আ' প্রত্যয় 'ক' হইতে উৎপন্ন। 'ক' মাত্রকেই যে 'আ' হইতেই হইবে, এমন নহে। মনুষ্যমাত্রই জন্তু, কিন্তু জন্তুমাত্রই মানুষ নহে। 'শৌণ্ডিক' এখন 'শুঁড়ি' বা শুঁড়ী; 'ক' এখানে লুপ্ত; কিন্তু প্রাচীন মূর্ত্তি 'শুঁড়িআ' বা 'শুঁড়িঅ' এইরূপ একটা ছিল কিনা অনুসন্ধানযোগ্য। হিন্দির সাক্ষ্য এখানে প্রামাণিক হইতে পারে। স্বার্থে 'ক' ও ক্ষুদ্রার্থে বা অল্পার্থে 'ক', এই দুই ককারে অধিক তফাত নাই। বাঙ্গলাতে দুই 'ক'ই আকারে পরিণত। 'পাগলা' 'বামনা' এমন কি 'রামা' 'শ্যামা' 'হ'রে'='হরিআ' প্রভৃতির আকার ক্ষুদ্রার্থ ক বা অবজ্ঞাবাচী ক হইতে উৎপন্ন।

'মাটিয়া' 'বালিয়া' প্রভৃতি এবং জঙ্গলিয়া প্রভৃতি এক পর্য্যায়ে ফেলা চলিবে না। 'মাটি' ও 'বালি' ইহাদের ইকার প্রত্যয়ের ইকার নহে। মৃত্তির ইকার 'মাটি'তে বর্ত্তমান; 'বালু'র উকার 'বালি'তে ইকারে পরিণত। কিন্তু 'জঙ্গলিয়া'র ইকার প্রত্যয়ের ইকার। এবং এই প্রত্যয় 'ইয়া'='ইআ' না লিখিয়া ই+আ লেখাই সঙ্গত। বিশেষ্য জঙ্গল হইতে বিশেষণ জঙ্গলি (জঙ্গলবাসী), তাহাই আবার স্বার্থে 'জঙ্গলিআ'। শেষ পরিণতি 'জঙ্গুলে'। এখানে 'আ' বোধ করি 'ক' হইতে উৎপন্ন। আর যদি সংস্কৃত ইক (ষ্ণিক) হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ই+আ না হইয়া 'ইআ' হইবে। 'মাটিয়া' 'বালিয়া' ইহাদের 'আ' বিশিষ্টার্থবাচী; স্বার্থবাচী নহে; তাহাদের মূলও সম্ভবতঃ পৃথক্।

'দেখা' 'দেখিও' এরূপ স্থলে অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎকালের অভিমুখে, কাজেই নিয়ম ভঙ্গ হইল না।

দেনা=যাহা দিতে হইবে।

পাওনা=যাহা পাওয়া যাইবে।

খেলনা=যাহা দ্বারা খেলা যায়।

বাটনা=যাহা দ্বারা বা যাহা বাঁটা যায়।

বাজনা=যাহা দ্বারা বা যাহা বাজান যায়।

ঢাকনা=যাহা দ্বারা ঢাকা যায়।

এই সমুদয়কে এক শ্রেণিতে ফেলা চলিবে না। শেষ শব্দচারিটির 'অনা' বোধ করি সংস্কৃত 'অন' (=অনট্) প্রত্যয়ের সম্পর্ক রাখে। সেখানে প্রত্যয়কে 'না' না বলিয়া 'অন+আ'

বলিতে হইবে। কিন্তু 'দেনা' 'পাওনা' র 'না' কোথা হইতে আসিল? 'শুক্‌না' র 'না'রও বোধ করি অন্য মূল।

ই প্রত্যয়ের বিবিধ অর্থভেদ। বিভিন্নার্থক ই প্রত্যয় বিভিন্ন মূল হইতে উৎপন্ন। আবার ই লিখিব কি ঈ লিখিব, তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত। দিদিতে আপত্তি নাই, কিন্তু 'মাসি' লিখিব কি 'মাসী' লিখিব, 'মামি' লিখিব কি 'মামী' লিখিব, ইহা লইয়া উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত। এই যুদ্ধ, 'কলুনী' 'মালিনী' প্রভৃতির নী'তেও উঠিয়াছে। উভয় পক্ষেই যুক্তি আছে। আমি মীমাংসায় অক্ষম।

তবে নবাবী হিসাবী জমীদারী ওকালতী প্রভৃতির ঈ কে ইকারে পরিণত করিবার বোধ হয় সময় যায় নাই। অকারণে ঈ কারের বোঝা বহিয়া লাভ কি?

খাঁটি বাঙ্গালায় যখন হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদ নাই, তখন একটাকে বিসর্জ্জন দিলে হানি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয় বোধ করি এইরূপ বিসর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

রবিবাবু যে সকল প্রত্যয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া দুই তিন ভাগ করিয়াছেন, তাহার কারণ বোধ হয় প্রতিবাদকারী মহাশয় এতক্ষণ বুঝিয়া থাকিবেন। কলিকাতার উচ্চারণ বা কোন প্রাদেশিক উচ্চারণ ধরিলে ঐরূপ খণ্ডীকরণের হেতু না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অর্থ ধরিয়া মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে ঐরূপে ভাঙ্গা আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। ব্যোমকেশ বাবু যে সকল নূতন প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছেন, অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে অনেকগুলিই ঐরূপ বিশ্লেষণযোগ্য। 'লম্বাই' 'চৌড়াই' ইহা বিশেষণ 'লম্বা' 'চৌড়া' শব্দের প্রতি ইকার যোগে উৎপন্ন বিশেষ্য; প্রত্যয় ই; আই নহে। কিন্তু বাছাই=বাছ+আ+ই। বাছ ধাতু হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বাছা, স্বার্থে বাছাই। আবার ঢাকাই=ঢাকা+ই (ঢাকাতে উৎপন্ন)। ব্যোমকেশ বাবুর দত্ত উদাহরণগুলি অনেক স্থলে এইরূপ বিশ্লেষণসাপেক্ষ। অধিক বাহুল্য।

পত্রিকা-সম্পাদক।

লালা উদয়নারায়ণ রায়।

কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গদেশে ইতিহাসচর্চ্চার আন্দোলন উঠিয়াছে। এবং বঙ্গদেশের নবাবী আমলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ ও সত্য নির্দ্ধারণ জন্য অনেক কৃতবিদ্য ও উৎসাহী লেখক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তন্মধ্যে অক্ষয় বাবু, নিখিল বাবু ও কালীপ্রসন্ন বাবু অগ্রগণ্য। উদয়নারায়ণ রায় সম্বন্ধে উক্ত তিন ব্যক্তিই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা নিরসন করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। উদয়নারায়ণ কোন্ সময়ের লোক, কি জাতি, কিরূপে তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহার পরিণামই বা কি হইয়াছিল, ইত্যাদি বিষয় আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তৎসমুদয় ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণকে জানাইবার জন্যই আমি নিজ পরিচয় প্রদানে ও আমাদের গৃহস্থিত প্রাচীন দলিলের প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

লালা উদয়নারায়ণ রায় কায়স্থ ছিলেন না। তিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঘনশ্যাম রায় মহাশয়ের জামাতা। ঘনশ্যাম রায় রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয়ের বংশসম্ভূত। তিনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং উদয়নারায়ণ রায়ও ব্রাহ্মণ। রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয়ের কোন বিশেষ বিবরণ আমরা জানিনা। সম্ভবতঃ জানিবার উপায়ও নাই। তঁাহার প্রতিষ্ঠিত ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম আমাদের বাটীতে আছেন এবং তাঁহার মাতার খনিত 'রাজার মা' নামক পুষ্করিণী আমাদের বাটীর নিকটে ও আমাদের দখলে আছে। ঘনশ্যাম রায় মুর্শিদকুলী-খাঁর সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে গনকর প্রভৃতি চারি পরগণার জমীদার ছিলেন। গনকর গ্রামেই তাঁহাদের বাস ছিল। আমরাও এখন ঐ গ্রামে বাস করিতেছি এবং পূর্ব্ব বসত বাটীতেই আছি। গনকর গ্রাম থানা মির্জাপুরের অধীন ও অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত এবং মহকুমা জঙ্গিপুর ও জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত। নলহাটী ব্রাঞ্চরেলওয়ের বোখারা ষ্টেশন হইতে উত্তর দিকে গনকর গ্রাম প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এক মাইল ব্যবধানে স্থিত। রেসমী বস্ত্রের জন্য মুর্শিদাবাদ বিখ্যাত। মির্জাপুর গনকর ঐ বস্ত্র বয়ন-কারী তন্তুবায়গণের নিবাসভূমি ও অতি পুরাতন গ্রাম। ঐ স্থানে আমাদের বাস প্রায় তিন শত বৎসরের অধিক হইবে। উদয়নারায়ণ রায়ের সহিত সম্পর্ক থাকায় ঘনশ্যাম রায় মহাশয়ের জমীদারী প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। এখন খানাবাড়ী গড়বাড়ী প্রভৃতি আমাদের দখলে আছে।

ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী প্রদত্ত হইল। তাহাতে তাঁহার সহিত উদয়নারায়ণ রায় ও আমাদের সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বোধ হয় উদয়নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কায়স্থোচিত লেখাপড়ার কার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া লালা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। এখনও উপাধির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গনকর গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাঁচলপাড়া নামক গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশ মুন্সী নামে পরিচিত। শুনা যায় তাঁহাদের বংশীয় একজন মুন্সীর কর্ম্ম করিতেন।

লালা উদয় নারায়ণ রায় আপন শ্বশুর ঘনশ্যামরায় মহাশয়কে যে ভূমি দান করেন, তাহাই এখন গড়বাড়ী নামে পরিচিত ও আমাদের অধিকারভুক্ত। ঐ স্থান গনকর হইতে এক মাইল পূর্ব্বে নূতনগঞ্জ নামক গ্রামের নিকট গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ঐ থানে এখন বাড়ী ঘর নাই। উচ্চ ভূমি ও গড়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গড়বাড়ী এখন ঘাসডাঙ্গার জন্য ব্যবহৃত হয়। ঘনশ্যাম রায়ের পৌত্র রাজারাম রায় ও প্রদৌহিত্র জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই উভয়ের মধ্যে ঐ গড়বাড়ী লইয়া ১১৬৫ সালে বিবাদ উপস্থিত হয়। ঐ সময় রাণী-ভবানীর আমল। তাঁহার কাছারী চরকা গ্রামেও ছিল। ঐ গ্রাম গনকরের দেড় ক্রোশ উত্তর। ঐ বিবাদসম্বন্ধীয় অনেক দলিল দস্তাবেজ আমাদের ঘরে আছে। তৎপাঠে উদয় নারায়ণ রায় প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। দলিলগুলি অতি জীর্ণ ও পুরাতন। এবং অযত্নরক্ষিত বলিয়া অনেক স্থানের অক্ষরও অস্পষ্ট ও অপাঠ্য হইয়া

গিয়াছে। আমি তিনখানিমাত্র দলিল প্রকাশ করিলাম। ইতিহাসতত্ত্বানুসন্ধায়ী লেখক ও পাঠকগণ ঐ দলিলসকল পাঠ করিলেই আমার বক্তব্য ও তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। আমার ঐ সকল বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা কিরূপ ছিল, কি ভাবে দলিল আদি লিখিত হইত, এ সকল বিষয় প্রকাশিত দলিলপাঠে জানা যাইবে। আমি ঐ দলিলগুলির ভাষার বা ভাবের কোন সংশোধন করিলাম না। বর্ণাশুদ্ধিও যথাবৎ রক্ষিত হইয়াছে।

উদয়নারায়ণ ও তৎপুত্র সাহেবরায় বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তাঁহার জমীদারীর সহিত ঘনশ্যাম রায়ের জমীদারীও বাজেয়াপ্ত হইয়া রঘুনন্দনের কৌশলে রামজীবনের নামে গৃহীত হয়। রঘুনন্দন উদয়নারায়ণকে বন্দী করিয়া আনেন বলিয়া ঐ সকল জমীদারী পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

বাঙ্গালা ১১১৫ সালে গড়বাড়ীর উৎপত্তি। ১১২০ সালে বা ১১২১ সালে উদয়নারায়ণ সপরিবারে পলায়ন করেন। ১১২৬ সালে ঘনশ্যাম রায় প্রভৃতি প্রত্যাগত হইলে ঐ সময় ঘনশ্যামের মৃত্যু হয়। ১১৩২ সালে রাজা রামজীবন ঘনশ্যামের পুত্রদিগকে খানাবাড়ী গড়বাড়ী প্রভৃতি ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা জমীদারী ফেরত পান নাই। দলিল পাঠে বুঝা যায়, উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করেন নাই। তিনি ও সাহেবরায় মুর্শিদাবাদে বন্দী ছিলেন। নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ বা চাঁদসিংহ নামে উদয়নারায়ণের কোন পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, না। তৃতীয় দলিলখানিতে গড়বাড়ী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে বলিয়াই বৃহৎ হইয়াছে। আরজী, মুচলিকা ও বর্ণনাপত্র (জবাব) এই তিনটী পূর্ব্বে ভাষা, মুচলিকা ও ভাষোত্তরপত্র বলিয়া অভিহিত হইত। অন্যান্য সংবাদ দলিলপাঠে পাওয়া যাইবে।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

(ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী)

গোবিন্দ রায়
|
বিনোদ রায়
|
ঘনশ্যাম

কন্যা— (উদয়নারায়ণ রায় লালার স্ত্রী)	কৃষ্ণপ্রসাদ	শ্যামসুন্দর
সাহেব রায়	রাজারাম	কন্যা
	গঙ্গাধর	জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
	হরিশঙ্কর	রামলোচন
	ব্রহ্মময়ী দেবী	মৃত্যুঞ্জয়
	রামরতন	ঈশ্বরচন্দ্র
	শ্রীদুর্গাদাস রায় (লেখক)	শ্রীগিরিনন্দিনী দেবী

১ নং

শ্রীশ্রীরামজী।

হকীকত শ্রীজগন্নাথ শর্ম্মার নিবেদন আমার মাতামহ ৺ শ্যামাসুন্দর রায়ের ব্রহ্মোত্তর গরবাড়ী পরগণে গনকরের তরফ লক্ষাহারের মধ্যে আছে। ইস্তক লাগাইদ রায় মজকুর ভোগ করিতেছিলেন। সন ১১৫৫ সালে ৺ প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি অপুত্রক আমি তাঁহার দৌহিত্র। বালককালাবধি তাঁহার নিকট তাঁহার গার্হস্থালি এবং বিত্তবিধান যে আছে সকল দফার মালিক আমাকে করিয়া গিয়াছেন এবং মাতামহী ঠাকুরাণী অদ্যাবধি আমার নিকট আছেন। মাতামহ অবর্ত্তমানে আমি খাজনাপত্র লইতাম, পরে আমার বর্দ্ধমান যাওয়া হইল। এমতে আমারদিগের সকলেই সেখানে গিয়াছিলেন। গড়বাড়ী শ্রীগৌরীকান্ত রায়ের জিম্মা করিয়া গিয়াছিলাম। তিন বৎসর বর্দ্ধমানে থাকা হইল। আমার মাতামহের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজারাম রায় খামাকা জোর করিয়া রাইয়তের স্থানে খাজানা লইয়াছেন। গৌরী রায়কে দখল দেন নাই। সন ১১৬২ সন ১১৬৩ দুই সনের খাজানা লইয়াছেন, তসরুফ জে জে করিয়াছেন তাহার ফর্দ্দ দৃষ্ট করিবেন। দুই সনের খাজনা লইলে পর গৌরীরায় আমার নিকট গেলেন কহিলেন তুমি গড়বাড়ী আমার জিম্মা রাখিয়াছিলা। রাজারাম রায়জী জোর করিয়া খাজনা লইলেন। তোমার বিত্ত তোমাকে কহিলাম। আমি ফারগ। যে কর্ত্তব্য হয় করহ। ইহা শুনিয়া আমি বর্দ্ধমান হইতে আইলাম। আমার সহিত বিরোধ করিয়া কহেন তুমি সির্ত্তের কেহ নও। অতএব নিবেদন তজবীজ করিতে আজ্ঞা হইবেক। মাফিক তজবীজ জে হয় আমার এলাকা বুঝিয়া দেওয়ান নিবেদন ইতি। সন ১১৬৫ সাল তাং ১৫ আষাঢ়।

২ নং

শ্রীশ্রীরাম।

লিখিতং শ্রীরাজারাম শর্ম্মা ও জগন্নাথ শর্ম্মা মুচালিকা পত্রমিদং সন এগার পয়সত্তী আব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমাদিগের দুইজনে পৈতৃক খানাবাড়ী ও লক্ষাহারের গরবাড়ী ও খনিত পুষ্করণী দিগরের বিরোধ। এজন্য শ্রীশ্রী ৺ মহারাজ সরকারে পরগণে গনকরের কাচাহরিতে নালিশ করিয়া উভয় কোহিলা পরে শ্রীভয়চরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকৃষ্ণরাম রায়কে মধ্যস্থ মানিয়া জাইতেছি। ইহারা তজবিজ করিয়া জে অবধি করিয়া দেন। সেই মঞ্জুর হইতে জে অন্যমত করে, সে ন্যায়ভঙ্গী দাওয়া হইতে বেদাওয়া এবং সরকার হইতে গুণাগার। এতদর্থে মুচলিকাপত্র দিল ইতি ১১৬৫।২২ ভাদ্র। মোঃ চড়কা।

৩ নং

শ্রীশ্রীহরি।

লিখিতং শ্রীরাজারাম দেবশর্ম্মণঃ। ভাসোত্তর পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। পরগণে গনকরের

তরফ গনকরের মধ্যে মহিধর বাটী ও তরফ লস্কাহার এই দুই তরফের আমেজে আমাদিগের পৈত্রীকি নিজ খনিত গড় সমেত খানাবাড়ী ও গোহালী বাড়ী মায় আমলা আছে। পিতা-মহ ঠাকুর ঘনশ্যাম রায় মহাশয় পরগণে গনকর ও গয়রহ চারি পরগণার জমিদারি বহিতে বহাল দৌলতে ৺গঙ্গাবাস কারণ করিয়াছিলা। বাড়ির চৌগির্দ্দে গড় খনিত করিয়া পিতামহঠাকুর উৎসর্গ আপুনি করিয়াছেন। গড় খোদাইতে ইমারত কচ্চা বাড়ি বাস ও গড় প্রতিষ্ঠা গএর হতে আট সহস্র টাকা খরচপত্র সকল নিজ সরকারে। বাড়ি মজকুরে থাকিয়া প্রত্যহ ৺গঙ্গাস্নান ব্রাহ্মণভোজন পুরাণ শ্রবণ এই সকল কার্য্য পরকালের করিতেন। গড় বাড়ির জন্য লালা উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়েয় দত্ত ব্রহ্মোত্তর। তাহার বিবরণ জেকালে পিতামহি ঠাকুরাণী অন্তিমকালে ৺গঙ্গাতিরে লস্কাহারে পাঁচুমণ্ডল নামে পুড়া জাতি চাসার বাড়িতে বাস করিয়া থাকেন। তাহাতে সাহেব রায় মহাশয় আপন মাতাঠাকুরানি সহিত বড় নগর হইতে আপন মাতামহিকে দেখিতে আসিয়া-ছিল। তাহাতে অনেক লোকের জনতা স্থানাভাবে দুখ হইল। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আপন মাতামহকে কইলেন মহাশয়ের শেষ কাল ৺গঙ্গাঁতীরে একখানা বাড়ী করিতে হয় অভাব কি। তাহাতে পিতামহ ঠাকুর কইলেন আমরা সে মনস্থ আছে কীন্তু আমার নিজ তালুকের ভোম এখাতে নাই। সকল আপনকার খাস তালুক তাহাতে কইলেন আমার তালুক মহাশয়ের নয়। সকলি মহাশয়ের যে স্থান মনস্ত করেন সেইখানে দেওয়া যায়। তার পর আপনে সকল সমেতে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়া খাড়া হইলা। ঠিকানা জন্তিপুর নামে বরজ ছিল উচ্চস্থান ডিহি সেই স্থান মন্যত করিলেন ৺গঙ্গাঁতীর হইতে ১৫০ দেড় শত হস্ত অন্তর। নাপ করিয়া বাড়ি চিহ্নিত করিয়া দিয়া পরদিবশ বড় নগর গেলা। তার পর তার খনিত ও বাড়ী প্রস্তুত হইলে গড় প্রতিষ্ঠার কালে ৺ঠাকুর বড় নগর মোকামে কর্ত্তা উদয় নারায়ণ রায় মহাশয়কে সংবাদ জ্ঞাত করিলা ৺গঙ্গাঁতীরে লস্কাহার গ্রাম সমিপে নাতি একখানা বাড়ী দিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে একখানি ধর্ম্ম কর্ম্মকরা উপস্থিত হইাছে বাড়ীর গৌদির্দ্দি গড় খানিত হইাছে তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে হবেক। ভোম মহাশয়ের আত্মসত্ত উপাদান পরমত্ত ত্যাগ ইহা নহিলে দান উৎসর্গের অধিকার হয় না তাহা শুনিয়া কহিলেন জামাতা দৌহিত্র ইহার দ্রব্যে মহাশয়ের অধিকার নাই। ঠাকুরান আজ্ঞা হইতেছে। তাহাতে কইলেন কেবল বাশ করা হইলে জে আজ্ঞা করিতেছেন সেই প্রমান, কিন্তু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে এমত নহিলে চিত্ত প্রসন্ন হয় না। অতএব বাড়ীর প্রকৃত মুল্য খরিদানি দেন। তাহাতে কইলেন এমত বিষয় মহাশয়ের সহিত অনুচিত।

সে বাড়ী মহাশয়ের খনিত গড় সমেত চতুঃসিমা সাবদে আমি আপন সত্তা ত্যাগ করিয়া দিল। মহাশয়ের সত্তা হইল। যে বাসনা হয় তাহা করুনগা। পরে বড় নগর হইতে পিতামহ ঠাকুর আসিয়া গর প্রতিষ্টা করিলেন। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চাটোয্যা ভাসাতে লিখিয়াছেন আমার মাতামহ শ্যামসুন্দর রায় একখানি বাড়ী করিয়া গড় খোদাইয়া ছিলা তাহা আপন

পিতাকে দিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন। পিতার ধনে ঐশ্বর্য্যে এবং জমীদারি আনিতে উপষ্টম্ভ ছিল। তাহাতে পুত্র কর্ত্তা ছিলা কি পিতা গৃহস্থ ব্রাহ্মন ছিলা। পুত্রটী উপযুক্ত হইয়া তালুক চৌধুরাই ধন উপার্জ্জন করিয়া পিতার ভরণ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম করাইতেন ইহাতে বুঝায় পুত্রের উপষ্টম্বে পিতা কর্ত্তা ছিলা। পুনশ্চ লিখিয়াছেন তখন সকলি একত্র ছিলা। আপনারা সুন্দর বিবেচনা করিবেন। তদনন্তর সমাচার কএক বৎসর পরে সন ১১২০ সালের আখেরি সন ১১২১ ।একইস সালের প্রথম লালা উদয়নারায়ণ রায় জাফর খাঁ সুবা সহিত পাত সাইতে কমর বান্দি করিয়া গালিম হইলা। সে জনিত তাঁহাদিগের রাজ্য গেল। আমার পিতামহ ঠাকুর তাহার শ্বশুর নিগুড় কুটুম্বিতা সে মতে তিহ আত্ম ভয়ে গোষ্টি সহিত তালুক ভৌম গৃহ বাটী আদি সকল ছাড়িয়া সেই হঙ্গামে পলায়ন পর হইয়া সুলতানাবাদের মহেশ পুর অবধি একত্র ছিলা।

সাহেব রায় জুদ্ধে পরাজয় হইয়া সোষ্টি সহিত কয়েদ হইয়া গেলা আমরা উদয়নগর পাথরিয়া মোকাম হইতে কর্ত্তারদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া আমরা আত্মভয়ে পলাইয়া বনের পথে বিরভোম পাঠানের অধিকারে থাকিলাম এথাস্তে জমিদারি তালুক সেস্তবিত্ত আদি গোবৎস খনিত পুষ্কর্নি শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন রায় মহাশয়ের ভ্রাতা রাজা রামজীবন রায় মহাশয়ের নামে উদয়নারায়ণ রায়ের জমীদারি হইল। তাহার তরফ সিকদার পং গনকর গএরহ পাঁচ পরগনার সিকদার রামেশ্বর রায় হইলা তিহ সকল দখল করিলেন কিন্তু বেসাত বিক্রয় করিয়া রাজ সরকার দাখিল করিলেন। পুষ্কর্নী সকলের মৎস্য বিক্রয় করিয়া লইলেন সেই অবধি সরকারে থাকিল। চতুর্দ্দিগে অগ্নিদাহ হইয়াছিল। সে কারণ গর বাড়ীর ঘর ভাঙ্গিঁয়াছিল। গড় বাড়ীতে আমল। গনকরের খানাবাড়ী সর্ব্বসাঝার পিতামহ ভ্রাতারা পালাইয়াছিলা। তাহারা বিষয়তে বেইনাকে সেমতে সম্বৎসর মধ্যে বাড়ি আসিয়াছিলা সেমতে বহাল থাকিল। গড় বাড়ি ও খনিত পুষ্কর্নী আদিতে জে পিতামহ ঠাকুরের নিজ দফা তাহাতে ভাই বগ্র সংকোচে মুজাহিম হইল না। আমরা বিদেশস্থ থাকিলাম। গড় বাড়ীতে ফলং করা আদি আছে তাহা লঙ্কাহারের প্রজা স্থানে কর্ম্মচারিতে বিক্রয় করিরা লইত। এই সকল ধারাতে কয়েক বৎসর গেল। অস্বামিক দ্রব্য থাকিলে রাজা ব্যতিরেকে কে লয়। আমরা দেশে ভোম সাক্ষাত করিতে কেহু লয় নাই। তার পর কয়েক সন বাদে পিতামহ ঠাকুর ৺ গঙ্গাঁস্নান করিতে গোপনিয়তে সহরের নিকট তক আইলা তাহাতে অশ্বাস্তি হইলা। তথা পরামর্শ হইল রাজাবাহাদুর সহিত সাক্ষাত করিয়া এক বন্দোবস্ত করিয়া দেশে জান। গড় বাড়িতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ ইচ্ছা ভোজন করাইব। তথা হইতে জাত্রা করিয়া নৌকাতে আসিয়া ডাহা পরজ পৌছিলা। বন্দোবস্তের পয়গাম হইতেছিল ইতিমধ্যে তথা ৺ তিরে স্বর্গীয় হইলা এই তদবস্থ থাকিল। পুনশ্চ দিয়াড়াগ্রামে গিয়া কর্ম্ম হইল। পিতামহ ভ্রাতা তাহার জেষ্ঠ শত্রুজিত রায় ঠাকুর বাড়িতে ছিলা খরচ পত্র পাঠাইয়া দেওয়া গেল। তিহ এথা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। তারপর কয়েক বৎসর পরে আমার পিতাঠাকুর দুই ভ্রাতাতে রাজা-

দিগের সহিত সহিত সাক্ষাৎ করিলা গোষ্টিগনকার বাড়ী আনিলেন। তারপর রাজা আজ্ঞা হইয়াছিল ইহারা আপন জমিদারী লইয়া সরবরাহ করিতে পারেন দেওগা। চাকলে রাজ-সাহির মুৎসুদ্দি তিহ কিশোর সিংহ সরকারকে কহিলেক সকল তালুকের খাশ আমানত বন্ধ দিতে কয়েক বৎসরে কি বাকী ফর্দ্দ কর। তাহাতে বাকী মবলক হয়—ইহারা হালমাল গুজারী কবুল করেন। এইরূপ কোন কিনারা পরে না। ইহারা ভোম পাইবেন এই প্রত্যাশাতে বাড়ি ও পুষ্কর্নী আদি অন্য চেষ্টা পান না। কয়েক বৎসর এই আশ্বাসে গেল। তার পর জাহার মুদ্দই তাহার সমকক্ষ লোক নন। মহারাজা সবল। দুর্ব্বলের বিষয় যাহাদের গলিভুত তাহাদিগের বদনামে কথু নালিশ করে জায় না। ইহার দিগের নিকটে কল কৌশল ব্যতিরেকে আপন কার্য্য লওয়া জায় না। তার পর রাজার মা পুষ্কর্নী ও পিতা-মহী ঠাকুরাণীর পুষ্কর্নী ও বাগিচা বাড়ি আদি সকল মৎস্য বিক্রয় করিয়া সরকারে লইয়াছিল। সে অবধি রাজ সরকারে নিজ গ্রামের বিসুহালদার মৎস্য জীনাই করিত, তাহা আমার ঠাকুর রামেশ্বর রায় শিকদারকে লইয়া উদ্ধার করিয়াছেন। গড় বাড়ির দফা রামেশ্বর বাবতগীরি পথ লাভে সরকার সিকদার হইলা। তাহার আসনে তাহাকে সমাচার জ্ঞাত করিলেন। তিহ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী আমিন তাহাকে কইলেন রায় জীরা কি কইতেছেন। চৌধুরী কইলেন ঘনশ্যাম রায়জীর ৵ স্নানের খানা বাড়ী ইহারা দেশে না থাকাতে ফলকরা বর্ম্ম-চারিতে বিক্রয় করিয়া লয় এবং লঙ্কাহারের প্রজাতে বাড়ীর দেওয়াল বাহির খানিকওত দিয়া জমা কিঞ্চিত করিয়াছে তাহা খারিজ দিয়া বাড়ি দেন। এই চৌধুরী মজকুর সিকদারের দস্তখত সমেত লিখন করিয়া কর্ম্মচারিকে দিলেন তাহার পাঠ এই উদয় নারায়ণী ভঙ্গিয়ানে রায় মজকুরেরা পালাইয়া বিদেশে ছিলা। সে মতে লঙ্কাহারের প্রজাতে কথোক স্থানে জমী করিয়া কিঞ্চিত জমা করিয়াছে খানাবাড়ীতে। অতএব সদর দখলে দাখিল হয় নাই। এমতে হস্ত বুঝে কমী লেখা যায় না। যে জমার এওজ নাএক জাবত পতিত জমী অন্যত্র ঠাওরা-ইয়া দিবা, তাহা আবাদ করিয়া জমার মালগুজারি করেন। খনিত গড় সমেত খানা বাড়ী মায় আমলা পুর্ব্বের মত ভোগ করিবেন। এই দখল হইল তারপর পিতৃব্যঠাকুর লঙ্কাহারের অন্য পলাতক প্রজার ডিহি বা বাঁশ বৃক্ষ ও জমি সমেত ২০।৵৫ বিশ পচিশ টাকার জমা লইয়া ছিলা। সেই সামিল গড় বাড়ির জমা এওজ জমী লইয়া মালগুজারি করিতেন তারপর দশ মাস পরে সে বৎসর আম্র সমূহ হইল তাহাতে দুষ্ট লোকে পুনশ্চ সিকদারকে কহিলেক বিশ পচিশ টাকার আম্র গড় বাড়িতে হইয়াছে। রায় মজকুরদিগরের দেশ ছাড়া অবধি কয়েক বৎসর খামারে বিক্রি হইতেছে বিনা বড়নগরের লিখনে কিরূপে ছাড়িয়া দিলা। এই সিকদার কহিলেন বড়নগরের একখানি লিখনে আনিলে ভাল হয়। আমরা চাকর একখান আশ্রয় থাকে। পুনশ্চ দুষ্ট লোকের কথাতে এই আপত্য হইল। পরে আমার ঠাকুরেরা দুই ভ্রাতাকে পরামর্শ করিলেন। আমার ঠাকুর অস্বাস্থি ছিলা। পিতৃব্য ঠাকুরকে কইলেন তুমি সহর গিয়া সাহেব রায়জী ফাটকে সংবাদ জ্ঞাত কর রাজা মহাশয়

এতশ খানাতে আছেন। তাহার সহিত অতি সৎভাব আচরণ হইয়াছে। তাহারা কহিয়া পাঠাইলে কার্য্য হইবেক এই পিতৃব্য ঠাকুর সহর গিয়া উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়কে (১) এবং সাহেব রায়জীকে জ্ঞাত করিলেন। সে বৎসর কালু কোঙর (২) স্বর্গীয় হইলে নবাব রাজা মহাশয়কে নাটোর হইতে আনিয়াছেন এতস খানাতে থাকেন। নজীর আহামদ ও গৌরাঙ্গ সিংহের বন্দোবস্তে রাজা সাক্ষাৎ হইল। পরে রায় মজকুরের ব্রাহ্মণ সদা রাজার নিকট রুজু থাকিত কিঙ্কর শর্ম্মা (৩) নামে। তাহাকে সঙ্গে দিয়া এতস খানাতে রাজার নিকট পাঠাইলেন উক্ত ব্রাহ্মণ কহিলেন মহারাজা ইহ সাহেব রায় ঠাকুরের মাতুল। এহারা সাবেক জমীদার। কর্ত্তার দিগের ভাগ্নিয়ানে পলাইয়া বিদেশে ছিলা সে মতে জমীদারী খাস আমল হইয়াছে। ৮ গঙ্গা তিরে কাহার সমিপ খনিত গড় সমেত খানাবাড়ি আছে তাহা মপষলের নায়েব দখল দেয়না। জে মত আজ্ঞা হয়। শুনিয়া কইলেন জমীদারের ভোম গেলে খানাবাড়ী খনিত পুষ্করনী আদি ইহা যায়না। ভাল আমি বিষয় ওয়াকিব হই। এই গনকরের আমিনকে তলব হইল ইত্ত মধ্যে চাকলে রাজসাহির আমিন শ্যাম সরকার দেওয়ানি কাচারিতে রুজু থাকিয়া কানুন নোই গৌরঙ্গি সিংহ মজুমদারকে কাগজ দিতে ছিলা। তাহার নিকট পরগনা হায়ের আমিন রুজু ছিল। গনকরের আমিন চৌধুরী তথা ছিল। তাহাকে আনিতে পেয়াদা গেল। চৌধুরী মজকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিহ আবোহমান সকল সমাচার বিস্তারিত জ্ঞাত করিলেন। শুনিয়া কইলেন এই দণ্ডে লিখন দেও। ইহাদিগের নিজ খনিত গড় সমেত মায় আমলা বাড়ির নিকট কেহ না যায়। এবং কইলেন উদয়নারায়ন রায়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর আমিও বহাল রাখিন। এই শ্যাম সরকারের সাক্ষরে মহারাজার সহি সমেতে এই তথাকার সনন্দ হইল। লিখনের পৃষ্ঠে তফসিল আছে। নিজ খনিত গড় পাহার ও জলসার খানা বাড়ি ও গোহিল বাড়ী। পথ নাভ সরকার সিকদারের নামে সনন্দ তলব করিয়া দৃষ্ট করিবেন সকল দফা তাহাতেই জ্ঞাত হবেন।

প্রকৃত সনন্দ এই। পূর্ব্বে ব্রহ্মোত্তরের বাড়ী সেমতে ইত্যাদি লোক জনরবে কেহ কোনমত জানেন। এবং পূর্ব্ব পিতামহ ঠাকুরের জমিদারী আদি যে উপষ্টত্ত ছিল তাহার বিশয় কর্ম্ম পিতৃব্য ঠাকুর করিতেন আপনাদিগের যাবতীয় অধিকার ছিল তাহাতে প্রাচীন লোক যে থাকেন সকলেই জ্ঞাত আছেন তাহাতে দ্ববিত্যর আবেন জানি প্রস্তিসিন ছিল। ইহাতে ইনামনক্স খ্যাত ইত্যাদী লোকে নতুবা স্বকীয় পুরুষার্থে নয়। পিতা অবিদ্যমানে কোন কর্ম্ম করিবেন। আমার পিতাঠাকুর পূর্ব্ব জমিদারী অবধি আশু-

(১) উদয়নারায়ণ ও সাহেব রায় মুর্শিদাবাদে বন্দী। মুর্শিদাবাদকে তত্রস্থ লোকে 'সহর' বলে। লেখক
(২) কুমার কালীকাপ্রসাদ রাজা রামজীবনের পুত্র। লেখক।
(৩) *ান কোন দলিলে আত্মারাম শর্ম্মা আছে। লেখক।

তোশ ছিলা। সদাকাল স্নান আহ্নিক পরমার্থ আচরণে থাকিতা। তারপর পিতৃব্য ঠাকুর কড়ি অপব্যয় নষ্ট করিতে লাগিলা। তাহাতে পিতামহ ঠাকুর আবেশ করিয়া জেষ্ট পুত্রকে কইলেন তুমি কচহরিতে বসিয়া ব্যাপার কর সাবেক আমলা মধ্যে জয়দেব রায় খান গীর সুমার নবিস এবং প্রতিবাশী অতি প্রাচীন জীবিত আছেন সকল জ্ঞাত আছেন। তারপর গড় বাড়ী হুএ বিভোগ এক দফা দ্বিতীয় কান্ত গতাগতের এই সমাচার মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। তদনন্তর সমাচার স্ত্রীলোক দিগের অসৌষ্টবে এবং সিতারাম শর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মন সেই বাড়ীর মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া অন্ন পৃথক হইল। কেবল অন্ন পৃথক মাত্র দুই ভ্রাতাতে অভিন্ন ভাবে। পিতৃব্য ঠাকুরের জেষ্ট ভ্রাতাকে পিতা হইতে অধিক সংকোচ এইমত আচরণ ছিল। কিন্তু পিতৃব্য ঠাকুর অপুত্রক সেমতে আমরা কোন দফা অংশাঅংশ করিয়া লইয়ে নাই। অংশ করিলে নিরূপণ হয় নিরূপণ হইলে উত্তর কাল পিতৃব্য ঠাকুরের চারি কন্যার দৌহিত্রগণ আছেন যদি কদাচিত কাহুকে লিখিয়া দেন। পশ্চাত দ্যায় পড়ে। সেমতে অপরের ক্ষতি হইত। তথাচ তাহার আপত্য করিবে নাই। করিলে আপত্য প্রকৃত অংশ করিয়া লইতে হয়। এক দফা অংশ করিলে নিরূপণ হয় এইমতে সকল অবিভক্ত সাধারণ অদ্যাবধি গনকরে বাড়ীর ঘড় দ্বার পিতামহ পিতামহী বর্ত্তমানে যে যে ঘড়ে ছিল। সেই খানে তাহারা অবিদ্যমানে ও ছিল দুই ভ্রাতাতে পৃথক হইলে ঘড় দ্বার মাপ করিয়া নুতনাতিরেক তুল্যমূল্য সম্মতি হইয়া নিরোপন করেন নাই এবং সম্মতি পত্র হয় নাই। গৃহ বাটী সকল সাধরণ কতাবাস্ত হয় নাই। গনকরে ও অন্য গ্রামের খনিত পুষ্করিনির মৎস ও ফলকরা আদি সকল দ্রব্য ইহাও পিতৃব্য সহিত অংশ করিয়া লইতাম না। জখনকার যে দরকার হইত লইতেন তারপর গড়বাড়ী তখন কড়ির বিষয় ছিল না। ফলকরা ও বাঁশ ঘড় ইত্যাদি যখনকার জে দরকার হইত লইতেন। এই ভোগ কোনরূপে অংশ হয় ঃকারন অনেক মতে আখেজ করিতেন পিতৃব্য ঠাকুর আমরা আপন ক্ষতি হইত কোন দফা জ্যাদা তসরুপ করিতেন তথাচ তাহাতে পরিচ্ছেদ দিতাম। তার ১১৩৯ সালে শ্রীযুক্ত ভাদুরী মহাশয় ষোল আনা জব্দ করিলেন তাহাতে আমার দিগের ঠিকা মাল গুজারির জমী জব্দ হইল তাহার জব্দ বেসী ও দর বেশী জনিত ইস্তফা দিলাম। সে জমী গনকরের রামজী মাহাতা ও দক্ষীন পাড়ার মুসলমান প্রজা মিতাব মণ্ডল ও গনি মণ্ডল গয়রহ লইলেক। ভাদুরী মহাশয়ের সাক্ষাতে। তারপর ১১৪৩ সনে ফাদুড়ী মহাশয় রাজ সহিতে তগীর হইল শ্রীযুক্ত দয়রাম রায় মহাশয়ের আমল হইল। তাহার নিকট নালিশ করিলে পুনশ্চ ঠিকার জমি ১১৪৩ সালের শ্রাবনে বহাল হইল এবং কালিচরন বানয্যার দিগের ভবানন্দ রায়ের এবং বিনোদের গোস্বামিরদিগের গুজস্তা বহাল থাকিল। আমার দিগের দস্ত ছারা হইয়াছিল। সে মতে জে জে লইয়াছিল তাহার দিগের মাল গুজারির মত লিখন হইল। পরে আমরা আপন দখল করিলাম। জমীর সকলকার গীর্দ্দ হইলে প্রস্তুত ফসল লইলাম সেমতে জে জে জমী লইয়া ছিল তাহার দিগের জিরাত খরচা পাঁচ মাহা মাসোড়া খাজনার প্রাণরাম চাটয্যা ও

আত্মারাম চক্রবর্ত্তী দুইজন মানসিক হইয়া রফা করিলেন ভরত রায় দিগের ৺মন্দির দালানের পিড়াতে তাহাতে মবলগ টাকা দেয়ন হইল। টাকা দিবার সংস্থা হয় না সে জনিত জেষ্ঠ পিতির্ব্যের পুত্র জয়দেব রায়ের স্থানে বন্ধক দিলেন ৫১৲ একান্নন্ন টাকাতে সাঝাতে পিতা ঠাকুর ও পিতির্ব্য ঠাকুর দুই ভ্রাতার দস্তখতে বাড়ীর সকলের ভাই ভগ্রের সাহিদি সমেত বন্ধক পত্র দিয়া টাকা লইয়া দেওয়া গেল। এই কারন বন্ধক দেওয়া গেল ফল কড়া ও বাঁশ ও ডনাকইশ্যার খড় তখন এই আমলার হাল মনাফা সব্ব বন্ধক পত্রে লিখিয়া দেওয়া গেল। তাহাই ভোগ করিতেন। তারপর রায় মজকুরের বন্ধক আমলে ডিহি বাড়ীতে বরজ পত্তন হইল। তাহাতেই কড়ি হইল। এইরুপে দশবৎসর জয়দেব রায়ের স্থানে বন্ধক থাকিল তারপর ১১৫০ সালে রানা বাই পালায়নে পদ্মাপার আয়তশপুর সকলে গিয়াছিলাম। আমরা দুই এক মাস পরে সগোষ্ঠ দেশে বাড়ী আইলাম। আমাদের নিজ পরিজন আর সাহেব রাম শর্ম্মাদিগের পরিজন ইহারা তথাতে থাকিল পরে ইস্তক আষাঢ় নাগাইদ আশ্বিন তথাতে থাকিয়া মাহে কার্ত্তিক আপন নিজ পরিজন সহিত বিনোদে আপনা জামতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীর অনুজ শ্রীযুক্ত রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে গিয়া থাকিলা। আমি ও নোকুল রাম দুই জন সমভ্যারেতে থাকিলা আমিও বাড়ী হইতে জাতায়াত করি। পরে কয়েক মাস পরে আমাকে কইলেন আপনাদিগের বড়ই অপ্রতুল জয়দেব রায় দাদা স্থানে গড়বাড়ী বন্ধক থাকিল তাহার বন্ধকে বরজ পত্তন হইয়াছে। খাজনা হইতেছে রায় মজকুরকে জিজ্ঞাশ মুনাফা সববতে আমলা লিখিয়া দিয়াছি তা ভোগ করেন। বরজের জে খাজনা পয়দা হয় সন বসন আসলে মজুরা দেন। তাহা না করেন আমার বৈয়াহিক কৃষ্ণচরণ সরকারের সহিত কথা হইয়াছে। তিহকহিয়াছেন রায় মজুকরকে জিজ্ঞাশা করিয়া তাহার নিকট হইতে লইয়া তোমার বন্ধক পত্র আমাকে দেও ও আমি তাহার টাকা আপন জিম্বা করিয়া লই-তেছি তোমার দিগের বাড়ীর খাজনা ও গএরহতে মহাজনের টাকা আদায় করিয়া লইব। বাড়ী বন্ধকে খালাষ হইবেক। সে কুটুমা আমার সর্ব্বদা তত্ব করিতেছে। যদি তাহাকে নিজে টাকা না লাগে তবে ও বাড়ী ছাড়িয়া দিবেক। এই পরামর্শ হইল তখন আমার পিতাঠাকুর অবিদ্যমান। আমাকেও কথা রুচি হইল। পরে দুইজনে গনকর আসিয়া রায় মস্তরকে এই সমাচার কইল সে কথা তিহ গ্রহন করিলেন না। পরে বড় নগর গিয়া সরকার মজকুরাক সংবাদ কওয়া গেল। রায় মজকুর।এ বন্দোবস্ত কবুল করিলেন না। পরে সরকার মজকুর দিগের গড় বাড়ীর বন্ধুক পত্র সমেত আনে আমার নিকট পহুচ আমি তোমার টাকার নিসা করিব। এই! লিখা অনুসারে জয়দেব রায়জী বড় নগর পহুছিলা। আমরা দুইজনে মোকাবিলা করিয়াছিলাম। আমারদিগের বন্ধকপত্র জয়দেব রায়ের স্থানে সরকার মজকুর লইলেন, টাকা কিছু নগদ দিতে কবুল করিলেন। বাকী টাকাও আদায় করিলেন। তারপর কথোক টাকা জয়দেব রায় বর্ত্তমানে দিয়াছিলা। তিহ অবিদ্যমানে তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত গৌরি রায়কে গড়ের খাজনা দেওয়াইলেন। তিহ কথোক

দিবস দখল করিলেন, এই মবলক টাকার করজ সরকার মজকুর যে তের টাকা আকজুদ লইয়াছেন, তাহা সমেত লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা তজবিজ সুরতে করজ ও এওজা বন্ধকদার স্থানে দৃষ্ট করিলে জানিবে। কয়েক বৎসর পিতৃব্যঠাকুর জামাতা ঐ বন্ধক সম্পর্কে অসির্ভা প্রজুক্ত লইতেন। তিহ কুটুম্ব তাহারদিগের অবশ্য পক্ষলোকে তাহারদিগের দুই চারি সতে মলিয়ত তসরুপ করিলেন। তাহা সে গুজস্ত করিলেক, তিহ সকলি পারেন। আমি বিনা বন্ধকে রফা নহিলে কীরূপে মালগুয়জারিতে মুৎসরিফ হই কাব লইলে বন্ধকে মোটচরে পিতি বর্ত্তমান থাকে, গাছ ৫।৭ আম্রের পাসে পাড়ার শ্রীযুত গঙ্গাধর রায়ের স্থানে বিক্রয় করিয়া লইয়াছি। তথা খাজনা লই নাহি। এই পুনশ্চ কৃষ্ণচরণ সরকার এওজাবন্ধকদার বড়নগর মোকামে হইলা ১৫ বৎসর সরকার মজুকুরের বন্ধকের আমল এই ১১৪৩ সাল নাগাইত ১১৬৫ সাল এই ২৩ বৎসর গড়বাড়ী বন্ধকের আমলে আছে। ইতমধ্যে বড়নগর মোকামে কৃষ্ণচরণ সরকারের পুত্র শ্রীযুক্ত নর্পনারায়ণ সরকার সহিত বিরধ শ্রীযুক্ত শ্যাম ভটাচার্য্য ও নওয়া নগরের উকিল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ সাক্ষাতে আমি ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায় কহিলাম আমাদের গড়বাড়ী ১৮।১৯ বৎসর বন্দকে থাকিল। মুরব্বিঠাকুর সকল সর্গিয় হইলা। প্রাচিন জ্ঞাতলোক সকলে গেলা। আমি আছি। শরীর ভদ্রাভদ্র হইলে বালক সকল কী জানেন। জয়দেব রায় বাবদ বন্ধকপত্র তোমার স্থানে গচ্ছান আছে, তাহা আনাও তোমারদিগে সহিত যে করার আছে তাহার মত কর ভাপই নতুবা ভাল মনুষ্যে যে রফা করিয়া দেন তদনুসারে রফা হয়। অনেক কাল গেল আমারদিগের কেবল খনাবাড়ী লইয়া বিষয় আছে। তুমি কুটুম্ব সাহাজ্য করিবা। এ কারণ ভাই ভাদ্রস্থানে ছাড়াইয়া তোমারদিগের স্থানে রাখিয়াছি কইলেন ভাল পত্র আনাইব। তারপর পত্র আনাইলেন না। আমরা তখন পারে থাকি। তারপর সরকার মজুকর বড়নগরের প্যাদা করিয়া আপন ভগ্নীপতি শ্রীজয়চন্দ্র মুখুয্যাকে সঙ্গে দিয়া গনকর পাঠাইলেন। সে ৭।৮ দিবস গনকরে থাকিয়া গড়বাড়ীর বরজের জোতদার বারই সকলের স্থানেই ১১৫৮ সাল ১১৬১ সাল ৪ সনের খাজনা বাকী ছিল তাহা লইয়া দর্পনারায়ণ সরকারের পুত্র শ্রীরামগোপাল সরকারের নামে নির্ব্বাহ করিয়া খাজনা লইয়া গেল। তারপর আমরা পদ্মাপার হইতে সপরিবারে গনকর আইলাম, সে অবধি এওজা বন্ধকদারকে রফা কারণ দখল দিবে না বন্ধকদার সহিত আদাঅদি করিয়াই সন ১১৬২ সন নারহাল আমি তসরুপ করিতেছি একদফা বন্ধকের সমাচার এবং পিতামহি ঠাকুরাণীর পুস্করর্ণি ও বাগিচা বাড়ী মায় বৃক্ষ আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্মে ১১৪৫ সনে বানয্যাদিগের স্থানে আমার দস্তখত পিতিব্যের দস্ত আছে। অংশ নিরূপণ হইয়া থাকে সে বন্ধকপত্রে মজমলে জানিবেন গরবাড়ী বন্ধকের এই বিবরণ তজবিজ অনুসারে বুঝিবেন, তারপর আমার পিতা ও পিতিব্যঠাকুরে স্ত্রিলোকের মতান্তরে কেবল অন্ন পৃথক আর নেস্তবিল এবং স্থাবর রাদি সকল অবিভক্ত সাধারণে আছে। উচিত বিচার করিবেন ইতি ১১৬৫ সাল মাহ ভাদ্র।

মন্তব্য—এই প্রবন্ধ আমরা পুরাতন বাঙ্গলা গদ্যের নমুনা স্বরূপ সাদরে পত্রস্থ করিলাম। উদয়নারায়ণ রায় প্রভৃতির সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্দ্ধারণে ইহা সাহায্য করিবে কি না, ইতিহাসজ্ঞেরা বিচার করিবেন। পঃ পঃ সঃ।

বাঙ্গলার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য।

প্রাচীন কবিদিগের কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহাদের কবিতার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ হইতে প্রাকৃত শব্দই অধিক আছে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি সেকালের ভাষা যেমন প্রাকৃত ভাষার নিকটবর্ত্তিনী ছিল, তেমনি আজকালকার ভাষা সংস্কৃতের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে। এরূপ হইলেও আমরা প্রাকৃত ভাষার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই। আমাদের কথিত ভাষার মধ্যে শতকরা নব্বইটী প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত—"আজকাল করিয়া আট দিন কাটিয়া গেল।" এই কয়টী শব্দের মধ্যে কেবল দিন শব্দটী সংস্কৃত, তদ্ব্যতীত সমস্ত শব্দগুলিই প্রাকৃত-জাত।

প্রাকৃত শব্দ হইতে বাঙ্গালাশব্দের উদ্ভব হইবার একটী সাধারণ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। সে নিয়মটী এই—

ছন্দ শাস্ত্রে একটি নিয়ম আছে সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্বস্বর গুরু হয়। তদনুসারে "সর্প" শব্দের 'স'কার গুরু, সুতরাং সর্প শব্দটী তিন মাত্রা। এই সর্প শব্দকে যদি প্রাকৃত করা যায় তবে, প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণানুসারে র কারের লোপ হইয়া প কারের দ্বিত্ব হইবে। সুতরাং সংস্কৃতভাষার সর্পশব্দ প্রাকৃত ভাষায় সপ্প হইল। এই সপ্প শব্দকে কোমল করিবার জন্যই বোধ করি বাঙ্গলা ভাষায় সাপ করা হইয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত ভাষার বিকৃত হইয়াও বাঙ্গলায় সাপ শব্দে পূর্ব্বোক্ত তিন মাত্রাই বর্ত্তমান আছে।

এইরূপ প্রাকৃত-বিকৃত শব্দেই যে বঙ্গভাষার অঙ্গ পুষ্ট হইয়াছে তাহার দুই চারিটা উদাহরণ দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করি না।

সংস্কৃত শব্দ।	প্রাকৃত শব্দ।	বাঙ্গলা শব্দ।
সর্প	সপ্প	সাপ।
দর্প	দপ্প	দাপ।
গর্ত্ত	গত্ত	গাত।
পত্র	পত্ত	পাত।
ভক্ত	ভত্ত	ভাত।
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ।

সংস্কৃত শব্দ।	প্রাকৃত শব্দ।	বাঙ্গলা শব্দ।
বজ্র	বজ্জ	বাজ।
উষ্ট্র	উট্ট	উট।
আম্র	অম্ব	আঁব।
অগ্র	অগ্‌গ	আগ।
ছত্র	ছত্ত	ছাত।
মস্ত	মৎস	মাথ।
হস্ত	হৎস	হাত।
ব্যাঘ্র	বগ্‌ঘ	বাঘ।
অদ্য	অজ্জ	আজ।
কল্য	কাল্ল	কালি।
বর্ত্ম	বট্ট	বাট।
কার্য্য	কজ্জ	কাজ।
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ।
নৃত্য	নচ্চ	নাচ।
সত্য	সচ্চ	সাঁচ।
ব্রাহ্মণ	বহ্মণ	বামণ।
বল্কল	বক্কল	বাকল।
ভর্ত্তার	ভত্তার	ভাতার।
ঘর্ম্ম	ঘম্ম	ঘাম।
কর্ম্ম	কম্ম	কাম।
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধ।
পক্ষ	পক্‌খ	পাখ।
অন্য	অণ্ণ	আণ।
কর্ণ	কণ্ণ	কাণ।
বর্ণ	বণ্ণ	বাণ।
মৎস্য	মচ্ছ	মাছ।
কক্ষ	কক্‌খ	কাখ।
রক্ষ	রক্‌খ	রাখ।
চর্ম্ম	চম্ম	চাম।
কর্ত্তন	কট্টন	কাটন।
প্রস্তর	পৎথর	পাথর।

সংস্কৃত শব্দ।	প্রাকৃত শব্দ।	বাঙ্গলা শব্দ।
বিস্তার	বিত্থর	বিথার।
গর্গরী	গগ্গরি	গাগরি।
ফুৎকার	ফুক্কার	ফুকার।
কায়স্থ	কায়ৎথ	কায়াত।
বৈদ্য	বেজ্জ	বেজ।
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ।
বন্ধ্যা	বঞ্ঝা	বাঁঝা।
দীয়তাং	দিজ্জে	দীজে।
নীয়তাং	নিজ্জে	নীজে।
ক্রিয়তাং	কিজ্জে	কীজে।
নাট্য	নট্ট	নাট।
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম।
ধান্য	ধণ্ণ	ধান।

যে শব্দগুলি প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে একইরূপ তাহাকে "সংস্কৃত সম প্রাকৃত" বলে। তাহাও পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নিম্নলিখিতরূপে বাঙ্গলা হইয়াছে।

কুণ্ড	কুঁড়।	বঙ্ক	বাঁক।
মুণ্ড	মুড়।	পঙ্ক	পাঁক।
শুণ্ড	শুঁড়।	কম্প	কাঁপ।
ষণ্ড	ষাঁড়।	ঝম্প	ঝাঁপ।
ভণ্ড	ভাঁড়।	লম্ফ	লাঁফ।
ভাণ্ড	ভাঁড়।	অঙ্গ	আঁগ।
কাণ্ড	কাঁড়। (বাণ)	অঙ্গন	আঁগন বা আঁগিনা।
ঘট্ট	ঘাট।	বণ্টন	বাঁটন।
ভট্ট	ভাট।	অঞ্চল	আঁচল।
হট্ট	হাট।	অন্ত্র	আঁত।
খণ্ড	খাঁড়।	দন্ত	দাঁত।
খণ্ড	খান।	জম্বীর	জামির।
চণ্ডাল	চাঁড়াল।	পট্ট	পাট।
কান্তি	কাঁতি।	পঞ্জী	পাঁজী।
অঙ্ক	আঁক।	সজ্জা	সাজ।
শঙ্খ	শাঁখ।		

প্রাকৃত শব্দের অন্তে যদি অকার থাকে তবে তাহা সন্ধির নিয়মে আকার হইয়া পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

মস্তক	মৎথঅ	মাথা।
ছত্রক	ছত্তঅ	ছাতা।
পত্রক	পত্তঅ	পাতা।
হস্তক	হৎথঅ	হাথা।

পর পর যদি দুইটী অকার থাকে তবে তাহা উভয়ে মিলিত হইয়া আ হইয়া থাকে।

মোদক	মোঅঅ	মোআ।
ঘট্টপাল	ঘট্টআল	ঘাটআল।

প্রাকৃত ভাষার ব ও হ বাঙ্গালায় প্রায় অ হয়

সংস্কৃত	সখী	প্রাকৃত	সহি	বাঙ্গলা	সই।
„	দধি	„	দহি	„	দই।
„	সাধু	„	সাহু	„	সাউ।
„	মধু	„	মহু	„	মউ।
„	বধূ	„	বহু	„	বউ।
„	গো	,	গাবি	„	গাই।

প্রাকৃত ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র আছে তাহা বঙ্গভাষাতেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

প্রাকৃত সূত্র—

"অধো হেট্‌ঠ" বঙ্গভাষায় হেঁঠমুখ বলিলে অধোমুখ বুঝায়। এইরূপ "থু থু ছি ছি কুৎসায়াং"

"যথা তথা অনয়োঃ স্থানে জিমতিমৌ।"

বাঙ্গালাতে এই জিম তিম শব্দই যেমন তেমন হইয়াছে। আমরা কাককে কাগ বলি এবং শাককে সাগ বলি তাহাও প্রাকৃত ভাষার নিয়ম বহির্ভূত নহে। ঐ ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে "প্রথমস্য তৃতীয়ঃ" অর্থাৎ বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়। এই জন্যই কাক শব্দের "ক" বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ গ হইয়াছে।

পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসিগণ স স্থানে হ বলিয়া থাকেন। ইহা শুনিলে আমাদের একটু হাস্যের উদ্রেক হয়, কিন্তু প্রাকৃত ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে "সস্য খ ছ হাঃ" অর্থাৎ স স্থানে খ ছ এবং হ হয়।

পশ্চিম বঙ্গেও এরূপ প্রয়োগ ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা শাশুড়ী=সাহুড়ী বা সাউড়ী।

হাতের লেখা বাঙ্গলা পুথি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন প্রাচীন পুথিতে তিনটী সকারের মধ্যে কেবল দন্ত্য সকারেরই প্রয়োগ আছে, দুটী জকারের মধ্যে কেবল বর্গীয় জকারেরই প্রয়োগ আছে। ইহাও ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত নহে।

সূত্র যথা—"যস্য জঃ" "রশষাণাং সঃ"।

এইরূপ বর্ণ বিপর্য্যয় সাধারণ ভাষায় বিরল প্রচার থাকিলেও বৈষ্ণবদিগের পদাবলীতে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রাকৃত ব্যাকরণের একটী সূত্র—

"হো খ ঘ ধ ভানাং"

খ, ঘ, ধ এবং ভ স্থানে হ হয়।

ইহার উদাহরণ—

খ স্থানে হ যথা মুখ=মুহ বা মু।

ঘ স্থানে হ যথা—

উঅল নব নব মেহ। দূরে রহু সাময় দেহ॥

এখানে মেঘ স্থানে মেহ হইয়াছে।

ধ স্থানে হ যথা—হই মাহ ফাল্গুন ভেল। বিহি নাহ কাহে লেই গেল॥

এখানে বিধি স্থানে বিহি হইয়াছে।

ভ স্থানে হ যথা—পহুঁ গৌরসুন্দর, ধাম সামর, কেশ চামর, শোহই।

এখানে শোভই স্থানে শোভহ হইয়াছে এবং প্রভু স্থানে পঁহু হইয়াছে।

অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।

দরশন দুলহ দূরে রহু কেলি।

এখানে দুর্ল্লভ স্থানে দুলহ হইয়াছে।

সূত্র—ক তৃতীয়য়োঃ স্বরে।

স্বরবর্ণের পরে ক এবং বর্গের তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ গ জ ড দ ব থাকিলে তাহাদের লোপ হইয়া কেবল স্বরবর্ণই থাকে।

উদাহরণ—ক স্থানে অ যথা—প্রেমে ঢর ঢর, কনঅ কলেবর, নটন রসে ভেল ভোর।

এখানে কনক স্থানে কনঅ হইয়াছে।

গ স্থানে অ যথা—বরিষা ঋতু ভেল ঝরয়ে নয়ানে জল দুখের সাঅরে ধনি ভাসে।

এখানে সাগর স্থানে সাঅর হইয়াছে।

জ স্থানে অ যথা—রঅনী ছোটী অতি ভীরু রমণী। কতি খণে আয়ব কুঞ্জরগমনী।

এখানে রজনী স্থানে রঅনী হইয়াছে।

ড স্থানে অ যথা—পহিলহি কুল তুল সম উঅল যাকর বেণুক ফুকে। এখানে উড়ল স্থানে উঅল হইয়াছে।

দ স্থানে অ যথা—রহু, পিআকি হিঅ হিঅ লাগি শয়ন হি বঅন বঅনহি ঝাঁপিয়া। এখানে প্রকৃত 'হিঅঅ' এখানে 'হিঅ' এবং বদন শব্দ বঅন হইয়াছে।

গোবিন্দ দাসের একটী পদ আছে—

ধনি, না করু পসাহন আন। এতনি নিহারী মুগধ মধুসূদন দিন রজনী নাহি জান। এই পদের 'পসাহন' শব্দটী খাটী প্রাকৃত ইহার সংস্কৃত 'প্রসাধন'।

আর একটী পদে—ধরম করম মতি ভরম সরিস ভেল নারী গারি সম দুখে। ইহার সরিস শব্দটী খাটী প্রাকৃত, ইহার সংস্কৃত সদৃশ।

আর এক স্থানে আছে—গুরুজন বচন বহির সম মানই। ইহার 'বহির' শব্দটী খাটী প্রাকৃত, ইহার সংস্কৃত বধির।

প্রকৃত ভাষায় ঐকার স্থানে একার অথবা অই হয়। যেমন তৈল স্থানে তেল্ল। বাঙ্গলা ভাষাতেও এই রীতি অবলম্বিত হইয়া তৈল স্থানে তেল বলা হইয়া থাকে। প্রাকৃতে কৈতব স্থানে ক ই অ ব হয়। বাঙ্গলা ভাষাতেও হৈল স্থানে হইল হয়। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণও এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

প্রাকৃত ভাষায় ঔ কার স্থানে ও কার এবং অউ হইয়া থাকে; বাঙ্গলাতেও ঐরূপ দৃষ্ট হয়। যেমন চৌর=চোর। গৌর=গোর। অথবা গউর। প্রাচীন কবিগণের উক্তি যথা—

গউরবরণ পুরুষরতন নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।

অথবা

গউর সহচর, পরম শুভকর। জগত দুখহর, অতুল গুণধর॥

সূত্র—স্বরা রিচ ঋ বর্ণস্য।

অর্থাৎ ঋ বর্ণ স্থানে অন্য কোন স্বর অথবা রি হয়। যেমন নৃত্য=নেত। ঘৃত=ঘিঅ=ঘি।

বৃষ্টি=বিষ্টি। পৃচ্ছসি=পুছসি। দৃষ্টি=দিঠি।

শৃণোতি=শুনই। বৃদ্ধ=বুড্ঢ=বুঢ়। সংস্কৃত বৃন্ত শব্দ প্রাকৃতে বেণ্ট হয়, এই বেণ্ট শব্দই বাঙ্গলায় বোঁটা হইয়াছে।

ঋকার স্থানে 'রি' ব্যবহার বাঙ্গলায় বিরল নহে। রিতু, রিণ শব্দই তাহার প্রমাণ।

সংস্কৃত ভাষার বিসর্গ প্রাকৃতে ও হয়। যে সংস্কৃত কঃ প্রাকৃত বিসর্গ কো, সঃ সো। প্রাচীন বঙ্গভাষায় ঠিক এইরূপই লক্ষিত হয়।

যথা—সজনি কো কহু কাম অনঙ্গ। কেলি কদম্বতলে সো রতি নায়ক পেখলু নটবর ভঙ্গ॥

প্রাকৃত বিট্ট বাঙ্গলায় বেটা। প্রাকৃত বিট্টি বাঙ্গলায় বিটি বা বেটী। এই বেটা বেটী শব্দ পুত্র পুত্রী শব্দ হইতে প্রাকৃতে বিট্ট বিট্টি হইয়া পরে বেটা বেটী হইয়াছে ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাকৃত ব্যাকরণে একটী সূত্র আছে—

"মত্বর্থে আল ইল্লৌ" অর্থাৎ সংস্কৃতের মতু প্রত্যয় স্থানে প্রাকৃতে 'আল' 'ইল্ল' প্রত্যয় হয়। বাঙ্গলাতেও আমরা আল প্রত্যয় এবং ইল্ল প্রত্যয়ান্ত শব্দ দেখিতে পাই।

যেমন—ঘোরাল, রসাল, গোলাল, ভরিল ইত্যাদি।

বাঙ্গলা ভাষায় ধর্ম্ম স্থানে 'ধরম,' কর্ম্ম স্থানে 'করম', অল্প স্থানে 'অলপ' এইরূপ শব্দ-সম্প্রসারণ ক্রিয়ার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ইহাও প্রাকৃত নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সূত্র—সংযোগস্থ ইষ্ট স্বরাগমো মধ্যে। দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ইষ্ট (অভিলষিত) স্বরের আগম হয়। যেমন—বর্ষা = বরিষা। হর্ষ = হরিষ। রত্ন = রতন। পদ্মিনী = পদুমিনী ইত্যাদি।

বর্ষা শব্দের মধ্যে অকারের আগম না হইয়া ই কার, পদ্মিনী শব্দের মধ্যে ই কারের আগম না হইয়া উকার হইয়াছে, ইহাই ইষ্ট (অভিলষিত) স্বর।

বহুবর্ষ পূর্ব্বের প্রাকৃত ব্যাকরণে যে রূপ নিয়মাদি ব্যবস্থিত হইয়াছে, অদ্যাপি সেই নিয়মের অধীন হইয়াই বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে ইহা কি আমাদের ভাবিবার বিষয় নহে? তবে বাঙ্গলা দেশের জল বায়ুর গুণেই হউক বা বাঙ্গালী জাতি দুর্ব্বল বলিয়াই হউক কতকগুলি কর্কশ শব্দকে কোমল করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র।

সংখ্যা বাচক শব্দ গুলিও প্রাকৃত শব্দ হইতে আসিয়াছে, উহা সংস্কৃত জাত নহে। নিম্নলিখিত প্রাকৃত ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ গুলি পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

এক্ক এক। এক শব্দটীও পূর্ব্বলিখিত মত পরস্থ দ্বিত্ববর্ণের একত্ব হইয়া পূর্ব্ব বর্ণ গুরু হইয়াছে।

দুঅ দুই। প্রাকৃত ভাষায় বে বলিলেও দুই হয়, এই বে শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় বিরল প্রচার নহে। যথা—বার, বাইস, বত্রিশ, বেয়াল্লিশ ইত্যাদি স্থানে বে র ব্যবহার আছে।

তিণ্ণি	তিন	
চারি	চারি	
পঞ্চ	পাঁচ	
ছক্	ছয় বা ছঅ	
সত্ত	সাত	এটী পূর্ব্বনিয়মানুমোদিত।
অট্ঠ	আট	
দহ	দশ	হ কার ও স কারের একত্ব।
গারহ	এগার	প্রাকৃত ভাষার হ কার গুলি বাঙ্গলায় প্রায়ই অ কার
বারহ	বার	রূপে উচ্চারিত হয়, ইহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেখান
তেরহ	তের	হইয়াছে। আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বনাম ও বিভক্তির কথা।

সংস্কৃত অস্মদ্ শব্দ প্রথমা করিলে অহং হয়। প্রাকৃতে অহ্মি ও অম্মি হয়।

বাঙ্গলাতেও ঐ অহ্মি বা অম্মি শব্দকে কোমল করিয়া পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে আমি হইয়াছে

বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর বিভক্তি একইরূপে কথিত হয় কিন্তু প্রাকৃত ভাষার সহিত কোনরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় না।

অস্মদ্ শব্দের ষষ্ঠীতে অম্মাণং হয় ইহাও পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আমার হইয়াছে। মূর্দ্ধন্য ণ কারের উচ্চারণ এবং র কারের উচ্চারণে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মূর্দ্ধন্য ণ কারের স্থানে র হইয়াছে।

অপাদান কারকের বহুবচনে অম্হে হিংতো হয়, এই হিংতো বিভক্তিই বাঙ্গলায় 'হইতে' হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

তদ্ শব্দের প্রথমায় সংস্কৃতে সঃ প্রাকৃতে সো হয়। প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ এইরূপই সো শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যথা—

"সো বর নাগর কাণ।" ব্রজপুর পরিহরি যাঅব সো হরি ইত্যাদি। এইরূপ যদ্ শব্দ প্রাকৃতে যো, কিম্ শব্দ কো হয়। পদাবলীতেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—কো জানে চান্দ চকোরিণী বঞ্চব। ইত্যাদি।

আজকালিকার চলিত বাঙ্গলায় যো = যে, সো = সে, কো = কে হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষায় করণ কারকে স্ত্রীলিঙ্গে এ হয়। যেমন সংস্কৃত করুণয়া প্রাকৃত করুণাএ, প্রাচীন বাঙ্গলাতেও 'করুণাএ', 'গঙ্গাএ' এইরূপ প্রয়োগ আছে।

প্রাচীন বাঙ্গলায় ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'ক' বা 'র' অথবা ক র উভয়েরই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—ধনি ধনি 'তাক' সফল ভেল জীবন। এখানে তদ্ শব্দের ষষ্ঠীতে ক প্রত্যয় হইয়াছে।

অন্যত্র—সজনি নিঁদ বৈরী মঝু ভেল।

যে দিন অবধি ছোড়ল ব্রজনন্দন 'তাকর' সঙ্গহি গেল। এখানে 'ক' ও র উভয় বর্ণের প্রয়োগ দেখা যায়। এই ক ও র এর একই অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—তাহাকে বলিলে যে অর্থ তাহারে বলিলেও সেই অর্থ বুঝায়।

সপ্তমী বিভক্তি সংস্কৃত ও প্রাকৃত একরূপ সুতরাং বাঙ্গলাতেও ঐরূপ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় করে, চলে, হয়, ফলে প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলি কিরূপে সিদ্ধ হইল তাহাই প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কৃ ধাতু সংস্কৃতে তিপ্ প্রত্যয় করিয়া করোতি, প্রাকৃতে করই হয়, এইরূপ ভণ ধাতু ভণতি = ভণই হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় করে ভণে কিরূপে হইল?

পূর্ব্বোক্ত করই ও ভণই পদাবলীতে ঠিক এইরূপ আছে। তবে কোন কোন স্থানে করএ বা ভণএ এরূপও দেখা যায়। আবার কোন কোন পদ্য গ্রন্থে করয়ে বা ভণয়েও আছে।

আমি অনুমান করি, 'করই' র ই বর্ণের গুণ এ হইয়া করএ বা ভণএ হইয়াছে। ইহার পরে শব্দ সংক্ষেপ করিবার জন্যই বোধ হয় ঐ একার পুর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হইয়া করে বা ভণে হইয়া থাকিবে। এই প্রকারে কহে, বলে, চলে, পড়ে, পঢ়ে, হএ প্রভৃতি ধাতুর রূপ হইয়াছে।

প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গলার সাদৃশ্য দেখাইতে হইলে দুই চারিখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং প্রাকৃত কাব্য গ্রন্থের বিশেষরূপে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু লেখকের ভাগ্যে তাহার কিছুই ঘটিয়া উঠে নাই, কেবল একখানি মাত্র "প্রাকৃত লক্ষণ" নামক ব্যাকরণের সাহায্যেই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির সাহায্য লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য হইলেও তাহা পাঠ করিয়া দেখাও সময়সাপেক্ষ এজন্য তাহাও দুর্ঘট হইয়াছিল। তবে গোবিন্দ দাসের পদাবলী সম্পাদনকালে সেই ভাষার আলোচনা করিয়া আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, সেইরূপই এই প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম। শ্রোতৃগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া আমার ভ্রম সংশোধন করিলে আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

এই প্রবন্ধ লিখিবার পরেই আমি ভাষাতত্ত্ব নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থকার সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গলা ভাষাকে সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি মনে করি সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত পরে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গলা হইয়াছে। বঙ্গভাষা প্রাকৃতের অন্তর্বর্ত্তিনী হইলেও প্রাচীন প্রাকৃত হইতে বহুদূরে গমন করিয়াছে, তবে প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গলার যেমন সাদৃশ্য আছে সেরূপ সংস্কৃতের সহিত নহে। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ভাষাকে বাঙ্গলার জননী না বলিয়া মাতামহী বলা যাইতে পারে।.

শ্রীকালিদাস নাথ।

অর্জ্জুন-সংবাদ।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মুকুন্দ দাসনামক কবির প্রণীত। গ্রন্থখানি প্রাচীন। রচনায় বিশেষ গুণপনা না থাকিলেও প্রাচীনত্ব হিসাবে ইহা আদরণীয়। আমরা এই গ্রন্থ হইতে কতিপয় স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥ শ্রীরাগ॥

এক চিত্ত হইঞা নর শুন সাবধানে। শুনিলে সকল পাপ হরে ততক্ষণে॥
বৈষ্ণব মাহাত্ম্য কথা কহেন নারায়ণে। শুনিলে সকল পাপ হরে ততক্ষণে॥
অর্জ্জুনে পুছেন্ত কথা হইঞা সাবধানে। ইহা শুনিবারে অভিলাষ মোর মনে॥
কেমন গতি পায় তোমার ভক্ত জনে। কহিল সকল কথা কমললোচনে॥
কোন্ লোকে যায় সেহি কোন্ কর্ম্ম করে। নিরবধি কারে ধ্যায় পুজএ কাহারে॥
তবে কৃষ্ণ কহেন কথা হইঞা সকরুণ। সাবধান হইঞা কথা শুনহে অর্জ্জুন॥
সকল বৃত্তান্ত আমি কহিব তোমারে। আমাকে চিন্তএ যেহি পুজএ আমারে॥
আমার পুজে রত হইঞা আমার গুণ গায়। আমাত মজিয়া চিত নিরন্তর ধ্যায়॥
যে গতি বৈষ্ণব যায় শুনহে অর্জ্জুন। যাইতে না পারে তথা যত দেবগণ॥
সূর্য্যের প্রতিভা তথা নাহি গতাগতে। নিশাপতি নিজতেজে না পারে যাইতে॥
যে গতি বৈষ্ণব যায় শুনহে অর্জ্জুন। না পারে যাইতে তথা যোগী সিদ্ধাগণ॥
না পারে যাইতে তথা ধার্ম্মিক যত জন। পবনের গতি নাহি মনুষ্যের মন॥
সচরাচর তথা নাহিক গমন। না পারে যাইতে তথা চারিবেদের ব্রাহ্মণ॥

কবির কর্ণে যেন উপনিষদের এই ধ্বনি প্রবেশ করিয়াছিল ;—"নতত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।"

ইহার পর অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসায় শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন :—

ভক্তজনের সম নহে জগতের রাজ। সুরপতি সম নহে অন্যের কি কাজ॥
ইন্দ্রের পাত হএ ভোগ অনন্তর। ভক্তজনের পাত নাহি চারিযুগের ভিতর॥
ভক্তের অধীন আমি কহিলোঁ তোমার স্থানে। ভক্তির সমান নহে জ্ঞান তপোধ্যানে॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির মাহাত্ম্যই বলিয়াছেন, ভক্তির লক্ষণ বলেন নাই।
আবার অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তোমাকে স্মরিঞা প্রাণ ছাড়ে যেই জন। তার কিবা ফল হএ কহিবে কারণ॥
কেমন গতি পাএ সেহি কেমন স্থানে যায়। এ সকল কথা আমি পুছিএ তোমায়॥

মৃত্যুকালে আমা যেবা করএ স্মরণ। আমার শরীরে লিপ্ত হএ সেই জন॥
সত্য করি কহি আমি বুলিল তোমাকে। ভুবন দুর্ল্লভ পদ দিএ আমি তাকে॥ ইত্যাদি।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা,—

পুনর্ব্বার অর্জ্জুন পুছেন্ত সাবধানে। আর কিছু নিবেদন করিতে আছে মোর মনে॥
তোমাকে যে আগে অন্ন করায় নিবেদন। অবশেষ অন্ন যেবা পাছে করেত ভোজন॥
কিবা পাপ পুণ্য ফল কহিবে আমারে। নিষ্কপটে কহেন প্রভু ই সব বিচারে॥
অমৃত সমান তোমার মুখাশ্রিত বাণী। কোন গতি কেবা যায় সেহি কহিবে আপনি॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর,—

আমার উচ্ছিষ্ট খায় আমাতে যার মন। আমি তাকে ধ্যাইতে থাকি শুনহে অর্জ্জুন॥
এই মত নিত্য নিত্য যেবা ভাল করে। তাহার পুণ্যের সীমা কেবা দিতে পারে॥
শুনহে অর্জ্জুন সত্য বলিল তোমাতে। বৈষ্ণব অধিক পদ নাহি ত্রিজগতে॥ ইত্যাদি।

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা,—

তোমার নাম লইলে প্রভু কিবা ফল হয়। ভাবিঞা সকল কথা কহেন মহাশয়॥
তোমার কর্ম্ম করিতে যাহার অভিলাষ মন। কৃষ্ণনাম কেমন বস্তু কহেন কথন॥

শ্রীকৃষ্ণ, নামের মহিমা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কর্ম্মের সদৃশ নহে আর যত পুণ্য। আমার কর্ম্ম ছাড়িঞা আর দেখ শূন্য॥
নামের মহিমা কেবা বুলিবাকে পারে। জ্ঞানব্রত ধ্যান নহে কিছুত সোসরে॥ ইত্যাদি।

অর্জ্জুন প্রার্থনা করিতেছেন,—

অবধান কর যদি প্রভু নারায়ণ। বিশ্বরূপ দেখিতে আছএ মোর মন॥
যদি কৃপা কর মোকে কমললোচন। বিশ্বরূপ মোরে প্রভু দেখাই এখন॥

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষুঃ দিলে অর্জ্জুন দেখিলেন,—

উদরের ভিতরে আছে ভুবন অনন্ত। কিবাদিবা কিবানিশি যতেক বসন্ত॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে শরীরের মাঝে। কত কত ব্রহ্মাণ্ড আছে কত সুররাজে॥
কত কত সূর্য্য অঙ্গে করিছে উদয়। কত কত গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর আছএ॥
কতেক পর্ব্বত আছে কত নদ নদী। কেবা বলিবাকে পারে ইহার অবধি।
কতেক বিদ্যাধরীগণ কতেক আছএ। স্থানে স্থানে আছে কত দেবের আলয়ে॥
কতেক বরুণ আছে কতেক পবন। কতেক আছএ তথা যোগী সিদ্ধাগণ॥
দিগে দিগে আছএ যতেক তীর্থ বাসী। কত ব্রহ্মচারী আছে কতেক সন্ন্যাসী॥
কায়মন বাক্যে যার এক চিত্ত মন। নানা মুক্তিপদ আছে দেখিতে সুশোভন॥
কত কত জন্তু আছে বিচিত্র দেখিতে। ইহার মহিমা কিছু না পারি বুলিতে॥
কীট পতঙ্গ আছে অন্ত নাহি তার। কত ব্রহ্মাণ্ড আছে কত বা সংসার॥
এক এক সংসারে আছে কত কত দেশ। নানাবর্ণে আছে লোক ধরি নানা বেশ॥
কাহার জন্ম হএ কাহার হএত প্রলয়ে। জলের বিম্ব যেন জলেত মিলাএ॥
কতেক দেশ তথা আছে কতেক দুঃখিতে। অন্যে কি বলিব ব্রহ্মা না পারে লেখিতে॥
কত কত দৈত্য নষ্ট করিছে পরজা। দুষ্ট সে রাজনে নষ্ট করিছে রাজা॥
স্থাবর জঙ্গম আছে কতেক সাগর। কত কত জন্তু আছে তাহার উপর॥
আপন সমান কত অর্জ্জুন দেখিল। দেখিঞা অর্জ্জুনের তবে বিস্ময় ঘুচিল॥

অনন্তর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব। ইহাতে গ্রন্থকারের কোন নৈপুণ্য প্রকাশ পায় নাই। গ্রন্থকার নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিতেছেন। সুহইরাগ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কথা হইল যেমনে। দাস মুকুন্দে কহে শ্রীহরি চরণে॥
অর্জ্জুনে কহিল সব বৈষ্ণব মাহাত্ম্য। কলি যুগে ত সে সব হইল বিদিত॥
ইহাত শুনিঞা আকুল হইল মোর মন। আপনার দুঃখ কিছু করো নিবেদন॥
কতভাগে জন্মিলোঁ মনুষ্যের কুলে। তোমায় নাম লইঞা জন্ম করিলোঁ সফলে॥

দীর্ঘচ্ছন্দ :—

সর্ব্বেশ্বর অধিকারী	গরুড় বাহন হরি।	প্রভুহে হরি তুমি।
লক্ষ্মীদেবী স্ত্রীয়ার	কি নৈবিদ্য দিব তার	কি আর বলিতে জানি আমি॥
ভবাদি ভাবক যার	আমি কি ভাবিব আর	কি আর বলিতে জানোঁ স্তুতি।
আমি নর অধমকিঙ্কর	তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর	কি আর বলিতে জানো শুদ্ধি॥

উদরে থাকিঞা মুই করিঞাছো আশ। তোমাকে সেবিমু যেন আর নহে গর্ব্ভবাস॥
নাম চক্রে কাট মোর ভবের বন্ধন। দাস করি রাখ মোরে শ্রীমধুসূদন॥
দাস মুকুন্দে কহে মনের অভিলাষে। হেন বুদ্ধি দেহ যেন নহে গর্ব্ভবাসে॥

ইতি শ্রীমুকুন্দানন্দরচিতং অর্জ্জুন সংবাদ পুস্তকং সমাপ্তং॥ * বাসুদেবস্য যে ভক্তা শান্তা স্তদ্গত মানসাঃ। তস্য দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্ম জন্মনি॥ *॥ (পাঠকগণ, এই শ্লোকের অশুদ্ধি ধরিবেন না, মূলে এইরূপ আছে)॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তি দোষক! ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম॥ ইতি সন হাজার এগারো শত চল্লিশ ১১৪০। ২৭ ফাল্গুন রোজ রবিবার॥

১১৪০ সাল গ্রন্থ লেখনের সময়, রচনার সময় জানা যায় না। গ্রন্থকার, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বতন কি অধস্তন তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেলনা। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের পক্ষে চৈতন্যদেবের বন্দনা করা স্বাভাবিক। তবে গ্রন্থে ভক্তির লক্ষণ, বৈষ্ণব মহিমা ও নাম মাহাত্ম্য যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মুকুন্দ দাসকে চৈতন্যের পরবর্ত্তী বলিতে সাহস হয়। গ্রন্থখানি প্রাচীন। রচনার সময় ত্রিপদীর দীর্ঘচ্ছন্দ নাম ছিল। ত্রিপদীর রচনার উৎকর্ষ ও সাধিত হয় নাই। ইহাতে বসেন্ত, কহেন্ত, পুছেন্ত প্রভৃতি প্রাচীন ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। সচরাচর "তে" বিভক্তির স্থানে "ত" ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন পদাবলীতে ব্যবহৃত জানিলুঁ, করিলুঁর ন্যায় ইহাতে জানিলোঁ, করিলোঁ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইয়া প্রত্যয়ান্তে অসমাপিকা ক্রিয়াগুলি ইঞা প্রত্যয়ান্ত রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন করিঞা খাইঞা প্রভৃতি। যে মুকুন্দ দাস চমৎকার চন্দ্রিকা ও সহজ চরিতের রচয়িতা, অর্জ্জুনসংবাদ রচয়িতা মুকুন্দ দাস, তাহা হইতে বা তাঁহাদের হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। উক্ত তিন গ্রন্থের ভাষা দেখিলেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। ১৬৮ বৎসর পূর্ব্বে মালদহ জেলায় যেমন অক্ষর প্রচলিত ছিল, গ্রন্থখানির লেখা দেখিলে তাহা জানিতে পারা যায়। তখন হসন্ত চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। তৎক্ষণ ততক্ষণ আকারে লিখিত হইত। জ, কৃ, হৃ, র এই গুলির আকার ড, হৃ, ক্ষ য ছিল। ক আপনার প্রাচীন মূর্ত্তির পরিত্যাগ করিতেছিল। আমরা অক্লিষ্ট কর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে বঙ্গদেশের প্রাদেশিক অক্ষর সমূহের সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার অতুল্য গ্রন্থে সংযুক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ২৯শে বৈশাখ (১৩০৮), ১১ই মে (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় পরিষৎ-কার্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভ্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন ;——

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি।)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, (সহকারী-সভাপতি)
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, এম্ এ ; ডি এল্।
শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, এম্ এ ; বি এল্।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ ; বি, এল।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ।
" ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এম্ এ ; বি, এল্।
" প্রমথনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল্।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
" নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
" সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, বি, এল্।
" কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, এম্ এ।
" অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ।
" ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
" কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাভূষণ, এম্ এ,।
" ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
" ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।
" চারুচন্দ্র ঘোষ।
" গোবিন্দলাল দত্ত।
" শরচ্চন্দ্র সরকার।
" নগেন্দ্রনাথ বসু।
" বাণীনাথ নন্দী।
" প্রমথনাথ মিত্র।
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্, এন্, পি, এস্।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।
" কালিদাস নাথ।
" গিরীশচন্দ্র রায়।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
" বসন্তকুমার বসু।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
" কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" ডাঃ ইন্দুভূষণ মজুমদার, এম্, এ ; বি এল্, এল্, এম্, এস্।
" চুনিলাল গুপ্ত।
" শচীন্দ্রনাথ বসু।
" কামিনীনাথ রায়।
" অম্বিকাচরণ দাস।
" কবিরাজ করুণাকুমার সেনগুপ্ত।
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ।
" মুনীন্দ্রনাথ সাম্খ্যরত্ন।
" বীরেশ্বর গোস্বামী।
" পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
" নগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।
" ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ ; বি এল্। (সম্পাদক)।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী-সম্পাদক)
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিএ }

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক গণ্যমান্য প্রায় শতাবধি লোক উপস্থিত ছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—

(১) মাসিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) সপ্তম বার্ষিক-কার্য্য বিবরণ পাঠ, (৪) ১৩০৮ সালের কর্ম্মচারি-নির্ব্বাচন, (৫) ভাওয়ালাধিপতি ৺ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের এবং পরিষদের অন্যতম সভ্য ৺ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও (৬) বিবিধ বিষয়। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর গত একাদশ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত নূতন সভ্যগণের নাম যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ, ৮নং সৃষ্টিধর দত্তের লেন। (২) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ, ৬৭নং সিমলাষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ ; বি, এল্, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৩) শ্রীযুক্ত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ, ১৭৬নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৪) শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্, এ, বঙ্গবাসী কলেজ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি, শ্যামবাজার।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ ; বি, এল্, (৬) শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভারত-সঙ্গীত-সমাজ, ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, (৭) শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ বসু ৩৪।৫ নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট, (৮) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৯নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৯) শ্রীযুক্ত আশুতোষ প্রামাণিক, ৮৬নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (১০) শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, ১ম মুন্সেফ বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাসা, মেদিনীপুর। (১১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ সিংহ, মোক্তার, মেদিনীপুর। (১২) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গোস্বামী, হেড আসিষ্টাণ্ট, সেক্রেটারিয়েট, শিলং। (১৩) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মিত্র, বাবু প্রাণগোবিন্দ মিত্রের বাটী, ধলদীঘী, বর্দ্ধমান। (১৪) শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র সেন, পুলিস্ আফিস, শিলং। (১৫) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বাগনান, হুগলী। (১৬) শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত, কবিরাজ, ঢাকাপটী, বড়বাজার কলিকাতা, (১৭) শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ঘোষ, গোবরহাটী, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ। (১৮) শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ভবানীপুর। (১৯) শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড, বর্দ্ধমান। (২০) শ্রীযুক্ত রাজা বনওয়ারী মুকুন্দ দেব বাহাদুর, বনওয়ারী আবাদ, মুরশিদাবাদ। (২১) শ্রীযুক্ত গোকুলানন্দ ঠাকুর দক্ষিণ খণ্ড, রাণীগঞ্জ। (২২) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস, হেড মাষ্টার, ভগবান ইনিষ্টিটিউশান, বাহুবল, শ্রীহট্ট। (২৩) শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, মাগুরা, যশোহর। (২৪) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরকার, মোক্তার, পাবনা। (২৫) শ্রীযুক্ত রায় রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কেচ্‌কা, কালিপাহাড়ী, পোঃ রাণীগঞ্জ। (২৬) শ্রীযুক্ত রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর, মথুরা (২৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাহা, চোরবাগান আর্টষ্টুডিও, ২৪নং ভুবন বাঁড়ুর্য্যের গলি, চোরবাগান। (২৮) শ্রীযুক্ত রাজা রঘুনাথ মল্লদেব বাহাদুর, ঝাড় গ্রাম, মেদিনীপুর। (২৯) শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী, মতিহারী। (৩০) ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমামহেশ্বর সামন্ত, ইউনিয়ান ফার্ম্মেসী, ৩নং বসাক লেন কলিকাতা। (৩১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, উকিল, খুলনা। (৩২) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল পাল, ভূতপূর্ব্ব সবজজ, ৩১নং শিবপুর রোড, হাবড়া।

(৩৩) শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ বসু, ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তার মেদিনীপুর। (৩৪) শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভূমি-সম্পাদক, ৯নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট। (৩৫) শ্রীযুক্ত জলধর সেন, বসুমতী-সম্পাদক, ১১৫।২নং গ্রে ষ্ট্রীট, (৩৬) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, বি, এল্, হাইকোর্টের উকিল, ৬৯নং সার্পেণ্টাইন লেন, শিয়ালদহ। (৩৭) শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর দক্ষিণেশ্বর। (৩৮) শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র বর্ম্মণ, আগরতলা।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, (৩৯) মহারাজ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর, (৪০) শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, (৪১) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, শিবনারায়ণপুর, (৪২) শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, জেনারল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশান।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল্, নূতন সভ্য, (৪৩) শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৪) শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ ঘোষ, বি এল, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৫) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাল, বি এল্, উকিল, মেদিনীপুর। (৪৬) শ্রীযুক্ত রাধানাথ পালিত, বি এল্, মেদিনীপুর। (৪৭) শ্রীযুক্ত লালমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকিল মেদিনীপুর। (৪৮) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন কর, বি এল্, হেডমাষ্টার, রীপণ স্কুল হাওড়া।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল্, নূতন সভ্য, (৪৯) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৩নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট। (৫০) শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত রায়, ৩নং বসাক বাগান লেন। (৫১) শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ নন্দী, ৭১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (৫২) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, খলসিনী, (৫৩) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ১১নং সিকদার বাগান লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি, এ; সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫৪) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের লেন।

তৎপরে সপ্তম-বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের সারাংশ পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিবর্গ ১৩০৮ সালের জন্য নিযুক্ত হইলেন,—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতিত্রয়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি; সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বি, এল্; সহকারীসম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ; ধনরক্ষক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি, এল্, পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, গ্রন্থরক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; আয়ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের শূন্য স্থান পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণদ্বারা পূর্ণ করা হইল। নিম্নে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণের নাম প্রদত্ত হইল।

(ক) নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।	(খ) মনোনীত সভ্যগণ।
১। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।	১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ; বি এল্।
২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্, এ।	২। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
৫। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৬। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
৭। " চারুচন্দ্র ঘোষ।
৮। " অক্ষয়কুমার বড়াল।

৩। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত
৪। " ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্‌ এ।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগী, সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষা বিশেষরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার শোকে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার শোকাকুল পরিবারবর্গকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

নগেন্দ্র বাবু আরও বলিলেন, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি সাহিত্য-সমালোচনী সভা হইতে বর্ষে বর্ষে ২০০০৲ হইতে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেন। এতদ্ব্যতীত সারস্বত-সমাজ হইতেও এই উদ্দেশে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত। পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি উৎসাহী ছিলেন; প্রাচীন-বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রকাশ জন্য ইহাকে ২০০৲ টাকা দানও করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, রাজাবাহাদুরের অভাব কেবল সাহিত্যে নহে, সুকুমার কলার বহু বিভাগেই অনুভূত হইবে। তিনি একান্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। তাহার গুরুভক্তি প্রবলা ছিল। আশা করা যায়, তাঁহার অভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সমালোচনী সভা বিলুপ্ত হইবে না। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থির হইল, এই প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিজন-বর্গকে পাঠান হউক।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, "পরিষদের অন্যতম সভ্য কবিবর যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকতপ্ত আত্মীয়বর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

এই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, "পদ্যপাঠ" আমাদের প্রায় সকলেই পাঠ করিয়াছেন। যদুগোপাল বাবুর কবিতা বড় মিষ্ট। বিশেষ সে সকল কবিতার সহিত আমাদের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত বলিয়া বুঝি আরও মিষ্ট। পদ্যপাঠের গ্রন্থকার সুন্দর কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্যমোদিমাত্রই দুঃখিত। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলেন, বার্ষিক বিবরণে অনেক আশার কথা আছে। আমাদের সভ্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে এখনও সভ্যপদ গ্রহণ করেন নাই। আশা করি, তাঁহারা সত্বরই চাঁদার টাকা দিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের কার্য্যও বিস্তৃত হইবে, সুতরাং উঁহারা যে সত্বর সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন, এ আশা দুরাশা নহে।

পরিষদের শাখা-সমিতি সকলের মধ্যে আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি হইতে বিশেষ কার্য্য হইয়াছে। পরিভাষা-সমিতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বাঙ্গালা ভাষা এখনও গতিশীল; ইহার গতিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু পরিভাষা একান্ত আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে। আশা করা যায়, সভ্যদিগের নিকট সাহায্য পাইলে পরিষৎ এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তব্য, ভাষায় হস্তক্ষেপ করা এখন অকর্ত্তব্য, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা হইতে শ্রী ও লালিত্য রক্ষার নিয়ম আবিষ্কার করা আবশ্যক।

অভিধানের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সুখের বিষয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই চেষ্টা করিতেছেন। সুখের বিষয় আলোচ্য, বর্ষে পরিষৎ পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক অধিবেশনে অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। শরৎবাবু এবং সতীশবাবুর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চরক ও সুশ্রুতের কাল নির্ণয় বিষয়ক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আশা করা যায়, প্রফুল্লবাবু তাঁহার বিরাট চেষ্টার ফল শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুঁথি-সংগ্রহের কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে যে সকল পুঁথি ও চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সভ্যগণের আনন্দ ও শিক্ষাদায়ক হইয়াছে।

পরিষদের অধিবেশনে আবৃত্তি করিবার প্রথা বর্ত্তমান বর্ষে প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। আবৃত্তিতে অর্থ পরিস্ফুট হয়। বিদ্যালয়ে ভালরূপ পড়া ও আবৃত্তি শেখান ভাল। এ বিষয়ে যদি কাহারও উৎসাহ থাকে, তবে একটা পারিতোষিক দিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে উৎসাহ-বর্দ্ধন করিলে ভাল হয়। আমাদের সংস্কৃত উচ্চারণ এতই বিকৃত যে আমরা সংস্কৃত ভাষার হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের সংস্কৃতকে "বাবু স্যাংস্কৃট্" বলিলে চলে। প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ যখন স্বতন্ত্র, তখন সেই স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উচ্চারণ-শুদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃত কলেজে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

পরিষৎ এখনও শিশুকাল অতিক্রম করেন নাই। একান্ত সুখের বিষয়, ইহারই মধ্যে পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নানা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। বিবিধ শাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ, ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন, দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি সকল প্রকার সাহিত্যের সমালোচনা, এ সকলই

পরিষদের বিরাট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। "ফ্রেঞ্চ একাডমী" দুই চারিজন সভ্য লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া এখন কত বড় হইয়াছে। এখন কত বিদ্বান ইহার সভ্য হইবার জন্য ব্যস্ত। প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতি বৎসর নূতন প্রচারিত বাঙ্গালা গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে ভাল হয়, তাহা হইলে প্রতি বৎসরে সাহিত্যের গতির একটা আলোচনা হয় ও পাঠকগণেরও ভাল গ্রন্থের সংবাদ জানিবার কতকটা উপায় হয়। পরিষৎ যে সকল গ্রন্থ প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, যদি তাঁহাদের ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন, তবে তাঁহাদেরও উৎসাহবর্দ্ধন করা হয়। গত বর্ষের সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ যোগ্য বলিয়া আমি মনে করি, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে।

ক্ষুদ্র গল্প।

নব কথা	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
সাজি	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
তমস্বিনী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ভ্রমণ।

হিমালয়	শ্রীজলধর সেন।
দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ইতিহাস।

সিরাজুদ্দৌলা	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র।
মীর-কাসিম	ঐ
মুরশিদাবাদ-কাহিনী	শ্রীনিখিলনাথ রায়।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বৈজ্ঞানিক।

কোন গ্রন্থ নাই, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধ সুপাঠ্য।

দর্শন।

বসু মল্লিক-ফেলোশিপের লেক্‌চার—ষড় দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

আমিত্বের প্রসার	শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্ এ; বিএল্।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ। শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, রায় বাহাদুর।
বিশালা (বৌদ্ধধর্ম্ম মহিমা)	শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

বিবিধ।

ভবভূতি	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ।
ভাষা তত্ত্ব	শ্রীশ্রীনাথ সেন।
বিশ্বকোষ	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
অভিশাপ	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত।

হাসির গান	শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
শত গান	শ্রীসরলা দেবী

কবিতা।

ক্ষণিকা, কথা, কাহিনী	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গীতিকা	শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী।
রেণু	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী।
মর্ম্ম গাথা	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।
অশোক গুচ্ছ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

অনুবাদ।

সংস্কৃত নাটকসমূহ	শ্রীজ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর পরিষদের গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, সমস্ত বৎসর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ আদিত্য পরিষদের গ্রন্থরক্ষক মহাশয়কে অনেকরূপে সাহায্য করায় পরিষদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে পরিষদের সভ্য, কর্ম্মকারক, পুস্তকদাতৃবর্গ ও অনুগ্রাহকবর্গকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া সভার কার্য্য শেষ করা যাইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।
২৬।২।০৮

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,
সভাপতি।
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়ে ১৩০৮ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, } সভাপতি।
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর }
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
" ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্, এস্।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
" কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
" কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" অক্ষয়কুমার বড়াল।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ।
" ডাঃ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
" রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।
" তড়িৎকান্তি বক্সী এম্, এ।
" ডাঃ সরসীলাল সরকার, এল্ এম্, এস্।
" সত্যকৃষ্ণ বসু।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
" কৃষ্ণলাল সাহা।
" সুরেন্দ্রকুমার রায়, বি, এ।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
" বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।
" ভুবনমোহন বসু।
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
" বীরেশ্বর গোস্বামী।
" চারুচন্দ্র ঘোষ।
" অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
" ভুবনমোহন বিশ্বাস।
" কবিরাজ সত্যচরণ সেনগুপ্ত।
" " অবিনাশচন্দ্র সেন।
" ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ; বি, এল্। (সম্পাদক)
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ। } (সহকারী
" ব্যোমকেশ মুস্তফী। } সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) বার্ষিক উৎসব ও সম্মিলনের নিমিত্ত স্থানদান করায় ভারত সঙ্গীত সমাজকে পরিষৎকর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রদান, (৪) প্রবন্ধপাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবাবী আমলের বিধি ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ এবং (খ শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "জগন্নাথ তীর্থে গুরু নানক ও জগন্নাথের আরতি" নামক প্রবন্ধ; তৎপরে তৎ-কর্ত্তৃক শিখধর্ম্মগ্রন্থ "জপজী হইতে কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা, (৫) বীণাপাণি-সাহিত্য-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্গীয় রামগোপাল সেনের ছবি গ্রহণ, (৬) মৃত সভ্য ৮ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ, (৭) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণাদি পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বি এল, নূতন সভ্য (১) শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সেণ্টজন কলেজের অধ্যাপক, আগরা। (২) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রয়াগসাহিত্যমন্দির, এলাহাবাদ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (৩) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাণাঘাট, (৪) শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত, ১২ নং হরিপালের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (৫) শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন মিত্র, এম্ এ বি এল, পিয়ারীচাঁদ মিত্রের গলি, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী (৬) ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সাহা, ৫৮ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, নূতন সভ্য, (৭) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ সেন, ১৮নং ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী, নূতন সভ্য, (৮) ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, এম্ বি, ১২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, নূতন সভ্য, (৯) শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস, এম্ এ, মুঙ্গের।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১০) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বসু রাধানাথ মল্লিকের লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনাথনাথ পালিত, এম্ এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য, (১১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, ১৯ নং শ্যামপুকুর লেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু সমর্থক—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, নূতন সভ্য (১২) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, ৬নং সনাতন শীলের লেন, বহুবাজার।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিক-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গৃহীত হইল,—"পরিষদের সপ্তম বার্ষিক উৎসবাদি নির্ব্বাহ জন্য ভারত-সঙ্গীত-সমাজ তাঁহাদিগের সুপ্রশস্ত গৃহ ও প্রাঙ্গণাদি ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষৎকে বাধিত করিয়াছেন; পরিষৎ সে জন্য সঙ্গীত-সমাজের সভ্যবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ-পাঠের মধ্যকালে সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিলেন।

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রবন্ধ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহা তাঁহার প্রায়-প্রকাশিত ইতিহাসের একটি অধ্যায়। শীঘ্রই ঐ ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধ হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, ঐ ইতিহাস কিরূপ উৎকৃষ্ট হইবে এবং উহার উপযুক্ত বিষয়-সংগ্রহে কালীপ্রসন্ন বাবু কিরূপ অনুসন্ধান, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। অদ্যকার প্রবন্ধ শুনিয়া বুঝা গেল, মুসলমান-রাজত্ব কেবলই যে অত্যাচার ও বিলাসিতার রাজত্ব ছিল তাহা নহে, সেকালেও প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের এবং রাজ্যের অনেক সুব্যবস্থা ছিল; তবে ইউরোপীয় প্রথা যতটা মার্জ্জিত নিয়মে গঠিত, তাহা ততটা নহে। আকবরের উদারতার রাজ্যে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য খুবই বেশী ছিল, কিন্তু আরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতার রাজত্বে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কোরাণের ধর্ম্ম মানাইবার জন্য অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা বল-প্রয়োগ করিতেন, ইংরাজ-রাজত্বে সে ভয় নাই। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় শিখ ও মহারাষ্ট্র অভ্যুদয় হইয়াছিল। খৃষ্টান রাজত্বের সূত্রপাতে যে বল-প্রকাশ হয় নাই এমন নহে; পর্ত্তুগীজেরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করিত, তাহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞাই ইংরাজ-রাজত্বকে এতটা দৃঢ় ও এতটা শান্তিময় করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, আজ আমরা এই প্রবন্ধে মুসলমান রাজত্বের রীতিনীতি, প্রভাব, উন্নতি, অবনতি, দেশের অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ শুনিলাম। এ সকল বিষয়ে আমাদের আজ অনেক জ্ঞানলাভ হইল। প্রবন্ধ শুনিয়া আজ আমরা সুখী হইয়াছি।

তৎপরে ঋতেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, শিখদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ এবং গুরু নানকের সম্বন্ধে আজ অনেক জানা গেল। গুরু নানক জগন্নাথে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। সময়ের কথা ধরিয়া বিচার করিলে যেন মনে হয় যে, প্রবন্ধকার যে সময়ে গুরু নানককে জগন্নাথ তীর্থে উপস্থিত করিতেছেন, ইতিহাস অনুসারে সে সময়ে চৈতন্যদেবও জগন্নাথে উপস্থিত ছিলেন, অথচ এরূপ একজন ঈশ্বর-প্রেমিক জগন্নাথে আছেন বা আসিলেন জানিয়া, উভয়ের দেখা শুনা হইল না, ইহা একটু আশ্চর্য্য-জনক বলিয়া বোধ হয়। প্রবন্ধকারকে এজন্য অনুরোধ যে, এ সম্বন্ধে তিনি আর একটু অনুসন্ধান করিয়া উভয়ের জগন্নাথে উপস্থিতির কালাকাল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য আমাদের জানাইবেন। তাঁহার প্রবন্ধ অতি সুন্দর। তাঁহার শিখ গ্রন্থের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যাকৌশলও প্রশংসনীয়।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পরিষদের সভ্য ৺ যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বালেশ্বরের কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "পরিষদের উৎসাহী সভ্য যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের অকাল-মৃত্যু হওয়ায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন এবং তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছেন।" এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইল। নগেন্দ্র

বাবু জানাইলেন, কুমার সত্যেন্দ্রনাথ দেবের একখানি বড় ছবি তাঁহার আত্মীয়বর্গ পরিষদে উপহার দিবেন।

তৎপরে বিবিধ বিষয়ের মধ্যে ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ছবির জন্য টাকাকড়ি আদায়ের কথা উঠিলে হেমেন্দ্র বাবুর প্রতি ভার দেওয়া হইল।

চারুবাবু গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলে স্থির হইল যে, চাঁদা আদায়ের পূর্ব্বে সাধারণকে বিশদরূপে জানাইবার জন্য পরিষদের একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ইহার অনুমোদন করিলে স্থির হইল, আগামী রবিবার এই বিশেষ অধিবেশন করা হউক। এসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ভূমিদানের দলীল রেজিষ্টারী হইয়া গেলে সেই দলীল উপস্থিত করিয়া এই অধিবেশন করা উচিত, তজ্জন্য উহা এক্ষণে স্থগিত থাকে। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সহঃ সম্পাদক।	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সভাপতি। ৩০ আষাঢ়, ১৩০৮।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ৩০ আষাঢ় (১৩০৮) ১৪ জুন (১৯০১) রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি)
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ ; বি এল্।
" নগেন্দ্রনাথ বসু।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।
" ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" ললিতমোহন ঘোষাল।
" অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
" লাডলীমোহন ঘোষ।
" কুমার শরৎকুমার রায়, এম্ এ।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" অম্বিকাচরণ দাস।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।
" বসন্তকুমার বসু।
শ্রীযুক্ত ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ শেঠ, এল্, এম্, এস্।
" মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্।
" যতীন্দ্রনাথ মিত্র।
" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর।
" রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
" বাণীনাথ নন্দী।
" কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, এম্, এ ; বি, এল।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
" ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম্ এ।
" সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ,—(ক) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ পাল তত্ত্বনিধি মহাশয়ের "অদ্বৈত-বাদ" নামক প্রবন্ধ ও (খ) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের "ইশা খাঁ মস্‌নদ-ই-আলী" নামক প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন ঃ—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুর।
		" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, দর্প-নারায়ণ ঠাকুরের লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
"	"	রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, আগরতলা রাজবাটী।
"	"	শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু, আদমপুর, ভাগলপুর।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণরায়	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর।
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	"	রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ দেব, লক্ষ্মীপুর রাজবাটী, বাঁকা পোঃ, ভাগলপুর।
"	"	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বেদান্তরত্ন, লক্ষ্মীপুর, ভাগলপুর।
"	"	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ধর, হেডমাষ্টার, শিয়ারশোল স্কুল, রাণীগঞ্জ।
"	"	শ্রীযুক্ত ভবনাথ আশ, ২১ নং রামতনু বসুর লেন।
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বসু, বি,এল্‌, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।
		শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু, সবরেজিষ্ট্রার, পোঃ পিঙ্গলা, মেদিনীপুর।

,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি,এল,	শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ; বি এল্।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীযুক্ত রমণীমোহন সিংহ, চম্পাইনগর, ভাগলপুর।
,,	,,	মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পাইনগর ভাগলপুর।
,,	,,	,, গোপীমোহন সিংহ, জেমো, রঘুনাথপুর।
,,	,,	কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, দিনাজপুর।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ,	শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ,	ডাঃ কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

অতঃপর প্রথম প্রবন্ধ-পাঠক উপস্থিত হইতে না পারিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ উপযুক্ত না হওয়াতে প্রবন্ধ-বিষয়ে কেহই কোন আলোচনা করিলেন না। সভাপতি মহাশয়ও লেখক উপস্থিত নাই বলিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবন্ধের প্রশংসা করিয়া যবদ্বীপে হিন্দুদিগের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ে নগেন্দ্র বাবুর নিকট একটু বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আনন্দ বাবুর প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, আনন্দবাবু প্রসঙ্গতঃ যবদ্বীপের উল্লেখ করিয়া দীনেশবাবুর যে কৌতুহল বাড়াইয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, আজিকার প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। যাহা হউক, যখন জিজ্ঞাসিত হইয়াছি, তখন আমি যতদূর জানি, বলিতেছি। রামায়ণের কাল হইতে যবদ্বীপের সহিত হিন্দুর সংস্রব দেখা যায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের বর্ণনা পাঠে বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপ সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া বুঝা যায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উহার নাম মলয়দ্বীপ। মলয়দ্বীপে ত্রিকূট পর্ব্বত, তদুপরি লঙ্কা বা রাবণ-রাজধানী। সুমাত্রার উত্তরাংশ এখনও সুবর্ণদ্বীপ বলিয়া অভিহিত হয়। সুমাত্রার পার্শ্বে রূপাত দ্বীপ আছে, উহাই পৌরাণিক রৌপ্যক দ্বীপ। লবকুশ লঙ্কা দর্শনে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামানুসারে রামদ্বীপ, লক্ষ্মণদ্বীপ, লবদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপের নাম এখনও ঐ অঞ্চলের দ্বীপাবলী মধ্যে পাওয়া যায়। বুগী জাতীয় লোকেরা সুমাত্রার পার্শ্ববর্ত্তী সাগরকে লঙ্কাই সাগর বলে। ক্লোরিশদ্বীপের অধিবাসী জাতির নাম রক্ষ বা রক্ষ। যবদ্বীপে হিন্দুশাস্ত্রের পুরাণাদি এবং রামায়ণ পাওয়া যায়। বালিদ্বীপের অধিবাসীরা হিন্দু, তথাকার কবিভাষায় লিখিত রামায়ণ কতকটা ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালীর অপেক্ষা এই সকল দ্বীপের সহিত তৈলঙ্গীদিগের সংস্রব বেশী ছিল। পুঁথিতে তেলগু

ভাষার সহিত অক্ষর সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গালীর সহিত বরং সিংহলের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্. এ, বলিলেন, আনন্দবাবুর প্রবন্ধ অতি সুন্দর। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস আমরা বিশেষ জানি না। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা যায়। এরূপ অবস্থায় আনন্দবাবু বঙ্গের এক প্রদেশের ইতিহাসের বিশেষতঃ বারভুঞার একজনের বিশেষ বিবরণ জানাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিলেন। তবে তিনি যে ভাবে সোনা বিবির বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাল লাগিল না। প্রসঙ্গতঃ লঙ্কা, যবদ্বীপ এবং সুবর্ণদ্বীপ সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছে, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে এই সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। থ্যাটো বলেন সুবর্ণদ্বীপ ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী। মহারক্ষিত সুবর্ণদ্বীপে গিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থেও এসম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বাঙ্গালীর সঙ্গে যবদ্বীপের যে ঘনিষ্ঠতা এক সময়ে ছিল, তাহার নিদর্শন বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান। যবদ্বীপের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

সভাপতি মহাশয় কহিলেন, প্রবন্ধ লেখক ধন্যবাদের পাত্র। আমরা নিজের দেশের ইতিহাস জানি না। বিশেষতঃ আমি বিশেষ লজ্জিত, আমি ইশাখাঁর নামও জানিতাম না। আনন্দবাবুর প্রবন্ধে আমি বিশেষরূপ উপকৃত। স্বদেশের স্বজাতির ইতিহাস যে সময়েরই হউক, জানা বড় আবশ্যক। আনন্দবাবু সে পক্ষে আমাদিগকে কিছু কিছু জানাইয়া উপকৃত করিয়াছেন। এজন্য তিনি আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমি ইতিহাস আলোচনা করি নাই, সুতরাং একটা অনুরোধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের অবতারণাকালে তাহার বৃত্তান্তগুলি কি উপায়ে সংগৃহীত, তাহার প্রমাণগুলির উল্লেখ করা উচিত। মুসলমান ঐতিহাসিক অনেক আছেন, যাঁহাদের সম্বন্ধে আজিও কোন আলোচনা হয় নাই; এই উপায়ে তাঁহাদেরনামাদি জানিতে পারিলে ক্রমে আলোচনার পথ প্রশস্ত হইবে। জন প্রবাদ, স্থানীয় প্রবাদ, স্থানীয় অট্টালিকাদির খোদিত লিপি প্রভৃতি অবলম্বনে ইতিহাসাদি লিখিত হয়। সে সকলের উল্লেখ প্রবন্ধে থাকা উচিত। অদ্যকার আনন্দবাবুর প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময় উহাতে ঐ সকল প্রমাণের উল্লেখ করিলে ভাল হয়। এই প্রবন্ধ অবলম্বনে যবদ্বীপের যে সকল কথা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটি সুলিখিত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আমরা শুনিতে পাইলে চরিতার্থ হইব। বিশেষতঃ যবদ্বীপের ভাষা যখন বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, তখন উহা আমাদের আলোচ্য হওয়া উচিত। বাঙ্গালী কখন সিংহলে যাইত, যবদ্বীপে যাইত, বুদ্ধের আগে কি পরে, তৎসম্পর্কে কি কি কথা বঙ্গভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকল দ্বীপের গ্রন্থাদির তুলনা, ভাষার তুলনা, করিয়া সমস্ত খুলিয়া লিখিলে প্রবন্ধ অতি সুন্দর হইবে। সতীশ বাবু নগেন্দ্র বাবু, এ বিষয়ে আমাদের কিছু শুনাইলে সুখী হইব। তাঁহারাও এ বিষয়ে পরে লিখিবেন, বলিলেন।

অতঃপর গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী সহঃ সম্পাদক।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ১১ শ্রাবণ। ১৩০৮।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

গত ১১ই শ্রাবণ ২৭ জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০৮ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় নিম্নলিখিত সভ্য গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। } (সহঃ সভাপতি)
,, রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর।
,, যোগেন্দ্রনাথ বসু বি এ।
,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ।
,, পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম এ।
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম এ, বিএল।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিএল।
,, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, অক্ষয়কুমার বড়াল।
,, অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
,, কানাইলাল ঘোষাল।
,, সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী।
,, রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
,, শরচ্চন্দ্র সরকার।
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
,, কিরণচন্দ্র বসু।
,, রমেশচন্দ্র বসু।
,, সুরেশচন্দ্র বসু।
,, ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, সত্যকৃষ্ণ বসু।
,, কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
,, আনন্দনাথ রায়।
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। (ক)
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী-সম্পাদক।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল—(১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য-নির্ব্বাচন (৩) প্রবন্ধ-পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,—এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থনের পর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

প্রস্তাবক।	সমর্থক।	সভ্য।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	১। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ; ভদ্রকালী পোঃ, উত্তরপাড়া।
"	"	২। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ ; শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরখেলের বাটী, মাণিকতলা রোড।
"	"	৩। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ; ৩৩নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট
"	"	২ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ৪নং হেমচন্দ্র করের লেন।
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	"	১। পণ্ডিত শ্রীযুক্তরাধাসুন্দর আচার্য্য মহাদেবপুর মধ্যইংরাজী স্কুল, পোঃ মহাদেবপুর, রাজসাহী।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উঠিয়া বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে কোন গবেষণা নাই। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ এখন যাহা আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ। সেই সকল ব্যাকরণ যে প্রণালীতে রচিত হয়, তাহারই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহাই বলিব। আজকার প্রবন্ধে আসল কথার বিশেষ কিছুই নাই, ইহা ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে এ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য। এ আলোচনার জন্য একা আমি দাঁড়াই নাই, আমার বন্ধু-বান্ধবেরাও এবিষয়ে প্রস্তুত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল কথা বলিলেন, তাহার অনেকাংশ ঠিক। আমারও একখানি বাঙ্গালা-ব্যাকরণ আছে ; কিন্তু সুখের বিষয় যে, তিনি যতগুলি দোষের কথা বলিয়াছেন, অধিকাংশের উদাহরণ আমার ব্যাকরণখানিতে নাই। শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত, তাঁহাদের ন্যায় লোকের অভিপ্রায় অনেক সময়ে উপদেশ বা হুকুমের কাজ করে ; কারণ, তাঁহাদের অভিপ্রায়-অনুসারে গ্রন্থকারগণকে পুস্তক লিখিতে হয়। আজকাল বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কারের একটা ঢেউ উঠিয়াছে। "এখনও বাঙ্গালা-ব্যাকরণ সংস্কৃত-ব্যাকরণের পন্থানুসরণে লিখিত হয় ; কিন্তু সংস্কার-প্রার্থীরা কতকগুলি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির দোহাই দিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণকে প্রাকৃতব্যাকরণের আদর্শে গড়িতে চাহেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা অদ্য=অজ্জ=আজ, কার্য্য=কর্জ্জ=কাজ" ইত্যাদি সংস্কৃতের প্রাকৃত ও বাঙ্গালা অপভ্রংশ শব্দমালার উল্লেখ করেন। আমার বোধ হয় সংস্কৃত ভাষা সেকালে লেখা-পড়ার ভাষা ছিল। তদ্ভিন্ন

প্রাকৃত ভেদে নাটকাদিতে যে বিভিন্ন অপভাষার প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাদের মাগধী, লাটী, মাথুরী, প্রভৃতি নাম হইতেই বুঝা যায় যে, সেগুলি তন্নামক দেশ-প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। নাটকাদিতে অলঙ্কার শাস্ত্রের শাসন অনুসারে পাত্র-বিশেষের মুখে ঐ সকল ভাষার প্রয়োগ হইত। এখনকার কথোপকথনের ভাষাকে আমরা লেখা পড়ার ভাষায় তুলিয়া লইতে গিয়া একটু গোলে পড়িয়াছি। চাটগাঁয়ের কথা, বিক্রমপুরের কথা, আসামের কথা সমস্তই বাঙ্গলা ; কিন্তু কাহার সাধ্য, ঐ সকল দেশের লোক পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে। আমার বোধ হয় সেইরূপ, তখনকার নানা দেশের কথোপকথনের ভাষাগুলি যেমন সংস্কৃতের অপভ্রংশ, এখনকার তেলগু, তামিল ভিন্ন হিন্দী, উড়িয়া, আসামী, বাঙ্গালা, মারহাট্টী সমস্তই সংস্কৃতের অপভ্রংশ। তবে কালক্রমে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বযুগের অপভ্রংশ ভাষায় অর্থাৎ সেকালের কথোপকথনের ভাষায় শব্দসংখ্যার সাদৃশ্য বেশী থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি ? মূলে তজ্জন্য তাহা সংস্কৃতানুসারিণী না হইবে কেন? লিখিত ও কথিত ভাষা কোন কালেই এক নহে ; যে প্রাকৃত ভাষা আমরা নাটকাদিতে দেখি, তাহাই যে তখনকার কথোপকথনের ভাষার ঠিক প্রতিরূপ, তাহা বলা যায় না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার দৃষ্টান্ত দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে,—হুতমী ভাষা, আলালী ভাষার সমান নহে, অথচ উভয়ই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। আবার বিদ্যাসাগরের ভাষা, বঙ্কিমের ভাষা এক নহে। এখনকার অনেক নবীন লেখকের চেষ্টা হইয়াছে যে, এতদঞ্চলের কথোপকথনের ভাষার শব্দের অপভ্রংশরূপের যেরূপ উচ্চারণ হয়, লিখিত ভাষায় তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। ইঁহারা "বিদিকিচ্ছি" লিখিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, "যাইব" লিখিতে ভালবাসেন ; কিন্তু "অদ্য" লিখিলে, "গমন করিব" লিখিলে বিরক্ত হন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষ দেন ; কারণ তিনিই লেখা পড়ার ভাষাকে সংস্কৃত-শব্দ-বহুল করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন। তাহা নয় ; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন গীতকার কবিদিগের গানের ভাষা, দেওয়ান মহাশয়ের গান, নিধুবাবুর গান, রামপ্রসাদের গান প্রভৃতির ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে বিদ্যাসাগরের অবলম্বিত ভাষার রূপ বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেকের আপত্তি বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্য হইলে উহা সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে ; অভিধান, ব্যাকরণ পাশে না রাখিয়া মাতৃভাষার সাহিত্য পাঠ করা চলিবে না ;—আমার মত তাহা নহে, পূর্ব্বে বরং শিক্ষা সঙ্কুচিত ছিল, নকল করিয়া কৃত্তিবাস কাশীদাস, সত্যনারায়ণ না পড়িলে সাহিত্য পড়িতে পাওয়া যাইত না ; সাহিত্য রসাস্বাদন করিতে হইলে গায়নের গান শুনিতে হইত। এখন তাহা নাই ; এখন mass education চলিয়াছে, সকলেই বালককাল হইতে বিদ্যাসাগরের ভাষায় অভ্যস্ত হইতেছে, mass education বৃদ্ধি হইলে, প্রসার হইলে ঐ আশঙ্কা দূর হইয়া যাইবে না কি ? এখন যে আকারের ভাষা লেখা পড়ার ভাষা বলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবলম্বিত ভাষার বহু পূর্ব্ব হইতেই দেশে চলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত শব্দ বাহুল্য থাকায়, তাহা চাটগাঁ হইতে আসাম এবং মেদিনীপুর হইতে জলপাইগুড়ি

সর্ব্বত্র বোধ সুলভ আছে, কিন্তু এই ভাষাকে ভাঙ্গিয়া যদি এই প্রদেশের slang অপভাষার এবং colloquial গ্রাম্য ভাষার শব্দ দিয়া নূতন করিয়া গড়িতে যাই, তবে ফল কি হইবে? এত দিনের চেষ্টায় যাহা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আবার পিছাইয়া পড়িবে। সত্য কথা বলিতে কি, এখনকার এই নূতন ভাষায় লিখিত শতকরা ৭৫ খানা পুস্তক আমিই বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠন সম্বন্ধে এই বলিতে চাই যে অনেকে "পিতা" পদকে শব্দের মূল রূপ বলিতে চাহেন। কারণ বাঙ্গালায় "পিতা" এই শব্দে বিভক্তি যোগ হয়, পিতাকে, পিতার, পিতা দ্বারা কাজেই তাঁহারা "পিতৃ" শব্দের অস্তিত্ব বাঙ্গালা ব্যাকরণে লোপ করিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য পৈতৃক, পিতৃব্য, পিতৃকৃত্য প্রভৃতি স্থলে "পিতা" পাইবেন কোথা? পিতাকে, পিতার, পিতাদ্বারা প্রভৃতি পদের জন্য যদি অভিনব ব্যাকরণ প্রয়োজন হয়, তবে পৈতৃক প্রভৃতির জন্য পূর্ব্ব ব্যাকরণ মানিব না কেন? কারকের বিভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই "দিয়া" "দ্বারা" "হইতে" প্রভৃতি যে অর্থে বিভক্তি সে অর্থে সে সকল শব্দের অন্য প্রয়োগ দেখি নাই, হইতে পারে বলিয়াও বোধ হয় না। হাত দিয়া খাই, আর "টাকা দিয়া ধান লই" এই দুটি "দিয়া" র অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। সম্প্রদান কারক বাঙ্গালায় নাই কেন?—দুটা "কে" বিভক্তি রাখিতে হয় বলিয়া কি সম্প্রদান কারক উঠাইয়া দিব?—সংস্কৃত দুটা "ভ্যস্" দুটা "ভ্যাম্" আছে, কৈ, কাহারও গোল লাগে কি? সে স্থলেও অর্থ বুঝিয়া কারক নাম বলিতে হয়, তবে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র নিয়ম কেন হইবে? বৃহদাকার বিভক্তি সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গালায় থাকিতে দোষ কি? আর যদিই হয়, তবে উহাই বাঙ্গালা কারকের বিশেষত্ব হউক না কেন? "হইতে" "থেকে" "কর্ত্তৃক" বাদ দিলে বাঙ্গালায় অপাদান ও করণ কারকের এক প্রকার অভাব হইয়া পড়ে, আর উহাদের বিভক্তিত্ব স্বীকার না করিলে ঐ সকল স্থলে উহাদের সার্থকতাই বা কি হইবে, তাহা বুঝি না। ক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তব্য এই, মারিয়া যাইব, খাইয়া ফেলিব, ইহাদিগকে মিশ্র ক্রিয়া না বলিয়া পূর্ব্বাংশকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিলে অর্থ হইবে কেন? মরিয়া যাইব—অর্থাৎ আগে মরিব পরে যাইব? এরূপে ক্রিয়া বিভাগ করিতে হইলে বাঙ্গালার ভূ অর্থাৎ হওয়া ও কৃ অর্থাৎ করা ভিন্ন ধাতু থাকে না। তবে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া ভাল। বাঙ্গালায় মৌলিক ধাতুর ব্যবহার বাড়ান আবশ্যক। অবশেষে বক্তব্য এই আজ কাল অনেক ভাবুক লেখক দেখা দিয়াছেন। এই সকল ভাবুক লেখকের ভাবের লেখায় অনেক সময় কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ঠিক থাকে না, বা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কাজেই আমাদের ভাবগ্রহ হয় না। তাঁহাদের ভাব তাঁহাদের মনেই রহিল, লেখায় ফুটিল না, আর আমি বুঝিয়া লইব,—একি electricity নাকি? এ ভাবের ভাষা বাড়িলে আর কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগরের ভাষা পড়িয়া কেহ কিছু বুঝিবে না। অতএব আমার অনুরোধ এই, ভাষার গতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, লোকে যে সংস্কারসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে না গিয়া, যাহা আছে তাহা মাজিয়া

ঘসিয়া লওয়া হউক। বিশেষ বিবেচনা করিয়া একটী কাজ করা ভাল। ইংরাজী ব্যাকরণের যে ধরণের সংস্কার হইতেছে, ঠিক সেই ধরণেই যে আমাদেরও ভাষা সংস্কার করিবার জন্য নাচিতে হইবে, তাহা ঠিক নহে। বিদেশী অনুকরণে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছি, আবার বিদেশী অনুকরণে অর্দ্ধপ্রস্তুত ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করি কেন?

তৎপরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমিও যতদুর আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এখানকার বাঙ্গালা ব্যাকরণ গুলিকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা কোনরূপেই যুক্তি সঙ্গত হয় না। তাহার কারণ আজ আমরা যে ভাষায় এই বিচারবিতর্ক করিতেছি তাহা আমার ভাষাই হউক, আর পাঁড়ে মহাশয়ের ভাষাই হউক, ইহার গঠনের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ আবশ্যক হয় না বা তাহার নিয়মাদি ইহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অল্পতা যাঁহারা সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা সংস্কৃতই শিখুন। তাঁহাদের বাঙ্গালা শিক্ষারূপ গলগ্রহ কেন? এখনও বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য ভাষার শব্দ প্রবেশ করিতেছে, ভাষার পুষ্টি হইতেছে; এ অবস্থায় কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মগুলি লইয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লিখিতে গেলে চলিবে কেন? যখন বিভিন্ন ভাষার শব্দ লইয়া এ ভাষা পুষ্ট হইতেছে, তখন ব্যাকরণও বিভিন্ন প্রণালীর হইলেই বা ক্ষতি কি? তবে আমার মতে ব্যাকরণের সময় এখনও হয় নাই। বাঙ্গালার লিখিত ভাষার আদর্শ যদি তারাশঙ্করের কাদম্বরীর ভাষা বা বিদ্যাসাগরের ভাষা হয়, তবে সে ভাষা অনুস্বারবিসর্গশূন্য সংস্কৃত ভাষাই হইবে, বাঙ্গালা ভাষাই হইবে না। সে ভাষা যদি কালে লোপ হয় হউক। আর একটী কথা কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে না হইলে ভবিষ্যতে সংস্কৃত শিখিবারবিশেষ ব্যাঘাত হইবে। ইহার উত্তরে আমি এই বলি বালকমাত্রেই যে ভবিষ্যতে সংস্কৃত পাঠ করে, এরূপ কোথাও দেখিয়াছেন? বাস্তবিক যাহাদিগের সংস্কৃত ভাষায় আস্থা নাই তাহাদিগের এ গলগ্রহ কেন? তবে যাঁহারা সংস্কৃত ভালরূপ শিখিতে চাহেন, তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিবেন। আধ বাঙ্গালা আধ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া লাভ কি?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে মতামত খুব ঠিক। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁড়ে মহাশয় প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ যত বেশী হউক, তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষার শব্দ কিছু আছে কি না? যদি থাকে তাহাদের জন্য ব্যাকরণের রূপ কিরূপ হওয়া উচিত? সংস্কৃতাদি প্রাচীন ভাষার গতি কিছু সংক্ষিপ্ততার দিকে। এখনকার ভাষার গতি বিস্তারের দিকে। পূর্ব্বে সন্ধি সমাসাদির দ্বারা শব্দযোগ করিয়া শব্দের অর্থান্তর ঘটাইয়া ভিন্নার্থ প্রকাশের চেষ্টা হইত, এখন প্রত্যেক অর্থের জন্য বিভিন্ন শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার বোধ হয়, ভাষায় যে সমস্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দ আছে, সে সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের নিয়মাদির প্রয়োজনমত সারসঙ্কলন হওয়া উচিত।

এইরূপে নবকল্পিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে সংস্কৃত, উর্দ্দু, পার্সী ইত্যাদি অধ্যায় ভেদ থাকিলে চলিতে পারে।

প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ভাষা সামান্য লোকে বুঝিত, অপভাষা বলিয়াই কেবল যে তাহা নাটকে সামান্য জনের মুখে দেওয়া হইত এমন নহে। কুমারে আছে, শিবপরিণয়ে শিব সংস্কৃতে মন্ত্র পাঠ করিলেন, আর পার্ব্বতীকে প্রাকৃত মন্ত্র পড়ান বা বুঝান হইল। সুতরাং যাহা সাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা প্রাকৃত হওয়াই উচিত। সেই জন্যই বুদ্ধদেব তৎকালপ্রচলিত পালি ভাষায় ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা করেন। এখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষাকে সাধারণবোধ্য করিতে হইলে ইহার সংস্কৃতত্ব হ্রাস করা আবশ্যক হইবে। শব্দত্যাগ করিতে বলিতেছি না। শব্দের ব্যবহার, পদ ও বাক্য গঠনাদির ব্যবস্থা প্রাকৃতভাবে হওয়াই উচিত। অজ্জ ও কজ্জ সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে "জ" এর সাদৃশ্য দেখাইয়া আজ ও কাজ শব্দ উৎপাদনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। প্রাকৃত ভাষার "য" এর প্রয়োগ যত বেশী, তত "জ" এর নহে; সুতরাং কার্য্য হইতে কজ্জ করিবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় "য" ত্যাগ করিবার কারণ "য" এর অভাব নহে এবং সেই অভাবকে মূল ধরিয়া বাঙ্গালায় "কাজ" লিখিতেও যে "য" বাদ দেওয়া হয় তাহা নহে। মিশ্রধাতু সম্বন্ধে পাঁড়ে মহাশয় যে অর্থ করিলেন, ওরূপ অর্থ কেহ করে না।" "মরিয়া গেল"—এখানে "গেল" গমনার্থক নহে, ইহা ক্রিয়ার সমাপ্তিসূচক অংশমাত্র। ঐ অংশের অর্থ ওরূপ নহে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা সুন্দর সুযুক্তিপূর্ণ এবং মনোজ্ঞ। তাঁহার মতামতের বিরুদ্ধে বলিবার আমার কিছু নাই। তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া যাঁহারা সমালোচনা করিলেন, তাঁহাদিগের কয়েকটি কথা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কোন কোন বক্তার কথায় বোধ হইল, তাঁহারা ভাষাকে ব্যাকরণের নিয়মনিগড়ে শৃঙ্খলিত করিতে একান্ত ইচ্ছুক। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। ভাষার স্রোতকে ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করা আমার বোধ হয় ঐরাবতের গঙ্গাস্রোতরোধ চেষ্টার মত উপহাসাস্পদ। আমার বিশ্বাস উহা মানুষের ক্ষমতায় হয় না। ব্যাকরণের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য নহে—ভাষার বিদ্যমান অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। দুটি প্রাচীন ভাষার উদাহরণ দিতেছি। প্রথমতঃ দেখুন সংস্কৃত ভাষা, যে ভাষার ভিত্তির উপর বাঙ্গালা ব্যাকরণ গঠিত করার প্রস্তাব হইয়াছে, সেই ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাকরণও কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৈদিকযুগে সংস্কৃত ভাষার যে আকার ছিল, কালে বৈদিক ভাষার সে আকার পরিবর্ত্তিত হইল। যখন বৈদিক ভাষা সংস্কৃত আকার ধারণ করিল, তখন ভাষার প্রকৃতি ও অবস্থা এবং বৈদিক ভাষার সহিত

প্রভেদ দেখাইবার জন্য পাণিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যাকরণ রচিত করিলেন—তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বত্র দেখান হইয়াছে, "ছন্দসি ভাষায়াং" এইরূপ। তাহাতেও সংস্কৃত ভাষা নিগড়িত হইল না, তাহার স্বাধীনগতি থামিল না। ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা যথাযথ বুঝাইতে পাণিনিসূত্রে কুলাইতে পারিলেন না। কাত্যায়ন তখন বার্ত্তিক রচনা করিয়া পাণিনির সূত্রকে সময়োচিত করিতে অগ্রসর হইলেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিককে যদি সমসাময়িক স্বীকার করা যায় তাহা হইলে মানিতে হয়, যে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির সূত্রের ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন জন্য তিনি বার্ত্তিক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব নহে। নতুবা বলিতে হয়, পাণিনির পরে ভাষায় যে পরিবর্ত্তিত অবস্থা হইয়াছিল। তাহা দেখাইবার জন্য বার্ত্তিককার পাণিনির সূত্রে নূতন সূত্র যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক ভাষার ব্যাকরণ পূর্ব্বে ছিল না। রোমকেরা যখন গ্রীস্ জয় করে, তখন রোমকেরা গ্রীস্ সাহিত্যের মনোহারিতার মুগ্ধ হয়। উহাতে তাহাদের প্রবেশলাভের জন্য গ্রীক্ বৈয়াকরণেরা গ্রীক ব্যাকরণ প্রস্তুত করে। ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত বা নিগড়িত করিবার জন্য গ্রীক ব্যাকরণ রচিত হয় নাই।

সেইরূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত, যে তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে, তাহারই প্রয়োগ প্রকৃতি গঠন প্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র, কেহ কিছু গড়িবেন না।

আজ অনেকেই সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারকের বিভক্তি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমার বোধ হয় তাঁহারা একটী কথা অনুধাবন করেন নাই। ভাষা বিজ্ঞানে যাহাকে Postposition পর নিপাত বলে, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ কতকগুলি আছে। 'হইতে, দ্বারা, থেকে' প্রভৃতির কারকের বিভক্তিবৎ ব্যবহার হয়। সংস্কৃতের সেইরূপ হয় না। অন্য ভাষার উদাহরণ দিলে কথাটা ভাল বুঝা যাইবে। ইংরাজিতে যেমন কারকার্থ প্রকাশক of, to, in, প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্বনিপাত হয়—যথা সেইরূপ বাঙ্গালায় 'হইতে' 'থেকে', 'দ্বারা', প্রভৃতির পর নিপাত হয়,—যেমন ছাদ হইতে জল পড়িতেছে।

সংস্কৃত বঙ্গ ভাষার আদি জননী বলিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের একটা বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা, লাটিন ভাষা হইতে উৎপন্ন হইলেও কাহারও ব্যাকরণ লাটিন ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত নহে। সমস্ত মানবজাতি মনুর অপত্য বলিয়া যদি ইউরোপীয় ও ভারতীয় জাতিকে কেহ এক বলিতে চাহেন, তাহা যেমন ভুল হয়, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া সংস্কৃতের সহিত এক বলাও সেইরূপ ভুল। সত্য বটে এই সকল ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর, কিন্তু উভয়ের মধ্যে এত অন্তর যে তাহাকে হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসন হিসাবে এক বলা যায় মাত্র। যাঁহারা শিক্ষার দোহাই দিয়া বা বিভিন্নদেশবাসী লোকের মধ্যে ভাষার একত্ব সাধন দ্বারা একতা

স্থাপনের কথা বলেন, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে এ প্রণালীতে ভাষার একতা হয় না; জাতীয় সাহিত্য গঠিত হইলে তবেই একতা হয়। জেলায় জেলায় বাঙ্গালা ভাষার বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য গঠিত না হইলে একতা হইতে পারে না। ভাষার একত্বসম্পাদন ব্যাকরণে হয় না। কোন দেশে প্রতিভাশালী লেখক জন্মিলেই লোকে তাহার রচনা অনুকরণ করিতে চেষ্টা পায়, এইরূপে সাহিত্যের ভাষার গতি একত্বের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কোনরূপ একতা থাকে না : প্রতিভাশালী লেখক যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানের কথিত ভাষাই লিখিত ভাষার আদর্শ হয়। এইরূপ ইংলণ্ডে চসারের ভাষা, ইটালীতে দান্তের ভাষা, জাতীয় ভাষা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার গদ্য সাহিতের পরিণতি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথমে রাজা রাম মোহন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরে বঙ্কিম বাবু ভাষার রশ্মি ধরিয়া তাহাকে যে দিকে লইয়া গিয়াছেন, ভাষা সেই দিকে গিয়াছে। এখনও বঙ্কিমের ভাষাই চলিতেছে, তাঁহার ভাষারই অনুকরণ সর্ব্বত্র হইতেছে। পাঁড়ে মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পরে বিদ্যাসাগরের ভাষার অবোধ্যতার বা লোপের যে আশঙ্কা করিলেন, আমি দেখিতেছি তাহার কোন প্রতিকার নাই। তাহা হইবেই হইবে। ইংলণ্ডেও তাহা হইয়াছে। চসারের বা সেক্সপিয়রের ভাষার অভিধান ব্যাকরণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে; তাহা বুঝিতে ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়।

ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা পাইলে বিদেশী ভাষা বুঝা দুরে থাক, বিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষার একত্ব সাধন দুরে থাক, শিক্ষারই বিস্তার হইবে না। পাঁড়ে মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, সে কালে শিক্ষার বিস্তার ছিল না। শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দ্বারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেব কথিত ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়াই পালি ভাষায় উপদেশ গ্রন্থাদি নিবদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আলোচনা কালে অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের পক্ষপাত দেখাইয়া যে সকল সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন, তাহার কোনটিই সংস্কৃতের প্রলেপময় ভাষা দ্বারা হইবার নহে. এসম্বন্ধে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। বাক্‌ল্ বলেন, জর্ম্মনিতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা অনেক প্রতিভাবান্ জ্ঞানী সুলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও জর্ম্মণীতে ইংলণ্ডের ন্যায় শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তাহার কারণ এই যে জর্ম্মণের সাহিত্যের ভাষা জন সাধারণের ভাষার অনেক দুরে। আর ইংলণ্ডের সাহিত্যের ভাষা, যে ভাষা শিক্ষাবিস্তারের মিডিয়ম, তাহা সাধারণের ভাষার অতি নিকটবর্ত্তী।

ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তবে সে পরিবর্ত্তন যত সাধারণের বোধ্য হয়, ভাষার নিকটস্থ হয়, ততই ভাল। তাহাই বাঞ্ছনীয়।

তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই। নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর

দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় আজ অনেক বিষয় শিক্ষা হইল, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ব্যাকরণ প্রবন্ধ কিরূপ হইবে, এ সন্দেহ আমার ছিল, কৌতূহলী হইয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু এমন মনোজ্ঞ প্রবন্ধ শুনিব, তাহা কল্পনা করিতেও পারি নাই। ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে, গড়িতে পারি, ভাঙ্গিতে পারি, এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে, সেগুলি লক্ষ্য করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্ত্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হবে কেন? সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য বাঙ্গালায় বেশী বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে? বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন? তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না। আমার আর বক্তব্য নাই; শাস্ত্রী মহাশয়কে আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, মহাশয় বলিলেন, আমার একটা কথা বলিবার আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়া পরিষদের একটি উদ্দেশ্যসাধনের সূত্রপাত করিলেন। ব্যাকরণ শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ Etymology. শব্দের রহস্য জানা আবশ্যক, শব্দটি কোথা হইতে আসিতেছে জানিতে পারিলে আমরা আমাদের ভাষাটিকে চিনিতে পারিব, তখন আমাদের নিজের জাতি জানিতে পারিব। শাস্ত্রী মহাশয় অদ্য যে আলোচনা আরম্ভ করিলেন, আশা করি ইহা সবেগে চলুক। এই আলোচনার ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ উত্তাপের উদ্ভব অনিবার্য্য; তবে আলোকের উদ্ভবও যথেষ্ট হইবে।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ, মহাশয় বলিলেন,—আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ছাত্র; আমা দ্বারা প্রবন্ধের সমালোচনা হওয়া উচিত নহে, তবে এ সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া আরও কিছু শিখিতে চাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ যখন আবশ্যক হইয়াছে, তখন তাহা কিরূপ হইবে ইহাই বিচার্য্য। সকল কাজের আদর্শ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ কি হইবে? প্রথমতঃ বাঙ্গালা কোন একখানা পুস্তক লইয়া বিবেচনা করা উচিত, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ও অন্যান্য ভাষার শব্দ কি পরিমাণে আছে। যে ভাষার শব্দ সংখ্যা অধিক হইবে, ব্যাকরণ তদনুসারে গঠিত হইলে ক্ষতি কি? অদ্য আলোচনা করিয়া বিভিন্ন দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহা ঠিক নহে। একটা সামঞ্জস্য আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার এ অবস্থায় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সুজন, কৃষক প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ হইলেও আর তাহা ত্যাগ করা যায় না। একজন বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা অল্পদিনের শিশু ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলে ইহার স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া ইহার অঙ্গ হানি

হইবে। সত্য; কিন্তু শিশুর অভিভাবকের তাহার পদস্খলনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়, নতুবা তাহাতেও অঙ্গহানি সম্ভাবনা। একজন বলিয়াছেন, পূর্ব্বে ভাষার গতি সংক্ষিপ্ততার দিকে ছিল, এখন একটি শব্দ মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এখনকার ভাষায় যে একেবারে সংক্ষিপ্ততার অভাব তাহা নহে। বিদেশীয় ভাষাতেও সন্ধি সমাসের অস্তিত্ব দেখা যায়। ইংরাজীর Pickpocket, Scarecrow প্রভৃতি শব্দ উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক পদকে এককরার জন্যই ভাষার সন্ধি সমাসের আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার গতি প্রতিরোধ আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা ভাষার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের কোন প্রকৃষ্ট উপায়ের কথা নির্দ্দেশ করিতেছেন না। অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার যে প্রার্থনীয় তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যাঁহারা বৈদেশিক শব্দ লইয়া ভাষায় পুষ্টির পক্ষপাতী, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও বলেন যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার বিদেশী শব্দের বা নূতন শব্দের এত প্রাদুর্ভাব হইবে যে সংস্কৃত শব্দগুলি টিম টিম করিতে থাকিবে। আমার মতে সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয়ের যোগে আবশ্যক শব্দসমূহ রচনা করিয়া লইতে যে বিলম্ব, বিদেশীশব্দকে বাঙ্গালার অঙ্গীভূত করিয়া ব্যবহার করিতেও সেই পরিমাণ বিলম্বই হইবে, এরূপ স্থলে মূলভাষার সহিত নৈকট্য রাখা কি প্রার্থনীয় নহে। এরূপ হইলে ভাষায় একটা আদর্শ থাকিবে, নতুবা বৈদেশিক শব্দের প্রাচুর্য্যে এবং তাহাদের ব্যবহারের একটা সুসঙ্গত প্রণালী না থাকায় ভাষায় উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়িবে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে গড়িলে বিশেষ ক্ষতি কি হইবে?

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—এতক্ষণ যাঁহারা প্রবন্ধের আলোচনা করিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই একটা বিষয়ে গোলমাল করিয়া তর্ক বিস্তার করিতেছেন। সকলেই অভিধান ও ব্যাকরণ এই দুটাকে একার্থ বোধক করিয়া আলোচা করিয়াছেন। তাহা নহে, ব্যাকরণের কার্য্য ও অভিধানের কার্য্য স্বতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন যাহাকে ভাষার প্রকৃতি বা genius বলে, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেই genius বা মূল প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহার দিকে কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না। সকল ভাষাতে বিভিন্ন ভাষার শব্দ অল্পবিস্তর মিশ্রিত আছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার, গঠন, ইত্যাদি তত্তৎ ভাষার নিজের প্রকৃতি অনুসারে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই যে ভাষার আলোচনা করিলাম, এই ভাষার প্রকৃতি স্বতন্ত্র, ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদি দ্বারা এ ভাষার গঠন হওয়া অসম্ভব; অতএব যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা এবিষয়টা স্মরণ রাখিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য বড় বেশী নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এ সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্যের আদর্শ। তাঁহার প্রতিবাদ করিতে যাওয়া স্পর্দ্ধা মাত্র। আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য

আবশ্যক। যে কোন ভাষার গতি পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, ভাষা ব্যাকরণের অনুসারে গঠিত হয় না; গঠিত ভাষার নিয়মাদি নির্দ্ধারণ ব্যাকরণের কার্য্য। বলিবার কথা উভয়পক্ষেই বিস্তর আছে। মীমাংসাও অল্পে হইবে না। এবিষয়ের যে বিস্তৃত আলোচনা হয়, আর তাঁহা পরিষদেই হয়, ইহা ত্রিবেদী মহাশয়ের মত; আমারও মত বটে। আমার নিজের মনের ঝোক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় প্রভেদ যত কম থাকে, ততই ভাল। যা বলি তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাহা লিখিয়া বুঝাইতে গেলে অভিধান ব্যাকরণের সাহায্য ভিন্ন হইবে না, ইহা একটু বিসদৃশ বোধ হয়। তবে ভাষার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য কিছু কিছু পার্থক্য কথিত ভাষার সঙ্গে থাকাও আবশ্যক। সে কতটা প্রয়োজন, তাহা সুলেখক ও সুকবি সহজেই বুঝেন। তাঁহাদের লেখায় তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা বাঙ্গালা ব্যাকরণ আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষার প্রধান উপাদান সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাল করিয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভাষার গতিও লক্ষ্য করা উচিত। বাঙ্গালা ভাষা এখন কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা যিনি দেখাইয়া দিতে পারিবেন, তিনিই বাঙ্গালা ব্যাকরণের ঠিক পথপ্রদর্শক হইবেন। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বড়ই উপকার করিলেন; তাঁহার নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ।

অবশেষে গ্রন্থ উপহার দাতাদিগকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক	সভাপতি

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

গত ২৫ শ্রাবণ (১৩০৮), ১০ই আগষ্ট (১৯০১) শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ ধর্ম্মপাল	„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল্।
কুমার „ শরৎকুমার রায়, এম্ এ।	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল্।
„ „ হেমেন্দ্রকুমার রায়।	„ অনাথনাথ পালিত, এম্ এ।
„ শরদিন্দু নারায়ণ রায়, এম্ এ।	„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।	„ জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।
" ব্রহ্ম-বান্ধব।
" মৃণালকান্তি ঘোষ।
ডাক্তার " রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" বাণীনাথ নন্দী।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (ক)।
" নগেন্দ্রনাথ বসু (খ)।
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
" হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী।
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি, এ।
" করুণাকুমার সেন গুপ্ত।
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল।
(সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী
(সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। কার্য্যবিবরণ-পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ। ৪। বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুমত্যনুসারে কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে কতকাংশ পড়িয়া শুনাইলেন এবং বলিলেন, এই প্রবন্ধ বিস্তৃত ভাবে পুস্তকাকারে শীঘ্রই ছাপা হইবে।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বিএল	১। শ্রীরামগোপাল ঘোষ সম্পাদক, করঞ্জলী বান্ধব সমিতি, ডায়মণ্ড হারবার, ১২নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
"	"	২। শ্রীচন্দ্রকমল লাহিড়ী মোক্তার, কুচবিহার।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ	৩। শ্রীসারদাপ্রসাদ সরকার, সব ডিভিসন্যাল আফিসার, কাটোয়া।
"	"	৪। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮৩নং পঞ্চাননতলা লেন, হাবড়া, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
"	"	৫। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীঅনাথনাথ পালিত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, মসজীদবাড়ি ষ্ট্রীট।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীঅক্ষয়কুমার মল্লিক, ১ নং বলরাম বসুর ২য় গলি, ভবানীপুর।
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,	৮। শ্রীসত্যপদ বন্দোপাধ্যায় ৭০ নং ডকটার্স লেন।
,,	,,	৯। সুরেন্দ্রনাথ কুমার ৩১ নং সুরীজ ট্যাঙ্ক লেন।
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক	শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	১০। শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী উকীল জজকোর্ট, পাবনা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	১১। শ্রীঅরুণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
শ্রীকুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথপাল চৌধুরী	১২। শ্রীতড়িৎভূষণ রায়, বিএ। কুমারটুলী।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১৩। শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র, বি এ ৯১ নং রামকৃষ্ণপুর লেন।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী		১৪। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী English clerk, Raj office. Nashipur

পরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল মহাশয় ইংরাজিতে যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই :—প্রবন্ধ পাঠক সত্যেন্দ্রবাবু আমাকে হীনযান ও মহাযান শব্দের ব্যাখ্যা করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এই দুটি শব্দ ভারতেই চলিত। আমি ভারত-ভ্রমণে আসিয়াই উহা শুনি। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানগ্রন্থ প্রজ্ঞাপারমিতা। মহাযান সম্প্রদায়ে ছয় খানি পারমিতা আছে। সিংহলে দশখানি পারমিতা দেখিতে পাই। হিমালয়াদি স্থানবর্ত্তী দেশের বৌদ্ধগণ বুদ্ধবচনকে বুদ্ধ-ভাষিত বা সারদা-ভাষিত বলিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন দেব-ভাষিত বা ঋষি-ভাষিত নামক কতকগুলি বুদ্ধ-বচনের অনুবাদ আছে। সিংহলে বুদ্ধ-ভাষিতগুলি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। হিমালয়াদি স্থানবর্ত্তী বৌদ্ধগণ মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সিংহলাদি হীনযান ভুক্ত। সিংহলে বুদ্ধ-ভাষিতের প্রাধান্য, অথচ তাহাকেই হীনযান বলা হয়। আর উত্তরের দেবভাষিত বা ঋষিভাষিতকে অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণের অনুবাদাদিকে মহাযান বলা হয়। মধ্যম-যান ও একযান নামক ঈষৎ পার্থক্য-বিশিষ্ট মতও আছে। জাপান-ভ্রমণকারীরা সিংহলের মন্দিরাদি দেখিয়া কিন্তু মহাযানের কথাই বলেন। সত্যেন্দ্রবাবু "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, ঐ মন্ত্র উত্তর-ভারতে দেবপূজায় ব্যবহৃত, সিংহলে উহা নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে হইলে অভিধর্ম্মপিটক পাঠ করা উচিত, পালিভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পালি ব্যাকরণ লিখিতেছেন। আপনাদের ন্যায় কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণকে ধন্যবাদ যে, আপনারা বিশেষতঃ সত্যেন্দ্রবাবুর ন্যায় গণ্য-মান্য লোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার আদর বাড়িতেছে।

তৎপরে সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রাত্রি অনেক হইয়াছে, প্রবন্ধপাঠককে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধের সমস্ত বিষয় ইংরাজী গ্রন্থরাশি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু একটী প্রবন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের এইরূপ একত্র সংগ্রহ বিশেষ উপকারী। বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে যে ব্যক্তি নূতন আলোচনা করিবে বা পড়িবে, তাহার বিশেষ সুবিধা হইবে। কারণ্ড-ব্যূহ আজ ২৫।২৬ বৎসর হইল কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে, উহাতে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রের ব্যাখ্যা আছে। ওঁ মণি পদ্মে হুঁ মন্ত্রের মণি রত্ন নয়, আর পদ্ম পদ্মফুল নয়। মণিভদ্রের নাম হইতে মণি এবং পদ্মপাণির নাম হইতে পদ্ম শব্দ লইয়া মন্ত্রটী গঠিত। মহাযান ও হীনযান শব্দের ব্যাখ্যা নেপালে এইরূপ—বুদ্ধ নিজ ধর্ম্মে বলেন, যাহারা তাঁহার সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই উদ্ধার হইবে; আর যাহারা তাঁহার নিজমুখে উপদেশ শুনিয়াছে সেই শ্রাবকেরা উদ্ধার হইবে, তবে সে এ জন্মে নহে, পরজন্মে হইবে। প্রত্যেক বুদ্ধ নিজে উদ্ধার হইবে, পরকে উদ্ধার করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বে এই দুই যান ছিল। পরে কনিষ্কের কিছুদিন পরে মহাযানের উৎপত্তি। মহাযান অর্থে খুব বড় সওয়ারী—যাহাতে জগৎশুদ্ধ প্রাণী যাইতে পারে অর্থাৎ উদ্ধার হইতে পারে। কনিষ্কের ৫০ বৎসর পরে নাগার্জ্জুন। কারণ্ড-ব্যূহে অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করি-লেন, তিনি সকলকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন? তিনি বলিলেন, বৈষ্ণবকে বিষ্ণুরূপে, শৈবকে শিবরূপে, গণেশোপাসককে গণেশরূপে, সূর্য্যোপাসককে সূর্য্যরূপে ইত্যাদি। অবলোকিতেশ্বরের নির্ব্বাণকালে জগতের জীবজন্তু সকল প্রার্থনা করিল, করুণাধার, আমা-দের কি হইবে? তাহাতে তিনি বলিলেন, জগতের একটী প্রাণীও নির্ব্বাণ অপ্রাপ্ত থাকিতে আমি নির্ব্বাণ লইব না। ইহাই মহাযানের বিস্তৃত ও উদার ভাব। ২০০।৩০০ বৎসরের মধ্যে মন্ত্রযানের উৎপত্তি। সেই সময়ে ওঁ মণি পদ্মে হুঁ প্রভৃতি মন্ত্রের উৎপত্তি। অশ্লীলতার ভাব এই সময়ে বিস্তৃত হয়। তৎপরে বজ্রযানের উৎপত্তি। দৈত্যাদির ভয়ে বৌদ্ধেরা আত্মরক্ষার জন্য বজ্র ব্যবহার করিতেন এবং মন্ত্রাদি সাধন করিতেন। ১০ম শতাব্দীতে কালচক্রযান। ইহার ৩০।৪০ পাতা টীকার এক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। টীকা বড় কঠিন। শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযানকে হীনযান বলে। হীনযান বলিয়া কোন sect ছিল না। মহাযানীরা শ্রাবকযান ও প্রত্যেক বুদ্ধযানকে হীনযান বলিয়া অবজ্ঞা করিত; অপর সমস্ত মহাযান।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহা-দুরের পদত্যাগ উপলক্ষে প্রস্তাব করেন, "রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এতদিন পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির ধনরক্ষকের কার্য্য যেরূপ যত্ন সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছেন,

তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন এবং এই জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।"

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ও গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি,

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

গত ২৩শে ভাদ্র (১৩০৮), ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯০১), রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী জেলার ইল্লোড়নিবাসী শতাবধানী পণ্ডিত ব্রহ্মশ্রী বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী বিদ্বত্তিলক মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহার যুগপৎ বহুবিষয়ে অবধান অর্থাৎ মনোযোগ-কৌশল দর্শন করিবার জন্য এই অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বহুসংখ্যক বিদ্বজ্জনের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি নাম উল্লিখিত হইল,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার এম্ এ।
" " কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি।
" " চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ।
" " রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন।
" " শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
" " দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
" " প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
" " মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
কুমার " শরৎকুমার রায়. এম্ এ।
" " হেমেন্দ্রকুমার রায়।
Mr. R. D. Mehta, C. I. E.

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।
" " বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন।
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" করুণাকুমার সেন গুপ্ত।
" শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
" চন্দ্রনাথ বসু, এম্ এ বি এল।
" কিশোরীলাল গোস্বামী, এম্, এ, বি, এল।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ, বি,এল
" শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
" শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি, এল।
„ চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম, এস্।
„ রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এম্ বি, এফ্ সি, এস্।
„ সরসীলাল সরকার, এল্, এম্, এস্।
„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ।
„ অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি এ।
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ।
„ পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, বি এ।
„ ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ।
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ অনঙ্গমোহন পাল।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
„ বিশ্বম্ভর মিত্র।
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র রায়
„ গৌরহরি সেন।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
„ লাড্‌লীমোহন ঘোষ।
„ ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
„ পূর্ণচন্দ্র দত্ত।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বাণীনাথ নন্দী।
„ কালীনারায়ণ সান্যাল।
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ দুর্গাদাস লাহিড়ী।
„ বীরেশ্বর পাঁড়ে।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ নরেন্দ্রনাথ সেন।
মুন্সী আব্দুর রহিম।

কার্য্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীরাম শাস্ত্রী সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত সভায় উপস্থিত হন।

সভাপতি মহাশয় কার্য্যারম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের সংক্ষেপে পরিচয়াদি বলিয়া দিয়া সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে প্রশ্ন করিবার জন্য অহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় পরিচয়ান্তে উদাত্তস্বরে স্বরচিত শ্লোকে গুরু-বন্দনা ও বাগ্‌দেবীর স্তোত্র-পাঠ করিলেন,—

তাঁহার গুরু-বন্দনার শ্লোক (অনুষ্টুভ্),—

গুরুং গুরুকৃপাপূর্ণং সুব্রহ্মণ্য সুধীমণিম্।
সুশ্লোকসম্পদে বন্দে শ্রীমতামগ্রতো দ্রুতম্॥

তাঁহার ভারতী-বন্দনার শ্লোক (আর্য্যা),—

সদসীহ কুতোঽবদমিতি,
যা চিন্তাহং শতাবধানীতি।
কৃপয়া মাতর্ভারতি,
সংহর সংহর সমূলমধুনা তাম্॥

অতঃপর সংক্ষিপ্ত ভাবে মঙ্গলাচরণ করিয়া তিনি পণ্ডিতগণের প্রশ্নের উত্তরদানে প্রস্তুত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় মধ্যস্থ হইলেন।

ক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয়কে যুগপৎ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হয়,—

১ম। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—

"স্রগ্ধরয়া বৃত্তেন ভবতা কলিকাতানগরী বর্ণনীয়া"—

অর্থাৎ স্রগ্ধরাছন্দে আপনি কলিকাতা নগরীর বর্ণনা করুন।

২য়। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় একটী ইংরাজী বাক্যের শব্দগুলির ক্রম বিপর্য্যস্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শতাবধানী পণ্ডিত যথাক্রমে ঐ সম্পূর্ণ বাক্যটি আবৃত্তি করিবেন।

৩য়। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় ৩য় প্রশ্ন করিলেন,—

"উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থায়াশ্চ বিমর্শঃ"—ইত্যস্য কোঽর্থঃ উপলব্ধ ব্যবস্থায়াঃ
অনুপলব্ধ ব্যবস্থায়াশ্চ সংশয়কারণত্বে কা যুক্তিঃ;
অনয়ো সংশয়কারণত্বং কস্য সম্মতং কস্য বা ন?

৪র্থ। পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি মহাশয় শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয়ের অভ্যর্থনার্থ স্বয়ং একটী কবিতা রচনা করেন। তাহার চারিটি চরণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারিবারে পাঠ করিলেন। শতাবধানী পণ্ডিতকে শেষে সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিতে হইবে।

৫ম। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় একটি বাঙ্গালা কবিতার আটটি কথা আটবারে উচ্চারণ করিলেন। শতাবধানী পণ্ডিতকে শেষে তাহা সম্পূর্ণ বলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল মহাশয় মালিনীছন্দে একটি পার্ব্বতী-বর্ণনাত্মক শ্লোক রচনা করিতে বলিলেন, উহার চারি চরণে "শ্রীস্তে সাস্তাং" এই চারিটি পদ সংযুক্ত থাকিবে।

৭ম। পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ত-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"পঞ্চচামরছন্দসা শৈশবং বর্ণনীয়ম্"— অর্থাৎ পঞ্চচামরছন্দে শৈশব বর্ণন করুন।

৮ম। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—"তোটকছন্দসা—সাগর সঙ্গমো বর্ণনীয়ঃ"—অর্থাৎ তোটকছন্দে সাগর সঙ্গম বর্ণনা করুন।

৯ম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমস্যা পূরণার্থ একটি কবিতার এক চরণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সেই চরণ শুনাইয়া দিলেন, —"ধত্তেঽধিকং গৌরবম্"। শতাবধানীকে এই বাক্যাংশ অবলম্বনে এরূপ একটী শ্লোক রচনা করিতে হইবে—যাহার শেষ চরণে এই বাক্যাংশ থাকিবে।

১০ম। রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর এতক্ষণ বসিয়া একটি ছোট পেটা ঘড়ি মধ্যে মধ্যে বাজাইতেছিলেন। কোনবারে ৩, কোনবারে ৫, কোনবারে ২ ঘা দিতে ছিলেন। মাননীয়

মেটা মহোদয় তাহার হিসাব গোপনে রাখিতে ছিলেন। শতাবধানী মহাশয়ের মনোযোগ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তর সকলের গোলোযোগের মধ্যেও এই ঘণ্টানাদের দিকে ছিল। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, সর্ব্বশেষে পণ্ডিত বলিবেন, সর্ব্বশুদ্ধ কতবার ঘণ্টা বাজিয়াছে এবং প্রথম হইতে কোন্‌বারে কত ঘা শব্দ হইয়াছে।

১১শ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন পণ্ডিতের গণনাশক্তি পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন কি বার ছিল?

১২শ। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ইতিমধ্যে শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয়কে অবধান হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য কতকগুলি ফটোগ্রাফ আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং পর্য্যায়ক্রমে তাহার এক এক খানি দেখাইয়া তাহাদের নামমাত্র শুনাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, শতাবধানী শেষে পর্য্যায়ক্রমে সকল ছবির নাম উল্লেখ করিবেন।

শতাবধানী শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপে সমস্ত প্রশ্ন একবারে উপর্য্যুপরি শুনিয়া লইয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা ৬টার সময় হইতে প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হয়, তাহার পর কিঞ্চিদধিক দুই ঘণ্টা পরে শতাবধানী পণ্ডিত মহাশয় সমুদায় প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ৮।০টা পর্য্যন্ত প্রশ্ন শ্রবণ কথোপকথন ও রহস্যালাপে কাটিয়া গিয়াছিল।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর সভাস্থলে শতাবধানী মহাশয় যেরূপ দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল এবং শ্লোকগুলি ছাপা হইবে শুনিয়া শতাবধানী মহাশয় পরদিন কোন কোন শ্লোকে কিছু কিছু সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া যান, তাহা পাদ-টীকায় সন্নিবিষ্ট হইল।

প্রশ্নগুলিও যেমন যুগপৎ শুনান হইয়াছিল, তেমনি শাস্ত্রীজীও এক এক করিয়া অবিরামে এক এক জনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

১ম প্রশ্নের উত্তরে স্রগ্ধরাছন্দে নিম্নলিখিতরূপ কলিকাতা বর্ণনা করিলেন,—

হর্ম্ম্যৈ সৌধৈশ্চ কৈশ্চিদ্ ধনিনৃপমণিভিঃ শোভমানা নিতান্তম্,
বীথ্যাং বীথ্যাঞ্চ চিত্রৈ র্বিবিধপদভরৈরাপণৈরেধমানা।
নানাবিদ্যাতিহৃদ্যা নিখিলমতজনান্যোন্যকৃত্যোজ্জ্বলেয়ম্,
প্রায়ঃ সর্ব্বত্র কৃত্যা প্রতিদিনমপি সা কালিকাতাস্তি দৃষ্টা॥*

২য় প্রশ্নের উত্তর,—ইংরাজী যে আটটি শব্দ বিভিন্ন সময়ে একটি একটি করিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয়, শতাবধানী শাস্ত্রীমহাশয় ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইয়াও

---

* হর্ম্ম্যৈঃ সৌধৈশ্চ কৈশ্চিদ্ধনমণি-তুলিতৈর্বস্তুভিঃ শোভমানৈঃ,
বীথ্যাং বীথ্যাং বিচিত্রৈর্বিবিধ পদভরৈরাপণৈরেধমানা।
নানাবৈশদ্যহৃদ্যা নিখিলমতজনান্যোন্যচর্য্যোজ্জ্বলৈষা,
প্রায়ঃ সর্ব্বত্র কৃত্যাবভিরুচিহি পুরী কালিকাতাস্তি দৃষ্টা॥

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-প্রভাবে যথাক্রমে শব্দ কয়টী আবৃত্তি করিলেন। কথা কয়টি এই :—

Is there a man with soul so dead.

৩য় প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্নটী প্রাচীন-ন্যায় গৌতম-সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, এরূপ স্থলে প্রশ্নের বিচার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনঃসংযোগ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সময়ে আমি উত্তর দিতে আরম্ভ করি, সে সময় আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিলে বাধ্য হইয়া আমাকে ইহার ব্যাখ্যার্থ বিষয়ান্তর গ্রহণ করিতে হইত, আর তাহা হইলেই পূর্ব্বশ্রুত বিষয় হইতে আমার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হইত এবং তাহা হইলেই আমার উত্তর রচনায় বিশেষ বাধা ঘটাইতে পারিতেন।

৪র্থ প্রশ্নের উত্তর,—তর্কনিধি মহাশয় যে কবিতাটির চারি চরণ বিভিন্ন সময়ে পাঠ করিয়া শতাবধানী মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন, শতাবধানী পণ্ডিত অবশেষে তাহা অবিকল আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকটি এই :—

অহো মহান্তো বহুদূরদেশতঃ
গীর্ব্বাণবাণীধৃতধর্ম্মজীবনান্।
জ্ঞাত্বাদ্য পূজ্যান্বয়জানিহাগতান্
ধন্যাঃ কিল স্মঃ কুশলাংশ্চ সংস্কৃতে ॥

৫ম প্রশ্নের উত্তর,—যতীন্দ্র বাবুর কথিত বাঙ্গালা কবিতার চরণটির শব্দগুলি পর্য্যায়ক্রমে আবৃত্তি কালে শতাবধানী প্রথম সাতটি শব্দ সহজেই পুনরাবৃত্তি করিলেন। শেষের একটি শব্দ শীঘ্র স্মরণ না হওয়ায় বিলম্বে স্মরণ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু সভাবৃন্দ আর অপেক্ষা না করায়, তাহা বলিবার অবসর পাইলেন না। কবিতার চরণটি এই,—

"বাণীর কৃপা শেষের অশেষ দেহ দেহ এ দাসেরে।" "দাসেরে" কথাটি বলিবার অবসর পান নাই।

৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর,—"শ্রীস্তে সাস্তাং" এই চারিটি শব্দযুক্ত মালিনীছন্দে গৌরী-বর্ণনাত্মক যে শ্লোকটি শতাবধানী পণ্ডিত রচনা করেন, নিম্নে তাহা লিখিত হইল,—

গিরিপতিবনিতা "শ্রীঃ"পুণ্যবাচো দদাতু
প্রচুরগণনয়া "তে" কীর্ত্তিপূর্ত্তাদ্যরীতিঃ।
নিখিল জগতি "সা" মে সানুকম্পেক্ষণেয়ং
সরসসদসি যা "স্তাং" শঙ্করেণাপি ভোগ্যা ॥*

* গিরিপতিবনিতা "শ্রীঃ" পুণ্যবাচাং বিলাসান্
বিতরতু সততং "তে" কীর্ত্তিপূর্ত্তোচ্চরীতীন্।
সকল ভুবি চ মে "সা" সানুকম্পেক্ষণৈবম্
সমরসপথমা"স্তাং" শঙ্করেণাপিভোগ্যা ।

৭ম প্রশ্নের উত্তর,—পঞ্চচামরছন্দে শৈশব-বর্ণনা করিয়া শতাবধানী নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করিলেন :—

ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রবুধ্য সৎ ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রবুধ্য সৎ
কার্য্য জাতকে বিলোকি লোকসন্ততে * * *।
সমস্তবেদ্য সঙ্গতিম্বতীব শক্তিশূন্যকং
ক্রমাদ্বিশেষগৌরবস্তু সঙ্গতিঃ সুদৃষ্টিমৎ ॥*

৮ম প্রশ্নের উত্তর,—শতাবধানী মহাশয়ের রচিত তোটকছন্দে সাগরসঙ্গম-বর্ণন শ্লোক,—

ইহ সাগর সঙ্গম আস্ত ইতি, প্রথিতঃ খলু সর্ব্বজনৈরধিকম্।
পুনরীক্ষণপাত্রমপীহ ভবন্নিতি ভূরি ময়াৰ্থিত এব ভবেৎ ॥†

৯ম প্রশ্নের উত্তর,—"ধত্তেঽধিকং গৌরবম্" এই শ্লোকাংশ অবলম্বনে শতাবধানী পণ্ডিত যে শ্লোক রচনা করিয়া কৃষ্ণকমল বাবুর সমস্যা পূর্ণ করিলেন, তাহা এই :—

দেশে হ্যন্যত্র তু বা স্বকীয়জনবন্দেশেঽপিবা কেবলং
সর্ব্বেষামপিতোষদানকরণৈ বিদ্যাবিশেষৈঃ ক্রমাৎ।
যাস্তল্লোকগণস্য কীর্ত্তিরতুলা পূর্ব্বার্জ্জিতা পুণ্যতঃ
দৃষ্ট্বা স্নেহবশাদপীহ মহতাং ধত্তেঽধিকং গৌরবম্ ॥‡

১০ম প্রশ্নের উত্তর—ঘণ্টাবাদনের সংখ্যা নির্দ্দেশ। এ বিষয়েও শতাবধানী পণ্ডিত অতি আশ্চর্য্যরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন মোট দ্বাদশবারে ৩৭টি শব্দ হইয়াছে;—১মবারে ৩ঘা, পরে ২, পরে ৩, পরে ৫, পরে ১, পরে ৩, পরে ২, পরে ৪, পরে ৫, পরে ২, পরে ৪, পরে ৩, এই বারোবারে ৩৭ ঘা বাজিয়াছে। মেটা সাহেবের লিখিত তালিকার সহিত শাস্ত্রী মহাশয়ের উত্তর ঠিক মিলিল।

১১শ প্রশ্নের উত্তর,—দীনেশ বাবুর তারিখের প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন :—"১৮৯৭ সালের ১২ জুন" শুক্রবার ছিল; কিন্তু প্রশ্ন কর্ত্তা ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলেন, উহা ভীষণ ভূমিকম্পের দিন; ঐ দিন শুক্রবার নহে, শনিবার।

---

* সদা চকাস্তি শৈশবং ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রবুদ্ধ সৎ-
প্রবুদ্ধি ভূরি কার্য্যতো বিনোদদক্ষ পশ্যতাম্।
সমস্তবেদ্য সঙ্গতিম্বতীবশক্তিহৈনাবৎ
ক্রমাদ্বিশেষদৃষ্টিলোকসঙ্গতেশ্চ কীর্ত্তিমৎ ॥

† ইহ সাগরসঙ্গম আস্ত ইতি
প্রথিতঃ খলু সর্ব্বফলোন্নততা।
গণিতো ভুবি পূর্ব্ববুধৈশ্চ ভবন্
বহু বস্তু ময়ার্থিত আশুভবৎ ॥

‡ দেশোঽন্যত্র তু বা স্বকীয়জনযুগ্দেশেঽপি বা কেবলং
সর্ব্বেষামপি তোষদানকরণৈর্বিদ্যাবিশেষৈঃ সমম্।
যাস্তল্লোকগণস্য কীর্ত্তিরতুলা পূর্ব্বার্জ্জিতা পুণ্যতো
দৃষ্টৈঃ স্নেহবশাদপীতি মহতাং ধত্তেঽধিকং গৌরবম্ ॥

১২শ প্রশ্নের উত্তর—অতঃপর শাস্ত্রীমহাশয় ব্যোমকেশবাবুর প্রদর্শিত ফটোগ্রাফগুলির নাম যে পর্য্যায়ে দেখান হইয়াছিল, সেই পর্য্যায়ে বলিয়া গেলেন—১ম Captain Mile Banke, ২য় Count Waldersee, ৩য় A. O Hume, ৪র্থ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ও ৫ম নবাব মীরজাফর।

রাত্রি অধিক হওয়ায় সভ্যবৃন্দের অনেকেই সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অনেকেই শেষের বিস্ময়রস-সম্বলিত আনন্দটুকু উপভোগ করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি সকলের সহিত শতাবধানী পণ্ডিতের কথোপকথন আদ্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিশেষ কার্য্যে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে চলিয়া যাওয়ায় মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় সভাপতি হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি এবং সভাস্থ সকলেই শতাবধানী পণ্ডিত শ্রীরামশাস্ত্রীর অদ্ভুত স্মরণশক্তি, কবিতা-রচনাশক্তি ও গণনাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সভাগৃহে পঞ্চশতাধিক লোক, সাধারণের কোলাহল, অথচ বারটি পৃথক্ বিষয়ের প্রতি যুগপৎ অবধান!—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার! মহা গোলমালের মধ্যে দশজনে দশদিক হইতে দশরকমের প্রশ্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে করিতেছেন, সেগুলি মনে রাখা, মাঝে মাঝে কতবার ঘণ্টার শব্দ হইল তাহা স্মরণ রাখা, বহুসংখ্যক অজ্ঞাত লোকের ফটোগ্রাফ একবার মাত্র দেখিয়া নাম মনে রাখা, অজ্ঞাত ভাষায় মাঝে মাঝে যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, তৎপ্রতি মনোযোগ বিধান করা এবং সমুদয় প্রশ্নের শেষে অবিরাম ভাবে যথাক্রমে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য এবং বিস্ময়কর ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইলেন। এই সময়ে অনেকেই শতাবধানী পণ্ডিতকে একটী গান শুনাইতে অনুরোধ করিলে তিনি প্রীতিপূর্ব্বক কল্যাণরাগে একটী কীর্ত্তনের সশীর্ষ একটি পদ গান করিলেন। অবশেষে শতাবধানী পণ্ডিত ও উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী, মহামহোপাধ্যায়গণকে এবং সভ্যমণ্ডলীকে তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

গত ১২ আশ্বিন (১৩০৮), ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯০১) শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় পরিষদের ৫ম মাসিক অবিধেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্. এ (সহকারী সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
„ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্।
„ ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বি এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ।
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।
„ প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
„ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
„ শিবভজন ত্রিবেদী।
„ মাখনলাল দীক্ষিত।
„ শ্রীরাম শাস্ত্রী।
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ।
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্।
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ। „
„ রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
„ মৃণালকান্তি ঘোষ।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ প্রমথনাথ চৌধুরী, এম্ এ, ব্যারিষ্টার

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, এম্ এ।
„ বামনচন্দ্র দাস এম্, এ।
„ অক্ষয়কুমার বড়াল।
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ রমেশচন্দ্র বসু।
„ শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
„ কিরণচন্দ্র দত্ত।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সতীশচন্দ্র সমাজপতি।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ বিনোদবিহারী বসু, বি এ।
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাপাধ্যায়।
রায় „ চুণিলাল বসু বাহাদুর, এম্ বি, সি এস্।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।
„ বসন্তকুমার বসু।
„ জগদ্বন্ধু মোদক।
„ বীরেশ্বর গোস্বামী।
„ কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
„ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি এল (সম্পাদক)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি এ }
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) আবৃত্তি (ক) শ্রীযুক্ত মাখনলাল দীক্ষিত কর্ত্তৃক সংস্কৃতে মদন ভস্ম এবং (খ) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বরচিত "খাঁ জাহান" নামক নাটকের অংশ বিশেষ। (৪) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাঙ্গালা

কৃৎ ও তদ্ধিত বিষয়ক প্রবন্ধ (খ) তমোলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের "তমোলুকের প্রাচীন ইতিহাস" (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সভার কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত ও গৃহীত হইল। পরে নিম্নলিখিত সভাগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভা শ্রেণীভুক্ত হইলেন:—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সাহা, বি এল, আলিপুরের উকীল।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	২। „ হরগোপাল দাস কুণ্ড, মাড়োয়ারী পটী, মাহিগঞ্জ
„ „	„ „	৩। „ হেমেন্দ্রমোহন বসু, ৬৭।১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
„ „	„ „	৪। „ হরিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১০নং শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত. এম্ এ, বি এল,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। „ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার) ৩৪নং বীডন ষ্ট্রীট।
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ	„ „	৬। „ বনমালী চক্রবর্ত্তী এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ।
„ „	„ „	৭। „ যোগেশচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্যরত্ন বেদান্ততীর্থ, ৭৪।১ হ্যারিসন রোড।
„ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্ এ	„ „	৮। „ সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী জমীদার গাগিবাড়ী, ১৬০নং বহুবাজার।
„ „	„ „	৯। „ নরেন্দ্রচন্দ্র সেন, ১৬০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ	১০। „ কুমার রজনীকান্ত রায়, বি এ চৌগা ১১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
„ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ,	„ „	১১। „ তারকদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ,	„ শরদিন্দুনারায়ণ রায়	১২। „ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এম এ এল এল ডি. উকীল, এলাহাবাদ হাইকোর্ট।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৩। „ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ১৩৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্তব্যোমকেশ মস্তফী	১৪। শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব, বোপুর।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, ,,	১৫।,, শ্রীধর বসু, ১১।২নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট।
,,	,, ,,	১৬।,, মুরলীধর রায়, ১৬নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট।

তৎপরে মাখন বাবু ও ক্ষীরোদ বাবু স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিষয় আবৃত্তি করিলেন। সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মান্দ্রাজী পণ্ডিত শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী মহাশয় মদনভস্ম ও রতিবিলাপ আবৃত্তি করিলেন এবং একটি সুমধুর স্তোত্র শুনাইয়া দিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু তাঁহার দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে ইন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন, আমার সাহিত্য পরিষদে আজ এই প্রথম আসা ঘট্‌লো, আমি ইচ্ছা করেই দূরে থাক্‌তেম। সাহিত্যপরিষৎ ব্যাকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছেন অনেক দিন। মধ্যে একবার একটা ব্যাকরণ সমিতি হয়েছিলো, তাতে আমাকে সভ্য নিযুক্ত করা হয়। আমায় কিজন্য যে সে সমিতিতে নেওয়া হয়েছিলো, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না; আমি ব্যাকরণের কিছুই জানি না। অনেক দিন এ সমস্যার মীমাংসা পাইনি, শেষে ব্যাকরণ সমিতির যখন রিপোর্ট দেখ্‌লেম, আমার মত যাঁরা কোন ব্যাকরণই জানেন না, তাঁহাদেরই অনেকে সভ্য হয়েছেন, তখন বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বাঁচলেম। যাই হোক, আজ এখানে এসে ভেবেছিলেম, কোন কথা না বোলেই শুধু শুনে চলে যাব, কিন্তু আপনাদের অনুরোধে তা হোলো না। কিন্তু কি বোল্‌বো, আমার স্মরণশক্তি বড় অনুকূল নয়। এতক্ষণ যা শুনেছি, তার অনেক কথাই স্মরণ নাই, সেজন্য সময়ে সময়ে আমায় বড় নাকানি চোবানি খেতে হয়। যাই হোক, এখন কথাটা এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই বোলেছেন, বাঙ্গালা ভাষাটা যে কি পদার্থ, তা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্র বাবুর এ প্রবন্ধও তদনুযায়ী হোয়েছে। তিনি পুরাতন পরিভাষা ছেড়ে দিয়ে দু একটা নূতন পরিভাষা কোরে নিয়েছেন, ণিজন্ত শব্দ ত্যাগ কোরে নৈমিত্তিক শব্দ গ্রহণ করেছেন। প্রত্যয় স্থির কর্‌তে গিয়ে অন্তোস্থিত স্বর বা ব্যঞ্জন দৃষ্টে একটা কিছু স্থির করে নিয়েছেন। উদাহরণ আমি ঠিক স্মরণ করে বল্‌তে পার্‌বনা। আর একটা কথা বলি, রবীন্দ্র বাবু হয়ত এ রকম বলেন নাই, যেমন কতকগুলা শব্দের শেষে "রি" আছে দেখে রবীন্দ্র বাবু স্থির কোর্‌লেন যে এই "রি" টা তদ্ধিত প্রত্যয়; অমনি সেই ধরণের কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ কোরে উদাহরণ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই ফর্দ্দের ভিতর হয়ত "মাষ্টারী" কথাটাও পোড়্‌লো। এখন "মাষ্টা" শব্দের উত্তর "রি" প্রত্যয় কোরে যে মাষ্টারী কথাটা হয়নি, তা সকলেই বুঝিতে পারেন। রবীন্দ্রবাবুর "রি" প্রত্যয়ের উদাহরণের ফর্দ্দে হয়ত মাষ্টারী কথাটা নাই, কিন্তু মন্ত প্রত্যয়ের উদাহরণে বুদ্ধিমন্তের পাশে "আক্কেলমন্তকে" বসিয়েছেন। আরও বিচার করে বোলেছেন আক্কেলমন্ত হয়, কিন্তু চালাকীমন্ত হয় না কেন? ফারসী ব্যাকরণে একটু আক্কেল থাক্‌লে জানা যেতো যে, ফারসী "আক্কেল মন্দ" শব্দটা বাঙ্গালীর উচ্চারণে ঐ রকম হয়ে

পোড়েছে, আর ফারসীতে "চালাকীমন্দ" হয় না, তাই চালাকীমন্ত বাঙ্গালীরা পায়নি। কাজেই বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তে গেলে সংস্কৃত, পারসী, হিন্দি, উর্দ্দু, ইংরাজী সবরকম ভাষার ব্যাকরণে ভাল রকম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক; তার উপর নানা স্থানের গ্রাম্য ভাষা, স্বর বিপর্য্যয় জানা আবশ্যক। বাঙ্গালী বল্‌তে যাদের বুঝায়, তাদের সকলের উচ্চারণ একরূপ নয়। পাঞ্চভৌতিক অত্যাচার বড় বেশী; সকলে সকল স্থানের কথা উচ্চারণ করিতে চায়, কিন্তু পারে না, তাদের বাক্‌যন্ত্র তা উচ্চারণ কর্‌তে সমর্থ নয়। তার উপর আমাদের বর্ণমালা নাই। বাঙ্গালা ব'লে যে বর্ণমালা আমরা ব্যবহার করি, তা সংস্কৃত, তাতে বাঙ্গালা ভাষার সকল কথার উচ্চারণ লেখা যায় না। আমাদের "অ" কাছে "আ" আছে; কিন্তু "অ্যা" নাই, "ও" আছে "ঔ" আছে "ওয়া" নেই, লিখি "এখন" বলি "য়্যাখন"। হ্রস্ব আকার নেই, সেজন্য বড়ই কষ্ট পেতে হয়। জপ, তপ, বল, শব্দের প্রত্যেকের প্রত্যেক বর্ণ চাই অকারান্ত; কিন্তু উচ্চারণে দুটা বর্ণের অকার একরূপ নয়, শেষেরটা অর্দ্ধ "অ" কার, ঠিক হসন্ত অর্থাৎ অকার হীন নহে অথচ প্রভেদ নাই। হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ বুঝ্‌তে পারে না, ও যেন বোসেদের বাড়ীর "রামা" আর ঘোষেদের বাড়ীর "রামা"। রবীন্দ্র বাবু একটি কথা বেশ ব্যবহার কোরেছেন, একমাত্রিক ধাতু মাত্রা দ্বারা একটা মাপ পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্রিকের ন্যায় দ্বিমাত্রিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্র বাবু যা এক রকমে ভাষার মাত্রা স্থির করে দিতে পারেন, তো মন্দ হয় না। তবে কি জানেন, আমরা জাত্‌টে মাত্রাহীন বা অতিমাত্র। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শুনে, আর আমি নিজে নাড়াচাড়া কোরে যতটা বুঝ্‌লাম, তাতে দেখ্‌ছি, বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কারের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনও হয়নি, তা করা তো দূরের কথা। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণের চেষ্টা রেখে দিয়ে এখন পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করুন। আর আমি আপনাদের বিরক্ত কর্‌ব না। যাই হোক, রবীন্দ্র বাবুকে আমার সহস্র ধন্যবাদ যে, তাঁর ন্যায় সুলেখক এবিষয়ে আলোচনা কর্‌ছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর সংগৃহীতাতিরিক্ত আর কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ উপস্থিত করিলেন। সভাপতি মহাশয় রাত্রির আধিক্য প্রযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর সমস্ত প্রবন্ধ পাঠে আপত্তি করিয়া বলিলেন, ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে গৃহীত ও মুদ্রিত হউক। এখন উহা সমস্ত পড়িতে গেলে, আমরা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত বা আলোচনা শুনিতে পাইব না। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব ব্যোমকেশ বাবুই অনুমোদন করিলেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর এই চেষ্টার পূর্ণতা সম্পাদন করা উচিত। ইন্দ্রনাথ বাবুর আলোচনাতে বক্তব্য পথ দেখিতে পাইলাম। শাস্ত্রী মহাশয়, রবীন্দ্র বাবু এবং ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রবন্ধাবলী এবং আজকার আলোচনা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিরা মোটামুটি

এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বাঙ্গালা ভাষাটা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। ইহার প্রকৃতি অন্যরূপ। ঠিক সংস্কৃতানুসারিণী হইলে এই ভাষার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। বিদেশী ভাষার শব্দও ইহাতে যথেষ্ট আছে। সে সকলের সংগ্রহ ও তাহাদের ব্যাকরণ-ঘটিত প্রয়োগাদি জানা আবশ্যক। অভিধানের বাস্তবিক অভাব। ইন্দ্রনাথ বাবুর প্রস্তাবিত শব্দসংগ্রহ অতি আবশ্যক। শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি নির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষার পাণিনি বলিলেই হয়। ণিজন্ত শব্দের পরিবর্ত্তে নৈমিত্তিক শব্দ ব্যবহার সুসঙ্গত হইয়াছে। পালি ভাষায় ণিচ নাম নাই, তৎপরিবর্ত্তে "কারিত" প্রত্যয় নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সমস্ত শব্দকে রবীন্দ্র বাবু যে ক্রিয়াবাচক ও বস্তুবাচক এই দুই ভাগে যে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। গুণবাচক শব্দগুলিও প্রকারান্তরে বস্তুবাচক। ব্যোমকেশ বাবুর "ইয়ৎ" প্রত্যয় ও রবীন্দ্র বাবুর "ইয়তী" প্রত্যয় একই কথা। ঐ সকল কথা মতভেদের মীমাংসা শব্দসংগ্রহের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রনাথ বাবু বর্ণমালা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, সে সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি ভারতীতে ভারতীয় বর্ণমালা নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি।

তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে আজ আমার আনন্দ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক মাস পূর্ব্বে আমি এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্র বাবুর মত লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই আরও অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।

মত ভেদ যাহা শুনা গেল, সে সম্বন্ধে একটা ভুল উভয় পক্ষেই হইতেছে, প্রবন্ধটী কি ও কি নয়, তাহা আগে দেখা আবশ্যক। রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ব্যাকরণ নহে। যাঁহারা তাহা মনে করিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু প্রত্যয়াদির রূপ বাঁধিয়া দেন নাই, প্রত্যয় পরে শব্দ গঠনের নিয়ম লেখেন নাই, বিধিনিষেধের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। তিনি পদান্ত স্বর ও ব্যঞ্জন ধরিয়া কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। ব্যোমকেশ বাবুর মত সেগুলির উৎপত্তি কোন্ ভাষা হইতে তাহাও নির্ণয় করিতে যান নাই, এমন কি জানা শুনা বিদেশী শব্দগুলিকেও জানিয়া শুনিয়া নিজকৃত বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় কৃৎ ও তদ্ধিত, প্রত্যয়, কিন্তু তিনি এতই সাবধান যে, কোন্‌গুলা কৃৎ আর কোন্‌গুলা তদ্ধিত তাহা পর্য্যন্ত তিনি পৃথক্ করিতে চেষ্টা পান নাই বা বলিয়াও দেন নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে কলাপেও "কৃৎ" নাম নাই। যে সকল বাঙ্গালা শব্দের উপর কাহারও কোন দিন দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্র বাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে। রবীন্দ্র বাবুর লেখার গুণে প্রবন্ধে সে আকর্ষণী আছে। রবীন্দ্র বাবুর এই সূত্রপাতে, আশা হয়, একদিন এবিষয়ে একটী exhaustive সংগ্রহ দেখিতে পাইব। রবীন্দ্র বাবু যে গৌড়িয়ান গ্রামারের কথা বলিলেন, তাহা ডাঃ হরন্‌লির লেখা। গৌড়িয়ান গ্রামারে এইরূপ দেখা যায়; কিন্তু তাহার টান সাধু ভাষার দিকে। আর

সেটা বড়ই পুরাতন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বিষয়ের অনেক কথা আছে। তবে সে খানি ছেলেদের পড়িবার জন্য লেখা, সুতরাং তাহাতে শব্দ গঠনের নিয়মাদি, বিধিনিষেধ সবই আছে। সংস্কৃত শব্দও তাহাতে আছে; কিন্তু উভয়ের মধ্যে কষি টানিয়া পৃথক্ করা আছে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমি আর বেশী কি বলিব? সবই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার আর এক রকম ব্যাকরণ যে হইতে পারে, আজকার আলোচনায় তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ই এই ভিন্ন পথটি দেখাইয়াছেন। অভিধান হওয়া অতীব আবশ্যক, নতুবা এ কার্য্য অগ্রসর হইবে না। অভিধান হ'লে বুঝা যাইবে, ব্যাকরণ কি ভাবের হইবে; সংস্কৃত শব্দের অনুপাত অধিক হইলে ব্যাকরণে সংস্কৃত সূত্রাধিক্য হইবে, আর অনুপাতের এদিক ওদিক হইলে ব্যাকরণ অন্যরূপ হইবে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয় অদ্যকার আবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, দীক্ষিতের উচ্চারণ অনেক শুদ্ধ, তথাপি শ্রীরাম শাস্ত্রীর ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। আমাদের দেশে সংস্কৃতের উচ্চারণশিক্ষা স্বরভেদশিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এখানকার পণ্ডিতদের উচ্চারণ অবোধগম্য ও লজ্জাকর। শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে এ বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতা। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ সংস্কৃত কলেজে স্বরশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন। আমার একান্ত মিনতি, এবিষয়ে তিনি কিছু করেন। যদি পরিষৎকে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করিতে হয়, বা করিলে সুবিধা হয়, তাহা হইলে পরিষদের তাহাও করা উচিত। পরিষৎকেও আমি অনুরোধ করি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।	**শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,** সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ (১৩০৮) ১লা ডিসেম্বর (১৯০১) অপরাহ্ন ৫॥০ টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্।	" যোগেশচন্দ্র ঘোষ।
" কালিদাস নাথ।	" বাণীনাথ নন্দী।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" গিরিশচন্দ্র বসু।	" মৃণালকান্তি ঘোষ।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।	" শরচ্চন্দ্র সরকার।
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।	" নগেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু।
" শরৎকুমার রায় এম, এ,
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম, এ।
" সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যারিষ্টার)।
" অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি, এ।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
" নরেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিশ্বাস, বি, এল।
" অমৃতলাল মল্লিক, বি, এল।
" সত্যকৃষ্ণ বসু।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,
সম্পাদক

ব্যোমকেশ মুস্তফী
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ } সহকারী সম্পাদক

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয় সকল নির্দ্দিষ্ট ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের লিখিত বাঙ্গালার সহিত প্রাকৃতের সাদৃশ্য নামক প্রবন্ধ, (৪) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি,এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। এই সময় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় শিবাপ্রসন্ন বাবু সভাপতির আসন ত্যাগ করিলেন। কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল। গত অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ,	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ	১। ডাঃ কেদারেশ্বর আচার্য্য এম্ বি, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
(পুনর্নির্ব্বাচন) শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল		২। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৩নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ,	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল,	৩। ডাঃ গিরিশচন্দ্র বাগছী।
"	"	৪। যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ অধ্যাপক আলিগড় কলেজ।
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৫। শ্রীযুক্ত বিনদাচরণ মিত্র, নলহাটি, বীরভূম।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্ এ,	কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ	৬। রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী, বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী।
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল,	৭। প্রবোধচন্দ্র বসু, ৮৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
		৮। যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল, উকিল যশোহর, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (নাটোর) ৪ নং ল্যান্সডাউন রোড়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের প্রবন্ধ পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ের এই প্রবন্ধ বহুমূল্য। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রবন্ধের প্রশংসা যথেষ্ট করিতে হয়। নাথ মহাশয়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রবেশ আছে। তাঁহার আড়ম্বর নাই, যশ আকাঙ্ক্ষা নাই, সাহিত্যালোচনাকে তিনি ধর্ম্মকার্য্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। আমি প্রস্তাব করি, বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্পূর্ণ আলোচনা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থাদি নির্ণয় করিয়া একখানি পুস্তক বা পুস্তিকা রচিত হউক, আর তাহার ভার নাথ মহাশয়ের ন্যায় লোকের হস্তেই অর্পিত হউক। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয় বিবেচনা করিলে বিশেষ প্রীত হইব। ৩।৪ মাসের পরিশ্রমে এ কার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ কর্ম্মের লোক আমি নাথ মহাশয়কেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে,—আমি যতটা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষা কোন দিনই কথিত ভাষা ছিল না—উহার নামার্থ হইতেই প্রতিপাদন হয় যে, উহা মার্জ্জিত ভাষা। ভাষার কথিত অবস্থা হইতে শব্দ চয়ন করিয়া পণ্ডিতেরা প্রাদেশিক ভাষার সম শব্দগুলির (common word) সহিত একত্র করিয়া লিখিত ভাষার রূপ স্থির করেন; পরে তাহার সংস্কার ও মার্জ্জনাদি কালে হইতে থাকে। বেদের সংস্কৃত ও পুরাণের সংস্কৃত এবং কাব্যাদির সংস্কৃত এক নহে। আমার অনুমান হয়, প্রাকৃত বলিয়া আমরা যে সংস্কৃতের অপভ্রংশ ভাষা পাই তাহা সেকালের কথিত ভাষার রূপ, আর সংস্কৃত সেকালের লিখিত ভাষার রূপ। কথিত ভাষার রূপ অতি প্রাচীন কালে বাঙ্গালার কিরূপ ছিল, তাহা ডাক ও খনার বচনে পাওয়া যায়। ডাকের বচনের পুরাতনত্ব আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া বোধ হয়। সেই ভাষা কালে মার্জ্জিত হইয়া যখন ভারতচন্দ্রের ভাষায় দাঁড়াইল, তখন তাহা একবারে সংস্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের অনেক স্থল এতই সংস্কৃত যে নাগরাক্ষরে লিখিলে, সংস্কৃত জানা অন্য প্রদেশের লোকের বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। ভারতচন্দ্রের ভাষার তুলনায় ডাক ও খনার বচনের ভাষা ইতর ভাষা নাম পাইয়াছে। ইহাও যেমন পরিণতি, প্রাকৃত হইতে বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার আকার নিরূপিত হওয়াও সেইরূপ পরিণতি। মার্জ্জিত ভাষা অর্থাৎ লিখিত ভাষার অবস্থা পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনে যখন অভিধান সাপেক্ষ হইয়া পড়ে, তখন যে ভাষার প্রতি লোকের আর আস্থা থাকে না, সে ভাষা ত্যাগ করিয়া তখনকার চলিত কথিত ভাষার আবার সংস্কার কার্য্য চলিতে আরম্ভ হয়। লিখিত ভাষার নূতন রূপ দেখা দেয়। এই সময়ে কথিত ভাষা আরও সরল হইয়া পড়ে। একটা কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষায় পরিণত করিয়া ফেলিলে কথিত ভাষার আর একটা রূপের উৎপত্তি হয়, আবার কালে তাহার সংস্কার হইয়া তাহাও

লিখিত ভাষার রূপ ধারণ করে। এইরূপে বিভিন্ন সময়ে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ আকার দেখা যায়। প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধেও আমার ঐরূপ ধারণা। প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কতটা ঘনিষ্ঠতা তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। প্রাকৃত ব্যাকরণের যে সূত্রগুলি দ্বারা নাথ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি শব্দ সাধিয়াছেন, আমার বিশ্বাস সকল শব্দে সে নিয়ম খাটাইতে পারা যাইবে না। তিনিও ঐ সকল সূত্রের উদাহরণে যে সকল শব্দের তালিকা দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ পদাবলীর ভাষার শব্দ; ঠিক বাঙ্গালা শব্দের সংখ্যা তাঁহার উদাহরণমালায় বড় কম। এইরূপ পিঙ্গলের প্রাকৃত ছন্দঃ শাস্ত্রে যে সকল প্রাকৃত শব্দ উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সমস্ত তুলসী দাসের রামায়ণেই পাওয়া যায়। এই জন্য বোধ হয় উহা তুলসীদাসের সময়ের বা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ। আমার ধারণা প্রাকৃত ব্যাকরণে ব্রজবুলীর বা পদাবলী সাহিত্যের ভাষার শব্দের অনুকূল সূত্র পাওয়া যায়। ঠিক বাঙ্গালা ভাষার শব্দের অনুকূল শব্দ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র বাবুর ভানু সিংহের কবিতা আর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভাষা আর রায় শেখরের ভাষা তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। আমার আরও বিশ্বাস পদাবলীর ভাষা সংস্কৃতমূলক প্রাকৃত ভাষার ন্যায় কখনও কথিত ভাষা ছিল না। উহা চিরদিনই লেখনীর ভাষা। বিদ্যাপতির কবিতায় বঙ্গীয় ও মৈথিল পাঠ পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। এই বিভিন্নতা দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, রায় বসন্ত, যিনি বিদ্যাপতির ভাষায় এবং পদের অনুকরণে পদাদি লিখিতেন, তিনিই মৈথিল বিদ্যাপতিকে ভাঙ্গিয়া বঙ্গীয় বিদ্যাপতি করিয়াছেন। আসল হইতে নকল ভালই হইয়াছে। পদাবলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার অনুমান, তখন বৃন্দাবনই লোকের প্রিয় তীর্থ ছিল, লোকে সেখানে গিয়া সেখানকার ভাষার অনুকরণে পদাদি রচনা করিত। সেখান হইতে যাহারা আসিত, বিদ্যাপতির অমৃতময়ী কবিতাগুলি তাহাদের বড়ই ভাল লাগিত, এইরূপে মৈথিল ভাষার কবিতার উপর ব্রজধাম প্রত্যাগত পদ কর্ত্তার ভাষার প্রভাবে বাঙ্গালা পদাবলী ভাষার উৎপত্তি। ইহা খিচুড়ী ভাষা। খিচুড়ী হইলেও অমৃতকুণ্ড তবে ভাষার হিসাবে সেটা কিছু নয়। ব্রজবুলীতে অর্থাৎ পদাবলীতে আম্হি তুম্হি আছে, আর শ্রীহট্টের কথিত ভাষায় আজও আম্হি তুম্হি প্রচলিত। অথচ ব্রজবুলী শ্রীহট্টের ভাষার ঘনিষ্ঠ বলিয়া চিহ্নিত নহে। পদাবলীর ভাষা ও প্রাকৃত ভাষার সম্পর্ক নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। আমি প্রবন্ধরচয়িতাকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার প্রবন্ধের এবং গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে আমিও এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। প্রবন্ধ সম্পূর্ণরূপে প্রশংসার যোগ্য। তবে প্রবন্ধের সকল কথা এবং দীনেশ বাবু ইহার আলোচনায় যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ আমি অনুমোদন করি না। দীনেশ বাবুর প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—বাঙ্গালা ভাষা ঠিক সংস্কৃত হইতে, না ঠিক

প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় প্রাকৃত অপেক্ষা বাঙ্গালায় পালির প্রভাব বড় বেশী। প্রাকৃতের মাগধী আর বৌদ্ধযুগের পালিভাষা এক নহে। বৌদ্ধযুগের পালিতে সংস্কৃত রীতি অল্পই বিকৃত, আর প্রাকৃত মাগধীতে বেশী বিকৃত। ঐ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা আছে পরিষদে আমি একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পড়িব। কালিদাস বাবুর পন্থানুসরণ করিয়া যদি কেহ কেহ এইরূপ একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মে বাঙ্গালার শব্দোৎপত্তি নির্ণয়ে অগ্রসর হন, তবেই ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের কার্য্য অগ্রসর হইবে। যাহা হউক দীনেশ বাবুর প্রস্তাবানুসারে পরিষৎ যদি এ কার্য্যের ভার কাহারও উপর নির্ভর করেন তবেই সুবিধা হয়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্য সামান্য। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে ধন্যবাদ সর্ব্বান্তঃকরণে দিতে হয়। এপর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় সুশৃঙ্খলে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে কেহ অগ্রসর হন নাই। তিনি প্রাকৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়া তৎ সাহায্যে যে সকল বাঙ্গালা শব্দ সাধিয়াছেন, তাহা কিছু নিতান্ত অল্প নহে। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। দীনেশ বাবু পিঙ্গলের প্রাকৃত এবং নগেন্দ্র বাবু বৌদ্ধ পালি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও বলিবার কথা আছে। বররুচি প্রণীত প্রাকৃত ব্যাকরণে আমরা দেখিতে পাই, বররুচি প্রাকৃতের চারিটি রূপ দিয়াছেন, এবিষয়ে আলোচনা করিলে বোধ হয় যে কথিত ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার কখনই একত্ব হয় না। লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার সম্বন্ধ থাকে বটে, কিন্তু ব্যাকরণাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যখন কথিত ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হয়, তখন কথিত ভাষার রূপান্তর হইতে থাকে। জমিদারী সেরেস্তার লোকেরা সাহিত্য ব্যাকরণের ধার বড় ধারে না, এখনও না। তথাপি এখনকার একখানা দলীলের বাঙ্গালা ও ৫০ বৎসর আগেকার লিখিত একখানা দলীলের বাঙ্গালা দেখিলেই কালের প্রভাবে ভাষার পরিবর্ত্তন ও কথিত ভাষার লিখিত ভাষায় প্রবেশ চেষ্টা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ব্যাকরণ লইয়া শব্দ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে একখানা ব্যাকরণের উপর নির্ভর করিলে হইবে না। বৌদ্ধ পালিতে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতই অধিকাংশ ছিল; শেষে সে পালিরও কত রূপান্তর ঘটিয়াছে। যাহা হউক আজ দীনেশ বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হউক। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয় এইরূপে শব্দ সংগ্রহ ও তাহার তত্ত্ব নিরূপণে নিযুক্ত হউন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবিষয়ে তাঁহার সহিত যোগদান করুন। আমি জানি তিনি নিজেই পদাবলী সাহিত্যের অনেকানেক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, এখন সেই তালিকা সম্পূর্ণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দের তথ্য ও ইতিহাস নিরূপণ করুন। ইঁহারা পরস্পর সাহায্য করিলে, কাজটা ভালই হইবে। সংস্কৃত শব্দ ভাঙ্গিয়া কেনই বা পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা euphony প্রভৃতি কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

আমার মনে হয়, হয়ত স্থানভেদে মানুষের বাক্‌যন্ত্রের গঠনও ভিন্ন হয়, তদনুসারে সর্ব্বত্র সকল স্বর বা সুর সমানাকারে উচ্চারিত হয় না। কুমিল্লার উচ্চারণে ও এদেশের উচ্চারণে পার্থক্য আলোচ্য বিষয় বটে। আমি অবশেষে আবার প্রস্তাবিত কার্য্যে গোস্বামী ও নাথ মহাশয়কে শীঘ্র শীঘ্র হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, পূর্ব্বপূর্ব্ব বক্তার ন্যায় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়কে আমিও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহার এই প্রবন্ধ এই প্রকার আলোচনার এই প্রথম। প্রথম প্রবন্ধ তিনি যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত উপস্থিত করিয়াছেন, তদনুসারে ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হইলে ভাষার অনেক রহস্য জানা যাইবে। দীনেশ বাবুর ধারণা সংস্কৃত ভাষা কোন দিন কথিত ভাষা ছিল না। সাহেবরাই এ কথা বলেন, আর তাঁহাদের ধারণা ধরিয়াই দীনেশ বাবু একথা বলিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবসাহিত্যে লীলাশুকের গ্রন্থের নাম কৃষ্ণকর্ণামৃত। উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহার সংস্কৃত টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে গ্রন্থ রচনার পরিচয় দিয়া কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, উহা লীলাশুকের গ্রন্থ রচনার হিসাবে রচিত নহে, বৃন্দাবন যাইতে যাইতে পথে ভাবাবেশে সহচরগণের কথা প্রসঙ্গে তিনি মুখে মুখে কৃষ্ণলীলা সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক তাঁহার সহচরেরা লিখিয়া লইত। এইজন্য কৃষ্ণকর্ণামৃতের কোথাও লীলাশুক বিরচিত এরূপ ভণিতা নাই। শুকমুখ উচ্চারিত বলিয়া বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে এখনও লোকে অনর্গল সংস্কৃত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। যতীন্দ্র বাবু অযোগ্য হস্তে ভারার্পণ করিতেছেন। আমার শব্দ সংগ্রহ আছে সত্য, কিন্তু তাহার ইতিহাস সংগ্রহের ক্ষমতা আমার কোথা। ইচ্ছা বটে করিব, এক্ষণে ভগবান্ যতটা করান, তাহাই হইবে।

তাহার পরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য পরিষদের এই সকল আলোচনা অত্যাবশ্যক এবং পরম আহ্লাদের বিষয়। অদ্যকার প্রস্তাব সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। সাহেবেরা এই ভাবে আমাদের ভাষা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক অমূলক কথা আছে, আমাদের চেষ্টায় অমূলক কথা প্রকাশিত হউক। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, পদাবলীর ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা নিরূপণের জন্য অন্যের মুখ চাহিয়া থাকিবার আবশ্যক কি? এ তত্ত্ব নিরূপণের জন্য পরিষদের একটা আজীবন চেষ্টা আরম্ভ হউক। আজকার মত যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। ১০।২০ বৎসরে এ চেষ্টার শেষ না হইলেও এখন হইতে কার্য্য আরম্ভ ও অগ্রসর হউক না? আমি অব্যবসায়ী, এসম্বন্ধে আমি আর বেশী যুক্তি কি দিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ পাঠককে সকলেই ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমিও দিতেছি। এবিষয়ে বেশী বলিবার কিছুই নাই। বলিবার যোগ্যতারও অভাব। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা আমার বড় নাই। ভাষাতত্ত্বের আলোচনার

আরম্ভ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে উহা প্রধান কার্য্য। ভারতের ভাষা আমার বোধ হয় তিন শ্রেণীর—সংস্কৃত, দ্রাবিড়ী ও অপরাপর। হিন্দি, উড়ে, বাঙ্গালা, আসামী সংস্কৃত সম্পর্কে উৎপন্ন; তামিল, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়ী; আর নেপালী, সাঁওতালী, পাহাড়ী প্রভৃতি অপরাপর ভাষা। ভাষার পরিবর্ত্তন অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রাকৃত একরকম নয়, শকুন্তলার, বিদূষক, ধীবর, শকুন্তলার মুখে যে সকল প্রাকৃত আছে, উহা বিভিন্ন প্রকারের। আবার মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃত শকুন্তলার প্রাকৃতের ন্যায় নহে। বিভিন্ন প্রাকৃতের এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সংস্কৃত কোন কালে কথিত ভাষা ছিল না, তাহা হঠাৎ বলা যায় না। প্রথম দৃষ্টিতে হঠাৎ দীনেশ বাবুর মত তাই বলিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু দ্রাবিড়ীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখিলে তাহাতে আবার সন্দেহ হয়। সংস্কৃত কিরূপে প্রাকৃত হইল তাহা নিরূপণ করিতে যাওয়া একটা speculation বলিতে হইবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে নিয়মগুলি কি তাহা অবধারণ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। মাগধী ও শৌরসেনী নামে প্রাকৃতের যে দুইরূপ আছে, তন্মধ্যে মাগধী হইতে বাঙ্গালা, উড়ে, বিহারী, আসামী ভাষার উৎপত্তি আছে, শৌরসেনী হইতে নানাবিধ হিন্দুস্থানীর উৎপত্তি। এতদ্ভিন্ন অন্য ভাষার স্রোতে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। হিন্দুস্থানীর সহিত পারসীক মিশিয়া উর্দ্দু হইয়াছে। প্রথমে মূল বৈদিক সংস্কৃত, পরে পণ্ডিতী সংস্কৃত; তৎপরে পালি প্রাকৃত পরে বাঙ্গালা তাহাও আবার দেশ ভেদে বিভিন্ন, ইহার মধ্যে কি একটা নৈকট্য আছে তাহাই দেখাইলে শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই হইতে পারে। এ বিষয়ে আজকার প্রস্তাব সৎ প্রস্তাব। এইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানের কার্য্যও অগ্রসর হইবে। অবশেষে প্রবন্ধ লেখককে এবং অন্যান্য বক্তাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অতঃপর বিবিধ বিষয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব মত গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ের বিবরণ যাহা আমায় দিতে হইবে, যে সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে দলীলের রেজিষ্টারী দাতার পক্ষ হইতে এবং পাঁচ জন ন্যাসীর মধ্যে তিন জনের পক্ষ হইতে হইয়া গিয়াছে। অপর দুই জনেরও আগামী সপ্তাহে হইবার আশা আছে। উহা হইয়া গেলেই আমরা ঐ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সভা করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যাবধারণ করিব।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ (১৩০৮) ১০ই ডিসেম্বর (১৯০১) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ দিন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদশাস্ত্রী (সহ সভাপতি)
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহ সভাপতি)
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর (নাটোর)
কুমার " শরৎকুমার রায় এম্ এ।
" " হেমেন্দ্রকুমার রায়।
রায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী।
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী।
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম্, এ।
" প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার।
" সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস "
" বলাইচাঁদ গোস্বামী।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি এল্।
" হেমচন্দ্র মল্লিক।
" উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব।
" দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম্, এ।
" সতীশচন্দ্র রায়, এম্. এ।
" অনাথনাথ পালিত, এম্, এ।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ।
" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম্, এ,
" কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, এম্ এ।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি, এল।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
" জগদীশচন্দ্র বসু, বি, এল।
নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল।
শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল।
কবিরাজ নবকান্ত সেন।
করুণাকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন।
পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
শতাবধানী শ্রীরাম শাস্ত্রি
প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
মনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন।
রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
বীরেশ্বর পাঁড়ে।
নগেন্দ্রনাথ বসু।
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ।
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
মৃণালকান্তি ঘোষ।
রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
নরেন্দ্রনাথ সেন।
নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
যতীন্দ্রনাথ বসু।
রমেশচন্দ্র বসু।
তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
অক্ষয়কুমার বড়াল।
হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।
কুঞ্জলাল রায়।
বীরেশ্বর গোস্বামী।
গিরিশচন্দ্র বসু।
শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।
বামনচন্দ্র দাস।
গোবিন্দলাল দত্ত।
বাণীনাথ নন্দী।
সুরেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু।
„ সতীশচন্দ্র বসু।
„ কালিদাস নাথ।
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ অম্বিকাচরণ দাস।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি,এল। (সম্পাদক)
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ, } সহঃসম্পাদক

এতদ্ভিন্ন আরও বহুতর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল। (১) কার্য্যবিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কর্তৃক একখানি পুরাতন দলীল (খ) মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক "রাগ কল্পদ্রুম" নামক গ্রন্থ। (৪) প্রবন্ধ-পাঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বাঙ্গালা ভাষা ও ব্যাকরণ" নামক প্রবন্ধ, (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশানুসারে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল আঢ্য ৩৯।১নং বেণেটোলা ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	২। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট।
		৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১১৪নং অপারসারকুলার রোড।
		৪। শ্রীযুক্ত হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ১১৪নং অপারসারকুলার রোড।
		৫। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, মহাফেজ হাইকোর্ট আপিলেট সাইড
		৬। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল, চঁচুড়া
		৭। শ্রীযুক্ত প্রেমতোষ বসু, ১১৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	৮। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এম, এ,
, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৯। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যাপার কতটা অগ্রসর হইল, তাহার বিবরণ দিবার ভার

আমার উপর আছে। আজ সে সম্বন্ধে কতকটা বিবরণ আমি দিতে পারিব। আপনারা দেখিতেছেন, আমাদের স্থানের কিরূপ কষ্ট। এই কষ্ট সহ্য করিয়াও যে আপনারা আসিয়াছেন, ইহাতেই পরিষদের প্রতি আপনাদের বিশেষ অনুরাগ আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে। যে সকল ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে পরিষদের প্রতি দিন দিন সাধারণেরও অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক কাশিমবাজারের বদান্যশ্রেষ্ঠ মহারাজের কৃপায় আমাদের এই স্থানের কষ্ট ঘুচিয়াছে, সাত কাঠা জমি তিনি দান করিয়াছেন। তাহার দলীলও রেজিষ্ট্রী হইতেছে। পাঁচ জন ট্রাষ্টী বা ন্যাস রক্ষকের মধ্য হইতে তিন জনের রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। বাকি দুই জনের রেজিষ্ট্রীও আশা করি এই সপ্তাহের মধ্যে হইয়া যাইবে। অদ্য একটা কথা বলিব। এতদিন দলীল পাই নাই তাই বলিতে পারি নাই। এখন যাহাতে উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারা যায়, আপনারা তাহার চেষ্টা করুন। চাঁদার খাতা উপস্থিত আছে, যাঁহার যাহা ইচ্ছা সহি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন। এই আমার প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ইহার সমর্থন করিলেন, কিন্তু কেহই সভাস্থলে স্বাক্ষর করিতে অগ্রসর না হওয়ায়, সেদিন এ প্রস্তাব অনুসারে কোন কার্য্য হইল না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—যে দলীল খানি দেখাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে সে সম্বন্ধে আরও অনেক দলীল ও বিবরণ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। নগর কীর্ত্তনে যে খণ্ডি বাহির হয়, সেই খণ্ডি কি, তাহার বিবরণ কি, বৈরাগী বিবাহে পাঁচ সিকার যে কণ্ঠী বদলের ব্যবস্থা আছে তাহার এবং বৈষ্ণবাপরাধে বৈরাগী সমাজের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি ঐতিহাসিক কথার ইতিহাস এই সকল দলীল হইতে প্রকাশিত হইবে, আর বিশেষতঃ আমি এখনও সমস্ত দলীল দেখিয়া উঠিতে পারি নাই, সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আজ এ দলীল প্রদর্শন বন্ধ থাক, পরে এ বিষয়ের প্রবন্ধ সহ দলীল উপস্থিত করিব।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তখনও উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার গ্রন্থ প্রদর্শনও বন্ধ রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [এই প্রবন্ধ ১৩০৮ সালের পৌষের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।]

যুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—রবীন্দ্র বাবু ভারতীতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে গিয়া প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য তিরস্কার বিদ্রূপ করা, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। ইহার উত্তর যে হয় না তাহা নহে, তবে আমি এখন কিছু বলিব না, আমি আমার বক্তব্য লিখিয়াই বলিব। তিনিও যদি তাঁহার প্রবন্ধে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি বলিতেন, তবে আপত্তি ছিল না। সাহিত্য-পরিষদে যদি আমার প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ হয়, তবে তাহাই হইবে; নতুবা পত্রান্তরে প্রকাশ করিব।

ব্যাকরণ প্রভৃতি লইয়া রহস্য বিদ্রূপ করা খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে খাটুক। রবীন্দ্র বাবুর এ সকল উপহাস অন্যায় স্থলে অন্যায়রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হউক ; পরে দেখাইব, তাঁহার প্রত্যেক কথা আপত্তি যোগ্য। আমি আজ আর কিছু বলিব না।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী বলিলেন,—আমাদের দেশের প্রতিভাবান কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; তাহা পারিলে ভাল, কিন্তু তাহা পারিবার উপায় নাই। সংস্কৃতের বন্ধন মোচন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে বড়ই কুফল ফলিবে। এখন বন্ধন থাকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় যে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা নিবারণ আবশ্যক হইয়াছে। আমি আপাততঃ যে কার্য্যে ব্রতী আছি, তাহাতে আমার হাতে ভাষায় বিকারাবস্থার নানারূপ আদর্শ উপস্থিত হয়। শব্দের অপপ্রয়োগ উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগ ভাষায় এত চলিয়াছে যে, দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দেখিতে পাই কেহ লিখিতেছেন—"লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্য" কেহ লেখেন "যাঁহার আত্মায় জগৎ সম্ভাবান্"—কেহ লেখেন "হৃদয়হারিণী নৃত্য"—এই সকল বাক্যের ভাব বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিতে হইলে বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে মুক্তি দিলে চলিবে না। আর যদি তাহা দিতে চেষ্টা করা যায়, তবে হয়ত ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল প্রয়োগের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কি, ঠিক্ বুঝি নাই, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর কথাগুলি বুঝিয়াছি। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে মুক্তি দিয়া কিরূপে চালাইবেন, বুঝিতে পারি না। ভাষার প্রকৃতি যাহাই হউক, তাহাকে অপপ্রয়োগের হাত হইতে রক্ষা করা উচিত। এরূপ স্থলে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন,—এ সভায় যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, সে বিষয়ে আমার ন্যায় লোকের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে এসম্বন্ধে আমার মতামত বহুকাল হইতেই রবীন্দ্র বাবু জানেন। আমার মত,—বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকৃতি, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ যত বেশী প্রবেশ করিবে, ততই দোষের হইবে। কেন, তাহা এখন বলিতে গেলে যথেষ্ট সময় নষ্ট হইবে। যদি সুযোগ হয়, পরে বলিব। শাস্ত্রী মহাশয় যে দুই প্রকার patent বাঙ্গালা ব্যাকরণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছে, ইহা বড় সুখের বিষয়। ভাষার আকার বা form কি, ব্যাকরণ তাহা দেখাইয়া দেয়, ব্যাকরণ form গড়িয়া দিতে পারে না। বাড়ন্ত জিনিষকে নিজের মত করিয়া ছাঁটা যায় না। বাঙ্গালা ভাষা এখন বাড়িতে চলিয়াছে, এখন ইহাকে ব্যাকরণের সাহায্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ভাষার পরিপুষ্টির জন্য যদি সংস্কৃত শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় রাখিতে হয়, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিয়া চলিতে হইবে।

বানান সম্বন্ধে রবীন্দ্র বাবু বলেন, যেটা বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, সেটা বাঙ্গালার মত লিখিতে হইবে,—কিন্তু অনেক স্থলে কার্য্যতঃ আমরা তাহা করি না; লক্ষ্মী, সঙ্গী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা উচ্চারণ অনুসারে বানান করিয়া লিখি না। লেখাও শক্ত, কারণ কোথায় দাঁড়ি টানিব, তাহা জানা যায় না। কোন্‌গুলা সংস্কৃত কোন্‌গুলা বাঙ্গালা শব্দ, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোথায় তফাত, কোথায় মিল, তাহা কিরূপে ধরা যাইবে? এরূপ স্থলে আমার জিজ্ঞাস্য বাঙ্গালা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত বলিয়া বাছিয়া কিরূপে কোথায় দাঁড়ি টানিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলে ভাল হয়।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বলিলেন,—যখনই ঝগড়া তখনই ভুল আছে, স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীন না পরাধীন? রবীন্দ্র বাবু বলেন স্বাধীন, আর সে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। ইহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহার স্বাধীনতা স্বতন্ত্র আছে ইহা যথার্থ। ইংরাজী ভাষাও ঐরূপ ল্যাটিন জাত, কিন্তু ল্যাটিন হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে। Termination, লিঙ্গ, প্রত্যয় প্রভৃতিতে সে স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। বাঙ্গালারও সেইরূপ। তবে উচ্ছৃঙ্খলতা না আসে সে জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক, আর সেজন্য ব্যাকরণই প্রধান সহায়। এজন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই মেলামেশার সময় স্বাধীনতা টুকু নষ্ট না হয় এটুকুও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেবল সংস্কৃতমূলক ব্যাকরণ হইলে বাঙ্গালা ভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বলিলেন,—আজকার প্রবন্ধে বিচারে লক্ষ্য নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাওয়া হইতেছে। এমন কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণ অর্থাৎ হাইলি পেটেণ্ট বা মুগ্ধবোধ পেটেণ্টের বর্ত্তমান কোন বাঙ্গালা ব্যাকরণই যে দাগী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সংস্কৃত রীত্যানুসারে "দাগিনী" লিখিতে বলেন, তাহা ত আমি দেখি নাই। সে কথা যদি কোন ব্যাকরণে থাকে, তবে তাহা উৎসন্ন যাক্। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ যে সংস্কৃত নিয়মে চলে— এ কথাই নয়, রূপবতী সংস্কৃত, রূপসী সংস্কৃত নয়, অথচ রূপসী শব্দকে সংস্কৃত নিয়মে বানান করিতে হইবে একথা কেহই বলে না। বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষার নানা রূপ বিকৃত শব্দ আছে, সেই সমস্ত বিকৃত শব্দ লইয়াই যদি ভাষার আকার স্থির করিতে হয়, তবে নাচার। যত রাজ্যের করিমু, খাইমু, যাইমু, কর্‌বা, খাবা, যাবা, করমু, খামু, যামু লইয়া ভাষার কাজ চালাইতে হয়, তবে সে ভাষা পড়িয়া বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থানের লোক কি বুঝিতে পারিবে? কাজেই সাহিত্যের ভাষায় আকার একটা স্বতন্ত্র হওয়া চাই। সম্প্রদান কারক লইয়া একটা বড় আপত্তি উঠিয়াছে। দূর হোক্ সম্প্রদান গেলেই যদি বিবাদ মিটে মিটুক; সম্প্রদান থাকিলেও যে "কে" বিভক্তি, না থাকিলেও সেই "কে" বিভক্তির ব্যবহার থাকিবে ত, তা যে না থাকে থাকুক। সাহিত্যের ভাষার ব্যাকরণ আবশ্যক। তদ্ধিত কৃৎ সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা, তাহার লক্ষণ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণে সেগুলার প্রয়োজন কি? কারণ সে লক্ষণের সঙ্গে এখনকার তর্কের বিষয়গুলা মিলিবে না। সাধারণতঃ বাঙ্গালার সকল

কারকে "এ" বিভক্তি হয়, যদি কর্ম্মে ও সম্প্রদানে "কে" বিভক্তি হয় বলিয়া দুটা নাম তুলিয়া একটা নাম রাখিলেই চলে, তাহা হইলে "এ" টাকে কোন্ কারকের বিভক্তি বলিতে হইবে? অথবা উহাকে বিভক্তি বলিয়াই কাজ নাই। বিভক্তি অর্থ বোধের জন্য; বিভক্তির নাম না জানিলে কি আর অর্থ বোধ হইবে না? শব্দ গঠনের জন্যই ব্যাকরণ। এখন বাঙ্গালা শিখিয়া ছাত্রেরা পরে সংস্কৃত শিখে; সুতরাং আমাদের মত ব্যাকরণকারদিগকে সেই সকল ছাত্রদের মুখ চাহিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়; ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাদের সংস্কৃত পড়িতে গোল না ঘটে বা সুবিধা হয়, এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে মিল রাখিয়া ব্যাকরণ লিখিতে হয়। ব্যাকরণের আর একটা উদ্দেশ্য ভাষায় একটা একতা রক্ষা করে, যথেচ্ছাচার না ঘটে। আজ যে প্রবন্ধ শুনিলাম, ইহা সত্য নির্ণয়ের বক্তৃতা নহে। আগাগোড়া বিদ্রূপ আর শ্লেষ। এরূপ বিদ্রূপে অপর পক্ষ ব্যথা পায়। হইতে পারে সে মূর্খ, কিন্তু তাহার মূঢ়ত্ব লইয়া বিদ্রূপ করাই পাণ্ডিত্য বিজ্ঞত্ব নহে। জেদ বজায় করিবার চেষ্টা বড় দূষণীয়। ভট্টাচার্য্যের ঝগড়ায় মীমাংসা বড় কম। এইরূপ জেদ বজায় করিতে গিয়া সংবাদপত্রে ঝগড়া ঢুকিয়া সেগুলা মাটী হইয়াছে, এখন দেখিতেছি এই জেদ বজায়ের জন্য সভাগুলা মাটী হ'বে।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—একটী প্রশ্ন এই যে ব্যাকরণ নিয়ে এত মতামত হইতেছে কেন। ব্যাকরণ একখানা লিখিতে হইবে, সেটা কোন্ ভাষার হইবে, ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা পড়া বড় বেশী দিন হইতেছে না। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় সাহেব সিভিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। সেই কলেজে সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরা গদ্যে পুস্তক লিখিতে লাগেন। বাঙ্গালা গদ্যের তখন তিন রূপ। এই কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের রচনা একরূপ। আদালত প্রভৃতিতে পারসী শব্দের আধিক্য মিশ্রিত একরূপ, দোকানদার, জমীদার, মহাজন, উকীল মোক্তার প্রভৃতির মধ্যে সে ভাষা চলিত। আর কথক মহাশয়েরা আর এক ভাষায় দেশের সাধারণ লোক ও স্ত্রীলোকের নিকট পুরাণাদি ব্যাখা করিতেন। তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের ভাষায় বহুল সংস্কৃত শব্দ আসিয়া পড়িত। আদালতী বা কিতাবতী বাঙ্গালায় পারসী শব্দের বহুল ব্যবহার হইত, তাহার একটা খিচুড়ি রকম সাহিত্য আছে, তাহাকে এখন মুসলমানি বাঙ্গালা বলা হয়। আর কথক মহাশয়েরা দেশের সাধারণ লোকের বোধ্য ভাষায় যে কথকতা করিতেন, তাহা ঠিক slang নয়। তার পর Education Committee শিক্ষা বিভাগ হইল, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালা পুস্তক লিখিবার ভার পাইলেন। তাঁহারা দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার সুখ বোধ্য যে একটা ভাষা আছে, আর সে ভাষার গদ্যে নহে পদ্যে যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে সংবাদ রাখিতেন না। কথকতার ভাষায় কোন লিখিত গ্রন্থ ছিল না। তাঁহারা

লিখিত ভাষার আদর্শ যাহা পাইলেন, তাহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মহাশয়গণের ভাষা আর আদালতী বা কিতাবতী ভাষায় দলীল দস্তাবেজ খাতাপত্র। কাজেই তাঁহারা ভাষার সংস্কার করিতে বসিয়া যাহা করিয়া তুলিলেন তাহাতে ঝুড়িঝুড়ি সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া গেল। কারণ তাঁহারা সেই ভাষাই ভাল জানিতেন, দেশের ভাষার খোঁজ রাখিতেন না। ক্রমে তাঁহাদের পরে যাঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, তাঁহারাও তাঁহাদেরই অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হইল বেতাল পঞ্চবিংশতি। দুঃখের বিষয় এই যে সে বাঙ্গালা বাঙ্গালীরা বুঝিল না, সংস্কৃত শব্দের অভিধান ও ব্যাকরণ ভিন্ন তাহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দুরূহ হইল। আর একখানি পুস্তক রেখাবতী, তাহা আবার বেতালেরও বাড়া। অভিধান ভিন্ন ইহার এক পংক্তির অর্থ সংগ্রহ হওয়া দুরূহ। শেষে যাহা হইবার হইল,—প্রথমে এইরূপ যাঁহারা সংস্কৃত শব্দ বহুল বাঙ্গালা ভাষা লিখিতেন, তাঁহারা সংস্কৃতের পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই তাঁহারা ব্যাকরণ বজায় রাখিয়া লিখিতেন, শেষে যাঁহারা অনুকরণ করিতে গেলেন, তাঁহারা অনেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের ধার বড় ধারিতেন না। কাজেই আবার একটা খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি হইল। ইহার পর একটা প্রতিঘাত হইল, হুতোম প্যাঁচার নক্সা বাহির হইল। তখন ভাষায় যে আর একটা দিক আছে, তাহার প্রতি কাহারও কাহারও দৃষ্টি পড়িল। বঙ্কিম বাবু এই সময় অল্প মাত্রায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া এক নূতন ধরণের লিখিতে লাগিলেন। দেশের লোক যেন প্রাণ পাইল, দেখিতে দেখিতে সেই ভাষার অনুকরণে দেশের সংবাদ পত্রাদি ছাইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ভাষা দেখিয়া বলিতেন, আমি সংস্কৃত শব্দ গুলা সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করি, আর বঙ্কিম সেগুলা অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করে; সাহিত্য পরিষদের চেষ্টা এখন সফল হইয়াছে। পণ্ডিতী বাঙ্গালা গদ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এদেশে একটা সাহিত্য ছিল, আর তাহাতে পদ্যে ১০০০।২০০০৷ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়েরা ইহার একখানাও পড়িতেন না বা সংবাদ রাখিতেন না; রাখিলে এ ভুল তাঁহারা করিতেন না। সেই ১০০০।২০০০ গ্রন্থ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্যই ভাষার ধারা স্থির করিতে পারিতেন। তাঁহারা যাহা করেন নাই, আমাদের তাহা করিতে হইবে। আমরা যখন সেই ১০০০।২০০০ গ্রন্থ হাতের কাছে পাইয়াছি, তখন তাহাদের আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ প্রকৃতি কি, তাহা স্থির করিতে চেষ্টা করিব, এবং তদনুসারে ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনের চেষ্টা করিব। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলিতে আমরা আর শব্দ সাধনের নিয়ম পুস্তক চাহি না। বৈদিক সংস্কৃতের একখানা ব্যাকরণ ছিল; তাহা কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাণিনির ব্যাকরণ হয়, তাহার কত পরে আবার বার্ত্তিক হয়। যদিও বাঙ্গালা ভাষার প্রথমাবস্থায় বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির দ্বারা কার্য্য চলিয়া গিয়া থাকে, এখনও কি আর তাহার সংস্কারের সময় হয় নাই? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার অনুকরণ আর এখন কেহ করে না, এখন যে ভাষায় লেখা পড়া গ্রন্থ রচনা চলিতেছে, তাহার style স্বতন্ত্র। এই style

অনুযায়ী একখানা বাঙ্গালা ব্যাকারণ হওয়া কি আবশ্যক নহে? গ্রন্থ রচিত হয় কেন? দেশের লোককে বক্তব্য বুঝাইবার জন্য; ভাষাবিৎ শিল্পিগণের শব্দ চকচির জন্য নহে। বাঙ্গালার ছাঁচ স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে এই আলোচনায় যে একটু জেদাজেদী হইতেছে, আমি ইহা শুভ বলিয়া মনে করি। প্রাণে জেদ না থাকিলে কেহ আসলের জন্য খাটিবে না। তরকারীতে ঝাল থাকা মন্দ নহে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় Vernacular Education Society যখন হয়, তখন সংস্কৃত জানা পণ্ডিত মহাশয়েরাই বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিবার জন্য অগ্রণী হইতেন। কাজেই বাঙ্গালা ভাষা নিজের ছাঁচ ছাড়িয়া সংস্কৃত ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই কথাটা বুঝান শক্ত নয়, কিন্তু বুঝিতে যে কেন শক্ত লাগিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। কথাটা উপেক্ষায় নয়, ধীর ভাবে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক। সন্ধির কথায় এই টুকু বলি বাঙ্গালায় সন্ধির নিয়ম সর্ব্বত্র আমরাও মানি না, পণ্ডিত মহাশয়েরাও মানেন না। তাঁহারাও "অপ্রতিহত প্রভাবে অপত্য নির্ব্বিশেষে" এই বাক্যাংশে সন্ধির সূত্রানুসারে পদ লিখিতে নারাজ, অথচ ব্যাকরণের সন্ধির সমস্ত সূত্রগুলি দিতে ছাড়েন না। বাক্যের শেষে একটি বাঙ্গালা ক্রিয়া পদ মাত্র ব্যবহার করিয়া আগা গোড়া দেড় গজী সংস্কৃত সন্ধি সমাস নিবদ্ধ পদ ব্যবহার করিলে বাঙ্গালা লেখা হয় না। পণ্ডিত মহাশয়দের পরে যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ না জানিয়া ঐরূপ ভাষা লিখিতে যান, তাঁহারই সুন্দরী মুখ লেখেন, তাহাতে আমরাও চটি। শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষায় যিনি যত বেশী fail হন, দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় তিনিই তত বড় গ্রন্থকার হন আমরা সংস্কৃত ছাড়িতে চাহি না। দুটাই আমাদের আবশ্যক, তবে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। অম্বর-ঘম্বর শব্দের খাতিরে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ সাধনেব নিয়ম বাঙ্গালা ব্যাকণে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন,—রবীন্দ্র বাবুর মতের সহিত আমার মতের সর্ব্বাংশে মিল আছে। ভাবিয়াছিলাম, আজই আবার প্রতিবাদ শুন্‌তে পাইব, কিন্তু তাহা হইল না, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মুলতুবী রাখিলেন। প্রতিবাদের অপেক্ষা পাঁড়ে মহাশয় যে সদুপদেশ দিয়াছেন তাহাতে উপকৃত হইলাম, তাঁহার কথায় বক্তব্য কিছু নাই। প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল, তাহাতে বোধ হইল যে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি তাহা অনেকের মনে নাই। রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় আমারও বিশ্বাস বাঙ্গালা ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা, তাহা সংস্কৃতের আদেশ অনুসারে গড়া উচিত নহে। রবীন্দ্র বাবুর উদাহরণে দুই চারিটা ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি? সেক্ষপীয়ারেরও ভুল আছে, বর্কেও ভুল আছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ কি ভাবে পঠিত হ'বে, তাহা ভাষা বিজ্ঞান তুলনা করিয়া পড়ুন বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ মিটিয়া যাইবে। অন্যান্য ভাষার সহিত তুলনা করিয়া ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, ভাষায় ব্যাকরণের প্রাণ কি? আমার যতটা অনুমান হয় তাহাতে বাঙ্গালার মধ্যে সমাস নাই। বাঙ্গা-

লায় যাহা দেখিতে পাই, তাহা সংস্কৃতের আমদানী। প্রমথ বাবু যে বানান সম্বন্ধে কোথায় দাঁড়ি টানিবেন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় বাঙ্গালা একবারে সংস্কৃত হইতে হয় নাই, মধ্যে পালি প্রাকৃত প্রভৃতি নানা অবস্থা আছে। মাঝের ধাপগুলি বিচার না করিয়া দাঁড়ি টানা যায় না, টানিতে গেলে প্রকৃতির বিপরীত হইয়া যাইবে। মাঝের ধাপগুলি ঠিক হইয়া গেলে দাঁড়ি টানিতে কষ্ট হইবে না। যেমন কার্য্য—কজ্জ—কাজ। প্রাকৃতে "জ" আছে, কাজেই কাজ শব্দের জবর্গই হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ ও তাঁহার আলোচনা শুনিয়া বোধ হইল, রবীন্দ্র বাবু সূত্রকার বেদব্যাস আর হীরেন্দ্র বাবু তাঁহার ভাষাকার শঙ্কর। হীরেন্দ্র বাবু বলিতেছেন বাঙ্গালায় সন্ধি সমাস নাই। আমার বোধ হয় আছে। লাঠা লাঠি, গুঁতো গুঁতি, মারা মারি প্রভৃতি পদগুলিকে সমাস বদ্ধ বলিব না কেন? বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কার করিতে গিয়া যাঁহারা প্রাকৃত ব্যাকরণের কথা তুলিতেছেন, তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে প্রাকৃত ব্যাকরণের সমস্ত সূত্রই সংস্কৃতানুরূপ, কেবল কতকগুলা বর্ণ পরিবর্ত্তনের নিয়ম বেশী আছে, তাহাও সংস্কৃত শব্দের বর্ণ পরিবর্ত্তন লইয়াই গঠিত এবং তাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের দোহাই আছে। আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত বলি, আর পালি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আগতই বলি, মূলে যে উহার সহিত সংস্কৃতের বিশেষ সম্পর্ক আছে। কাজ শব্দ যে কজ্জ হইতে হইয়াছে বলিব সে কেবল "জ"কে রক্ষা করিবার জন্য, নতুবা যদি "য" দিয়া লিখি তবে "কার্য্য" শব্দের অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার নৈকট্য উপেক্ষা করা আমার মতে কতকটা নিমকহারামী। সংস্কৃতের অস্থি মজ্জায় বাঙ্গালার উৎপত্তি বাঙ্গালার পরিপুষ্টাবস্থায় সংস্কৃতকে দূরে পরিত্যাগ করা বড়ই অকৃতজ্ঞতার কথা। ব্যাকরণ লইয়া যে উভয় দলে মতভেদ হইয়াছে, আমার সে বিষয়ে বোধ হয়, সত্য হইতে উভয় পক্ষই দূরে দাঁড়াইয়া তর্ক করিতেছেন। Aristotle বলেন, সত্য সর্ব্বদাই উভয়পক্ষে থাকেন। এস্থলেও বোধ হয় সত্য উভয় মতের মধ্য স্থানেই আছে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, ব্যাকরণের প্রবন্ধ শুনিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এই মহতী সভায় তর্ক ঘটার মধ্যে পড়িয়া নিপাতনের মত একদিকে পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক, বুঝিলাম বাঙ্গালা ব্যাকরণের উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। ব্যাকরণের আবশ্যকতা কি? পদ গঠনের জন্য নহে, সিদ্ধ পদ সাধনের জন্যই ব্যাকরণ শাস্ত্র, সুতরাং বাঙ্গালা ব্যাকরণ যে কিরূপ হইবে, তাহার জন্য এত বিচার বিতর্কের প্রয়োজন কি? ব্যাকরণের বাদ প্রতিবাদে বুয়র যুদ্ধের মাক্সিমগনের আবির্ভাব না হওয়াই ভাল। সাহিত্য পরিষদে আলোচনার সময়ে এরূপ পরিষদের অযোগ্য কার্য্যটা না হওয়াই প্রার্থনীয়। এরূপ ভাবে বাদ প্রতিবাদ প্রয়োজন হইলে কাগজে কাগজে হওয়াই ভাল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাদের বিশেষ কিছু নাই, তবে তাঁহারা যদি এখনই ব্যাকরণ লিখিতে অগ্রসর হন, তবে সে চেষ্টা নিরর্থক হইবে, কারণ সজীব ভাষার ব্যাকরণ হয় না। এখন বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা, তাহাতে ইহার ব্যাকরণ হইতে পারে না। এ ভাষার এখনও বহু পরিবর্ত্তন হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বত্র একার্থবোধক একরূপ শব্দ প্রচলিত নহে, সুতরাং পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কথোপকথনের ভাষার ব্যাকরণ হয় না। Slang শব্দের ব্যাকরণ হয় না। কেতাবী ভাষার ব্যাকরণ হইতে পারে। পালি ভাষায় যে ব্যাকরণ পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুরূপ।

তাহার পর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যাকরণ শব্দের অর্থ সংস্কৃতে যাহা, বাঙ্গালায় তাহা নহে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাঙ্গালীর জন্য নাও আবশ্যক হইতে পারে। যাহারা শব্দের উৎপত্তি ও প্রকৃতি জানিতে চাহে, তাহাদের জন্যই ব্যাকরণ আবশ্যক। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে বাঙ্গালার সমস্ত শব্দ প্রথমে সংগ্রহ করা আবশ্যক। তাহার পর সেই শব্দ রাশি আলোচনা করিয়া ব্যাকরণের চেষ্টা করা উচিত। সে সময়ে যদি সংস্কৃত ব্যাকরণের অপেক্ষা করিতে হয়, করা হইবে। পরিষৎ এদিকে চেষ্টা করিয়া একটা মহৎ কার্য্য করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, এত কথার পর আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমি বলিয়াছি বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাঙ্গালা নিয়মে চলিবে, সংস্কৃত নিয়মে চলিবে না, একথার প্রতিবাদ কেন হয় বুঝি না। পণ্ডিত মহাশয়েরা মুখে যাহা বলিয়াই প্রতিবাদ করুন না কেন, মনে মনে আমার কথাটা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমিই ব্যাকরণ লিখিতেছি বা লিখিব এরূপ দুরভিসন্ধি আমার? আমি কতকগুলা শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণের কার্য্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই কি আমার এতটা অপরাধ হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল শব্দকে slang বলিয়া ঘৃণা করেন আর ভাষার মধ্যেই আমিই এই সকল slang আমদানী করিতেছি বলিয়া আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমি আমদানী করিতেছি এটা কি রকম কথা? পিতৃ পিতামহাদি হইতে এই সকল শব্দ কি আমরা পাই নাই। আজ সবগুলিকে কুড়াইয়া একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছি, ব্যবহার করিবেন আপনারা। তাহাদের মধ্যে যদি সংগ্রহের দোষে দু একটা বিজাতীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি কি? ব্যবহারের সময়ে বিচার করিয়া লইবেন। সংগ্রহকারকের হস্তে বিচারভার দিতে নাই, তাহা হইলে অনেক আসল জিনিস বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যয়গুলির আমি যে রূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই প্রত্যয়ের প্রকৃত রূপ

বলিয়া আমি আপনাদের গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমার নিজেরও সে বিষয়ে সন্দেহ যে নাই এমন নহে। আরও একটা কথা আমি যতগুলা প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছি, তাহা দেখিয়া আপনাদেরও কি ধারণা হয় না যে বাঙ্গালা প্রত্যয় বলিয়া কতকগুলা পদার্থ বাস্তবিকই আছে, তা সেগুলার রূপ, আমি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই হউক আর আপনারা বিচার করিয়া যাহা স্থির করিতে পারেন তাহাই হউক। অনেকের মনের গূঢ় ভাব এই যে অধিকাংশ কথাই যখন সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারা বাঙ্গালা ব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না। তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশ্যক। আমি ত কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি। সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্নকর্ত্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না। সুতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশ্যক। আমার গলদ্ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইল? বাঙ্গালা ব্যাকরণে কতকটা পরিমাণ সংস্কৃত নিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দ সংগ্রহ দেখিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন যে ভাষা হইতে সংস্কৃত শব্দগুলির চিরনির্ব্বাসনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কিছুই আত্যন্তিক রকম ভাল বলি না। সংস্কৃত শব্দের সমাস ঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোন দিন বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। তা কোন দেশেই হয় না। এক সময়ে ইংলণ্ডে Anglo Saxon দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা টিকিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল। তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃত শব্দ হজম করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই; সে সকল নাই তাহার কারণ এই ভাষায় যে সকল কথা বলিবার আবশ্যক কোন দিন হয় নাই সুতরাং সে সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত "ঘৃণা" বাঙ্গালায় "ঘেন্না" হইয়াছে কিন্তু তাহাতে "ঘৃণার" অর্থ বজায় নাই। "পিরীতি" শব্দে "প্রীতির" অর্থ নাই। কাজেই এ সকল শব্দের মূলানুসন্ধান না করিলে বিশেষ ফল কি হইবে? এইরূপ অর্থান্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হইলে, আমাদের

বাঙ্গালা শব্দ ভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিবে না। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ লইয়াই সকল ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গাল শব্দের বানান লইয়া যে দাঁড়ী টানিবার কথা উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যন্ত বলি, আমি কিছুই পাকাপাকি করিয়া দিই নাই। এ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা দীনেশ বাবু ভাল বলিতে পারেন, কত প্রাচীন কাল হইতে কোন শব্দের কি বানান লেখা চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় যখন "শ্রবণ" হইতে "শোনা" লিখিবার সময়ে "ন" লেখা হয় মুর্দ্ধণ্য "ণ" লিখিলে ভুল হয় তখন স্বর্ণ হইতে "সোনা" যদি "ন" দিয়া লিখি তবে ভুল কেন হবে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যে অপরিবর্ত্তনীয় তাহাই যে সর্ব্বথা গ্রাহ্য, একথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাঙ্গালা ব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—রোগ নির্ণয়ে যদি ডাক্তারে ডাক্তারে বিবাদ হয় তবে আমরা আর কি করিতে পরি? এ সকল বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা আবশ্যক, বিচার বিতর্ক প্রয়োজন, এরূপ স্থলে শ্লেষ বিদ্রূপ করা বা অপমান বোধ করা উচিত নহে। এ সকল বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইলে ঝাল মিটাইবার ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত। ভাষার প্রাণ কি তাহা বুঝিয়া ব্যাকরণ গাড়তে নিয়ম আবশ্যক হয় না। ভাষা আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। বাঙ্গালা ভাষার জন্য নিয়ম করা চলিবে না। আমরা পরিষৎ হইতে যদি বলিয়া দিই, ভাষা এমন হবে না অমন হবে, তাহা কেহ লইবে না। বাঙ্গালা ভাষার এখন একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা ভাল কি মন্দ, তাহা বিচার করিয়া দেখাইতে গেলে কেহ দেখিবেও না। ভাষার বদল কেহ করিতে পারে না। তাহা আপনিই হয়। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য তাহা নহে। উহা ভাষার রীতি নীতি দেখাইয়া দিবার ও বুঝাইবার জন্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকা মাত্র। সুতরাং ভাষায় যাহা আছে, ব্যাকরণে তাহা রাখিতে হইবে বা থাকা চাই। কেবল সংস্কৃত কথা লইয়া বাঙ্গালা ভাষা নহে, সুতরাং কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাদির অনুবাদ দিলে চলিবে না। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ যে শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের ব্যবহার ও গঠন সম্বন্ধে নিয়মাদি বাঙ্গালা ব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন। লিখিত ও কথিত ভাষায় এক হয় না। গ্রাম্য ভাষা বা কথিত ভাষার ন্যায় চিরকালই স্বতন্ত্র থাকিবে। Dialectical গোলমাল মিটাইবার জন্য সাহিত্যের ভাষা স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য কি গ্রাম্য শব্দের বাহুল্য হইলে ভাল হয় তাহা এখনও ঠিক্ বলা যায় না। আপাততঃ দুইই পাশাপাশি সমান দরে ব্যবহার হইতেছে। ব্যাকরণ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যে, ভাষার যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার একটা নিয়ম বাহির করা আবশ্যক। এই নিয়মের জন্য কেহ যদি নূতন পথ দেখান, তবে

সে পথে কতকটা অগ্রসর হইতে পারি তাহা আমাদের দেখা চাই। ইহা আবার ধীরতার সঙ্গে দেখা চাই। পরিষদের এই বৃহৎ কার্য্যটি সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইলে সুখী হইব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৮শে পৌষ (১৩০৮), ১২ জানুয়ারী (১৯০২) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
" মতিলাল ঘোষ।
" রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
" কুমার শরৎকুমার রায়।
" রমেশচন্দ্র বসু।
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
" অমরনাথ দত্ত।
" দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ।
" শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
" দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
" দীনেশচন্দ্র সেন।
" কিরণচন্দ্র দত্ত।
" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
" রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী।
" অবিনাশচন্দ্র ঘোষ।
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" অতুলকৃষ্ণ বসু।
" গোবিন্দলাল দত্ত।
" বাণীনাথ নন্দী।
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি।
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
" বামনচন্দ্র দাস।
" চারুচন্দ্র ঘোষ।
" অক্ষয়কুমার বড়াল।
" সুরেশচন্দ্র বসু।
" সরসীলাল সরকার।
" অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।
" সখারাম গণেশ দেউস্কর।
" মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
" বসন্তকুমার বসু।
" রাধিকানাথ কবিভূষণ।
" রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।
" হেমচন্দ্র মল্লিক।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
" চারুচন্দ্র বসু।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহ-সম্পাদক
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল, (১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রদত্ত ভূমির রেজেষ্টারী করা দলীল প্রদর্শন (৪) গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে কার্য্যারম্ভ ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা, (৫) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "ব্যাকারণ ও বাঙ্গালা ভাষা নামক" প্রবন্ধ পাঠ (৬) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে সহকারী সম্পাদক গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত হইল। তৎপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	১। শ্রীযুক্ত অটলকুমার সেন, ১০নং রাজেন্দ্রনাথ সেনের লেন সিমলা।
„ প্রকাশচন্দ্র দত্ত,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	২। „ দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৪২নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি।
„	„	৩। „ খগেন্দ্রনাথ দে এটর্নী, ২৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„ কেদারনাথ সান্যাল,	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,	৪। „ জ্ঞানশঙ্কর সেন, ডেঃ কালেক্টর ৬৪নং অপার সারকিউলার রোড।
„ দীনেশচন্দ্র সেন,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৫। „ যতীন্দ্রমোহন সিংহ,ডেঃ মাজিষ্ট্রেট, মানিকগঞ্জ ঢাকা।
„	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	৬। „ হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট।
„	„	৭। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি, এল, হাইকোর্টের উকীল।
„	„	৮। „ সুবোধচন্দ্র রায়, ব্যারিষ্টার ৫৭ লান্সডাউন রোড।
„	„	৯। „ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপাল কায়স্থ কলেজ এলাহাবাদ।
„	„	১০। „ অনুকূলচন্দ্র বসু, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট।
„	„	১১। „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস. ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	১২। „ রামনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭০নং লোয়ার সারকিউলার রোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন,	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	১৩। „ কুমুদবন্ধু বসু, এসিষ্টাণ্ট, ইন্‌স্পেক্টার হুগলী।
„	„	১৪। „ কবিরাজ রমেশচন্দ্র সেন, বি এ, ২০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
„	„	১৫। „ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম,এ প্রিন্সি-পাল ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।
		১৬। „ গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা।
„ অনাথনাথ পালিত	„	১৭। „ মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৭নং রাধানাথ বসুর লেন।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৮। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর ৭৪নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	„	১৯। রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর, ১৬৩নং লোয়ার সার্কুলার রোড।
„	কুমার শরৎকুমার রায়	২০। কুমার ঘনদানাথ রায়, দুবলহাট।
কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়	„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	২১। „ চারুচন্দ্র চৌধুরী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।
„	„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২২। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৩। „ রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, গৌরীপুর, আসাম।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	„ কুমার শরৎকুমার রায়	২৪। „ মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী, বি এল।
„	„	২৫। „ মণিলাল নাহার
„	„	২৬। „ পূরণচাঁদ নাহার, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	২৭। „ মোহিনীনাথ বিশী, জোয়াড়ী পোঃ জোয়াড়ী।
„	„ কুমার শরৎকুমার রায়,	২৮। „ শশিভূষণ রায়, দুবলহাটী, রাজসাহী।
„ সুরেন্দ্রনাথ রায়	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৯। „ জে, সি মিত্র আসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেল।
„ কুঞ্জলাল রায়	„ „	৩০। „ প্রয়াগরাজ মুখোপাধ্যায়, ১০নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ,	৩১।	„ জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
„	„	৩২।	„ হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বি, এল, ১নং জেলেপাড়া রোড।
„	„	৩৩।	„ সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯নং কাঁসারী পাড়া।
„ সত্যেন্দ্রনাথ রায়,	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী,	৩৪।	„ হেমচন্দ্র সেন, বি এ, কড়িয়াপুকুর লেন।
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ,	„	৩৫।	„ সনৎকুমার সেন, ৩৮নং রামতনুবসুর গলি।
„ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী,	„	৩৬।	„ প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, ১৭নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট।
„ রাধিকানাথ কবিভূষণ,	„ রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী,	৩৭।	„ রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, বেতাগড়ি ময়মনসিংহ।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী,	„ বাণীনাথ নন্দী,	৩৮।	„ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী, ৮৮নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট।
„ অতুলচন্দ্র গোস্বামী,	„ বাণীনাথ নন্দী,	৩৯।	„ রামকুমার কবিরত্ন, বাইনাগ্রাম ময়মনসিংহ।
„ দীনেশচন্দ্র সেন,	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	৪০।	„ উপেন্দ্রলাল রায়, বি, এল, হাইকোর্টের উকীল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী রেজিষ্টারী দলীল প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, কাশিম বাজারের মহারাজ পরিষদের জন্য ৭ কাঠা জমি দিয়াছেন তাহা আপনারা জানেন। সেই জমি এই রেজেষ্টারী হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই জমিতে বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য অর্থ আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমাদের চেষ্টায় যতটা হইয়াছে তাহা পত্রেই আপনারা অবগত হইয়াছেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন আবশ্যক অর্থ উঠিবে না। প্রত্যেক সভ্য চেষ্টা করিলে তাঁহার দ্বারা যে ভাবে যতটা সাহায্য হইতে পারে পত্রে তাহার প্রস্তাব করা গিয়াছে। এক্ষণে আপনারা ঐকান্তিক উৎসাহ সহকারে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে পরিষদের বাটী নির্ম্মাণ দুষ্কর হইবে—এক্ষণে আপনাদিগকে অনুরোধ আপনারা কাল বিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন।

অতঃপর চতুর্থ বিষয় সম্বন্ধে যতীন্দ্র বাবু বলিলেন, পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ, সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার বাবু যদুনাথ বরাট ও মার্টিন কোম্পানির অংশীদার পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর নক্সা প্রস্তুতের ভার

লইয়াছেন। সেই সকল নকসা প্রস্তুত হইলে গৃহ নির্ম্মাণ সমিতির পরামর্শ মত কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন, পরিষদের বাটী নির্ম্মাণার্থ যতগুলি ইটের প্রয়োজন হইবে, যদি পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহা হইলে ইট প্রস্তুত করাইয়া লইতে যত মাটী ও জলের দরকার হইবে তন্নিমিত্ত আমাদের সুযোগ্য সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নারিকেল ডাঙ্গায় খালের ধারে উঁহার যে জমি আছে তাহা হইতে মাটী উঠাইয়া লইতে আদেশ দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, নাটোরের মহারাজ, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, এম্ এ, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়গণকে গৃহনির্ম্মাণ সমিতির সভ্য করা হউক। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [ভারতীতে প্রকাশিত]

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ দিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমার বোধ হয় পালি ও প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক। রবীন্দ্র বাবুর ক্রিয়াপদের তালিকার ন্যায় ঐ সকল শব্দেরও তালিকা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; তৎপরে বিচার। ইংরাজীর সহিত ল্যাটিনের যে পার্থক্য বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের সেইরূপ। সংস্কৃতে সন্ধিসমাসের দ্বারা ভাষা সংকোচ করিবার দিকে দৃষ্টি থাকে বাঙ্গালার সন্ধি সমাসের দিকে সেরূপ লক্ষ্য নাই; সুতরাং ইহার গতি বিস্তারের দিকে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাদি বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সাধনের জন্য আবশ্যক হইলেও ইহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। ব্যাকরণ রচনার জন্য আমার মতে পাণিনির পদানুসরণ করা আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এবং সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর বলেন, যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা শ্রেষ্ঠ। তিনি উপস্থিত আছেন তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ বলিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বলিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ আমি কিছুই শুনি নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারিব না। তবে কথ্য ভাষাই হউক আর গ্রন্থ ভাষাই হউক সংস্কৃতের সহিত মহারাষ্ট্রীয় অপেক্ষা বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, আজ রবীন্দ্র বাবু উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। কোন একটা বিষয়ে প্রথমে বাদীর বক্তব্য পরে প্রতিবাদীর বক্তব্য পরে বাদীর উত্তর, আলোচনা এইরূপে হইলেই ভাল হয়। আলোচনায় বিতণ্ডা না হয় ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়। শাস্ত্রী মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর কটাক্ষপাত করিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমেও যদি তিনি এ প্রণালীতে ব্যাকরণ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে উঁহার মত পরিবর্ত্তিত

হইতে দেখা যাইত। নানা দেশের বহু পণ্ডিতের যত্নের, আদরের, যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহা কখনই উচ্ছৃঙ্খল নহে। বাঙ্গালা ভাষা এখন উন্নতির দিকে চলিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রণালীতে তাহাকে নিগড়িত করিতে চান উহাতে উহার উন্নতি বন্ধ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার নিয়মের দড়ি দড়া দিয়া উহাকে যে বাঁধন দেওয়া হইয়াছে সংস্কৃতের তেজস্বিনী কন্যা বাঙ্গালা ভাষা সে বাঁধন এখন আর মানিতেছে না। ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যখন কোন প্রতিভাবান্ লেখক কোন ভাষার গ্রন্থ লেখেন, তখনই সেই ভাষা বিস্তৃত হইয়া উঠে। যত দিন না ভাষার গ্রন্থ লেখা হয়, ততদিন ভাষা পরিপুষ্ট হয় না। বন্ধুবর যতীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের অতি নিকট-বর্ত্তী, আমার বিশ্বাস তাহা আদৌ নহে। চসারের লেখায় লাটিনের আধিক্য নাই, তাই সে লেখা সাধারণে বুঝিতে পারে এবং সেই জন্যই চসারের লেখার গৌরবে তাঁহার সমসাময়িক অন্য সকলের লেখা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পর মিল্টনাদি চসারের অনুকরণ করিয়াই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। এইরূপ ইটালিতে প্লুটার্ক, জার্ম্মানিতে লুথার। বাঙ্গালায় সেই রূপ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভাশালী লেখকেরা বই লিখিয়াছেন, ভাষার নিজের শক্তি কিছু নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা সেই ভাষায় লিখিতেছেন বলিয়া উহার প্রভাব। আসামী হিন্দীতে লিখিলেও তাঁহারা সেই সেই ভাষাকে এইরূপ করিতে পারিতেন। বাঁশীতে কিছুই নাই, বাদকের গুণেই বাঁশী মিষ্টি বাজে। শাস্ত্রী মহাশয় বিতণ্ডা বুদ্ধিতে এতটা সাহসী হইয়াছেন এবং এই বিদ্বৎ সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন যে এই বাঙ্গালা, ভাষা কালান্তর প্রচলিত সংস্কৃত মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের এরূপে আলোচনা হইবে না। ৪০০শত বৎসরের হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথিতে যখন 'য' স্থানে সর্ব্বত্র 'জ' দেখিতে পাই; তখন বাঙ্গালা ভাষার ঐ সকল শব্দ লিখিতে 'য' ব্যবহার কেন করিব? প্রাকৃত ব্যাকরণে 'য' নাই। ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের প্রভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে ঐ সকল শব্দ 'য' দিয়া লিখিতে হয়। বররুচি সংস্কৃত জানিতেন না এমত নহে। অথচ পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণ লিখিবার সময়, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় যাহা নাই, সংস্কৃতের দোহাই দিয়া সেই সকল বর্ণ উহাতে প্রবেশ করান নাই। আপনাদের সে কালের পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ বর্ণ আছে না আছে, তাহা হিসাব না করিয়াই সংস্কৃতের বর্ণমালা অবিকল বাঙ্গালার বর্ণমালা বলিয়া লইয়াছেন এবং সেই বর্ণমালা দেখিয়া আপনারা বর্ণ শিক্ষা করিয়াছেন। কাজেই বাধ্য হইয়া আপনারা— দুটা ('য' 'জ') দুটা ('ণ' 'ন') দুটা 'ব' তিনটা ('শ' 'ষ' 'স') লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের ন্যায় লোক অর্থাৎ যাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে কাহার সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত কাহারও সহিত বাঙ্গালার প্রকৃতি মিলে না। ঐ তিন ভাষায় বিভক্তির ব্যবহার বড় বেশী, বাঙ্গালায় তাহা খুব কম। ইংরাজিতে যাহাকে preposition বলে, বাঙ্গালায় সেইরূপ

প্রয়োগই অধিক। ইংরাজিতে যখন Anglo-saxon প্রভাব ছিল তখন বিভক্তি দিয়া যাহা করিত এখন অন্য শব্দের সাহায্যে তাহা করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষার এক একটি বিশেষত্ব আছে; সংস্কৃতে তিনটি লিঙ্গ দেখিয়া অনেকে বাঙ্গালায় তিনটি লিঙ্গের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কিন্তু মিসরের প্রাচীন ভাষায় তেরটি লিঙ্গ। পাণিনি শুনিলেও হয়ত লইতে পারিতেন। সংস্কৃত ভাষার কতকগুলি শব্দ আমরা বাঙ্গালায় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সংস্কৃত শব্দ সাধনের সমস্ত সূত্র যদি বাঙ্গালা ব্যাকরণে দিতে হয় তাহা হইলে শিশু হত্যা করিতে হয়। সে সকল সূত্রও আবার সেইরূপ কঠিন। "পতৎ+অঞ্জলি" নিপাতনে পতঞ্জলি হয়। এরূপ সূত্র বাঙ্গালা ব্যাকরণে কি আবশ্যক জানি না; এরূপ সূত্র না জানিলে পতঞ্জলি শব্দ ব্যবহারে কি ক্ষতি হইবে জানি না। রচনার প্রণালী ধরিয়া ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা যায় না। শকুন্তলায় কালিদাস প্রাকৃত ভাষায় 'শকুন্তলা' লিখিয়াছেন তাহাতে ভাষার কি হানি হইয়াছে জানি না। কৃত্তিবাসও সংস্কৃত জানিতেন, বুদ্ধদেবও সংস্কৃত জানিতেন। উঁহারা যদি বাঙ্গালা লিখিবার সময় "যখন" লিখিতে "জ"দিয়া লিখিয়া থাকেন, আর চারি শত বৎসরের সাক্ষী একখানা হাতের লেখা পুঁথিতে তাহা দেখিতে পাই তাহা হইলে কি আমরা বলিব যে তাঁহারা "যখন" লিখিতে বানান ভুল করিয়াছেন। উঁহারা সংস্কৃত জানিয়াও এরূপ ভাষায় গ্রন্থ লিখিলেন কেন? গ্রন্থের উদ্দেশ্য যদি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে হয়, তবে জন সাধারণ যে ভাষা বুঝে তাহাতেই লেখা আবশ্যক। আপনারা বাঙ্গালাকে যদি সে স্বাধীনতা না দেন তবে ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণির কথা স্মরণ করিবেন। সংস্কৃতের মাত্রার হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে উচ্চারণে যে প্রভেদ হয় বাঙ্গালায় সে উচ্চারণ প্রভেদ কোথায়? যদি উচ্চারণই সেরূপ না করা হয় তবে হ্রস্ব, দীর্ঘ লইয়া একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধির আবশ্যক কি? বিশেষতঃ প্রাচীন কালের লেখায় তাহার যখন প্রমাণ পাইতেছি না। এক মাত্রিক ও আড়াই মাত্রিক কথা লইয়া শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্র বাবুর মধ্যে যে তর্ক উঠিয়াছে, আমার বোধ হয় সে তর্ক নিষ্ফল, বাঙ্গালীর উচ্চারণ সর্ব্বত্রই এক।

তৎপর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্র বাবু যাহা বলিলেন, তাহা বড়ই ভাল লাগিল। ভাষার গতিক দেখিয়া ব্যবস্থা করা উচিত। ভাষার উপরে evolutionএর কার্য্য হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস বা কাশীদাসের উপর প্রাকৃতের যতটা প্রভাব ছিল, এই তিন চারি শত বৎসর পরে সেটা আছে কি?

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয় বলিলেন:—Monosyllabic এর অনুবাদ "একমাত্রিক" না হইয়া "এক স্বর" হইলে ভাল হইত। যাহাতে একটি মাত্র স্বর আছে, ব্যঞ্জন যত গুলিই থাকুক না কেন, তাহাকে একস্বর ধাতু বলে। পৃথিবীর মধ্যে দুইটি ভাষা monosyllabic চীন ও তিব্বতীয় ভাষা; তিব্বতীয় ভাষার কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা জানিয়াছি হ্রস্ব বা দীর্ঘ স্বরের ভেদ বশতঃ monosyllabic শব্দের "এক স্বর" এরূপ অনুবাদে কোন হানি হয় না। "যখন" শব্দটি "যৎক্ষণ" এই সংস্কৃত শব্দ হইতে পালি ভাষার দ্বার দিয়া

আসিয়াছে। পালি ভাষার "যদ" শব্দটি "য" এইরূপ ধারণ করিয়াছে। পালি ভাষায় "ক্ষ" নাই। তাহার স্থলে "খ" বসিয়াছে। পালি ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে "ণ" স্থানে "ন" বসিয়াছে। সূত্রটি এই :—"রকারান্ত ও হকারান্ত ধাতুর পরস্থিত অনট্ প্রত্যয়ের ণ মূর্দ্ধন্য হয়, তদ্ভিন্ন স্থলে দন্ত্য ন ব্যবহৃত হয়।"

উচ্চারণের অনুরূপ বর্ণ বিন্যাস (phonetic) করিতে হইবে কি পদের অনুযায়ী বর্ণ বিন্যাস (etymological) করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা একরূপ স্থিরই হইয়াছে যে বর্ণ বিন্যাস etymology অনুসারে করিতে হইবে।

সম্প্রদান কারক কেবল পাণিনি স্বীকার করিয়াছেন এরূপ নহে। গ্রীক্ লাটীন প্রভৃতি ভাষায় কর্ম্ম ব্যতীতও সম্প্রদান কারক ছিল। ইংরাজী ভাষায় আজকাল উহাকে Indirect object বলা যায়; বাঙ্গালায় সম্প্রদান কারকের অর্থ সঙ্কুচিত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। কেবল দান বুঝাইলে এরূপ নহে। পতঞ্জলি ইত্যাদি শব্দের সন্ধি বিশ্লেষণ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ সমূহের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি সন্ধি বিভাগ বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। ঐ সময় তিব্বতীয় ভাষায় যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদিত হইত, সেই সকল গ্রন্থের শব্দ সমূহ খণ্ড খণ্ড ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া লওয়া হইত। পতঞ্জলি এই শব্দ সংস্কৃত আকারে তিব্বতীয় ভাষায় গ্রহণ করিবার কোন উপায় নাই। অতএব তিব্বতীয় অনুবাদকগণ "পতৎ" ও "অঞ্জলি" এই দুই ভাগে উক্ত শব্দকে বিভক্ত করিয়া "পতৎ" ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দ ও "অঞ্জলি" ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দ সংযোজন পূর্ব্বক একটি নূতন তিব্বতীয় নাম বাচক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইরূপ কৃশানু=কৃশ+আনু=কৃশকারী=ছুঙ্ ব্যেদ্। কৃশ ইহার প্রতিশব্দ ছুঙ্ ও কারী ইহার প্রতিশব্দ ব্যেদ্। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে "রাক্ষস" "গন্ধর্ব্ব" ইত্যাদি শব্দের ব্যাখায়ও ঐ রূপ সন্ধি বিশ্লেষণ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত প্রাকৃত বা পালি কাহারও অনুরূপ নহে। বাঙ্গালা কথিত ভাষা আর ঐ গুলি গ্রন্থের ভাষা, ঐ গুলি কখনও কথিত ভাষা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ঐ সকল ভাষার শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার রীতি স্বতন্ত্র। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার অনুরূপ কথিত ভাষা সকল প্রচলিত ছিল। কালক্রমে কথিত ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার কোন নিদর্শন স্থায়ী সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন, তর্কটা ক্রমশই বিতণ্ডার দিকে যাইতেছে। আমার মনে হয় হীরেন্দ্র বাবু এবং রবীন্দ্র বাবু বিতণ্ডার একদলে এবং আমরা বাহিরে, এ বিতণ্ডার মীমাংসা হইলেই ভাল হয়। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রশংসার্হ, তাঁহার লেখায় বিচারের অনেক কথা আছে। তাঁহার প্রবন্ধের আলোচনা কালে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, উপস্থিত মত তাহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে একটা কথা সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। একটা কথা উঠিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার গঠন,—এই গঠন কাহার আদর্শে হইবে? কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষার আদর্শে হওয়াই উচিত। এরূপ স্থলে সংস্কৃতের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতা যে অধিক তাহা সকলেই স্বীকার রেন। অতএব বাঙ্গালা ভাষার গঠন সংস্কৃতের আদর্শে হউক, আমি তাহারই পক্ষপাতী। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করি নাই বা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। যে শিশুমারণের কথা উঠিয়াছে, যদি হীরেন্দ্র বাবুর মতে ব্যাকরণাদি হয় তবে তাহা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। সংস্কৃত শব্দগুলির জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এবং অপরাপর শব্দের জন্য অপরাপর ভাষার নিয়ম শিখিতে হইবে। উচ্চারণ অনুসারে বানান লিখিতে গেলে ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মাণ ভাষার শব্দগুলির দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। ভাষার গঠন প্রণালীর প্রধান লক্ষ্য কি হইবে? শব্দচয়ন ও ভাব গ্রন্থন দুই আবশ্যক। ইংরাজিতে চসার ও টেনিসনের সময়ের ভাষার তুলনা করুন, রামপ্রসাদ ও কালিদাসের তুলনা করুন। যে প্রাকৃতকে বাঙ্গালা ভাষার মূল ধরিয়া তর্ক চলিতেছে সেই প্রাকৃত ভাষার ছাঁচই যে সংস্কৃত। কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভাষাকে আদর্শ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে তাহা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের উপযোগী করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ ভাষায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এখনকার পাঠকশ্রেণী তখনকার অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। সেকালে যাঁহারা অর্দ্ধ-শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহারা তখনকার অর্দ্ধশিক্ষিতের উপযোগী বাঙ্গালা গ্রন্থের তত বেশী আলোচনা করিতেন না।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ মহাশয় বলিলেন, আজকার আলোচনায় আমার বোধ হয় আমরা মূল বিষয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। প্রথমে দেখা উচিত বাঙ্গালা ভাষা কি প্রণালীতে লিখিত হয়। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন"। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই বাক্যটীর মধ্যে "হইয়া" ও "করিতে লাগিলেন" এই দুইটি ব্যতীত খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ আর নাই। নাই বলিয়া যদি কেহ বলেন এটি বাঙ্গালা নহে, তাহা আমরা কেহ শুনিব না, মানিব না বা সে ভাবে তর্ক করাও অনুচিত। রবীন্দ্র বাবুও তাহা বলেন না। তবে কেহ বলিবেন এই আদর্শের বাঙ্গালা উৎকৃষ্ট, কেহ বলিবেন নিকৃষ্ট, সে তর্কের মীমাংসার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ঐ বাক্যটি যখন বাঙ্গালা তখন উহার অন্তর্গত সমস্ত শব্দের নিয়মই জানা আবশ্যক; ছাত্রেরও আবশ্যক, তাহাতে শিশুমারণ হয়, কি করা যাইবে। কিন্তু "অপ্রতিহত প্রভাবে" পদের ধাতু, প্রত্যয়, সমাস যদি জানা আবশ্যক হয়, "হইয়া" ও "করিতে লাগিলেন" পদের ঐ সমস্ত জানা আবশ্যক নহে কেন? একের জন্য যদি শিশুমারণ আবশ্যক হয়, অপরের জন্য না হইবে কেন? ভাষার গঠন প্রণালী আবিষ্কারের জন্য এই সকল আলোচনা চলিতেছে। যতদিন তথ্য নির্ণীত না হইবে তত দিন এইরূপ

বিতণ্ডা চলিবেক। বাঙ্গালা শব্দ লিখিতে লিখি "করিব" বলিতে বলি "কর্‌ব" দেশ ভেদে তাহারও আবার নানা ভেদ আছে। ইহার যদি নিয়মাদি জানা যায় তবে ক্ষতি কি ? শাস্ত্রী মহাশয় কি "করিব" র পরিবর্ত্তে করিষ্যামি প্রয়োগ করিতে বলেন, কখনই না। এ সকলের মীমাংসা প্রার্থনীয় নহে কি ? "করিব" শব্দের সংস্কৃত মূল থাকিতে পারে কিন্তু কত দূরের পরিবর্ত্তে উহা জন্মিয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক নহে কি ? শিশুব্যাকরণ সরল হওয়া উচিত ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। রবীন্দ্র বাবু শিশুব্যাকরণের কথা বলেন নাই, তিনি ভাষা তত্ত্বালোচনার একটা পথ দেখাইয়াছেন মাত্র।

অতঃপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, আমার বক্তব্যের অধিকাংশ আমি প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি। এখন আমি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিতেছি। কেহ কেহ মনে করেন বিতণ্ডা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ই আমার অভিপ্রেত। আমি শব্দবিজ্ঞান মানি না এ কথা কেন উঠিল ? আমি কেন, জগতের প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই শব্দবিজ্ঞান শ্রদ্ধার বস্তু। ভট্ট মোক্ষমুলর ও মুর সাহেবের ভাষা বিজ্ঞানের মর্ম্ম আমি অতি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ সকল মনীষী প্রত্যেকের শ্রদ্ধাভাজন। বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ অর্থে ঐ সকল মনীষীর উপাদেয় গ্রন্থ নহে, যাঁহারা শব্দের প্রকৃত বর্ণবিন্যাস তুলিয়া দিতে ইচ্ছুক ও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে একান্ত বদ্ধপরিকর সেই নব বৈয়াকরণগণের নবপ্রবর্ত্তিত ঠেসান হেলান, পরাস কটাসৃজ, চলকনো নিঙ্‌ড়ানো ইত্যাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি জনক ব্যাকরণই আমার লক্ষ্য। চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তখনকার বর্ণবিন্যাসের প্রথা এখন বর্ত্তমান নাই। আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বের হস্ত লিখিত পুস্তক অধিক পাওয়া যায় না সুতরাং কাহার উপর নির্ভর করা যাইবে। আর যদিই কোন পুরাতন পুস্তকে "যখন" শব্দে বর্গ্য জ থাকে তাহাই বা কেন বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব ? যদি কোন অশিক্ষিত কিংবা সংস্কৃত জ্ঞানবিহীন গ্রন্থকার বা লিপিকার "যখন" শব্দে বর্গ্য জ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা শিক্ষিত বা বিদ্বান্ ব্যক্তিদের আদর্শ হইতে পারে না। আমার নিকট একখানি অতি পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক আছে, উহাতে গোঁসাই শব্দের বর্ণবিন্যাস "গষাঞি" এইরূপ আছে তাহাই কি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিব ? তবে রবীন্দ্র বাবু যে প্রকার বর্ণবিন্যাস ও ভাষা বানাইতে উৎসুক উহা চলিবে না, আজ কাল শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংস্কৃতানুযায়ী বিশুদ্ধ ভাষার প্রতি অনুরাগ অধিক। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ সংস্কৃতোন্মুখী হইতেছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অতি অল্প কারণে কত বৃহৎ ব্যাপার কত বাগবিতণ্ডা হইয়া থাকে। পরিষদের ব্যাকরণ প্রবন্ধ লইয়াও তাহাই হইতেছে। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাঙ্গালা প্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই এ কথা তিনিও বলেন না। তাহাতে দুটা একটা ভুল যে না আছে তাহাও নহে।

তাঁহার উদ্দেশ্য সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দ সমষ্টি ছাড়া ভাষার আর একটি দিক যে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা হউক এত আলোচনা দুঃখের নয়। ভাষার অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা লক্ষ্য করা উচিত। ভাষা এখন যে স্রোতে চলিয়াছে তাহা বদলাইতে পারা যাইবে না। বাঙ্গালা প্রত্যয়ান্ত শব্দ আজ কাল লেখায় বেশী ব্যবহার হইতেছে। লেখার একটা পথ আছে। প্রতিভাসম্পন্ন লেখক যে দিকে লইয়া যাইবেন ভাষা সেই দিকেই যাইবে। কথ্য ও গ্রন্থভাষায় বড় বেশী পার্থক্য রাখা সঙ্গত নহে। অক্ষয় দত্তাদির ভাষার গতি ফিরিয়াছে। অক্ষয় দত্তাদি এবং এখনকার ভাষার সমতা রাখিয়া ভাষার গতিকে স্থির করাইতে পারিলে ভাল হয়। ভাষা শিক্ষিত অপেক্ষা সাধারণ লোকের বোধগম্য হওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় ভাষায় প্রথমে কৃত্রিমতা ছিল, প্রতিভাশালী লেখকের লেখার গুণে তাহা দূর হইয়াছে। ভাষাকে সহজবোধ্য করিতে হইলে যে কি নিয়মে হইবে তাহা বলা যায়না। প্রথমে দেখা আবশ্যক মনের ভাব ঠিক কথায় ফুটিল কি না তাহার পর তাহার সেই প্রাঞ্জলতা বজায় রাখিয়া অঙ্গ সৌষ্ঠবও আবশ্যক। ব্যাকরণ মনগড়া হইলে চলিবেক না। সংস্কৃত ছাঁচে ব্যাকরণ হওয়াই ভাল এবং দেখিতে হইবে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার শব্দ কি কি আছে, তাহাদের প্রয়োগাদি সম্বন্ধে, ধাতু প্রত্যয় সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এখনও ব্যাকরণ হইবার সময় হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তবে দেখা উচিত নানা দেশের শব্দ নিজস্ব কিরূপ? প্রত্যয়াদির রূপ রবীন্দ্র যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হউক আর অন্যরূপই হউক তাহাতে বড় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তাহা আলোচনার মুখে স্থির হইবে। আমার একটা অনুরোধ আলোচনা ব্যক্তিগত না হয়, সুপথে চালিত হয়, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। শ্রীপ্রাণশঙ্কর রায় চৌধুরী।
সহঃ সম্পাদক। সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

গত ২৭শে মাঘ অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় সময় পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশন হয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।—

শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী (সভাপতি)	শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ,
„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	„ রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর
„ প্রিয়নাথ ঘোষ	„ শরচ্চন্দ্র সরকার
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ,	„ করুণাকুমার সেন
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ.	„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত	রামনাথ চক্রবর্ত্তী
"	যোগেন্দ্রনাথ বসু	"	রাজেন্দ্রনাথ মুস্তফী
"	সুরেন্দ্রনাথ রায়	"	বিশ্বেশ্বর সেন মজুমদার
"	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	"	দুর্গাদাস গুপ্ত
"	মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	"	হেমচন্দ্র সেন
"	রমেশচন্দ্র সেন	"	শরৎকুমার সেন
"	সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"	সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী
"	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	"	নলিনীভূষণ গুহ
	অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	"	ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
	জ্যোতিশচন্দ্র সমাজপতি	"	হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, } সহঃ সম্পাদক
	বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ		

আলোচ্য বিষয় :—(১) কার্য্য-বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রস্তাব, (ক) অধ্যাপক সি, আর, উইলসন্ কর্ত্তৃক ম্যাক্স্ মুলারের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনার্থ পরিষদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাব, (খ) সভ্যনির্ব্বাচন নিয়মে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন জন্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মহাশয়ের প্রস্তাব (৪) প্রবন্ধ :—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "অজাতশত্রু সম্বাদ" ও (খ) শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের "পাল রাজগণ" (৫) বিবিধ বিষয়।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় সভাপতি পদে বৃত হয়েন। পূর্ব্ববারের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

অধ্যাপক উইলসন্ ম্যাক্স্ মুলারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ যে সাহায্য প্রার্থনা করেন, তদ্বিষয়ে স্থির হইল, পরিষদ পূর্ব্বে পুস্তকাগারে তাঁহার গ্রন্থ সমুদয় রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপাততঃ আমরা আর কিছু করিবার সুযোগ পাইলাম না। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এম,এ, মহাশয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়.

রামেন্দ্র বাবু প্রস্তাব করেন—নিয়ম হউক বার জন সভ্য প্রবেশিকা বা মাসিক চাঁদা না দিয়া পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নিয়োগে সম্পাদক তাঁহাদের নাম পরিষদের মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। প্রকাশিত সভ্য তালিকায় তাঁহাদের নাম স্বতন্ত্র ভাবে চিহ্নিত থাকিবে না। রামেন্দ্র বাবু বলেন, বর্ত্তমান পরিষদে দুই শ্রেণীর সভ্য আছেন। কিন্তু এমন লোক আছেন, যাঁহারা পরিষদের উপকারক্ষম বা উপকার রত। সে উপকারের প্রত্যুপকার আমাদের ক্ষমতার অতীত। পত্রিকার জন্য মূল্য দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সকলের সে সাধ্য নাই। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রবেশিকা ও চাঁদা দানে অসমর্থ। দেশের প্রচলিত প্রথায় অধ্যাপকশ্রেণী গ্রহণ করেন, দেন না। পরিষদের হিতের জন্য পরিষদে তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজন। এই সকল কারণে যাঁহাদের নিকট পরিষদ উপকৃত বা উপকারের আশা রাখেন, তাঁহাদিগকে বিনা চাঁদায় সভ্য করা

হউক। সংখ্যায় অধিক না হয়; এজন্য বার জন নির্দ্ধারিত করা হউক। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। স্থির হয় এই নিয়ম ১০ (ক) রূপে নিয়মাবলী মধ্যে সন্নিবেশিত হইবে।

দীনেশ বাবু প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি একখানি দুষ্প্রাপ্য পালি গ্রন্থের মূল ও ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ মনোজ্ঞ, ভাষা চমৎকার। ইহাতে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার আছে। জীবক সুপণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি ভৃত্য থাকিবার সর্ত্তে আট বৎসর আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। অজাতশত্রু খৃঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে মগধের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধী ছিলেন ও বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করেন। তাঁহার তাড়নায় তাহারা নেপাল, তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ায় গমন করে। অজাতশত্রুর অষ্ট পুরুষ পিতৃ হন্তা।

রাধিকা বাবুর প্রবন্ধ "পাল রাজগণ" পঠিত স্বরূপে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয় পালাশবন ও সীতা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত গীতার অনুবাদ (পুঁথি) ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় India of Aurangzeb গ্রন্থ পরিষদকে উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণের নাম প্রস্তাবিত হইল ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য	
রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্.এ	শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মৈত্রেয় বি, এল	ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
„	„	প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য বি,এল	ঐ
„	„	„ মহেন্দ্রনাথ সান্যাল „	ঐ
„	„	„ শশধর রায় „	ঐ
„	„	„ সুদর্শন চক্রবর্ত্তী „	ঐ
„	„	ডাক্তার অক্ষয়কুমার ভাদুড়ী	ঐ
„	„	„ চন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ
„	„	শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিন্সিপ্যাল	ঐ
„	„	„ হরকুমার সরকার (জমীদার)	ঐ
„	„	„ রাজকুমার সান্যাল	ঐ
„	„	„ রামজয় বাগচী (মোক্তার)	ঐ
„	„	„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি,এল	ঐ
„	„	„ গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী ঐ	ঐ

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক জমিদারী কাছারি, কাউনার বাড়ী রামপুর, বোয়ালিয়া।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩ ফড়াইস্ লেন।
"	"	" গিরিশচন্দ্র দত্ত ৪নং নবাবদী ওস্তাগরের লেন।
"	"	" অবিনাশচন্দ্র বসু মদন মিত্রের লেন।
"	"	" সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় Manager, Nawab Bahadurs' Estate, Kandi, Murshidabad.
শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ	" দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী Assistant Manager, Gouripur Raj, Assam.
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	" অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৭৯ মুজাপুর ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়
"	"	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায়
"	"	" সীতানাথ রায়
"	"	" হরেন্দ্রলাল রায়
"	"	" যশোদালাল রায়
"	"	" বিনোদলাল রায়
"	"	" নন্দলাল রায়
"	"	" কৃষ্ণমোহন মৈত্র
"	"	" লালমোহন মৈত্র
"	"	" কুমার শরদিন্দু রায়
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	Dr. U. Gupta. ৩৫।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট,
"	"	শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগী ৯৫ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
"	"	" শরৎচন্দ্র গুপ্ত ১৬ সাগরধরের লেন,
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	"	" গুরুপ্রসাদ মৈত্র

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সভ্য
শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	„ নন্দকিশোর মিত্র

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

দশম অধিবেশন।

গত ২রা চৈত্র অপরাহ্নে পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,
„ হারাণচন্দ্র রক্ষিত
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
„ দীনেশচন্দ্র সেন, বি, এ,
„ যোগেন্দ্রনাথ সেন
„ দ্বারকানাথ বসু
„ রমেশচন্দ্র বসু
„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
„ যতীন্দ্রনাথ বসু
„ মণীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
„ ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ মন্মথনাথ সেন

শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ মিত্র
„ সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ প্রাণনাথ নন্দী
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত
„ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
„ চারুচন্দ্র ঘোষ
„ মন্মথমোহন বসু, বি, এ,
„ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদকদ্বয়।
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ }

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) প্রস্তাব, (ক) পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের হাইকোর্টের জজ পদোন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ (৪) প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের "বঙ্গে নীল" এবং (খ) শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সুদ্ধ পাঁচালী" নামক প্রবন্ধ। (৫) বিবিধ বিষয়।

গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়। বাবু নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাটার নীলকরদিগের যে সকল অত্যাচারের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন। সে সময় যে সকল বাঙ্গালী সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের কথায় নলিনী বাবু বলেন, যাঁহারা দেশের বা লোকের হিতকল্পে

কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন রাখা বাঞ্ছনীয়। সভাপতি মহাশয় বলেন, বঙ্গে নীলের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্র বাবু আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। বঙ্গে নীলের কথা এখন ইতিহাসগত। নীলের ব্যবসায় বিলোপের কারণ—(১) রসায়নের উন্নতি ও কৃত্রিম নীলের উৎপাদন, (২) নীলের ফসল ফলনে নিশ্চয়তার অভাব; সকলে সাহস করিয়া সে ফসলের ব্যবসায় করে না। পূর্ব্বে বঙ্গে নীলের ব্যবসায় কিরূপ ছিল, নীল ব্যবসায়ে কাহারা খ্যাতি লাভ করেন, প্রবন্ধকার তাহা দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের সহিত নীলের সম্বন্ধ 'নীল দর্পণে' প্রকটিত। দীনবন্ধু বাবু তখন বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক ও অলঙ্কার। মিষ্টার লংএর মকর্দ্দমার সময় লোকে কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহার কারারোধে সাধারণ জনগণ কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মনে আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য দেবেন্দ্র বাবু ধন্যবাদ ভাজন।

অপর প্রবন্ধ পঠিত রূপে গৃহীত হইল।

গত অধিবেশনে গৃহীত নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়কে পরিষদের সভ্য করা হইল।

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় স্থাপনাবধি পরিষদের সভ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পরিষদ এখন যে কার্য্য করিতেছেন, সারদা বাবু প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই প্রাচীন সাহিত্য প্রচার কার্য্য করেন। তিনি ইহাতে সমূহ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সমূহ পরিশ্রমের ফল। পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষিতগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে মন দিতেন না। কাপ্তেন মার্শাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, তুমি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, ইংরাজী পড় ও বাঙ্গালা লেখ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাই করেন, তাহাতে বঙ্গ ভাষায় অপূর্ব্ব শ্রী হয়। সারদা বাবু ইংরাজী সাহিত্যে ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। এরূপ ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের ও তাহার টীকাকারের কার্য্যে মন দিলেন। শেষে অবকাশাভাবে তিনি সে ভাবে সাহিত্য সেবা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু সাহিত্য সেবা ত্যাগ করেন নাই।

স্থির হইল, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নলিখিত প্রস্তাব সারদা বাবুর নিকট প্রেরিত হউক :—

"পরিষদের হিতৈষী সদস্য বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের পদোন্নতিতে পরিষদ আনন্দ প্রকাশ ও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধন করিতেছেন।"

সভায় প্রকাশ করা হয় অল্পদিনের মধ্যে পরিষদের তিন জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে।—(১) যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, খিদিরপুর, (২) বিরজাভূষণ চট্টোপাধ্যায়, (৩) চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, মেদিনীপুর। ইঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইল।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু যোগেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে বলিলেন, যোগেন্দ্র বাবু সাহিত্যসেবী ছিলেন।

তিনি বঙ্গদর্শন প্রভৃতি অনেক পত্রে দার্শনিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি চিন্তাশীল ও মৌলিক লেখক ছিলেন। তবে তিনি দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার রচনার আদর করে নাই। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু জনিত ক্ষতি সহজে পূর্ণ হইবে না। সভাপতি মহাশয় হীরেন্দ্র বাবুর কথার সমর্থন করিয়া বলেন, যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। স্থির হয়, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত শোকপ্রকাশক পত্র তাঁহার পুত্রের নিকট পাঠান হইবে।

সভায় প্রকাশ করা হয়, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ২০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বনমালী রায়ও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

তৎপর নিম্নলিখিত গ্রন্থোপহার দাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় :—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রামজয় বাগচি, শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায়, কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, Q. Jewson Esq. ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু।

সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হয়েন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ বি এল	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায় ১৯।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
,,	,,	২। রাজর্ষি বনমালী রায় বৃন্দাবন।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,	,,	৩। রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর কুচবিহার।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	,,	৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ কাণুগির ৮ উইলিয়মস্ লেন।
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	,,	৫। শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ বি এল, ৩৯ বেচু চাটুজ্যের ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,	৬। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ ৩২।২ শ্যামপুকুর।
,,	,,	৭। ,, ধন্নুলাল আগরওয়ালা ৪ মদনমোহন চট্টোর লেন
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল,	৮। ,, কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, গ্রে ষ্ট্রীট।
		৯। ,, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পিরোজপুর।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সভাপতি।

একাদশ অধিবেশন।

গত ১৪ই বৈশাখ ১৩০৯, ইংরাজী ২৭শে এপ্রেল ১৯০২ রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)
,, চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল
,, সতীশচন্দ্র বসু
,, কালিদাস নাথ
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, নলিনীভূষণ গুহ
,, জগদীশচন্দ্র বসু বি, এল
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
জ্ঞানশঙ্কর সেন
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
গোবিন্দলাল দত্ত

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন এম্,এ,
,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল,
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
,, রাধিকানাথ কবিভূষণ
,, অনাথনাথ পালিত এম্, এ,
ডাক্তার ,, সরসীলাল সরকার
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,
সম্পাদক
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি,এ, } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল ;—(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ, (২) সভ্য নির্ব্বাচন, (৩) প্রদর্শন (ক) ১১৬৭ সালে দেশী উপায়ে মুদ্রিত দুই খানি পুঁথি,—(খ) অর্দ্ধখানি ফুল্‌স্কাপ্ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত সমগ্র গীতগোবিন্দ (গ) বৃন্দাবনের আধ্যাত্মিক মানচিত্র, (৪) প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ," (৫) বিবিধ বিষয়।

১। কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য
শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ সরকার মুরশিদাবাদ কাতলামারী।
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী	,,	২। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী পুটীয়া রাজবাড়ী।
শ্রীযুক্ত রঞ্জন বিলাস রায় চৌধুরী	,,	৩। ,, মতিলাল দাস বরাহনগর, কুটিঘাটা।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,	৪। „ চারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, ডেঃ মাঃ ভাগলপুর।
„	„	৫। „ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণপাড়া লেন, বৈদ্যবাটী।
„	„	৬। „ কমলকৃষ্ণ সাহা ১৮ নং দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট
„	„	৭। „ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪ নীলমণি সরকারের লেন।
„	„	৮। „ প্রসন্নকুমার মজুমদার ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	৯। শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক ১৬।১৭ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
„ প্রাণশঙ্কর চৌধুরী	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,	১০। শ্রীরায় জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল,		শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কলিকাতা।

অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী তিনটী প্রদর্শনের দ্রব্য উপস্থিত করিয়া বলিলেন, পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই তিনটী দ্রব্য পাঠাইয়াছেন এবং ইহাদের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ বিবরণ পঠিত হইল। সভায় স্থির হইল এই তিন দ্রব্য রক্ষা করা হউক। বৃন্দাবনের মানচিত্র কাপড়ে আঁটিয়া আসলকে এবং উহার অনুলিপি করাইয়া সেই নকলও রাখা হউক। তারকেশ্বর বাবুকে এজন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। (১) কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর যাবজ্জীবন সভ্য পদ গ্রহণ করায় তাঁহাকে এবং (২) মহারাজা বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৃহ নির্ম্মাণার্থ দান ১০০০৲ ও কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের দান ২৫০৲ উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হইল, (৩) শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের প্রদত্ত পুঁথি উপহারের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল এবং ভবিষ্যতে বেয়ারিং পার্শেলে না আনাইয়া অগ্রে পোষ্টেজ পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। (৪) গ্রন্থোপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (৫) অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন অন্যান্য ভাষা হইতে সদ্‌গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করা হউক।

ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাবলী অনুবাদিত হইলে অনুবাদক লাভবান্ হইবেন এবং ভাষারও পুষ্টি সাধিত হইবে। মাহারাষ্ট্র ভাষায় ঐরূপ আছে। আমাদের পরিষদের যে গ্রন্থ রচনা সমিতি আছে, অনুবাদ সমিতি তাহার শাখা হউক। এসম্বন্ধে ১৩০৭ সালের

পূর্ব্বের গ্রন্থ রচনা সমিতির উদ্দেশ্য প্রভৃতি পঠিত হইলে স্থির হইল আগামী বুধবারে গ্রন্থ রচনা সমিতির অধিবেশন করাইয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করা হউক।

অতঃপর প্রবন্ধ লেখক যদু বাবু উপস্থিত না থাকায় সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন,—যদুবাবুর প্রবন্ধ উত্তম হইয়াছে। তিনি উচ্চারণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন বর্ণমালায় যখন তিন শ, দুই ণ, দুই ব, দুই জ, আছে তখন ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণই ভাল। আমার এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু আমার চাকরকে "সদয়" বলিয়া ডাকিতে "স" এর প্রকৃত উচ্চারণ করিয়া ডাকিতেন, বড় মিষ্ট লাগিত। সংস্কৃত উচ্চারণ পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগ আছে। আমরা যখন সংস্কৃত বর্ণমালা লইয়াছি, তখন সংস্কৃত উচ্চারণ লইব না কেন? সংস্কৃত উচ্চারণ বড় মিষ্ট, মিষ্টতার দরুণ লোকে সহজে লইবে, লিখিবারও কষ্ট হইবে না। উচ্চারণ পরিশুদ্ধ হইলে ভাষাও মিষ্ট হইবে। অন্তস্থ "ব" কে "উঅ" বলিলে অনেক স্থলে বড় মিষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উচ্চারণ সাদৃশ্যে জাতীয়তার বৃদ্ধি হইবে। আমি পূর্ব্বে পরিষদে ভাষার অপভ্রংশ ত্যাগ বিষয়ে আমার মতামত বলিয়াছিলাম। অপভ্রংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। তাহাতে একতার হ্রাস হয়। অপভ্রংশের বহুলতা ও বিভিন্নতার জন্য এক ভাষা ভিন্নরূপ বোধ হয়। একথা যদু বাবু বলিয়াছেন, এ বড় গুরুতর কথা। ইহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। পরিষদে আপাততঃ ব্যাকরণ লইয়া তর্ক চলিতেছে—ব্যাকরণ ঠিক করিবার সময় এখনও আসে নাই; বিশেষতঃ এই তর্ক বিতর্কে সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যাইতেছে তাহা ভাল নহে, এ তর্ক বিতর্ক এখন আবশ্যক। ব্যাকরণ যে ভাবে আছে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় নাই। ইহা ক্রমে আপনিই মীমাংসিত হইবে। ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? দলাদলিই বা কেন? গবর্ণমেণ্ট সহজে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে পণ্ডিতগণ পরামর্শ দিয়া প্রবৃত্ত করাইতে পারেন? উচ্চারণ প্রভেদে ভাষার বর্ণাশুদ্ধিও ক[illegible]। প্রবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালায় কতকগুলি অক্ষর উচ্চারণ হিসাবে অনাবশ্যক স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ণমালা একটা সুরে বাঁধা—বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত। তাহা অঙ্গহীন করি কেন? সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেই ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলেন, শুনিয়াছি আমাদের উচ্চারণ বিকৃতির একটা কারণ পালি প্রাকৃত সংস্কৃত পুরা গ্রহণ করে নাই। বাঙ্গালায় সেই সকল হইতে গৃহীত শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃতামূলক নহে। ক্রমে সংস্কৃত হইতে গৃহীত শব্দও বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়াছে। উচ্চারণ শিক্ষা সাপেক্ষ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলেন, প্রবন্ধকার আমাদের ধন্যবাদ ভাজন। তিনি উপস্থিত থাকিলে অনেক সমস্যার নির্ণয় হইত। সংস্কৃত যদি হুবাহুব বাঙ্গালায়

চলে, তবে আর বাঙ্গালা থাকে কেন? প্রাকৃত চারি প্রকার—তাহাতে কোথাও একটা স আছে। কথিত ও লিখিত ভাষা পৃথক হইয়া পড়ে। সংস্কৃত উচ্চারণে সূক্ষ্ম দেখা আছে। ইতরে তাহা পারে না বলিয়াই প্রাকৃতের সৃষ্টি। তাহা বাঙ্গালায় চলিবে কি? আমরা উচ্চারণে বর্গ ছাড়িয়াছি, কিন্তু বর্ণমালায় কোন বর্গ ছাড়ি নাই। আসল কথা বাঙ্গালার মূল সংস্কৃতের হুবাহুব অনুকরণ চলিবে কি? সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ করিতে পারিলে গৌণভাবে বাঙ্গালা উচ্চারণ যথাসম্ভব করিতে হইবে এবং বাঙ্গালায় সংস্কৃতানুযায়ী উচ্চারণ প্রচলন কতদূর সম্ভব হইবে তাহাও বুঝা যাইবে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় বলেন, বাঙ্গালা যদি দেবনাগরে লিখিত হয়, সেই রূপে উচ্চারিত হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইবে, কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে কি? সংস্কৃত অক্ষর বলিলেই কি দেবনাগর অক্ষর বুঝায়? সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গেই কি দেবনাগর সৃষ্ট হয়? তত্ত্বে তাহা দেখা যায় না

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের সকল কথায় আমার সম্মতি নাই। তবে মূল উদ্দেশ্য সফল হইলে ভাল হয়। কাহারও কথায় উচ্চারণ স্থির হয় না; উচ্চারণের পরিবর্ত্তনও সহজ নহে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং যতীন্দ্র বাবুও বলিয়াছেন সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃত করিলে ও সংস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে লিখিলে ভাল হয়। সহজেই বঙ্গদেশের Babu Sanskrit সংশোধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে হইতে পারে। তবে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই পণ্ডিত শ্রেণীর মত চালাইবেন। তাঁহাদের মত বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের নিকট গ্রাহ্য হইবে। তবে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল। শুদ্ধ বাঙ্গালা প্রাদেশিকতা রক্ষা করিয়া আদর্শানুযায়ী করা কর্ত্তব্য। মূলের সহিত যোগ রাখিয়া যথা সম্ভব বিশুদ্ধি রক্ষা করা ভাল। সন্ধান করিলে কতকগুলি নিয়মও পাওয়া যাইতে পারিবে। ছেলে, খেলা, যেমন কেন ইত্যাদির প্রকারের উচ্চারণ কোন্ নিয়মে ভিন্ন হয়? লিখি পূজা কিন্তু উচ্চারণ করি পূজো ইহার কারণ কি? এসব নিয়ম নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রবন্ধকারের দেবনাগরে সংস্কৃত লিখিয়া বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ করিবার প্রস্তাব অতি উত্তম। এখন গতায়াতের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে অন্যত্র হইতে পণ্ডিত আনাইয়া সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃত করা সহজ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত, সভাপতি।

অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ রবিবার অপরাহ্ণে পরিষদের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (সভাপতি)
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্‌ এন, পি, এস,
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ,
,, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
,, রমেশচন্দ্র বসু
,, গোবিন্দলাল দত্ত
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. এ, বি, এল,
,, মন্মথমোহন বসু বি, এ,
,, মুনীন্দ্রনাথ সাংখ্যরত্ন
,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী
,, কিরণচন্দ্র দত্ত
,, অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, বি, এ,
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র সমাজপতি
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
,, বিহারীলাল সরকার
,, সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্. এ,
,, বাণীনাথ নন্দী
,, প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি
,, সত্যচরণ সেন গুপ্ত
,, করুণাকুমার সেন গুপ্ত
,, দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
,, যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্. এ, বিদ্যাভূষণ
,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,
,, জগদীশচন্দ্র বসু, বি, এল,
,, নলিনীভূষণ গুহ
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, (সম্পাদক)
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদকদ্বয়
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ, }

আলোচ্য বিষয়—(১) সভাপতির আহ্বান, (২) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব, (৩) ১৩০৯ সালের কর্ম্মচারী নিয়োগ, (৪) সহযোগী পত্রিকা সম্পাদক ও সহকারী গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়ের প্রস্তাব, (৫) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত যাবজ্জীবন সভাপদের নিয়ম অনুমোদন, (৬) বিবিধ।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে গতবর্ষের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বহু গুণের ও যোগ্যতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে আগামীবর্ষের জন্য সভাপতিপদে বৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারী নিয়োগ গৃহীত হইল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম, এ,
বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, সহকারী সভাপতি
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল,—ধনরক্ষক
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,—পত্রিকা সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি,এ,—সহঃ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী—গ্রন্থরক্ষক
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,—আয়ব্যয় পরীক্ষক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, বর্ত্তমানবর্ষের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আগামীবর্ষে আমরা সভাপতি মহাশয়কে ও হেমেন্দ্র বাবুকে পাইব না। উভয়েই পরিষদের সহিত যে ভাবে জড়িত তাহাতে আমরা সহজেই আশা করি, তাঁহাদের সহিত পরিষদের সংস্রব কখনও যাইবে না, তথাপি তাঁহাদিগকে কর্ম্মচারিরূপে না পাইয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। সভাপতি মহাশয় যেরূপ আন্তরিকতা, পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার সহিত পরিষদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট পরিষদের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতা ভাষার অতীত। আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করি। আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে কর্ম্মচারিরূপে না পাইয়া আমরা দুঃখিত। আমরা তাঁহাকে সহকারী সম্পাদক পদে অবস্থিত থাকিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহিত্যিক কার্য্যে অবকাশাভাব হয় বলিয়া তিনি উহাতে অনিচ্ছুক। তাঁহার মত উৎসাহী, কৃতবিদ্য, সহকারী সম্পাদক সহজে পাওয়া যাইবে না। পরিষদ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, সভাপতি মহাশয় আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে শীর্ষস্থানীয়। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। হেমেন্দ্র বাবু নানাপ্রকারে পরিষদকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের প্রথম আট জনের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধনরক্ষক হওয়ায় অব্যবহিত পরবর্ত্তী তিন জনকে তাঁহাদের স্থানে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে গ্রহণ করা হইল।

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম, এ,	শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী	,, রমণীমোহন মল্লিক
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	,, চারুচন্দ্র ঘোষ
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	,, এস, কে, মহম্মদ রসনওয়ালা।

ইঁহাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এস, কে, মহম্মদ রসনওয়ালা ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত

সমান সংখ্যক ভোট পাইয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবুকে মনোনীত সভ্য করাতে শ্রীযুক্ত এস, কে, রসনওয়ালী মহাশয় উক্ত স্থান পাইলেন।

মনোনীত সভ্য

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
,, নগেন্দ্রনাথ বসু	,, গোবিন্দলাল দত্ত

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদের প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সমর্থনে অন্যান্য বিদায়গ্রাহক কর্ম্মচারিদিগকে ধন্যবাদের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযুক্ত ডাঃ শরৎকুমার মল্লিক ১৫নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	,, সুবোধচন্দ্র দাস ১১নং ক্যাথিড্রাল মিসন্ লেন।
,,	,,	,, শৌরীন্দ্রনাথ দে ১৭।১ হ্যারিসন রোড।
,,	,,	,, সর্ব্বেশ্বর বাগচী, হাইকোর্ট।
,,	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্ট।
	,,	,, হরেন্দ্রনাথ বসু ৭৪নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট।
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী	,, অমরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত ৩২।১ ঝামাপুকুর ষ্ট্রীট।
,, অনাথনাথ পালিত	,,	,, ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্য্যপ্রেস, শ্যামপুকুর।
,,	,,	,, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ
কবিরাজ সত্যচরণ সেন গুপ্ত	,, মৃণালকান্তি ঘোষ	,, প্রমথনাথ মিত্র লোকো আফিস, কাঁচড়াপাড়া।
,,	,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী চাঁচোল, মালদহ।
শ্রীযুক্ত সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	,, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ বিদ্যারত্ন ভারতী চতুষ্পাঠী, ৫নং ডক্টরস্ লেন।
,, মন্মথমোহন বসু	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী।	,, নগেন্দ্রকুমার বসু ২৭নং চুনাপুকুর লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	মনোনীত সভ্য।
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু ৪ নং গোকুলমিত্রের লেন।
,,	,,	,, নন্দলাল কবিরত্ন বিদ্যাবিনোদ জেনারেল এসেম্বলি।
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	,, অম্বিকাচরণ বসু উকীল, যশোহর।
,,	,,	,, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ
,,	,,	,, রাধিকানাথ দত্ত ঐ ঐ
,,	,,	,, কিরণচন্দ্র মিত্র ঐ ঐ
,,	,,	,, নিবারণচন্দ্র বসু ঐ ঐ
,,	,,	,, হীরালাল বসু ষ্টেশন মাষ্টার, ঝিকারগাছা।
,,	,,	,, হৃদয়নাথ মজুমদার হেড মাষ্টার, সম্মিলনী স্কুল, যশোহর।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন—অভিভাষণে আমি দুই চারিটী কথা বলিতে চাহি। আমার মনে হইয়াছিল, আজ গতবর্ষের সাহিত্যিক উন্নতির ইতিহাস দিতে পারিলে উপযুক্ত বিষয়ের চর্চ্চা হইত। সে বিষয়ে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই; যিনি সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও উদ্যোগী হয়েন নাই। বিদায়ে হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকে। বিশেষ আপনারা যেরূপ ভাবে আমার কৃত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে হৃদয় সহজেই কৃতজ্ঞতা ভারাবনত হইয়া পড়ে। গতবর্ষের পরিষদের কয়জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; অনেকে মুখ্যভাবে না হইলেও গৌণভাবে সাহিত্যকে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কথা আজ আমার বিশেষ মনে পড়িতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ইহা যেমন দুঃখের কথা, তেমনই আমাদের আনন্দের কথাও আছে। পরিষদের সুযোগ্য সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের বিচারকের পদে উন্নীত হইয়াছেন ও সে পদে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতেছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পালি ভাষায় প্রথম এম, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের সংগ্রহ ও প্রকাশ পরিষদের শুভ চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হইয়া এখন বিশেষ আদৃত হইয়াছে। পরিষদের গ্রন্থাবলী প্রকাশের

সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্তির আশাও করা যাইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় নানা বাধা দেখিয়া স্বহস্তে কার্য্যভার লইয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের আরও উদ্যোগী হওয়া আবশ্যক।

আলোচ্যবর্ষে যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই প্রধান। এ বিষয়ের আলোচনা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সংক্রান্ত তর্কবিতর্ক পরিষদের গাম্ভীর্য্যোপযোগী হউক বা না হউক—কারণ দুর্ব্বল প্রকৃতি আমাদের সত্যের আলোচনাও স্পর্দ্ধা ও সংস্কার কলুষিত হইয়া পড়ে—ইহাতে উপকার হইয়াছে। ব্যাকরণের গতি কোন্ দিকে হইবে তাহা বিবেচ্য। আমাদিগকে ভাষার স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন চেষ্টা করিতে হইবে। উপাদান বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইহা একান্ত সুখের বিষয়। বাঙ্গালায় আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। সে বিষয়ে সম্যক্ দৃষ্টি রাখিয়া ব্যাকরণ গঠন করিতে পারিলে একটি বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইংরাজীতে এখন লাটিন বহুল শব্দ সমাদৃত—জনসনের রচনা প্রণালী অব্যাহত। ব্রাইট, রাস্কিন প্রভৃতির ভাষা সুললিত; কিন্তু Anglo Saxon ভাষা সাধারণের বোধগম্য ও হৃদয়স্পর্শী হওয়াতেই তাহার সার্থকতা। পরিষদে তর্কবিতর্কে যদি বঙ্গভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা যথেষ্ট সুফল বলিতে হইবে।

বানান কিরূপ হইবে—phonetic হইবে কি না, মূল সংস্কৃতানুযায়ী হইবে কি মধ্যস্তরে পালির অনুযায়ী হইবে, তাহা বিবেচ্য। সাহিত্য ব্যবসায়ীরা যদি একটা পদ্ধতির অনুসরণ করেন তবেই একরূপ বানান স্থির ও প্রচলিত হয় ইহার একটা আদর্শ দিতে পারিলে ভাল হয়। উচ্চারণ সম্বন্ধেও একটা আদর্শ গঠনের চেষ্টা আবশ্যক ও সময়োপযোগী, সংস্কৃত উচ্চারণ সংস্কৃতে করিতে পারিলেই ভাল হয়। তাহা অপেক্ষাকৃত সহজও বটে, কারণ সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের যে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উচ্চারণ বিশুদ্ধি প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা রচনায় কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবে তাহা আলোচনার যোগ্য। সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম করা দুষ্কর। Loveএর অর্থ প্রেম প্রীতি ইত্যাদি, কিন্তু ভালবাসা বলিলেই ঠিক ভাবটি ব্যক্ত হয়। প্রচলিত কথা ত্যাগ করা সম্ভব হইবে না। সে সব কালের উপর নির্ভর করিবে। ভাষার সৌন্দর্য্য ও ভাব প্রকাশক শক্তি অব্যাহত রাখিয়া যিনি রচনা করিবেন তিনিই বরেণ্য। পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে।

আলোচ্যবর্ষে অনুবাদের কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। আগামীবর্ষে তাহাতে আরও মনোযোগ দিলে উপকার হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি গ্রন্থের বিশেষ অভাব আছে। এরূপ গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকও হইতে পারে। সুখের বিষয় যজ্ঞেশ্বরবাবু ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুবাদের ভার লইয়াছেন। আমাদের আরও মনোযোগ দান আবশ্যক।

গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে গৃহ যত অল্প হয় করা কর্ত্তব্য। গৃহ সুদৃশ্য, কার্য্যোপযোগী ও অল্পব্যয়-সাধ্য হওয়া আবশ্যক।

পরিষদের কার্য্যপ্রণালী প্রসার ও উন্নতি প্রাপ্ত হইলে পরিষদ গৌরবান্বিত হইবে এবং পরিষদের প্রশংসা সাহিত্য-সেবকের আগ্রহের বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। বঙ্গ সাহিত্যে বিদুষী সাহিত্য সেবিকার সংখ্যা এখন আর নগণ্য নহে; তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণিভুক্ত করিয়া সভ্যের যথাসম্ভব অধিকার দানের সময় আসিয়াছে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হস্তে পরিষদের ভার দিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। আশা করি তাঁহার হস্তে পরিষদ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

সহযোগী গ্রন্থরক্ষক নিয়োগ অনুমোদিত হইল।

যাবজ্জীবন সভ্য সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নিয়মের অনুমোদন কালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, যখন দুই শত টাকার সুদে বৎসরে ৬৲ টাকা হয়, তখন ৫০০৲ টাকার স্থলে ২০০৲ টাকা লইয়া যাবজ্জীবন সভ্য করিবার নিয়মই সঙ্গত। স্থির হইল, এ নিয়ম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার আলোচনা করিতে হইলে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া করিতে হইবে। নিয়ম অনুমোদিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত
সভাপতি।